আল কুরআনে নারী

প্রথম খন্ড

অধ্যাপক মোহাম্মদ মোশাররফ হোসাইন

আল কুরআনে নারী

প্রথম খণ্ড

অধ্যাপক মোহাম্মদ মোশাররফ হোসাইন

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
পরিচালক
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২

আঃ প্রঃ ২৯১

১ম প্রকাশ

জিলহাজ্জ	১৪২২
ফাল্গুন	১৪০৮
ফেব্রুয়ারী	২০০২

বিনিময় ঃ ৮২.০০ টাকা মাত্র

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

Al-QURANE NARE by Prof. Mohammad Mosharraf Hossian. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 82.00 Only.

প্রাসংগিক কথা

আল কুরআন আজকের দুনিয়ায় আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের একমাত্র নির্ভুল বাণী-সম্ভার। কিয়ামত পর্যন্ত মানব জাতির পথনির্দেশিকা হিসেবে একক গ্রহণযোগ্য গ্রন্থ আল কুরআন মানবজাতির জন্য আল্লাহর মহান এক নি'আমত। পৃথিবীতে মানুষ আল্লাহর খলীফা বা প্রতিনিধি। মহাকাশ ও মহাবিশ্বের যাবতীয় সৃষ্টিরাজি এ মানবজাতির কল্যাণের জন্যেই নিয়োজিত। দুনিয়ার জীবন সুচারুরূপে ও সুবিন্যস্তভাবে অতিবাহিত করে আখেরাতের জীবনে সার্বিক কল্যাণ ও পূর্ণ সাফল্য অর্জনের তথা রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি লাভের পথে চলার একমাত্র আলোকবর্তিকা এ আল কুরআন। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মানুষকে আল কুরআনই সঠিক পথের দিশা দিয়ে থাকে।

নারী-পুরুষ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনেরই প্রিয় সৃষ্টি। আল্লাহর রহমত ও দানের ব্যাপারে তিনি যেমন তাঁর সৃষ্টির মধ্যে কোনো পার্থক্য করেননি, তেমনি তাঁর বিধানে নারী-পুরুষের অধিকার ও মর্যাদার মধ্যেও কোনো তারতম্য রাখেননি। মহান আল্লাহ পুরুষদের জন্যে যেমন অপার করুণার আধার, তেমনি মহিলাদের জন্যেও তাঁর দয়া সীমাহীন। সংকীর্ণ দৃষ্টির কোনো মানুষের চোখেই বিভিন্ন কারণে মানুষে মানুষে পার্থক্য থাকতে পারে। কারণ, মানুষের জন্যে তো কেউ আপন, কেউ পর, কেউ কাছের আর কেউ দূরের হতে পারে। কিন্তু আল্লাহর চোখে তো সকল মানুষই সমান—আল্লাহর তো কেউ আপন, কেউ পর, কেউ কাছের, কেউ দূরের নেই। সুতরাং আল্লাহর বাণী আল কুরআনে নারী পুরুষ সকলের জন্যেই সমান কল্যাণকর বিধান দেয়া হয়েছে।

আজকের বিশ্বে ইসলাম বিদ্বেষীরা নারী অধিকার ও নারী মর্যাদা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ব্যাপদেশে ইসলামকেই দায়ী করে থাকে। মানব ইতিহাসে একমাত্র যেই ইসলাম নারীদের প্রকৃত মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে সেই ইসলামকেই ওরা দায়ী করছে নারী মর্যাদা ক্ষুণ্ন করার দায়ে ! আশ্চর্যের ব্যাপর হলো, এক শ্রেণীর তথাকথিত বুদ্ধিজীবি নামধারী মুসলিমগণও এ নির্জলা মিথ্যার বেসাতি করে বেড়াচ্ছে আজকের সমাজে। তারা বিভ্রান্ত করে ছাড়ছে আধুনিক বিশ্বের নতুন প্রজন্মকে। অথচ তাদের মনগড়া পথ নারী সমাজকে নিয়ে যাচ্ছে পশুত্বের এক মারাত্মক ও ঘৃণ্য পর্যায়ে।

আল্লাহর বাণী আল কুরআন ও রাসূলুল্লাহর সুন্নাহ সমন্বয়ে সুবিন্যস্ত পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান আল ইসলাম নারী-পুরুষের সার্বিক কল্যাণ নির্দেশ করেছে। 'নারী' বিষয়ে অনেক লেখক ও চিন্তাবিদের লেখা গ্রন্থরাজি বাজারে চালু

রয়েছে। "আল কুরআনে নারী" শীর্ষক বইটি সে ধরনের একটি বই নয়। বরং কুরআন শরীফে 'নারী' উল্লেখে যেসব আয়াত রয়েছে, সেসব আয়াত চয়ন করে তা থেকে উল্লেখযোগ্য আয়াতসমূহ বাছাই করে বিভিন্ন তাফসীরের আলোচনা থেকে এ বইটি লিখা হয়েছে। এজন্যে বইটিতে গতানুগতিক রীতিতে কোনো বিষয়ের অধীনে সংশ্লিষ্ট আয়াত নিয়ে আলোচনা করা হয়নি ; বরং আয়াতের অধীনে সেই আয়াতে সন্নিহিত বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহর বাণীর ভাবার্থ এতই ব্যাপক যে একই আয়াত থেকে বহুবিধ বিষয় বের করা যায় বিধায় একটি আয়াত কেবল মাত্র একটি বিষয়ের জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়া বৈধ বা সমীচীন মনে করিনি। এ কারণেই শিরোনামের নীচে আয়াত না লিখে, প্রচলিত রীতির খেলাফ আয়াতের নীচে শিরোনামের উল্লেখ করা হয়েছে। এতেকরে একই আয়াতের অধীনে উল্লিখিত শিরোনাম ছাড়াও যেন প্রয়োজনে অন্যান্য শিরোনাম ব্যবহারের অবকাশ থাকে বা অন্য কোনো বিষয়ের সাথে আয়াতটিকে সংযুক্ত করা যেতে পারে। কারণ, কিয়ামত পর্যন্ত যে কোনো পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে উদ্ভূত সমস্যাদির যেসব সমাধান আল কুরআনের আয়াতগুলোতেই বিদ্যমান রয়েছে, তা যেন প্রয়োজন মত বের করে সমাধান হিসেবে পেশ করা যায়।

তাছাড়া বইটির আলোচনায় বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়নি, বরং কুরআনের সূরাগুলোর ধারাবাহিকতা ঠিক রেখে বিভিন্ন আয়াতের বিষয়বস্তু বির্ধারণ করা হয়েছে। আলোচনার উৎসের উল্লেখ কোনো কোনো স্থানে অসতর্কতাবশত বাদ পড়ে গেছে। আবার কোথায়ও আলোচনা শেষ করে উৎসের উল্লেখ করা হয়েছে, কোথাওবা আলোচনার সাথেই উৎসের উল্লেখ করা হয়েছে। তবে সার্বিকভাবেই এ বইতে যেসব তাফসীরের সাহায্য গ্রহণ করেছি, তাহলো ঃ

১. আল কুরআনুল করীম—ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।
২. কুরআনুল হাকীম—শাহ রফি উদ্দীন (র) ও শাহ আশরাফ আলী থানভী (র)
৩. মা'আরেফুল কুরআন—মুফতী মুহাম্মদ শফী (র)
৪. তাফসীরে ইবনে কাসীর—আল্লামা ইবনে কাসীর (র)
৫. তাফহীমুল কুরআন—সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)
৬. বায়ানুল কুরআন—শাহ আশরাফ আলী থানভী (র)
৭. তাফসীরে মাজেদী—আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী।

৮. তাফসীরে মাযহারী—কাযী ছানা উল্লাহ পানীপথী (র)

৯. মিশকাত শরীফ—শেখ অলি উদ্দীন মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ (র)

১০. তাদাব্বুরে কুরআন—মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী (র)

১১. তাফসীরে হাক্কানী—মাওলানা আবদুল হক (র)

১২. আল কুরআনুল কারীম—মাওলানা মাহমুদুল হাসান (র) ও মাওলানা শিব্বির আহমদ উসমানী (র)

১৩. চল্লিশ হাদীসে কুদসী—ড. ইয্যুদ্দীন ইবরাহীম (র)

বিষয়বস্তু নির্ধারণে যেসব শিরোনামের উল্লেখ করা হয়েছে তা সংশ্লিষ্ট আয়াতের মর্মার্থ বিভিন্ন তাফসীর থেকে যেভাবে বুঝতে পেরেছি সেভাবেই উল্লেখ করেছি। এ ব্যাপারে সহৃদয় পাঠকমণ্ডলীর মন্তব্য/পরামর্শ পেলে বইটির মানোন্নয়নে সহায়ক হবে বলে আশা রাখি। ব্যক্তিগত ও দাপ্তরিক কার্যক্রম সম্পাদনের পর সময় পেলে লেখার কাজে হাত দিতে হয়েছে বিধায় অনেক সময় অতিবাহিত হলেও লেখাব কাজ শেষ করতে পারিনি। এদিকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় আগ্রহী ছাত্র ও শিক্ষকের তাগিদে ও অনুরোধে আপাততঃ যে পর্যন্ত লেখার কাজ সম্পন্ন হয়েছে তা-ই প্রকাশের উদ্যোগ নিতে হয়েছে। এজন্যে সূরা আন নিসা পর্যন্ত লেখা শেষ করে একে বইয়ের প্রথম খণ্ড হিসেবে ছাপানোর ব্যবস্থা নেয়া হলো।

সময়ের স্বল্পতার কারণে বইয়ের শিরোনামের অধীনে সন্নিবেশিত কিছু কিছু আলোচনা অতি সংক্ষেপে পেশ করা হয়েছে। ভবিষ্যতে তা সম্প্রসারণের ও পূর্ণাঙ্গ রূপদানের আশা রইল। বইটি বহুমুখী বিভ্রান্তি ও ষড়যন্ত্রের শিকার আজকের নারী সমাজের প্রকৃত অবস্থান, সত্যিকার মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টিতে সামান্য অবদান রাখতে পারলেও শ্রম সার্থক মনে করবো।

আধুনিক প্রকাশনী বইটি প্রকাশ করার দায়িত্ব গ্রহণ করায় সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। বইটি প্রকাশের কাজে বিভিন্নভাবে যারা সহযোগিতা করেছেন, প্রেরণা যুগিয়েছেন, ব্যবস্থা নিয়েছেন আল্লাহ সবাইকে নেক জাযা দিন।

—মোহাম্মদ মোশাররফ হোসাইন

সূচীপত্র

সূরা আল বাকারা

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১. জান্নাতে পুরুষরা পাবে পবিত্র নারী, আর নারীরা পাবে নিষ্কলুষ নর	১১
২. নরের জীবন-যাপনে নারীর আবশ্যকতা	১৪
৩. নরকে খতম করে নারীকে জীবিত রাখার মানব ইতিহাসের এক জঘন্যতম অধ্যায়	১৭
৪. মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার ও সকল মানুষের সাথে সদাচারের নির্দেশ পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহেও বিদ্যমান ছিল	১৯
৫. স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ সৃষ্টি জঘন্যতম কাজ	২২
৬. নারী হত্যাকারী যে-ই হোক না কেন, তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড	২৬
৭. স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের পোশাক স্বরূপ	২৯
৮. বৈবাহিক সম্পর্ক কি কেবল যৌন সম্পর্ক ?	৩৩
৯. হায়েজ অবস্থায় স্ত্রীর সাথে স্বামীর আচরণ	৩৬
১০. কেবল লালসাবৃত্তি চরিতার্থই কি স্ত্রী সহবাসের উদ্দেশ্য ?	৩৯
১১. স্ত্রীর সাথে সহবাস না করার কসম করলে	৪২
১২. স্ত্রীকে তালাক দেয়া ঃ ইদ্দত ও প্রত্যাহারের সময়সীমা	৪৪
১৩. স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক মর্যাদার মূলনীতি	৪৬
১৪. স্ত্রীকে বর্জন করতে হলে তা করবে সহৃদয়তার সাথে	৫০
১৫. সম্পর্ক ছিন্ন করার নিয়তে নিজেদের দেয়া কোনো কিছু স্ত্রীদের থেকে ফেরত নেয়া হারাম	৫৩
১৬. যখন তালাক প্রত্যাহারের সুযোগ থাকে না	৫৬
১৭. স্ত্রীকে কষ্ট ও যন্ত্রণা দেয়ার উদ্দেশ্যে বিবাহ বন্ধনে আটকে রাখা নিষেধ	৫৯
১৮. অভিভাবক বা পূর্ব স্বামী মহিলার নির্বাচিত স্বামী গ্রহণে বাধা দিতে পারবে না	৬১
১৯. শিশুকে দুধ খাওয়াবে মাতা, আর মাতার ভরণ-পোষণ দিবে পিতা	৬৩
২০. সহবাসের পূর্বেও যদি স্বামী মারা যায় তবুও স্ত্রীকে ইদ্দত পালন করতে হবে	৬৫

২১. ইশারা-ইংগিতে বিধবাদের বিবাহ পয়গাম জায়েয কিন্তু গোপনে বিবাহ-চুক্তি বৈধ নয় ৬৮
২২. স্ত্রীকে স্পর্শ না করলেও এবং মোহরানা ধার্য না হলেও তাকে তালাক দিলে অবশ্যই কিছু সম্পদ দিতে হবে ৭০
২৩. নারীরাও সাক্ষী হিসেবে গণ্য ৭২

সূরা আলে ইমরান

২৪. মাতৃগর্ভে আল্লাহই নিজের ইচ্ছানুযায়ী মানুষের আকৃতি গঠন করেন ৭৩
২৫. পার্থিব নেয়ামতসমূহের মধ্যে নারীর স্থান শীর্ষে ৭৫
২৬. বেহেশতের নেয়ামতসমূহের মধ্যে নারীও অন্তর্ভুক্ত ৭৮
২৭. নারীর গর্ভস্থ সন্তান আল্লাহর রাহে মান্নত করার ইতিহাস প্রসংগ ৮০
২৮. পুত্রের চেয়ে যে কন্যার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষিত হয়েছিল ৮২
২৯. বন্ধা নারী ও বৃদ্ধ স্বামীর সন্তান লাভ ৮৪
৩০. পবিত্রতা নারীদের উচ্চ-মর্যাদায় উন্নীত করে ৮৬
৩১. মর্যাদাবান নারীরা সমাজ বিমুখ থাকে না ৮৮
৩২. মহান আল্লাহ নর ছাড়া শুধু নারী থেকে সন্তান দিয়েছেন ৯০
৩৩. আমলের ক্ষেত্রে আল্লাহর কাছে নর-নারীর কোনো পার্থক্য নেই ৯২

সূরা আন নিসা

৩৪. যৌন আকর্ষণ সৃষ্টির মূল্য লক্ষ্য মানব বংশের বিস্তার সাধন ৯৪
৩৫. একজন পুরুষ শর্ত সাপেক্ষে সর্বাধিক চারজন নারী বিয়ে করতে পারবে ৯৭
৩৬. স্ত্রীদের মোহর তাদেরকেই দিতে হবে সন্তুষ্টি চিত্তে উদার মনে ১০২
৩৭. পূর্বপুরুষদের সম্পত্তিতে নারী-পুরুষ উভয়েরই অংশ নির্ধারিত ১০৪
৩৮. সম্পত্তি বন্টনে কন্যার অংশই হলো মূলভিত্তি ১০৬
৩৯. নারীরা যেমন বংশগত ওয়ারিশ তেমনি তারা বৈবাহিক ওয়ারিশও ১০৮
৪০. নারীকে অপরাধী সাব্যস্ত করার বিষয়ে কঠোরতা আরোপ ১১০
৪১. নারীদের জান-মালে বলপ্রয়োগ অবৈধ ১১২
৪২. স্ত্রীদের দেয়া অর্থ-সম্পদ ফেরত নেয়া অন্যায় ও প্রকাশ্য গুনাহ ১১৫
৪৩. পূর্ব পুরুষ ও অধস্তন পুরুষের স্ত্রীদের বিয়ে করা হারাম ১১৭
৪৪. যে ১৪ প্রকার মহিলাকে বিয়ে করা হারাম ১১৯

৪৫. স্ত্রী গ্রহণ করার ব্যাপারে আল্লাহর মীমাংসা ১২২
৪৬. বিবাহে মোহরানা নির্ধারণ করা ফরয ১২৫
৪৭. বিয়ে করবে স্বাধীন মুসলিম নারীকে ১২৭
৪৮. সম্ভ্রান্ত স্বাধীন মহিলাকে বিয়ে করার সামর্থ না থাকলে সবর করাই উত্তম ১২৯
৪৯. পুরুষ পাবে তার অর্জিত অংশ আর নারী পাবে তার অর্জিত অংশ ১৩১
৫০. পুরুষগণ নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল ১৩৪
৫১. অবাধ্য স্ত্রীকে সংশোধন করে নেয়ার নির্দেশ ১৩৬
৫২. স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কচ্ছেদের আশংকায় সালিসের মাধ্যমে মীমাংসার নির্দেশ ১৩৮
৫৩. ঈমান ও আমলের পুরস্কার প্রাপ্তিতে নারী-পুরুষের কোনো পার্থক্য নেই ১৪২
৫৪. ইয়াতীম মেয়ে ও ইয়াতীম শিশুদের হক সংরক্ষণে তাকীদ ১৪৫
৫৫. বিচ্ছিন্নতার চেয়ে আপোষ-মীমাংসা উত্তম ১৪৮
৫৬. এক স্ত্রীর প্রতি ঝুঁকে গিয়ে অন্য স্ত্রীকে ঝুলন্ত রেখো না ১৫২
৫৭. বিচ্ছেদের বিকল্প না থাকলে আল্লাহই প্রত্যেকের সহায় ১৫৫
৫৮. নিরপরাধ মারইয়ামকে দোষী সাব্যস্ত করার পরিণতি ১৫৭
৫৯. মীরাসের মাল নারীদের দিগুণ পাবে পুরুষরা ১৫৯
৬০. মু'মিনগণ কি কোনো অমুসলিমকে বিয়ে করতে পারে ? ১৬১
৬১. অপরাধী পুরুষ বা মহিলা—তাদের শাস্তি সমান ১৬৪
৬২. নারী অধিকার খর্ব করার জাহেলী যুগের একটি নমুনা ১৬৯
৬৩. আল্লাহর হুকুমের অবাধ্যতায় নারী-পুরুষ উভয়কেই চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয় ১৭২
৬৪. পৃথিবীর প্রথম জঘন্য অশ্লীলতা ও সেজন্য আল্লাহর গযব ১৭৬
৬৫. অসাধু নারী সাধু পুরুষের স্ত্রী হলেও তার নাজাত নেই ১৮১
৬৬. মুনাফিক পুরুষ-মহিলা উভয়ই সমাজে অপকর্ম ছড়ায় আর ভাল ও ন্যায় কাজে বাধার সৃষ্টি করে ১৮৩
৬৭. মুনাফিক নর-নারী ও কাফিরদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী জাহান্নাম ১৮৬
৬৮. মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন মহিলা সমাজে সৎ ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করে আর অসৎ ও অকল্যাণ প্রতিরোধ করে ১৮৮

এক

وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّهُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ○ (البقرة : ٢٥)

"জান্নাতবাসীদের জন্যে পূত-পবিত্র যুগল রয়েছে। সেখানে তারা স্থায়ীভাবে বসবাস করবে।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৫)

জান্নাতে পুরুষরা পাবে পবিত্র নারী আর নারীরা পাবে নিষ্কলুষ নর

সৎকর্মশীল ঈমানদার লোকদের জন্যে নির্ধারিত স্থায়ী নিবাস হবে জান্নাত। তথায় অনুপম সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণাদির মধ্যে পবিত্র যুগল বা জোড়ও থাকবে।

আরবী ভাষায় أَزْوَاجٌ (আয্ওয়াজ) যওজ শব্দের বহুবচন। অর্থ যুগল বা জোড়। স্ত্রী ও স্বামী উভয়ের জন্যেই এ শব্দ সমভাবে প্রযোজ্য। স্বামীর যওজ স্ত্রী, আর স্ত্রীর যওজ স্বামী। এ অর্থে সৎকর্মশীল পুরুষ পাবে পবিত্র রমণী আর সৎকর্মশীলা রমণী পাবে নির্মল চরিত্রের স্বামী।

দুনিয়ার জীবনে যে ব্যক্তি সৎকর্মশীল ঈমানদার, কিন্তু তার স্ত্রী যদি হয় অসৎ চরিত্রের দুষ্কর্মশীলা। এ ধরনের দুনিয়ার যুগলের পরকালের জীবনে পূর্বের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। অতপর সৎকর্মশীল ঈমানদার লোকটিকে স্ত্রী হিসেবে অন্য কোনো সৎকর্মশীলা পূত-পবিত্র রমণী দেয়া হবে। আর যদি মহিলাটি হয় সৎকর্মশীলা আর স্বামী হয় চরিত্রহীন বেঈমান। তখন ঐ অসৎ স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাকেও অন্য কোনো চরিত্রবান ঈমানদার স্বামী দেয়া হবে। অবশ্য কোনো দম্পতির উভয়ই যদি দুনিয়াতে নেককার হয়, তবে পরকালীন জীবনেও তাদের পূর্ব সম্পর্ক বহাল থাকবে। সর্বাবস্থায় তাদের এ সম্পর্ক হবে চিরস্থায়ী। দুনিয়ার জীবনের স্বামী-স্ত্রী বেহেশতেও স্বামী-স্ত্রী হিসেবে বহাল থাকবে। তাদের সম্পর্ক অটুট থাকবে।–(তাফহীমুল কুরআন)

কুরআন শরীফের অনেক মুফাস্সির উপরোক্ত আয়াতের তরজমায় (أَزْوَاجٌ) আযওয়াজ শব্দের অর্থ করেছেন স্ত্রী, সংগিনী বা রমণী শব্দ দিয়ে। কারণ, আয়াতের মধ্যে 'হুম' শব্দ পুরুষ বাচক সর্বনাম। তাই তাদের জন্যে আযওয়াজ হবে রমণী বা স্ত্রী। কিন্তু 'হুম' শব্দ পুরুষ বাচক সর্বনাম হলেও এর মধ্যে জান্নাতবাসীনী নারীও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যে শুধু

পুরুষ বাচক সর্বনামের ব্যবহার কুরআনের বিভিন্ন স্থানে পরিলক্ষিত হয়। যেমন كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ (তোমাদের জন্যে রোযা ফরয করা হলো) এখানে 'কুম' শব্দ পুরুষ বাচক সর্বনাম হলেও তা মূলতঃ নর-নারী উভয়ের জন্যে প্রযোজ্য।

উপরোক্ত আয়াতে কারিমায় اَزْوَاجٌ (আযওয়াজ) শব্দের বিশেষণ নেয়া হয়েছে مُطَهَّرَةٌ (মোতাহ্হারাহ) শব্দ। সুতরাং اَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ মানে পূত-পবিত্র যুগল বা জোড়া। আরবীতে পুংলিঙ্গ বাচক বহুবচন শব্দের صفت (বিশেষষণ) স্ত্রীলিঙ্গ বাচক একবচন শব্দ ব্যবহারের রীতি প্রচলিত আছে। কাজেই مُطَهَّرَةٌ শব্দের কারণেও 'আয্ওয়ায' শব্দ দ্বারা কেবল স্ত্রী বুঝাবে না।

হাদীসে কুদ্সীতে আছে ঃ

عن ابى هريرة رضـ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى اعددت لعبادى الصالحين ما لاعين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر -(رواه البخارى، ومسلم والترمذى وابن ماجاه)

হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ বলেছেন, "আমার নেক বান্দাদের জন্য আমি এমন অনেক কিছু রেখেছি, যা কোনো চক্ষু দেখেনি, কোনো কান শোনেনি, আর না কোনো মানুষের অন্তরে সে বিষয়ে জাগ্রত হয়েছে।–(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযি, ইবনে মাযাহ)

কুরআন শরীফের উল্লেখিত আয়াত ও হাদীস শরীফ থেকে জানা যায় জান্নাতে নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য মওজুদ থাকবে অসংখ্য নায-নিয়ামত ও বহু সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সামগ্রী, আরও থাকবে পবিত্র জীবন সংগী—জান্নাতী পুরুষের জন্য সতী-সাধ্বী ও পবিত্র নারী—আর জান্নাতী নারীর জন্য সৎ পুরুষ।

জান্নাতের পবিত্র জীবন সংগিনী বা স্ত্রী হবে যাবতীয় বাহ্যিক ও গঠনগত ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে পবিত্র, তাছাড়া পেশাব-পায়খানা রজস্রাব ইত্যাদি ঘৃণ্য বস্তুর উর্ধে। তেমনি নীতি ভ্রষ্টতা, চরিত্রহীনতা, অবাধ্যতা প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ ত্রুটি ও কদর্যতা–প্রভৃতির লেশমাত্রও তাদের মধ্যে পাওয়া যাবে না।

–(মাআরেফুল কুরআন)

জান্নাতে নর-নারীর পূত-পবিত্রতা বলতে বুঝায় গঠনগত ত্রুটি বিচ্যুতি ও চারিত্রিক কলুষতা মুক্ত হওয়া। তারা পেশাব-পায়খানা ইত্যাদি ঘৃণ্য বস্তু থেকে

পবিত্র ও নিষ্কলুষ থাকবে। অনুরূপভাবে নীতি ভ্রষ্টতা, চরিত্রহীনতা ও আবাধ্যতা প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ ত্রুটি এবং কদর্যতা থেকেও পবিত্র পরিচ্ছন্ন এমনকি নারীদের রজস্রাব থেকেও তারা মুক্ত থাকবে। অনুরূপভাবে নীতি ভ্রষ্টতা, চরিত্রহীনতা, অবাধ্যতা প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ ত্রুটি ও কদর্যতার লেশমাত্রও তাদের মধ্যে পাওয়া যাবে না। অর্থাৎ তারা বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীন দোষ তথা দৈহিক ও মানসিক যাবতীয় পংকিলতা, অপবিত্রতা ও নিকৃষ্টতা থেকে থাকবে সম্পূর্ণ পবিত্র ও স্বচ্ছ।

কুরআন ও হাদীসে জান্নাতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সামগ্রীকে মানুষের বুঝার জন্যে দুনিয়ার কোনো আরামদায়ক সুখ সামগ্রীর সাথে তুলনা করা হলেও তার অর্থ জান্নাত ও দুনিয়ার বস্তুর সামঞ্জস্যতা বর্ণনা করা নয়। বরং মানুষের জানাশুনা বস্তুর নিরিখে তা অনুধাবন করানোই উদ্দেশ্য। বস্তুত জান্নাতের কোনো নিয়ামতের নজীর দুনিয়ার কোথায়ও নেই। পৃথিবীর কোনো চোখ জান্নাতের নিয়ামত দেখেনি, কোনো কান সে ব্যাপারে শোনেনি, আর কোনো মানুষের অন্তরে তার ধারণারও উদ্রেক হয়নি।–(হাদীসে কুদ্‌সী)

উৎস ঃ ১। আল-কুরআনুল করীম–ইসলামিক ফাউণ্ডেশন

২. মায়ারেফুল কুরআন–মুফ্‌তী মুহাম্মদ শফী (র)

৩. কুরআনুল হাকীম–শাহ রফিউদ্দীন (র) ও আশরাফ আলী থানবী (র)

৪. বায়ানুল কুরআন–আশরাফ আলী থানবী (র)

৫. তাফহীমুল কুরআন–সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)

দুই

وَقُلْنَا يَاٰادَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلاَ مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ص

وَلاَ تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ○ (البقرة : ٣٥)

"আমি আদমকে বললাম, হে আদম ! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করতে থাক। আর সেখান থেকে যা-ই ইচ্ছা, পূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্য ও তৃপ্তি সহকারে খেতে থাক। কিন্তু এ গাছটির ধারেও যেয়ো না। অন্যথা তোমরা যালেমদের মধ্যে গণ্য হয়ে যাবে।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ৩৫)

নরের জীবন যাপনে নারীর আবশ্যকতা

আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করলেন মাটি থেকে। অতপর তারই সংগিনী স্ত্রী হিসেবে তার দেহাংশ থেকে তৈরী করলেন বিবি হাওয়া (আ)-কে এবং তাদের নির্দেশ দিলেন, জান্নাতে বসবাস করতে। এখানে আল্লাহ তা'আলা সরাসরি আদমকে নির্দেশ দিলেন যে, তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে বাস করতে থাক। জান্নাতের হাজারো রকমের নায-নেয়ামত ভোগ করার জন্যে আদমকে বলা হলো। কিন্তু এতসব নিয়ামতের মধ্যেও তাঁর সামগ্রিক প্রশান্তি ও পরিপূর্ণ তৃপ্তির জন্যে তাঁকে সস্ত্রীক থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অথাৎ আল্লাহ মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, স্ত্রী ছাড়া একজন পুরুষের জীবন যাপন অপূর্ণ থেকে যায়। তাই পৃথিবীর প্রথম মানুষ হযরত আদম (আ)-কে তৈরী করার পর পূর্ণাঙ্গ জীবন-যাপনের জন্যে সংগিনী (স্ত্রী) হিসাবে সৃষ্টি করলেন হযরত হাওয়া (আ)-কে। পূর্বের আয়াতের মত এখানেও হযরত হাওয়া (আ)-কে আদম (আ)-এর যওজ রূপে আখ্যা দেয়া হয়েছে।

দুনিয়াতে মানব জাতিকে নর ও নারী রূপে সৃষ্টি করার পেছনে মহান আল্লাহর বিশেষ সুকৌশল ও সুনিপুনতা বিরাজিত রয়েছে। যেমন সূরা আর রূমে ২১নং আয়াতে রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করেছেন ঃ

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا ـ

অর্থাৎ "তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে এও একটি যে, তিনি তোমাদেরই মধ্য হতে তোমাদের জোড় সৃষ্টি করেছেন। যেন তোমরা তাদের কাছে পরম প্রশান্তি লাভ করতে পার।" রাব্বুল আলামীন এমন ব্যবস্থা করেছেন যে, নর নিজ প্রকৃতির দাবী পূরণ করতে পারে নারীর কাছে, আর নারী তার প্রকৃতির দাবী পূরণ করে নরের কাছে। উভয়ই পরস্পরের সাথে সংযুক্ত সংশ্লিষ্ট হয়ে থাকবে আর একে অপরের কাছে লাভ করবে পরম শান্তি, তৃপ্তি, স্বস্তি ও আশ্বস্তি। এতে করে আল্লাহ তা'আলা একদিকে যেমন মানব বংশ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন, অপর দিকে তেমনি মানবীয় সভ্যতা ও তমদ্দুন সৃষ্টির মাধ্যমও বানিয়েছেন।

আল্লাহ মানুষকে পুরুষ ও স্ত্রী দুটো লিংগে বিভক্ত করে সৃষ্টি করেছেন। এদের দেহ গঠনের মৌল ফর্মূলা একই রকম। তবুও তারা পরস্পর হতে ভিন্ন ধরনের দৈহিক গঠন, মানসিকতা, আবেগ ও ভাবধারা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে থাকে। এতদ্‌সত্ত্বেও তাদের মধ্যে বিস্ময়কর সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্য রয়েছে। তারা সবাই পরস্পরের জন্যে পরিপূরক জুড়ি। সমস্ত পশু প্রজাতির মোকাবিলায় মানব জাতির মধ্যে সভ্যতা ও তমদ্দুন সৃষ্টির এটাই মূল কারণ যে, আল্লাহ এ নর-নারীকে পরস্পরের প্রতি এমন বাসনা-কামনা ও ব্যগ্রতা-ব্যাকুলতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন যে, একজন আরেক জনের সাথে মিলিত ও সংযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত কেউই প্রশান্তি লাভ করতে পারে না। এ প্রশান্তি প্রাপ্তি ও ভোগের আকাঙ্ক্ষা ও ভূমিকা উভয়েরই সমান। সুতরাং সভ্য জীবন-যাপনে নরের জন্যে যেমন নারী আবশ্যক, ঠিক তেমনিভাবে নারীর জন্যে আবশ্যক নরের।

মানব সৃষ্টির গোড়াতেই আল্লাহ তা'আলা নর-নারীকে পরস্পরের সান্নিধ্যে প্রশান্তি লাভের ব্যবস্থা করেছেন। জান্নাতে তাদের সামষ্টিক বাসস্থান নির্ধারণ করে নির্দিষ্ট গাছের ফল ছাড়া যে কোনো স্থানের যে কোনো খাদ্য গ্রহণের অনুমতি দিয়ে দিলেন তাদের। উপরোক্ত আয়াতে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, আল্লাহ বসবাসের ব্যাপারে বলেছেন, তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর। কিন্তু পরবর্তীতে খাদ্য ও অন্যান্য নির্দেশাদি পালনে বলেছেন তোমরা দু'জনে যা ইচ্ছা খেতে পারো ; কিন্তু দু'জন এ গাছের ধারেও যাবে না। অর্থাৎ তোমাদের অবস্থানের দিক থেকে স্বাতন্ত্র থাকবে ঠিক কিন্তু তোমরা জীবন-যাপনে পরস্পরের সহায়ক ও পরিপূরক হয়ে থাকবে।

এ পৃথিবীতে মানব সৃষ্টির সূচনাতেই আল্লাহ তা'আলা এভাবে মানব সমাজ ও মানব সভ্যতার ভিত্ রচনা করেছিলেন। এখান থেকেই পরিবার ও পারিবারিক জীবনের সূচনা। পরিবার গঠন ও পারিবারিক জীবন-যাপন করা

মানব জীবনের জন্য যেমন অত্যাবশ্যকীয়, তেমনি তা একটি উত্তম সমাজের জন্যও অপরিহার্য ভিত্তি স্বরূপ। পরিবারকে বাদ দিয়ে মানবতার বিকাশ ও মানবীয় চরিত্র অর্জন ও সংরক্ষণ–কিছুতেই সম্ভব নয়।

সূত্র ঃ ১. তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন ঃ মুফ্তী মুহাম্মদ শফী (র)

২. তাফসীরে ইবনে কাছির ঃ আল্লামা ইবনে কাছীর (র)

৩. তাফহীমুল কুরআন ঃ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)

তিন

وَاِذْ نَجَّيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ط وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ○(البقرة : ٤٩)

"স্মরণ করো সেই সময়ের কথা যখন আমি ফেরাউনী সম্প্রদায় থেকে তোমাদের মুক্তি দিয়েছিলাম, যারা তোমাদের মর্মান্তিক যাতনায় ডুবিয়ে রাখতো। তারা তোমাদের পুত্রদের যবাই করতো আর কন্যাদের জীবিত রাখতো। বস্তুত এটা ছিল তোমাদের রবের পক্ষ থেকে এক কঠিন পরীক্ষা।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ৪৯)

নরকে খতম করে নারীকে জীবিত রাখার মানব ইতিহাসের এক জঘন্যতম অধ্যায়

হযরত মূসা (আ)-এর সময়কার মিসরের দ্বিতীয় ফিরাউন বাদশাহর আমলের ঘটনা। একদা ফেরাউন স্বপ্নে দেখল যে, বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে একটা অগ্নিপিণ্ড মিসরের ফিরাউন বংশীয় কিব্‌তি লোকদের ঘরে ঘরে প্রবেশ করলো। ঐ স্বপ্নের ব্যাখ্যায় সে জানতে পারলো যে, বনী ইসরাঈল গোত্রের একটা লোকের হাতে তার রাজত্ব খতম হয়ে যাবে। আল্লামা ইবনে কাসির এভাবে বর্ণনা করেছেন। মুফতি শফি (র)-এর মতে কেউ তাকে একথার ভবিষ্যদ্বাণী করে ছিল। যাই হোক, এ স্বপ্ন বা ভবিষ্যদ্বাণীর প্রেক্ষিতে ফিরাউন তার রাজ্যের নবজাত পুত্র সন্তানদের হত্যা করতো আর কন্যা সন্তানদের জীবিত রাখতো। আল-কুরআনে ফিরাউনের এ আচরণকে বনী ইসরাঈলদের জন্য জঘন্যতম বিপদ ও পরীক্ষা বলে ঘোষণা করা হয়েছে। চারটি দৃষ্টিকোণ থেকে ইসরাঈলীদের জন্যে এটা মহাবিপদ ও পরীক্ষা ছিল। এক. ফিরাউনী বংশের হাতে তাদের বংশের ধ্বংস হওয়া এবং তাদের ভবিষ্যত বংশ বিস্তার খতম হয়ে যাওয়া। এভাবে ইতিহাসে তাদের নাম-নিশানা শেষ হয়ে যাওয়া। দুই. তাদের পুত্র সন্তানদের তাদেরই সামনে প্রকাশ্যে হত্যা করার কঠিন মর্মপীড়া। তিন. নর-নারীর প্রজন্মের ভারসাম্য লোপ পেয়ে মানবীয় পরিবেশ ক্ষতবিক্ষত হওয়া। চার. পুরুষরা পরিবারের কর্তা। জন্মগতভাবে পুরুষদের উপার্জন করার ও কঠোর জীবন পরিচালনার যোগ্য করে সৃষ্টি করা হয়েছে।

পুত্র সন্তানগণকে হত্যা করার পরিণামে পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ অংশকে ধ্বংস করা হতো। এটাও ইসরাঈলীদের জন্য কঠিন অগ্নি পরীক্ষা ছিল।

মূসা (আ)-এর যুগে তৎকালীন ফিরাউন তার রাজত্ব ও ক্ষমতা ঠিক রাখার জন্য মানব হত্যার এ জঘন্যতম পন্থা অবলম্বন করেছিল। মানবেতিহাসের এ হচ্ছে এক অমানবিক ও নির্মম অধ্যায়। নারীদের জন্য পুরুষ হচ্ছে জীবন-যাপনের অপরিহার্য স্বাভাবিক উপাদান স্বরূপ। নারী-পুরুষ পরস্পরের জন্য পরিপূরক হলেও উভয়ের গঠন-প্রকৃতি আর আজকের সামাজিক পরিবেশের নিরিখে নারীর জন্য বরং নর অধিক কাম্য। অথচ ফিরাউন তার তখ্‌ত ঠিক রাখার জন্য সমাজের প্রধান সদস্য নরকে হত্যা করে নারীকে ছেড়ে দিত। ফলে নারীর জীবন এক ভয়াবহ প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়ে পড়তো। এ ছিল নারীদের জন্য এক অসহনীয় যন্ত্রণা ও স্বাভাবিক জীবন-যাপনের পথে বিরাট প্রতিবন্ধকতা। এ যন্ত্রণা ও যুলুমকে আল্লাহ তা'আলা سُوْءَ الْعَذَابِ (মর্মান্তিক যাতনা) হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ)-এর অনুসারীদের ফিরাউনের সেই কঠোর শাস্তি থেকে উদ্ধারের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। আল্লাহ তা'আলা শেষ পর্যন্ত ফিরাউনকে নীল নদে নিমজ্জিত করে মূসা (আ)-এর সাথে বনী ইসরাঈলীদের নাজাত দিয়েছিলেন।

চার

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِىْٓ اِسْرَائِيْلَ لَاتَعْبُدُوْنَ اِلاَّ اللّٰهَ قف وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ط (البقرة : ٨٣)

"স্মরণ করো, যখন ইসরাঈল সন্তানদের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদাত করবে না, আর মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে ; আর ইয়াতীম ও মিসকীনের সাথেও। তাছাড়া মানুষের সাথে ভাল কথা বলবে। নামায কায়েম করবে ও যাকাত দিবে।"

–(সূরা আল বাকারা ঃ ৮৩)

মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার ও সকল মানুষের সাথে সদাচারের নির্দেশ পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহেও বিদ্যমান ছিল

উপরোক্ত আয়াতে প্রতীয়মান হয় যে, তাওহীদ পন্থী হওয়া, মাতা ও পিতার সেবাযত্ন করা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম-মিসকীন, বালক-বালিকা ও দীন দরিদ্রের সাথে সদ্ব্যবহার করা, সকল মানুষের সাথে নম্র ব্যবহার করা এবং নামায কায়েম করা ও যাকাত আদায় করা বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্বের শরীয়তসমূহেরও নির্দেশ ছিল। এখানে এসব বিষয়ে বনী ইসরাঈলের সাথে তাওরাতে এ অঙ্গীকারও পাকা-পোকত ওয়াদা নেয়া হয়েছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

আল কুরআনের বহু স্থানে মানব জাতিকে আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ মেনে নেয়ার নির্দেশের পর পরই নিজের মাতা ও পিতার সেবাযত্ন করার প্রতি তাগিদ দেয়া হয়েছে। বরং বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ সরাসরি তাওহীদের পরেই মাতা ও পিতার প্রতি ইহসান করার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلاَّ تَعْبُدُوْا اِلاَّ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ط -

"তোমার প্রভু নির্দেশ দিয়েছেন যে তোমরা আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদাত করো না, আর মাতা-পিতার সাথে ইহসান বা সদাচার করো।"–(সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৩)

সূরা লোকমানে বলেছেন ঃ

أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ط-(لقمان : ١٤)

"তুমি আমার প্রতি ও তোমার মাতা-পিতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও।"

এভাবে সৃষ্টিকর্তা রাব্বুল আলামীন নারীকেও অর্থাৎ মাতাকেও পিতার সাথে মর্যাদা দিয়ে নর-নারী সবাইকে নিজ নিজ মাতা ও পিতার খিদমত ও শোকর আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আর এ নির্দেশ হচ্ছে আল্লাহর একত্ববাদ স্বীকৃতির সাথে সাথে মাতা-পিতার প্রতি কর্তব্য পালন করার।

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর এক বাণীতে পিতার তুলনায় মাতা অর্থাৎ নারী জাতির সেবা শুশ্রূষার প্রতি অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। একদা জনৈক সাহাবী তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমি কার প্রতি সদাচার প্রদর্শন করবো ? তিনি বললেন, তোমার মায়ের প্রতি। দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করলেন, তারপর ? তিনি বললেন, তোমার মায়ের প্রতি। তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করলেন, তারপর ? তিনি এবারও জবাব দিলেন তোমার মায়ের প্রতি। ৪র্থবার জিজ্ঞাসিত হলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাব দিলেন, "তোমার পিতার প্রতি।" অন্য হাদীসে কিছু সংযোজন করা হয়েছে যে, অতপর তোমার রক্ত সম্পর্কের নিকটাত্মীয়ের প্রতি।

হযরত আদম (আ) তথা পৃথিবীর প্রথম মানুষ ও প্রথম নবী থেকে শুরু হয় মানব জাতির প্রতি আল্লাহর হুকুম-আহকাম ও বিধানাবলীর নির্দেশনা। মানব জাতির প্রতি আল্লাহর প্রতিটি নির্দেশে নিহিত রয়েছে মানুষের কল্যাণ আর প্রতিটি নিষেধের মধ্যে তাদের ধ্বংস ও ক্ষতির কারণ। তাওহীদ বা একত্ববাদে বিশ্বাস ও আমল মানুষের স্বার্থেই আবশ্যকীয়। মাতা-পিতা হচ্ছে পৃথিবীতে মানুষের বংশের সিল্‌সিলা জারী থাকার একমাত্র কার্যকর মাধ্যম। এজন্যে তাওহীদী আকীদার পাশাপাশি মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করার জন্য রাব্বুল আলামীন নির্দেশ দিয়েছেন। আবার মৌলিক ইবাদাতের পাশাপাশি মানুষের সাথে সদাচার তথা আল্লাহর মাখলুকাতের হক আদায় করাও কর্তব্য। ইয়াতীম, মিসকীন, আত্মীয় স্বজন—সকলের সাথে সদ্ব্যবহার করার, সকল মানুষের সাথে ভাল কথা বলার নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ তা'আলা।

মানবেতিহাসের সকল অধ্যায়েও নবী রাসূলগণের যুগে আল্লাহর মৌলিক বিধান অপরিবর্তনীয়। সকল যুগের মানুষের জন্যই কল্যাণ ও অকল্যাণের মৌলিক আমল অভিন্ন। বরং ইবাদাতের মৌল কাঠামোতে সংযোজন এবং পরিবর্তন হলেও তাওহীদী আকীদা, মাতা-পিতার প্রতি সদাচার, মানুষ তথা সকল সৃষ্টিকে ভালবাসার নির্দেশ রয়েছে অপরিবর্তনীয়। কারণ, এযে মানুষের প্রাকৃতিক প্রয়োজন।

সূত্র ঃ ১. কুরআনুল কারীম ঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন

২. কুরআনুল হাকীম ঃ শাহ রফিউদ্দীন (র) ও আশরাফ আলী থানবী (র)

৩. মাআরেফুল কুরআন–মুফতী মুহাম্মদ শফী (র)

৪. তাফহীমুল কুরআন ঃ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)

৫. তাফসীরে ইবনে কাসির–আল্লামা ইবনে কাসির (র)

পাঁচ

فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهٖ ط-(البقرة : ١٠٢)

"তারা (ফেরেশতাদের কাছে) এমন তদবীর শিখতো যাতে তারা স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটাতো।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ১০২)

স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ সৃষ্টি জঘন্যতম কাজ

হযরত সোলায়মান আলাইহিস সালামের যুগের একটি ঘটনা এখানে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে। তখন লোকদের নিকট অধিকতর চাহিদার বিষয় ছিল তাবিজ-তুমার বা যাদুর প্রভাবে অন্যের স্ত্রীকে তার থেকে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে নিজের দিকে আকৃষ্ট করা। হারূত ও মারূত নামের দু'জন ফেরেশতাকে আল্লাহ তা'আলা পরীক্ষার জন্যে দুনিয়াতে পাঠিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত তারা পরীক্ষায় টিকতে পারেনি। ঘটনাটি সংক্ষেপে এই ঃ

একদা কতিপয় ফেরেশতা মানব জাতির আমল নিয়ে সমালোচনা করে আল্লাহকে বললো, যেই মানব জাতিকে তোমার ইবাদাতের জন্যে সৃষ্টি করেছ, তারাই তো তোমার নাফরমানীতে লিপ্ত। আল্লাহ বললেন, মানুষ আমাকে দেখছে না বিধায় এমনটি করছে। কোনো কোনো বর্ণনা মতে ফেরেশতাদের অভিযোগ ছিল মানুষ দুনিয়াতে ন্যায় বিচার করে না। আল্লাহ বললেন ঃ তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন ফেরেশতাকে আন। অধিক সদাচারী দু'জন ফেরেশতা হারূত ও মারূতকে নফসের খাহেশ দিয়ে পরীক্ষার জন্যে দুনিয়াতে পাঠানো হলো। জোহরা নাম্নী একটি অতি সুন্দরী মহিলাকে দেখে তারা ঠিক থাকতে পারলো না। কোনো কোনো বর্ণনা মতে মহিলাটি হযরত হারূত ও মারূতের আদালতে তার স্বামীর বিরুদ্ধে এক মোকদ্দমা নিয়ে এসেছিল। অবশেষে হত্যা করা, শরাব পান করা ও মূর্তিপূজা করার মধ্যে যে কোনো একটি শর্ত পূরণ করলে ঐ মহিলা ফেরেশতাদ্বয়কে তাদের বাসনা পূরণ করতে দেবে বলে সম্মতি জানালো। কিন্তু আল্লাহ তো তাদের পাঠানোর সময় ঐসব কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়ে পাঠিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত তাদের প্রবৃত্তির ওয়াস্ওয়াসায় তারা শরাব পান করাকে অপেক্ষাকৃত কম জঘন্য মনে করে শরাব পান করলো। অতপর যেই একজন ফেরেশতা তার বাসনা পূরণে উদ্যত হলো তখনি মহিলাটি বললো, আচ্ছা তোমরা কি পড়ে আকাশে উঠে

যাও তা আমাকে বলো। তবে তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূরণ করবো। তারা তাকে ওটা শিক্ষা দিল। মহিলাটি তা পড়ে আকাশে উঠে গেল। সেখানে সে অগ্নিপিণ্ডে পরিণত হয়ে স্থবীর হয়ে গেল। আজকেও জোহরা সেতারা নামে মানুষ তাকে জানে। তাফসীরকারকদের এ ঘটনাকে অনেক মুহাক্কিক আলেম ইসরাঈলী রেওয়ায়াতের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন। হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী তাঁর তাফসীরে বলেছেন ঃ যে এ ঘটনাটি কোনো নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েত দ্বারা সমর্থিত নয়। ইবনে কাসীরের উদ্ধৃত এ ঘটনাকে তিনি আয়াতের ব্যাখ্যার ভিত্তি নয় বলে উল্লেখ করেছেন।

উপরোক্ত আয়াতে তখনকার মানুষ যে ঐ দু'জন ফেরেশতা থেকে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানোর তদবীর বা যাদু শিখতো ; তাদের নৈতিক অধঃপতনের সেই জঘন্যতম অবস্থার বর্ণনা করা হয়েছে। ফেরেশতাদ্বয় মানুষকে স্পষ্ট ভাষায় সাবধান করে দিতো যে, আমরা তো পরীক্ষার জন্যে এসেছি। সুতরাং তোমরা এসব করে—নিজের পরকাল ধ্বংস করো না। এতদসত্ত্বেও মানুষ তাদের কাছ থেকে তাবীজ-তুমার বা আমালিয়াত গ্রহণের জন্যে পাগল হয়ে গেল।

মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) তাঁর "তাফসীরে মাআরেফুল কুরআনে" হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভীর বায়ানুল কুরআনের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, এক সময়ে বাবেল শহরে যাদু বিদ্যার খুব প্রচলন ছিল। যাদুর অত্যাশ্চার্য ক্রিয়া দেখে মূর্খ লোকদের মধ্যে যাদু ও মোজেযার মধ্যে বিভ্রান্তি দেখা দেয়। কেউ কেউ যাদুকরদের সজ্জন ও অনুসরণ যোগ্য মনে করতে থাকে, আবার কেউ কেউ যাদুকে পূন্য কাজ মনে করে তা শিখতে ও আমল করতে থাকে। যেমন আজকাল মেস্‌মারিজমের বেলায়ও তাই হচ্ছে। এ বিভ্রান্তি দূর করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা বাবেল শহরে হারূত ও মারূত দুজন ফেরেশতা পাঠান। তাদের দায়িত্ব ছিল যাদুর স্বরূপ ও ভেল্কিবাজী সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা—যাতে বিভ্রান্তি দূর হয় এবং মানুষ যাদুর আমল ও যাদুকরদের থেকে দূরে থাকে। নবীদের নবুওয়াতের জন্য যেমন মুজেযা দেয়া হয় তেমনি হারূত ও মারূতের ফেরেশতা হওয়ার প্রমাণ সহ তাদের পাঠানো হলো।

ফেরেশতাদ্বয় বাবেল শহরে তাদের কাজ শুরু করে দিলেন। তারা যাদুর মূল ও শাখা-প্রশাখা বর্ণনা করে জনগণকে এ কু-কর্ম থেকে বিরত থাকার ও যাদুকরদের ঘৃণা করার উপদেশ দিলেন। এ সময় বিভিন্ন লোক বিভিন্ন সময়ে ফেরেশতাদের কাছে আসা-যাওয়া করতে থাকে। পরে এসব যাতায়াতকারীগণ অনুরোধ করতে থাকে যে, তাদেরকেও যাদুর মূল ও শাখা-প্রশাখা শিখিয়ে

দেয়া হোক যেন তারা অজ্ঞতাবশতঃ এতে বিশ্বাসী না হয়ে পড়ে অথবা কোনো অপকর্মে লিপ্ত হয়ে না পড়ে। ফেরেশতাগণ তাদের অনুরোধ রক্ষা করে যাদু শিখিয়ে তাদের সাবধান করে দিতো, "দেখ ! আমাদের উপদেশ এই যে, তোমরা যেন যাদু বিদ্যা শিখেও সুনিয়্যাতের উপর কায়েম থাক। এমন যেন না হয় যে আত্মরক্ষার অজুহাতে আমাদের থেকে যাদু শিখে নিজেই অপকর্মে লিপ্ত হয়ে পড় ! আর দ্বীন ও ঈমান বরবাদ করে বসো।

এভাবে যারা ওয়াদা অঙ্গীকার করতো তাদের যাদুর মূল ও শাখা-প্রশাখা বলে দেয়া হতো। অতপর কেউ কেউ ওয়াদা ভংগ করে সৃষ্টজীবের অনিষ্ট করতো। এটা নিশ্চিতরূপেই একটি দুষ্কর্ম ছিল।

দাম্পত্য সম্পর্ক মানব সভ্যতার ভিত্তি স্বরূপ। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সুষ্ঠু ও সঠিক সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার উপরই গোটা মানব সমাজের সুষ্ঠুতা একান্তভাবে নির্ভর করে। অন্যথা পুরো সমাজটিই চূর্ণবিচূর্ণ হতে বাধ্য। হাদীস শরীফে আছে, ইবলীস তার কর্মকেন্দ্র থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে তার এজেন্ট প্রেরণ করে। তারা ফিরে এসে নিজ নিজ রিপোর্ট পেশ করে থাকে। কেউ বলে আমি অমুক বিপর্যয় সৃষ্টি করেছি, কেউ বলে আমি অমুক অশান্তি ঘটিয়েছি, কেউ বলে আমি অমুক পাপাচার সংঘটিত করেছি। কিন্তু তাদেরই রিপোর্টের জবাবে ইবলীস মন্তব্য করে যে, তোমরা কিছুই তো করনি। অবশেষে একটা এজেন্ট এসে বলে আমি একটি দম্পতির মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করেছি। একথা শুনে ইবলীস তার সাথে আলিংগন করে বলে, "তুমিই তো একটা কাজের মত কাজ করেছ।"

মানুষের প্রকাশ্য শত্রু শয়তান মানব জীবন, মানব পরিবার ও মানব সভ্যতার ভিত্ স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক বিনষ্ট করতে পারলেই খুশী হয়। আর এ সম্পর্ক স্থাপিত হয় বিবাহের পবিত্র বন্ধন দিয়ে। আজকের সমাজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে পর্যালোচনা করলে ঐ সময়ের শয়তানের চরিত্রের সাথে সামঞ্জস্য দেখা যায়। সে যুগের লোকদের নৈতিক ও চারিত্রিক অধপতনের গভীরতা যেমন উক্ত অবস্থা থেকে জানা যায়, তেমনি তার সাথে তুলনা করে বর্তমান সমাজকেও মূল্যায়ন করা সহজ হয়। আমাদের সমাজের প্রত্যেক আনাচে-কানাচে আজকে যেন হযরত সোলায়মান (আ)-এর যুগের লোকদের চারিত্রিক অধঃপতনের চূড়ান্ত রূপায়ণ ঘটছে। কথায় কথায় তাবীয-তুমার ও যাদু-বিছট করে সামাজিক অশান্তি মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। তাবীয করে অন্যের স্ত্রীকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করা, অন্যের কন্যাকে অবৈধভাবে নিয়ে যাওয়া আজকের নৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। আর সে পথ সহজ

করে দিয়েছে বেপর্দায় মহিলাদের চলাফেরা, তাদের বেপরোয়া যত্রতত্র বিচরণ, সহশিক্ষার প্রচলন ও সিনেমা টি. ভি.র অশ্লীল ছবি প্রদর্শন। একশ্রেণীর বিকৃতমনা তথাকথিত বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অদূরদর্শিতা ঘেরা অজ্ঞতা আমাদের সমাজের এহেন বিরূপ পরিবেশ সৃষ্টির সহায়ক ও লালনকারীর ভূমিকায় তৎপর থাকায় এ অধপতিত সমাজের বিশুদ্ধতা লাভের সম্ভাবনার বিলুপ্তি ঘটেছে।

আজকের সমাজে মানুষ যে কোনো হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার মানসে তারই মত আরেকজন লোককে যথাযথ কারণ ছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত এমনকি হত্যা পর্যন্ত করে বসে। আর গ্রামে-গঞ্জে পর্যন্ত খনার-খলীফা দিয়ে তাবীজ-তুমার করে মানুষের ক্ষতি করতে এমনকি জানে শেষ করে দিতেও কুণ্ঠাবোধ করছে না। সামান্য স্বার্থ হাসিলের জন্যও মানুষ মানুষকে প্রতারিত করতে এমনকি জীবনে শেষ করে দিতে এতটুকুও ইতঃস্তত করে না।–(তাফসীরে ইবনে কাসীর ও মা'আরেফুল কুরআন)

ছয়

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ـ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى ـ(البقرة : ١٧٨)

"(হে যারা ঈমান এনেছ) তোমাদের জন্যে নর হত্যার কিসাস গ্রহণ সম্পর্কিত বিধান দেয়া হলো। স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস ও নারীর বদলে নারী।"

–(সূরা আল বাকারা ঃ ১৭৮)

নারী হত্যাকারী যেই হোক না কেন, তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড

স্বাধীন ব্যক্তির হত্যাকারী কোনো স্বাধীন ব্যক্তি হলে যেমন তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে, তেমনি কোনো ক্রীতদাস বা কোনো নারী হত্যার বদলেও হত্যাকারী স্বাধীন ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। স্ত্রী হত্যার অপরাধে পুরুষকে এবং পুরুষ হত্যার অপরাধে স্ত্রীলোককে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। কোনো প্রভাবশালী ক্ষমতাধর ব্যক্তিকে যেমন, কোনো একজন প্রভাবশালী পুরুষ লোকের কিসাস স্বরূপ মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে, তেমনি তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে একজন অসহায় নারী হত্যার কিসাসেও।

ইসলাম পূর্ব জাহেলী যুগে একজন নিহত ব্যক্তির হত্যাকারীর মৃত্যুদণ্ডকে যথেষ্ট মনে করা হতো না, বরং তারা প্রতিপক্ষের বহুলোককে হত্যা করা ছাড়া তাদের প্রতিশোধ স্পৃহা অবদমিত হতো না তেমন দাস বা নারী হত্যার কিসাসে তারা স্বাধীন পুরুষদের বহু লোককে হত্যা করার আগে শান্ত হতো না।

উপরোক্ত আয়াতে যে স্বাধীনের বদলে স্বাধীন, দাসের বদলে দাসের এবং নারীর বদলে নারীর মৃত্যুদণ্ডের কথা বলা হয়েছে, তা ছিল জাহেলী যুগের এক বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে।

আল্লামা ইবনে কাসীর (র)-এর বর্ণনা অনুযায়ী ইসলাম পূর্ব আরব গোত্রের মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ঘটে। এতে স্বাধীন পুরুষ, নারী ও কৃতদাসের বহু লোক নিহত হয়। তাদের পরস্পরের মধ্যে বিষয়টির নিষ্পত্তি হওয়ার পূর্বেই ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়, আর তারা উভয় গোত্রই ইসলাম

গ্রহণ করে। ইসলাম গ্রহণের পর তাদের মধ্যে কিসাস সম্পর্কে কথাবার্তা চলছিল। তাদের প্রবল গোত্রটি দাবী করে বলে যে, তাদের প্রত্যেক নিহত পুরুষ, নারী ও কৃতদাসের পরিবর্তে অপর গোত্রের, এক একজন স্বাধীন লোককে হত্যা না করা পর্যন্ত তারা কোনো মীমাংসায় পৌঁছবে না। তাদের এহেন জাহেলিয়া সুলভ দাবীর জবাবে উপরোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। যাতে তাদের মীমাংসার জন্যে কিসাস স্বরূপ স্বাধীন পুরুষের বদলে স্বাধীন পুরুষ, নারীর বদলে নারী, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাসকে মৃতদণ্ড দেয়ার বিধান দেয়া হয়েছে। ইসলামে হত্যাকারীকেই হত্যার বদলে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার ইনসাফ ভিত্তিক বিধান জারী করা হয়েছে।

হত্যা জঘন্য অপরাধ। একটি জীবন, চাই তা স্বাধীন ব্যক্তির হোক, অথবা গোলামের জীবন হোক ; চাই তা পুরুষের হোক, অথবা হোক কোনো নারীর। হত্যার পরিবর্তে হত্যাই হলো ইনসাফপূর্ণ কাজ আর তা ভবিষ্যতের জন্য সামাজিক নিরাপত্তার গ্যারান্টিও বটে। অপরাধের বিচার যথার্থ ও ইনসাফপূর্ণ না হলে সে সমাজে মানব জীবনে শান্তি ও নিরাপত্তার সম্ভাবনা থাকে না। রাব্বুল আলামীন তাই সামাজিক অনাচারের মূলোৎপাটনের ব্যবস্থাই করেছেন এ আয়াতের নির্দেশে।

'قصاص' (কিসাস)-এর শাব্দিক অর্থ সমপরিমাণ বা অনুরূপ। অর্থাৎ কারো উপর যতটুকু যুলুম করা হয়েছে তার সমপরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করা মাযলুমের জন্য জায়েয। তার চাইতে বেশী করা জায়েয নয়। এ সূরার ১৯৪ আয়াতে এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলা হয়েছে ঃ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ অর্থাৎ "তার উপর ততটুকু বাড়াবাড়ী কর যতটুকু বাড়াবাড়ী সে তোমাদের উপর করেছে।" তেমনিভাবে সূরা নহলের ১২৬ আয়াতে রয়েছে وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ "আর যদি তোমরা তাদের থেকে প্রতিশোধ নিতে চাও তবে ততটুকু প্রতিশোধ নাও, তারা তোমাদেরকে যতটুকু কষ্ট দিয়েছে।"

হত্যার অপরাধে যেমন স্বাধীন ব্যক্তির হত্যাকারী স্বাধীন ব্যক্তিকে মৃতুদণ্ড দেয়া হবে, তেমনি কোনো ক্রীতদাসের বেলায়ও কোনো স্বাধীন ব্যক্তিকে মৃতুদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। ঠিক তেমনিভাবে নারী হত্যার অপরাধে পুরুষকে এবং পুরুষ হত্যার অপরাধে স্ত্রী লোককেও মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। আলোচ্য আয়াতে স্বাধীন ব্যক্তির বদলায় স্বাধীন ব্যক্তি এবং স্ত্রীলোকের বদলায় স্ত্রীলোককে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার যে কথা বলা হয়েছে, তা কেবল একটা বিশেষ

ঘটনার প্রতি ইংগিত করে বলা হয়েছে যে, বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়েছিল।

আয়াতের মর্মার্থ এটাই সাব্যস্ত হয় যে, যে ব্যক্তি হত্যা করেছে কেবল সেই ব্যক্তিই কিসাসে দণ্ডিত হবে। সুতরাং কোনো নারীকে যদি কোনো পুরুষ হত্যা করে থাকে তবে ঐ নারীর কিসাসে তার হত্যাকারী সেই পুরুষকেই মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে।-(মুফতী মুহাম্মদ শফী (র), তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন)

সাত

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ ط هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ط عَلِمَ اللّٰهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ج فَالْئٰنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ ص (البقرة : ١٨٧)

"সিয়ামের রাতে তোমাদের জন্যে স্ত্রী সহবাস হালাল করা হলো। তারা তোমাদের জন্যে পোশাক আর তোমরাও তাদের জন্যে পোশাক। আল্লাহর জানা আছে যে, তোমরা নিজেদের সাথে নিজেরাই খিয়ানত করেছ। তিনি তোমাদের তাওবা কবুল করেছেন ও তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন। এখন তোমরা স্ত্রী সহবাস কর আর তোমাদের জন্যে আল্লাহ যা হালাল করে দিয়েছেন তা সন্ধান কর।"-(সূরা আল বাকারা ঃ ১৮৭)

স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের পোশাক স্বরূপ

আলোচ্য আয়াতে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতা, নৈকট্য ও অবিচ্ছেদ্যতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। দেহ ও পোশাক যেমন পরস্পরের একান্ত ঘনিষ্ট অবিচ্ছেদ, স্বামী-স্ত্রীও তেমনি একে অপরের জন্যে একান্ত আপনজন। পোশাক যেমন দেহকে হেফাজত করে ও তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, স্বামী-স্ত্রীও তেমনি পরস্পরকে সংরক্ষণ ও পরস্পরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। পোশাক যেমন শীত ও গরমের ক্ষতি থেকে রক্ষা করে, স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য সম্পর্কও মানুষকে পদস্খলন ও জীবনের দুঃখ-দুর্দশা থেকে বাঁচিয়ে রাখে। সমস্যাটি তৎকালীন সাহাবায়ে কিরামের সিয়াম পালন ব্যাপদেশে উদ্ভূত সমস্যার সমাধানকে কেন্দ্র করে দেখা দিয়েছিল। তখন ইফতার গ্রহণের পর থেকে নিদ্রা গমন পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী সহবাস জায়েয ছিল। কিন্তু নিদ্রাগমনের পর রাত্রি থাকা সত্ত্বেও কেউ পানাহার বা স্ত্রী সহবাস করতে পারতো না। আল্লামা ইবনে কাসীরের মতে ইসলামের প্রথম দিকে তা ছিল নিষিদ্ধ। এ আয়াতে তা হালাল করা হয়েছে। কিন্তু তাফহীমুল কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ ব্যাপারে কোনো সুস্পষ্ট নীতি বিধান ছিল না। তবুও মুসলমানরা এরূপ করাকে নাজায়েয বলেই মনে করতো। নাজায়েয অথবা মাকরূহ ধারণা থাকা সত্ত্বেও তারা স্ত্রী সহবাস করতেন। এতে তাঁদের মনে অপরাধী ভাব বিরাজ করতো। এ আয়াতে আল্লাহ

মু'মিনদের মনের সংকীর্ণতা পরিহার করে বিবেকের পূর্ণ আশ্বস্তি ও পবিত্রতার অনুভূতি সহ স্ত্রীগমন করার নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লামা ইবনে কাসীর (র) তাঁর তাফসীরে ইবনে কাসীরে অনেকগুলো বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন। এখানে সংক্ষিপ্ত একটি বর্ণনার উদ্ধৃতি দেয়া গেল।

একদিন হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা) দাঁড়িয়ে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! বিগত রাত্রে আমি আমার স্ত্রীর কাছে সেই অভিলাষ ব্যক্ত করেছিলাম যা সাধারণত একজন পুরুষ তার স্ত্রীর কাছে করে থাকে। আমার স্ত্রী জানালো, সে ঘুমিয়েছিল। কিন্তু তার সে কথাকে আমি বাহানা মনে করে তার সাথে সহবাস করেছি। এ ঘটনার পর উপরোক্ত আয়াত ঃ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ নাযিল হয়।

ঘটনাটির আরেকটি দিক হলো হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রা)-এর বর্ণনা। তিনি বলেন, পরদিন প্রত্যুষেই উমর ইবনে খাত্তাব (রা) রাসূলের খিদমতে হাজির হয়ে তাঁর অবস্থা (উপরোক্ত ঘটনা) বর্ণনা করেন। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন ঃ

عَلِمَ اللّٰهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ج فَالْئٰنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَاكَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ ص -(البقرة : ١٨٧)

"তোমরা যে নিজেদের ব্যাপারে খেয়ানত করেছিলে তা আল্লাহ জানেন। অতপর আল্লাহ তোমাদের তাওবা কবুল করেছেন, আর তোমাদের ক্ষমা করেছেন। সুতরাং এখন থেকে তোমরা (সুবহে সাদেক পর্যন্ত) স্ত্রী সহবাস করতে পার।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ১৮৭)

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ -

"স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য পোশাক আর তোমরাও তাদের জন্য পোশাক।"

উক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় হযরত ইবনে আব্বাস (রা), মুজাহিদ, সাঈদ ইবনে যুবাইর প্রমুখ বলেন ঃ

هُنَّ سَكَنٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ سَكَنٌ لَهُنَّ -

"স্ত্রীগণ তোমাদের মানসিক শান্তি ও তৃপ্তি স্বরূপ আর তোমরাও তাদের জন্যে শান্তি ও তৃপ্তি স্বরূপ।"

রবী ইবনে আনাস এর ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে ঃ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ অর্থাৎ "তারা তোমাদের জন্যে লেপ স্বরূপ আর তোমরাও তাদের জন্যে লেপ স্বরূপ।"

এসব ব্যাখ্যার সারকথা হলো স্বামী-স্ত্রী উভয়কে এক সাথে অহরহ মিলে-মিশে থাকতে হয় এবং পরস্পরের সান্নিধ্যে ও সংস্পর্শে জীবন কাটাতে হয়। একই শয্যায় শয়ন করতে হয়। সুতরাং রমযানের রাতের বেলায় রোযা যেন তাদের জন্যে পীড়াদায়ক না হয়, সেজন্যে রযমানের রাতে স্ত্রীসহবাস হালাল করে দেয়া হয়েছে।

মানব সৃষ্টির আদিকাল থেকেই স্বামী-স্ত্রী সহবাসকে আল্লাহ তা'আলা মানুষের স্বভাবগত ধর্মে পরিণত করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা যে কারণে প্রথম মানুষ হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করে বিবি হাওয়া (আ)-কে তার জীবন সংগীনি (স্ত্রী) হিসাবে সৃষ্টি করে বেহেশতে শান্তিতে বসবাস করতে দিলেন। মানব বংশ রক্ষার জন্যে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ থেকে একজন পুরুষ ও একজন মহিলাকে দিয়ে সমাজ জীবনের ভিত্তি স্থাপিত করতেই ইসলামে বিবাহ নীতির প্রবর্তন করা হয়েছে। এটি হচ্ছে ফিতরাতের ধর্ম ইসলামের স্বাভাবিক পদ্ধতি।

আলোচ্য আয়াতে স্বামী-স্ত্রীকে পরস্পরের জন্যে পোশাক ঘোষণা দিয়ে মানব স্বভাবের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেয়া হয়েছে। দু'জন পৃথক স্বত্ত্বা হলেও দু'জনই অবিচ্ছেদ্য হয়ে দুনিয়ার জীবন যাপন করে থাকে। স্ত্রীদের সে জন্যেই অর্ধাঙ্গীনী বলে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। কিন্তু আজকের সমাজে মেকী ভালবাসার খপ্পরে পড়ে আল্লাহর ঘোষিত স্বামী-স্ত্রীর সেই অকপট মধুর সম্পর্ক আর বাকী নেই। অধিকন্তু আজকের সমাজে যৌতুকের প্রাধান্য এবং ঘোষিত ও অঘোষিত যৌতুক প্রথার দৌরাত্মে দাম্পত্য জীবনের সেই প্রাকৃতিক প্রেম-প্রীতি বিলীন প্রায়। শরীয়তী বিবাহের পরিবর্তে বাণিজ্যিক বিবাহ মুসলিম সমাজকেও আজ এক ভয়াবহ পর্যায়ে উপনীত করেছে। মুসলমানদের সচেতনতা ও খাটী শরয়তী রাষ্ট্রব্যবস্থা ছাড়া এ মারাত্মক পর্যায় অতিক্রম করা কি সম্ভব ?

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ

وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَأَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ فِى الْمَسٰجِدِ ط-

"মসজিদে ই'তিকাফে থাকা অবস্থায় তোমরা স্ত্রীসহবাস করো না।"

রমযানের রাতে খানা-পিনা ও স্ত্রীসহবাস ইত্যাদি হালাল করা হয়েছে, কিন্তু রমযানের শেষ ১০দিনে যে ই'তিকাফ এর বিধান রয়েছে সেই ই'তিকাফে থাকা অবস্থায় রাত্রী বেলায়ও স্ত্রী সহবাস জায়েয নেই। এখানে খানা-পিনা ও স্ত্রীসহবাসের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। অর্থাৎ ই'তিকাফকারী ব্যক্তি রযমানের রাতের বেলায় পানাহার করতে পারবে ঠিকই তবে স্ত্রীসঙ্গম করতে পারবে না। এ হুকুম কেবল ই'তিকাফকারী রোযাদারের জন্য মাত্র, আর ই'তিকাফ ছাড়া রোযাদারদের জন্য এ হুকুম প্রযোজ্য নয়। আয়াতটির শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ

وَلاَ تُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ فِى الْمَسٰجِدِ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلاَ تَقْرَبُوْهَا

"আর তোমরা স্ত্রীসহবাস করো না যখন তোমরা মসজিদসমূহে ই'তিকাফ অবস্থায় থাক। এসব হচ্ছে আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা, সুতরাং তোমরা এসবের ধারেকাছেও যেও না।"

'اعتكاف' (ই'তিকাফ) শব্দের অর্থ 'কোনো স্থানে অবস্থান করা।' কুরআন-সুন্নাহর পরিভাষায় কতগুলো বিশেষ শর্ত সাপেক্ষে একটা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে মসজিদে অবস্থান করাকে ই'তিকাফ বলে।

'فى المسجد' মসজিদসমূহে (বহুবচন) বলে বুঝানো হয়েছে যে, এ ই'তিকাফ যে কোনো মসজিদে হতে পারে। অবশ্য মসজিদ বলতে যেসব মসজিদে নিয়মিত জামাআত হয়ে থাকে তাকেই বুঝানো হয়ে থাকে।

ই'তিকাফে থাকা অবস্থায় নিজের মানবিক ও প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ করার জন্য মসজিদের বাইরে যাওয়া যায়, কিন্তু যৌন স্বাদ আস্বাদন করা থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ দূরে রাখা একান্ত অপরিহার্য। রোযাদার ও ই'তিকাফকারীর জন্য এসব সীমারেখা বলে দেয়ার পর আল্লাহ তা'আলা সাবধান করে দিয়ে বলেছেন, এসব সীমারেখার ধারেও যেও না। অর্থাৎ যেখান থেকে গুনাহের সীমানা শুরু হচ্ছে ঠিক সেই শেষ প্রান্তের সীমানা লাইনে চলাফেরা করা বিপদজনক। সীমানা থেকে দূরে অবস্থান করাই নিরাপদ ব্যবস্থা। কারণ সীমানা বরাবর চলতে গেলে ভুলেও সীমানার ওপারে পা চলে যেতে পারে।

–(তাফহীমুল কুরআন)

আট

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ط وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ
وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ج وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا ط وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ
خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ ط اُولٰئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ج وَاللّٰهُ يَدْعُوْا
اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ ج وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ○

"তোমরা কোনো মুশরিক নারীকে ঈমান না আনা পর্যন্ত বিবাহ করো না। মুশরিক নারী তোমাদের মুগ্ধ করলেও তার চেয়ে ঈমানদার দাসী অনেক উত্তম। তেমনি কোনো মুশরিক পুরুষ ঈমান না আনা পর্যন্ত তোমাদের কন্যাদের তার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করো না। মুশরিক পুরুষ তোমাদের মুগ্ধ করলেও তার চেয়ে বরং একজন ঈমানদার দাস অনেক ভাল। কারণ তারা (মুশরিকরা) আহ্বান করে জাহান্নামের দিকে আর আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে জান্নাত ও ক্ষমার দিকে আহ্বান করেন। তিনি তাঁর বিধানসমূহ মানুষের জন্যে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন—যেন তারা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২২১)

বৈবাহিক সম্পর্ক কি কেবল যৌন সম্পর্ক ?

বৈবাহিক সম্পর্ক কেবল যৌন সম্পর্কই নয় বরং তা এক গভীর সামাজিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও তামাদ্দুনিক সম্পর্কও বটে।

আলোচ্য আয়াতে মু'মিন পুরুষ ও স্ত্রীদের জন্যে মুশরিকদের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করা বা হওয়া হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। আহলে কিতাবদের মুশরিকগণ সহ সর্ব প্রকার মুশরিকের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। ঈমানদার ও মুশরিক স্বামী-স্ত্রীর প্রভাব পরস্পরের উপর পড়ে থাকে। সেই পরিবারে ঈমান ও কুফরীর একটা জগাখিচুড়ী জীবনধারা দাঁনা বেঁধে উঠতে পারে। এ জাতীয় জীবনধারা মুশরেকী বা কুফরী জীবন বিধানের দৃষ্টিতে আপত্তিজনক নাও হতে পারে ; কিন্তু ইসলামী জীবন বিধানের চোখে তা কিছুতেই বরদাশত করার বিষয় নয়। দু'জনের মধ্যে যেই অধিকতর প্রভাবশালী হবে পরিবারের সদস্যগণের উপর তার প্রভাব পড়বে সর্বাধিক।

এতে পরবর্তী বংশধরদের জগাখিচুড়ী চরিত্রই প্রকাশ পেয়ে থাকবে। তাছাড়া দু'জন যদি চরমপন্থী হয় তাহলে দাম্পত্য জীবন কলহপূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কোনো প্রকৃত ঈমানদার ব্যক্তি কেবলমাত্র যৌন ভোগ-লালসা চরিতার্থ করার এমন একটি অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির উদ্ভব হতে দিতে পারে না। কোনো ঈমানদার ব্যক্তি যদি কখনো কোনো মুশরিকের প্রেমে পড়ে তখন তার ঈমান, তার বংশ-পরিবার এবং নিজের দ্বীন ও চরিত্র রক্ষার জন্যে ব্যক্তিগত হৃদয়াবেগ কুরবানী করাই তার কর্তব্য। কারণ তাদের সাথে এরূপ সম্পর্কের ফলে কুফর ও শিরকের মধ্যে নিমগ্ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তীব্রভাবে।

মুশরিক মহিলা বা পুরুষ কোনো ঈমানদার পুরুষ বা মহিলার জন্যে উপযুক্ত বা বিবাহযোগ্য হতে পারে না—যতক্ষণ না সে ঈমান আনবে বা মুসলমান হবে। অমুসলিম নারী-পুরুষ যতই দৈহিক বা আর্থিক আকর্ষণ সম্পন্ন হোক না কেন, সে কখনো ঈমানদারদের দাম্পত্য সাথী হতে পারে না। কারণ স্বরূপ কুরআন ঘোষণা করেছে যে, তারা তো জাহান্নামের অগ্নির দিকেই আহ্বান করে থাকে। আর আল্লাহ আহ্বান করেন জান্নাতের দিকে। তাই আল্লাহ চান না যে, কোনো বান্দা-বান্দী অমুসলিম জীবনসাথীর সংস্পর্শে গিয়ে তার প্রেমে পড়ে তাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে অথবা তার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে নিজেকে আল্লাহর ইচ্ছার বিপরীত পথে পরিচালিত করতে থাকে।

যৌন সম্পর্ক অনেকটা পাশবিক আকর্ষণ। মানব জীবনে যৌন আকর্ষণ আল্লাহর সৃষ্টি কৌশলের একটা বিশেষ দিক মাত্র। পারিবারিক জীবনের ভিত্তি ও মানব বংশ রক্ষার জন্যে আল্লাহ তা'আলা নারী-পুরুষ সৃষ্টি করে তাদের বয়সের একটা সীমা পর্যন্ত যৌন আকর্ষণ দিয়েছেন। পরিবারের ভিত্তি স্থাপন করে মানব সমাজের শৃংখলা আনয়ন করে মানব বংশ বৃদ্ধি করে ও আধ্যাত্মিকতার উন্মেষ ঘটিয়ে পূর্ণ মানবতা হাসিলের জন্যে দাম্পত্য জীবনে নর-নারীর এক সুনিবিড় সম্পর্ক স্থাপনের পেছনে এ যৌন আকর্ষণের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। অনেক সময় আধ্যাত্মিক প্রেম সাধনায় পাশবিক প্রেম প্রাথমিক সোপানের ন্যায় গণ্য হয়ে থাকে। 'ইশকে মাজাযী' থেকে মানুষ 'ইশকে হাকীকীর' স্তরে উপনীত হতে পারে।

সুতরাং যৌন ক্ষুধা নিবৃত্তিই বিবাহের উদ্দেশ্য হতে পারে না। এটা তো যুবক-যুবতীর মনের সাময়িক—সম্পূর্ণ অস্থায়ী অবস্থা মাত্র। স্বামী-স্ত্রীর পূর্ণাঙ্গ সম্পর্কের একটা দিক মাত্র। একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হলেও একমাত্র দিক এটা নয়। এক জোড়া দম্পত্তির পুরো জীবনের সফলতার জন্যে তাদের সার্বিক সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য। কাজেই দু'জনের চিন্তাধারা, মন-মানসিকতা

ও আকীদা-বিশ্বাসে সামঞ্জস্য একান্ত অপরিহার্য। কোনো অমুসলিম নারী একজন মুসলিম নরের জন্যে উপযুক্ত নয়, যেমন করে একজন অমুসলিম পুরুষ একজন মুসলিম নারীর সাথী হওয়ার যোগ্য নয়। অমুসলিম নর-নারীর দৈহিক সৌন্দর্য ও আর্থিক সচ্ছলতা এ ক্ষেত্রে মোটেই গণ্য হতে পারে না।

আমাদের সমাজে দেখা যায়, সহশিক্ষার কারণে অনেক স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রী যৌন আকর্ষণে পরস্পরকে ভালবেসে মাতা-পিতার প্রতি কলংক লেপন করে ও বেরিয়ে চলে যায়। আর তাদের ঐ সম্পর্ক শেষ পর্যন্ত বিচ্ছিন্নতায় রূপায়িত হতেও দেখা যায়। একটি সমীক্ষা অনুযায়ী দেখা যায় লাভ মেরেজের প্রায় ৭০% শেষ পর্যন্ত বিবাহ বিচ্ছেদের সম্মুখীন হয়। কারণসমূহের মধ্যে প্রধানত এর সাময়িক আকর্ষণ, বাহ্যিক ভালবাসা, আবেগ প্রবণতা, অদূরদর্শিতা এবং সর্বোপরি মাতা-পিতার সদিচ্ছার অভাবই এজন্য দায়ি বলে মনে করা হয়।

বিবাহে মানুষের পুরো দুনিয়ার জীবনের জন্য সাথী নির্বাচন করা হয়ে থাকে। তাই ইসলাম উভয়কে এখতিয়ার দিয়েছে পরস্পরকে দেখে শুনে নেয়ার জন্য। তা ছাড়া বর ও কনের সার্বিক সমতা (কুফু) হওয়ার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে ইসলামে। বিশেষতঃ দীনের ব্যাপারে সতর্কতা অত্যাবশ্যক। আদর্শিক মানসিকতা ও আমলী জিন্দেগীতে বর-কনে যেন অভিন্ন হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা কর্তব্য।

নয়

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ ط قُلْ هُوَ اَذًى لا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِى الْمَحِيْضِ لا
وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ ج فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَاْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ ط
اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ (البقرة : ٢٢٢)

"লোকেরা তোমাকে হায়েজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বল, তা অপবিত্র ময়লা। সুতরাং তোমরা হায়েজ অবস্থায় স্ত্রীদের সহবাস থেকে দূরে থাক। তারা পবিত্র হওয়ার পূর্বে তাদের (সাথে সহবাস কর না) নিকটে যেও না। যখন তারা পবিত্র হবে তখন আল্লাহর নির্দেশিত স্থানে তাদের কাছে যাও। আল্লাহ তওবাকারী ও পবিত্রতা অবলম্বনকারীদের ভালবাসেন।"

-(সূরা আল বাকারা ঃ ২২২)

হায়েজ অবস্থায় স্ত্রীর সাথে স্বামীর আচরণ

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, ইয়াহুদীরা ঋতুবতী স্ত্রীদের তাদের সাথে খেতে দিতো না। এমনকি তাদের সাথে এক ঘরে ঘুমাতোও না। সাহাবায়ে কিরাম এ সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলে উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়। অতপর রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, "তাদের সাথে সঙ্গম ছাড়া সবকিছুই জায়েয।"

সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হায়েজ অবস্থায় আমি হাড় চুষে দিলে তিনিও একই স্থানে মুখ দিয়ে চুষতেন। আমি পানি পান করে রেখে দিলে তিনি পাত্রের একই স্থানে মুখ দিয়ে ঐ পানি পান করতেন।

তিনি আরও বলেন, আমার হায়েজ অবস্থায় হুজুর (স) গোসলের সময় আমাকে তাঁর মাথা ধুয়ে দিতে বলতেন। আমার ঐ অবস্থায় তিনি আমার কোলে হেলান দিয়ে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতেন।

হাদীস শরীফে এও রয়েছে যে, একদা হুজুর (স) তাঁর কোনো ঋতুবতী স্ত্রীকে মসজিদ থেকে (জানালা দিয়ে) বিছানা এনে দিতে বললেন। তখন তিনি

ঋতুবতী বলে ওজর পেশ করলে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, اِنَّ حَيْضَكِ لَيْسَتْ بِيَدِكِ তোমার হায়েজ তো তোমার হাতে নয়।

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের বর্ণনায় স্ত্রীদের হায়েজ অবস্থায় স্বামীর ব্যবহার সম্পর্কে বর্ণনা দেয়া হয়েছে। যার মূলকথা অন্যান্য জাতির ন্যায় মুসলিম জাতির স্ত্রীগণ হায়েজ অবস্থায় অস্পৃশ্য হয়ে যায় না। ঐ অবস্থায়ও স্ত্রীরা স্বামীদের সাথে একই বিছানায় শয়ন করতে ও একই পাত্রে খেতে পারে। ইসলাম নারীদের এ প্রাকৃতিক অবস্থায়ও তাদের সাথে স্বাভাবিক ব্যবহার করার রীতি বহাল রেখেছে। অপবিত্রতার কারণে স্ত্রীসংগম করা জায়েয না হলেও তাদের ঐ অবস্থায় অন্যান্য স্বাভাবিক আচার-ব্যবহার বৈধ। এভাবে ইসলাম নারীদের যথার্থ মূল্য ও মর্যাদা দিয়েছে। এখানে উল্লেখ করা যায় পাশ্চাত্যের গবেষকদের নারী সম্পর্কিত মন্তব্যের কথা। তারা ভাবতেন নারীদের আত্মা আছে কিনা ? থাকলে তা কি ধরনের ? কোন্ জাতীয় ? তা কি মানুষের আত্মা?

উক্ত আয়াতের মাঝের অংশে বলা হয়েছে, "যখন তারা পবিত্র হবে তখন আল্লাহর নির্দেশিত স্থানে তাদের কাছে যাও।" অর্থাৎ সহবাস কর। এখানে স্থান বলতে সঙ্গমস্থল অর্থাৎ স্ত্রীলিংগ বুঝানো হয়েছে। স্ত্রীলিংগ ছাড়া অন্য পথে সংগম করলে তা হবে সীমালংঘন জনিত অপরাধ।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও অন্যান্যের মতে পায়খানার রাস্তায় রতিক্রিয়া হারাম বলে প্রমাণিত হয়েছে। আজকের পাশ্চাত্যের প্রগতিশীল (?)-দের দেশে আইন করে সমকামিতা বৈধ করা হয়েছে। এভাবে তারা রুচী বর্জিত হয়ে পশুত্বের পর্যায়ে অবনত হয়েছে। আর অভূতপূর্ব রোগ বিস্তার লাভের পথ সুগম করছে। তথাকথিত সভ্য জাতির মাঝে এমনি ধরনের অসভ্য আচরণ চলছে।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ "আল্লাহ তওবাকারী ও পবিত্রতা অবলম্বনকারীদের ভালবাসেন।" এখানে আল্লামা ইবনে কাসীরের মতে তাওবাকারী বলতে গুনাহ বর্জনকারী ও হায়েজ অবস্থায় স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে ; আর পবিত্রতা অবলম্বনকারী বলতে আল্লাহর নিষিদ্ধ যাবতীয় নোংরামী ও হায়েজ অবস্থায় স্ত্রীসংগম থেকে বিরত ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে।

'أَذًى' -এর দু'টো অর্থ হতে পারে। এক. কষ্ট ও ক্ষতি ; দুই. এমন অপবিত্রতা যা মানুষ অপছন্দ করে। হায়েজ অবস্থায় স্ত্রীসহবাস করলে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জন্যেই কষ্টকর, ক্ষতি ও অপবিত্রতা। স্ত্রীর ক্ষতি হলো, হায়েজ জনিত

ব্যাথার আঘাত লাগা, ব্যথিত শিরায় আঘাত লাগার কষ্ট, জরায়ূর সংকোচন-সম্প্রসারণ, হায়েজে অনিয়মিতা আর স্বামীর ক্ষতি জরায়ু হতে রক্ত মিশ্রিত জীবানু পুরুষাংগের মধ্যে ঢুকে পড়ে নানা রোগের সৃষ্টি করে থাকে। এসব কারণে হায়েজ অবস্থায় স্ত্রীসংগম নিষেধ করা হয়েছে। উত্তম রূপে পবিত্র হওয়ার পূর্বে স্ত্রীসংগম হারাম করে দিয়ে আল্লাহ তা'আলা নর-নারীকে উপরোক্ত ক্ষতির হাত থেকে রক্ষার ব্যবস্থা করেছেন।

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ص فَأْتُوا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ ز وَقَدِّمُوا لِاَنْفُسِكُمْ ط
وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوا اَنَّكُمْ مُّلٰقُوْهُ ط وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ○(البقرة : ٢٢٣)

"তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্যে কৃষি ক্ষেত্র। তাই তোমরা নিজেদের কৃষি ক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পার। তবে নিজেদের জন্যে কিছু যোগাড় করে রাখ। আর আল্লাহকে ভয় কর। জেনে রেখ, তোমাদের অবশ্যই একদিন তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে হবে। আর মুমিনদের সুসংবাদ দাও।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২২৩)

কেবল লালসাবৃত্তি চরিতার্থই কি স্ত্রীসহবাসের উদ্দেশ্য ?

স্ত্রী জাতি সৃষ্টির উদ্দেশ্য এ নয় যে, তারা পুরুষদের "বিহার ক্ষেত্র" হিসেবে ব্যবহৃত হবে। বরং দুনিয়ার জীবন-যাপনে নর-নারী হবে পরস্পরের সহযাত্রী। সহাবস্থানের ব্যাপদেশে বৈধ উপায়ে তাদের সংগমের অনুমতি রয়েছে। প্রকৃতিগতভাবে তাদের মাঝে সেই স্পৃহাও রয়েছে। কিন্তু তাই বলে নারীদেরকে পুরুষের যৌন ক্ষুধা মিটানোর জন্যেই সৃষ্টি করা হয়নি, সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহর পৃথিবীতে মানব বংশ বিস্তার সহ দুনিয়ার জীবন-যাপনে, পুরুষের সহগামী হিসেবে। বরং নর-নারীর পারস্পরিক আকর্ষণ সৃষ্টির পেছনেও সৃষ্টির ক্রমধারা জারী রাখা তথা মানব বংশের বিস্তার সাধন করার উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে। উদ্দেশ্য এ নয় যে, সহবাস বা সংগমের কারণে সন্তান হবে, বরং সন্তান উৎপাদনের মাধ্যম ও প্রসেস হলো স্ত্রীসংগম। যে কারণে আল্লাহ তা'আলা স্ত্রীদেরকে পুরুষদের কৃষিক্ষেত্র বলে স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে ক্ষেত ও কৃষকের সম্পর্ক নির্ধারণ করেছেন।

সুফিয়ান, আবু নাঈম ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন যে, ইবনে মুনকাদির বলেন, আমি হযরত জাবির (রা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, ইয়াহুদীরা বলতো পেছনের দিক থেকে স্ত্রীসংগম করলে সেই সংগমের সন্তান টেরা হয়। এ প্রেক্ষাপটে উপরোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। ইবনে জারিজ একটি হাদীস বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, পেছন দিক সন্মুখ দিক—যেদিক থেকেই ইচ্ছা মিলতে পারবে, তবে স্থান হবে যৌনদ্বার বা স্ত্রীলিংগ।

ইমাম আহমদ ও সুনান সংকলকগণ একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন যে, বাহায ইবনে হাকীমের দাদা রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করেন। হে আল্লাহর রাসূল ! আমরা আমাদের স্ত্রীর কাছে কিভাবে আসবো ? উত্তরে তিনি বললেন, তারা তোমাদের ক্ষেত্র স্বরূপ, তাদেরকে যেভাবে যে দিক থেকে ইচ্ছা ব্যবহার কর। তবে তাদের মুখের উপর মেরো না, গালমন্দ করো না, ক্রোধবশতঃ তাদের থেকে পৃথক হয়ে অন্য ঘরে থেকো না।

আল্লামা ইবনে কাসীর তাঁর বিখ্যাত তাফসীর তাফসীরে ইবনে কাসীরে বহু হাদীস এ প্রসংগে উল্লেখ করেছেন। সবক'টি হাদীসই উপরোক্ত আয়াতের সমর্থক ও ব্যাখ্যা স্বরূপ। অর্থাৎ স্ত্রী সংগম সামনের দিক থেকে ও পেছন দিক থেকে উভয় দিক থেকেই জায়েয ; তবে অবশ্যই যৌনদ্বার হতে হবে। তাউস (র) বলেন, জনৈক ব্যক্তি হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-কে স্ত্রীদের গুহ্যদ্বার দিয়ে সহবাস করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, "তুমি কি আমাকে কুফরী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছো ?" আল্লামা ইবনে কাসীর এটিকে সহীহ বর্ণনা রূপে লিপিবদ্ধ করেছেন।

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, সে ব্যক্তি অভিশপ্ত যে তার স্ত্রীর গুহ্যদ্বার দিয়ে সহবাস করে।"

হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে আরেকটি হাদীস আল্লামা ইবনে কাসীর (র) তাঁর তাফসীরে উদ্ধৃত করেছেন যে, নবী (স) বলেছেন, "যে ব্যক্তি স্ত্রীদের বা পুরুষদের গুহ্যদ্বার দিয়ে সঙ্গম করে সে কুফরী করে।"

আয়াতের শেষাংশে আছে ঃ وَقَدِّمُوا لِاَنْفُسِكُمْ বিভিন্ন তাফসীরে এর তরজমা হলো ঃ

–তোমরা তোমাদের জন্যে কিছু করিও।

–(আল কুরআনুল করীম (ইসলামিক ফাউণ্ডেশন)

–নিজেদের পরিত্রাণের জন্যে নেক আমল পেশ করতে থাক।

–(ইবনে কাসীর)

–তোমাদের ভবিষ্যত সম্পর্কে চিন্তা করিও।–(তাফহীমুল কুরআন)

–নিজেদের জন্যে আগামী দিনের ব্যবস্থা কর।–(মাআরেফুল কুরআন)

এ আয়াতাংশের দু'টো অর্থ হতে পারে। এক. নিজের বংশ রক্ষার জন্যে চেষ্টা কর। যেন তোমার মৃত্যুর পর তোমার স্থলাভিষিক্ত বর্তমান থাকে। দুই.

নবাগত বংশধরকে তোমার স্থলাভিষিক্ত করতে হলে দ্বীন ইসলাম, নৈতিক চরিত্র তথা মনুষ্যত্বের ভূষণে ভূষিত করার চেষ্টা কর। পরবর্তী আয়াতাংশে সতর্ক করে বলা হয়েছে এ ব্যাপারে যদি ইচ্ছাকৃত অবহেলা ও ত্রুটি দেখাও তবে সে জন্যে অবশ্যই আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

–(তাফহীমুল কুরআন)

এগার

لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ ج فَاِنْ فَآؤُ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○ وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○ (البقرة : ٢٢٦-٢٢٧)

"যারা নিজেদের স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক না রাখার প্রতিজ্ঞা (ঈলা) করে বসে, তাদের জন্যে চার মাসের অবকাশ রয়েছে। তারপর তারা যদি মিলমিশ করে নেয় তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু। আর যদি বর্জন করার সংকল্প করে নেয়, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ শ্রবণকারী ও জ্ঞানী।"

স্ত্রীর সাথে সহবাস না করার কসম করলে

যদি কোনো ব্যক্তি কিছুদিন তার স্ত্রীর সাথে সহবাস না করার কসম করে বসে, তবে সেই কসমকে শরীয়তের পরিভাষায় 'ঈলা' বলা হয়। এ বিচ্ছিন্নতার সময় চার মাসের কম হলে সময় গত হওয়ার অপেক্ষা করবে, স্ত্রীও ধৈর্যধারণ করবে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার এরূপ সম্পর্ক সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক হতে পারে না। তবুও মাঝে মধ্যে এরূপ বিপর্যয় সৃষ্টি হতে পারে। আল্লাহর শরীয়তে এমন বিপর্যয় অপছন্দনীয়। এ ধরনের বিপর্যয়ের জন্যে আল্লাহ তা'আলা চার মাস সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এ চার মাসের মধ্যে হয় পুনরায় স্বাভাবিক সম্পর্ক পুনস্থাপন করবে। অন্যথা স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক একেবারেই ছিন্ন করবে, যেন বসবাসযোগ্য অন্য কারো সাথে সম্পর্ক স্থাপনের জন্যে অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে।

এ আয়াতে প্রতিজ্ঞা বা কসম করার হুকুমের ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। হানাফী ও শাফেয়ী মাযহাবের ফকীহদের মতে স্বামী যদি স্ত্রীর সাথে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক না রাখার প্রতিজ্ঞা করে, কেবল তখনই আলোচ্য আয়াতের প্রয়োগ হবে। আর প্রতিজ্ঞা না করেই যদি স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক ত্যাগ করা হয় তবে এমতাবস্থায় যত কালই অতিবাহিত হোক না কেন, এ আয়াত সেখানে প্রযোজ্য হবে না। কিন্তু মালেকী মাযহাবের শাস্ত্রবিদদের মতে প্রতিজ্ঞা করা হোক আর না-ই হোক, উভয় অবস্থায়ই স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক না রাখার ব্যাপারে এ চার মাস কাল সময়ই চূড়ান্ত ফায়সালার জন্যে নির্দিষ্ট রয়েছে। ইমাম আহমদের একটি মতও এরই সমর্থনে রয়েছে।

হযরত আলী (রা), হযরত আব্বাস (রা) এবং হাসান বসরী (র)-এর মতে এ নির্দেশ কেবল তখনই প্রযোজ্য হবে যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিপর্যয় দেখা দেয়ার কারণে সম্পর্ক ত্যাগ করা হয়ে থাকে। কিন্তু বিশেষ কোনো সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে যদি স্ত্রীর সাথে দৈহিক সম্পর্ক ছিন্ন করা হয়, অথচ মনের দিক থেকে পরস্পরের মধ্যে হৃদ্যতা, পূর্ণ সম্পর্ক বজায় থাকে ; তবে তার জন্যে এ আয়াত প্রযোজ্য হবে না। কিন্তু অন্যান্য ফিক্‌হ শাস্ত্রবিদদের মতে যে কোনো ধরনের প্রতিজ্ঞা স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক দৈহিক সম্পর্ক ছিন্ন করলে তাকে 'ঈলা' বলা হবে। আর সন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টি যে কোনোভাবেই হোক না কেন, চার মাসের অধিক এরূপ অবস্থা বর্তমান থাকা উচিত হবে না।

ইমাম বুখারী ও মুসলিমের সহীহ হাদীস গ্রন্থদ্বয়ে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) একবার এক মাসের জন্যে 'ঈলা' করেছিলেন এবং উনত্রিশ দিন পরে বলেন, উনত্রিশ দিনেও মাস হয়ে থাকে।

চার মাস সময়ের অধিক সময় ঈলা করলে স্ত্রীর স্বামীর কাছে এ আবেদন করার অধিকার থাকবে যে, হয়ত সে মিলিত হবে, না হয় তালাক দেবে। অতপর বিচারক স্বামীকে দু'টোর মধ্যে একটি পথ গ্রহণ করতে বাধ্য করবে যেন মহিলাকে দুর্ভোগ পোহাতে না হয়।

আয়াতে فَاۡنْ فَاۤؤُا (তারা যদি মিলে যায়) বলে বুঝানো হয়েছে যে, তারা যদি পূর্বের অবস্থায় ফিরে যায় অর্থাৎ সহবাস করে। ইবনে আব্বাস (রা) মাসরূক (র) সাঈদ ইবনে যোবায়ের প্রমুখ মনীষীগণ এ অর্থই গ্রহণ করেছেন। কোনো কোনো ফিক্‌হ শাস্ত্রবিদ এর এ অর্থ নিয়েছেন যে, ঐ সময়ের মধ্যে ঐ স্বামী যদি নিজের প্রতিজ্ঞা ভংগ করে এবং পুনরায় স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক স্থাপন করে নেয় ; তবে তাকে প্রতিজ্ঞা ভংগের জন্য কাফ্‌ফারা দিতে হবে না। আল্লাহ এমনিই মাফ করে দেবেন। কিন্তু অধিকাংশ ফিক্‌হ শাস্ত্রবিদের মতে প্রতিজ্ঞা ভংগের কাফ্‌ফারা অবশ্যই দিতে হবে। ক্ষমাশীল ও দয়াবান হওয়ার অর্থ এ নয় যে, কাফ্‌ফারাও মাফ করে দেবেন বরং এর অর্থ আল্লাহ এ কাফ্‌ফারা কবুল করে নেবেন ; আর সম্পর্ক ত্যাগ করার সময় পরস্পরের প্রতি যে বাড়াবাড়ী হয়েছে তা ক্ষমা করে দেবেন।

হযরত উসমান (রা), ইবনে মাসউদ (রা), যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) প্রমুখের মতে প্রতিজ্ঞা ভংগের ও পুন সম্পর্ক স্থাপনের সময় চার মাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এ সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে তালাক পড়ে যাবে। অর্থাৎ এক তালাক বায়েন হবে, মানে ইদ্দত পালনের সময় স্বামী তাকে পুনরায় গ্রহণ করতে পারবে না। অবশ্য উভয়ের ইচ্ছা থাকলে পুনরায় বিবাহ করতে পারবে। হানাফী মাযহাবের ফকীহগণও এমতই গ্রহণ করেছেন।

বার

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ ط وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِىْ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ط وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِىْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًا ط ـ(البقرة : ٢٢٨)

"যেসব নারীকে তালাক দেয়া হয়েছে, তারা তিন হায়েজ পর্যন্ত নিজেদেরকে অপেক্ষায় রাখবে। আর আল্লাহ তাদের গর্ভে যা সৃষ্টি করেছেন, তা যেন তারা গোপন না রাখে—এটা তাদের জন্যে জায়েয নয়, যদি তারা আল্লাহ ও পরকালকে বিশ্বাস করে—তাওহীদ ও আখেরাতে যদি ঈমান থাকে। আর তাদের স্বামীদের এ অধিকার আছে যে তারা ইচ্ছা করলে এ অবকাশের মধ্যে সদ্ভাব রাখতে চাইলে নিজ স্ত্রীদের ফিরিয়ে নিতে পারে।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২২৮)

স্ত্রীকে তালাক দেয়া ঃ ইদ্দত ও প্রত্যাহারের সময়সীমা

এ আয়াতের নির্দেশের উপর আমল করার ব্যাপারে ফিক্‌হবিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। একদল ফকীহর মতে তৃতীয় তালাক থেকে পাক হয়ে গোসল না করা পর্যন্ত বাইন তালাক সংঘটিত হবে না ; এবং স্বামী তাকে ফিরিয়ে নিতে পারবে। হযরত আবু বকর (রা), ওমর (রা), আলী (রা), ইবনে আব্বাস (রা) ও ইবনে মাসউদ (রা) হযরত আবু মূসা আশআরী (রা) প্রমুখ বড় বড় সাহাবীদের এটাই মত। হানাফী মাযহাবের ফকীহগণও এ মতই নিয়েছেন। আরেক দলের মতে তৃতীয় হায়েজ আসার সাথে সাথেই তাকে ফিরিয়ে নেয়ার স্বামীর অধিকার বাতিল হয়ে যাবে। হযরত আয়েশা (রা), ইবনে উমর (রা), যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) এ মত প্রকাশ করেছেন। শাফেয়ী ও মালেকী মাযহাবের ফকীহগণও এ মতই গ্রহণ করেছেন। এখানে স্মরণ রাখতে হবে এ হুকুম কেবল তখনি প্রযোজ্য হবে যখন স্বামী স্ত্রীকে এক কিংবা দুই তালাক দেয়। কারণ, তিন তালাক দেয়ার পর ফিরিয়ে আনার আর কোনো অধিকার থাকে না।–(তাফহীমুল কুরআন)

স্ত্রীর জুরায়ুতে যা কিছু থাকবে তা তাকে অবশ্যই প্রকাশ করতে হবে। এটা তার ঈমানের দাবী। আল্লাহ ও আখিরাতের বিশ্বাসী কেউ আল্লাহর

নির্দেশের বিপরীত করতে পারে না। তাই জরায়ুতে গর্ভধারণ অথবা ঋতুস্রাব যাই হোক এসব বিষয়ে গোপন করবে না। কারণ এসব বিষয় গোপন করতে গেলে ইদ্দতের হিসাব ভুল হয়ে যাবে।

আয়াতে اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًا (তারা যদি সদ্ভাব রাখার ইচ্ছা করে) বলে একথা বুঝানো হয়েছে যে, তালাকে রাজয়ী হয়ে থাকলে স্বামী স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে চাইলে তা হতে হবে সংশোধনের উদ্দেশ্যে। শাস্তি দেয়া, প্রতিশোধ নেয়া, বা জ্বালাতন ও নির্যাতনের উদ্দেশ্যে ফিরিয়ে নেয়া একান্ত গর্হিত কাজ সম্পূর্ণ না-জায়েয। অবশ্য শরীয়ত মতে রাজয়াত (পুনঃ গ্রহণ) হয়ে যাবে কিন্তু নির্যাতনের নিয়তের কারণে অবশ্যই আল্লাহর কাছে গুনাহগার হতে হবে।

মুমিনগণ সর্বদা শরীয়তের সীমারেখার মধ্যে থেকে দুনিয়ার জীবন অতিবাহিত করে থাকে। 'তালাক' দাম্পত্য জীবনের জন্য মারাত্মক শব্দ ও ঘৃণ্য কাজ। সুতরাং এ শব্দ উচ্চারণ ও এ কাজ করার প্রতি অত্যধিক সচেতনতা ঈমানের দাবী। ইসলামী শরীয়তে সবচেয়ে ঘৃণিত (ابغض المباحات) থেকে বিরত থাকা উত্তম।

তের

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ص وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ط وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○(البقرة : ٢٢٨)

"আর নারীদের জন্যেও ন্যায়সংগতভাবেই ঠিক সেসব অধিকার রয়েছে যেমন তাদের উপর রয়েছে পুরুষদের অধিকার। অবশ্য তাদের উপর পুরুষদের বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। আর আল্লাহ তা'আলা মহাপরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী।"–(সূরা আল বাকরা ঃ ২২৮)

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক মর্যাদার মূলনীতি

নারীদের উপর যেমন পুরুষদের অধিকার রয়েছে। তেমনি পুরুষদের উপরও রয়েছে নারীদের অধিকার। আর উভয়কেই উভয়ের অধিকার প্রদান করা একান্ত কর্তব্য। তবে এতটুকু পার্থক্য আছে যে, পুরুষদের মর্যাদা নারীদের তুলনায় কিছুটা অধিক। এ আয়াতে সেই দিকেই ইংগিত করে বলা হয়েছে ঃ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ অর্থাৎ নারীদের তুলনায় পুরুষদের রয়েছে বিশেষ মর্যাদা।

সূরা নিসায় বিষয়টি আরও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَا اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ط ـ(النساء : ٣٤)

"পুরুষরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল। কারণ, আল্লাহ তাদের একের উপর অপরকে বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করেছেন এবং এ জন্যে যে পুরুষরা নারীদের পেছনে তাদের সম্পদ ব্যয় করেছে।"

আল কুরআনে সূরা আল বাকারার এ ছোট আয়াতাংশে নর-নারীর দায়িত্ব ও কর্তব্যের বিরাট বিষয়কে তুলে ধরা হয়েছে। এতে নারী-পুরুষের অধিকার সম্পর্কিত মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে উভয়ের অধিকার ও কর্তব্য পালন সমভাবে ওয়াজিব করে দেয়া হয়েছে। অধিকন্তু আয়াতাংশে স্ত্রীলোকদের অধিকারের কথা পুরুষদের অধিকারের পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ

পুরুষদের উচিত তারা যেন অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নারীদের অধিকার প্রদান করে। কারণ, পুরুষ তো নিজের বাহুবলে ও আল্লাহ প্রদত্ত মর্যাদা বলে নারীর কাছ থেকে নিজের অধিকার আদায় করে নেয়। কিন্তু পুরুষদের উচিত নারীদের অধিকারের কথা চিন্তা করা। কেননা সাধারণত নারীরা শক্তি দিয়ে নিজ অধিকার আদায় করতে পারে না।

আল্লাহর বাণীর শব্দাবলী খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এখানে مِثْلُ শব্দ দিয়ে স্বামী ও স্ত্রীর কর্তব্য ও অধিকারের সমতার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ উভয়ের প্রতি উভয়ের অধিকার সমান। তাই বলে এর মানে এ নয় যে, উভয়কেই একই ধরনের কাজ করতে হবে এবং তাদের কর্মস্থল অভিন্ন হবে। কারণ প্রকৃতিগতভাবেই তাদেরকে দৈহিক আকৃতি, গঠন, শক্তি ও সামর্থের পার্থক্য করা হয়েছে। যে কারণে তারা সামাজিক ও পারিবারিক কাজে পরস্পরের বিকল্প নয় বরং পরিপূরক বা সম্পূরক।

আল কুরআনে পুরুষদের বিশেষ মর্যাদা দানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ পুরুষদের জন্যে নারীদের তুলনায় বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। এখানে পুরুষদেরকে স্ত্রীদের তত্ত্বাবধায়ক ও জিম্মদার ঘোষণা করা হয়েছে। যেমন সূরা আন নিসায় قَوَّامُونَ বলে পুরুষদেরকে কর্তৃত্বশীল বানিয়ে দেয়া হয়েছে। এ তত্ত্বাবধান ও কর্তৃত্ব দান এজন্যে যে, পুরুষদের দৈহিক গঠন ও মানসিকতার সৃষ্টিগত পার্থক্যের দরুন তারা কর্তৃত্ব করারই উপযোগী। তাছাড়া স্ত্রীদের যাবতীয় ভরণ পোষণের দায়িত্ব স্বামীরই উপর বর্তায়। আর স্ত্রীগণ হচ্ছে তাদের সহযোগী মাত্র। আল-কুরআনের ভাষায় স্ত্রীদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যেমন জঘন্য অন্যায় তেমনি তাদের বল্গাহীনভাবে পুরুষদের আওতা মুক্ত করে দেয়াও নিরাপদ নয়। বৈষয়িক জীবনে স্ত্রীদের পুরুষদের সম্পূর্ণ আওতামুক্ত করা নিতান্ত ভয়ের কারণ। এতে করে পৃথিবীতে রক্তপাত, ফিতনা-ফাসাদ ও বিবাদ-বিষম্বাদের সৃষ্টি হয়ে থাকে। আর সমাজে বিস্তার লাভ করে লজ্জাহীনতা, অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা। হত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতন সমাজকে করে কলুষিত।

আজকের বিশ্বে নারী প্রগতি ও নারীর অধিকারের নামে নারীকে পুরুষদের বিকল্প হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। অথচ সৃষ্টি রহস্যে নর-নারী হলো পরস্পরের পরিপূরক বা সম্পূরক। আল-কুরআন নারীকে তার স্বাভাবিক মর্যাদা দিয়েছে। কিন্তু তথাকথিত প্রগতিবাদীরা নারীকে স্বভাব-প্রকৃতির বিরুদ্ধে পুরুষদের কর্মস্থলে টেনে এনে সমান অধিকারের কথা বলে তাদের কাঁধে দিয়ে বসেছে দ্বিগুণ বোঝা। স্বভাব-প্রকৃতির দেয়া নারীত্বের দায়িত্ব আর তারই সাথে কথিত

প্রগতিবাদীদের আরোপিত পুরুষের সমান পুরুষোচিত দায়িত্ব। এতে করে নারীদের প্রতি বাড়তি যুলুমই চাপিয়ে দেয়া হয়েছে মাত্র। প্রকৃতিগতভাবে নারীত্ব ও মাতৃত্বের দায়িত্ব তাদের পালন করতেই হচ্ছে। আবার পুরুষদের কর্মক্ষেত্রে তাদের প্রতিযোগী হয়ে উপার্জনের দায়িত্বও তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে।

সামাজিক শান্তি শৃংখলা মানব চরিত্রের স্বাভাবিক প্রবণতা, সর্বোপরি স্ত্রীলোকদের সুবিধার্থেই পুরুষকে স্ত্রীদের উপর কিছুটা প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। অধিকন্তু তা পালন করা ফরয করেও দেয়া হয়েছে। এর অর্থ অবশ্যই এ নয় যে, পুরুষরা স্ত্রীদের সাথে যথেচ্ছ আচরণ করবে অথবা স্বামীরা স্ত্রীদের ঘরের আসবাবপত্র বা গৃহপালিত জন্তু-জানোয়ারের মত ব্যবহার করবে। বরং পুরুষদের এ বিশেষ মর্যাদাটুকু রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে এজন্যেই বরাদ্ধ করা হয়েছে যাতে পৃথিবীর 'জীব পরিবেশ' তথা মানব পরিবেশের সামগ্রিক ভারসাম্য সংরক্ষিত হয়।

প্রসংগত উল্লেখ্য যে, একমাত্র ইসলামই নারীদের যথার্থ মর্যাদা ও অধিকার দিয়েছে। কথাটা এজন্যে প্রশ্নাতীত সত্য যে ইসলাম তথা কুরআন-সুন্নাহ সেই আল্লাহরই দেয়া বিধান, যে আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন—তাদের নর-নারীতে শ্রেণী বিন্যাস করেছেন। আর আল্লাহর চেয়ে তার সৃষ্টির কল্যাণ করার যোগ্যতা কার আছে?

নারীর সামাজিক মর্যাদা সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ আল কুরআনে বলা হয়েছে وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ তাদের (স্ত্রীদের) সাথে সদাচরণ করে জীবন-যাপন কর। হাদীসে এসেছে خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِكُمْ "তোমাদের মধ্যে উত্তম সে ব্যক্তি যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম।" তা ছাড়া اَلْجَنَّةُ تَحْتَ اَقْدَامِ الْاُمَّهَاتِ "বেহেশত মায়েদের পদতলে" ইত্যাদি।

নারীগণের অর্থনৈতিক অধিকার ইসলাম ছাড়া আর কোথাও নেই বলা চলে। ইসলাম নারীকে তারই হাতে সমস্ত মোহরানার টাকা দেয়ার নির্দেশ দিয়েছে। স্ত্রীর চাহিদা মোতাবেক মোহরের অর্থ তাকে দিতে হয়। আর মোহরের পরিমাণ হতে হবে মর্যাদার ভিত্তিতে। টাকা স্ত্রীকেই দিতে হয় আর তাতে স্বামীর কোনো অধিকারই থাকে না। আর তখন থেকে স্ত্রীর ভরণ-পোষণের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব স্বামীর উপরই ন্যস্ত। কসমেটিক্স থেকে শুরু করে সমস্ত ব্যয়ভার স্বামীকে বহন করতে হয়। এমনকি স্ত্রীর আয়ের উৎস থাকলেও তার ব্যয়ভার স্বামীর উপরই বর্তায়। তার আয়ের মালিক সেই হবে অথচ তার ব্যয়ভার সম্পূর্ণরূপে বহন করবে স্বামী। পিতা-মাতার সম্পত্তিতে ও

স্বামীর সম্পত্তিতেও তার হিস্যা সংরক্ষিত আছে। নারীর এতবড় অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিশ্বের অন্য কোনো জাতির মধ্যে নেই। মুসলিম মহিলারা ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণেই মতলববাজদের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে এত সুন্দর খোদায়ী ব্যবস্থা তথা ইসলামী জীবন পদ্ধতির বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করতে দেখা যায়। কতই না ভাল হতো, যদি শিক্ষিতা মহিলারা দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে পড়াশুনা করতো।

আজকের সমাজে আল্লাহর দেয়া উপরোক্ত বিশেষ মর্যাদার অপব্যবহার করে পুরুষরা নারীদের উপর যেমন চালাচ্ছে নির্যাতন ও অত্যাচার ; তেমনি এ নির্যাতন থেকে নিষ্কৃতির নামে এবং নারী স্বাধীনতার ধূয়া তুলে অবলা নারীদের নামিয়ে আনা হচ্ছে পুরুষদের কর্মস্থলে। নারী মুক্তির আকর্ষণীয় যবনিকার অন্তরালে তাদের গণ্য করা হচ্ছে ভোগ্য পণ্যে বা ভোক্তার দ্রব্যে। মানব ইতিহ-াসের সামগ্রিক পরিণতির প্রতি লক্ষ্য রেখে এগুতে অক্ষম অসহায় নারী সমাজ অপরিণামদর্শী ও সামগ্রিক কল্যাণ সম্পর্কে অজ্ঞ পণ্ডিতমন্য কতিপয় পুরুষের পাতানো ফাঁদে পা দিয়ে নিজেদের চরম অবমাননা ও লাঞ্ছনা গঞ্জনার হাতে সঁফে দিচ্ছে। আজকের পাশ্চাত্যের নারী সভ্যতার ইতিহাস একথার জ্বলন্ত সাক্ষী। তবুও কি মুক্তিকামী নারী সমাজের বোধোদয় হবে না ? অন্যথা অনাগত প্রজন্ম এদের কখনো ক্ষমার চোখে দেখবে না। তাদের আদালতে এদের দেখতে পাওয়া যাবে আসামীর কাঠ গড়ায়।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা নারীদের তুলনায় পুরুষদের বিশেষ মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য দিয়েছেন। তাই তাদের (পুরুষদের) অতি ধৈর্য ও সতর্কতা সহকারে চলা উচিত। যদি স্ত্রীর পক্ষ থেকে কতর্ব্য পালনে কোনো প্রকার গাফলতি বা ত্রুটি দেখা যায়, তবে তা সহ্য করে নেবে এবং স্ত্রীদের প্রতি নিজের কর্তব্য পালনে মোটেই অবহেলা করবে না।

পরিশেষে আল্লাহর নিজের বৈশিষ্ট্য প্রসংগে স্বয়ং তাঁরই কথা وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ "আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী" বলে ইংগিত করা হয়েছে যে নর-নারীর বৈশিষ্ট্যের তারতম্য ও পুরুষদের কিছুটা অতিরিক্ত মর্যাদাদান কোনো প্রকারের বৈষম্য সৃষ্টি বা পক্ষপাতিত্বজনক নয় ; বরং তাঁর অসীম জ্ঞান ও অনুপম ক্ষমতার কারণেই তিনি সৃষ্টিকূলের বৈশিষ্ট্য ও তারতম্য সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন বিধায় যা কল্যাণকর তাই করে থাকেন। সৃষ্টির সার্বিক মঙ্গল কোন্ পথে—তা একমাত্র স্রষ্টাই জানেন। তাই তিনি সেভাবেই সুশৃঙ্খল নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

চৌদ্দ

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ص فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ ط(البقرة : ٢٢٩)

"তালাক দু'বার। তারপর হয় সোজাসুজি স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেবে, না হয় ন্যায়ভাবে তাকে বিদায় দেবে।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২২৯)

স্ত্রীকে বর্জন করতে হলে তা করবে সহৃয়তার সাথে

এ সংক্ষিপ্ত আয়াতাংশে আরবের জাহেলী যুগের এক সামাজিক ক্রটির সংশোধন করা হয়েছে। আরব দেশে এক এক ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে অসংখ্যবার তালাক দিয়ে থাকতো। কোনো স্ত্রীর উপর স্বামী বিরূপ হলে তাকে বার বার তালাক দিয়ে আবার ফেরত নিতো। ফলে এ অসহায় নারীরা না পুরোপুরি স্বামী সংগ পেতো, না তার বন্ধনমুক্ত হয়ে অন্য স্বামী গ্রহণ করতে পারতো। কুরআন মজিদের আলোচ্য আয়াত এ যুলুমের পথই বন্ধ করেছে। এখানে আল-কুরআন স্বামীকে প্রয়োজনে কেবল দু'বার তালাক দেয়ার অধিকার দিয়েছে। তারপর হয় স্ত্রীকে নিয়মানুযায়ী রেখে দেবে, না হয় সহৃদয়তার সাথে তাকে বর্জন করবে।

আল্লামা ইবনে কাসীর তাঁর তাফসীর গ্রন্থে ইবনে জারীরের তাফসীর থেকে একটি বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তাহলো জাহেলী যুগে স্বামীরা স্ত্রীদের যতবার ইচ্ছা ততবার তালাক দিতো এবং ইদ্দত চলাকালীন সময়ে তাদের ফিরিয়ে আনতো। এমনিভাবে রাসূল (স)-এর যামানায় একজন আনসার রাগান্বিত হয়ে তার স্ত্রীকে বলেছিল, আমি তোমাকে একেবারে ছেড়েও দেব না, আবার রাখবও না। মহিলা বললেন, তা কিভাবে ? আনসার বললেন, তোমাকে তালাক দেব এবং ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বে ফিরিয়ে আনবো। আবার তালাক দেব এবং ইদ্দত শেষ হওয়ার আগে ফিরিয়ে নেব। এভাবে করতে থাকবো। মহিলাটি একথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে গিয়ে আরয করলো। তারপর কুরআনের উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়। হাদীস বর্ণনাকারী আরও বলেন, তারপর থেকে লোকজন তালাকের ব্যাপারে সতর্ক হয়ে যায় এবং অসংযমী ব্যক্তিরাও সংযমী হয়ে উঠে। এতে করে পুরুষদের এতদিনের বাড়তি অধিকার রহিত হয়ে যায়।

আয়াতে দু' তালাক দেয়ার পর হয় নিয়মানুযায়ী স্ত্রীকে রাখার অথবা সহৃদয়তার সাথে পরিত্যাগ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ দু' তালাক প্রদানের পর স্ত্রীর ইদ্দতের মধ্যে তাকে পুনরায় গ্রহণের অধিকার স্বামীর রয়েছে। কিন্তু স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করতে হলে অবশ্যই স্ত্রীর সাথে সদ্ব্যবহার করার ও তার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করার মনোভাব থাকতে হবে। তাকে যন্ত্রণা দেয়ার মনোভাব অবশ্যই পরিহার করতে হবে। আর যদি বাইন তালাক দেয়ার ইচ্ছা থাকে তবে ইদ্দত পূর্ণ করতে দিয়ে তাকে সহৃদয়তার সাথে বর্জন করবে। তাকে পুন বিবাহের সুযোগ দিবে, তার অধিকার হরণ অথবা ক্ষতি সাধন করার জন্যে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা হারাম।

ইসলামে বিয়ের চুক্তি সম্পাদন করা হয় সারা জীবনের জন্যে। এ চুক্তি যাতে অটুট থাকে তৎ প্রতি অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হয়। কারণ এ সম্পর্ক ছিন্ন করার পরিণাম কেবল স্বামী-স্ত্রী পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে না বরং তাতে পরবর্তী বংশ ও সন্তানাদির জীবনও বিপন্ন হয়ে পড়ে। এমনকি অনেক সময় উভয়ের মধ্যে সুদূর প্রসারী ঝগড়া-বিবাদ লেগে যায়, আর তাতে সংশ্লিষ্ট সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। যেসব কারণে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি হয় সেগুলো নিরসনের জন্যে কুরআন-হাদীস সুষ্ঠু ও সুন্দর ব্যবস্থা করেছে। প্রথমতঃ স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক দিন দিন যাতে গাঢ় হয় এবং কখনো ছিন্ন না হয় তৎপ্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্যে কুরআন ও হাদীস উপদেশ দিয়েছে। দ্বিতীয়তঃ কখনো কোনো কারণে অসহযোগিতা দেখা দিলে পরস্পরকে বুঝাবার ব্যবস্থা করার প্রতি ইসলাম লোকদেরকে উদ্বুদ্ধ করে থাকে। তৃতীয়তঃ সৃষ্ট অসহযোগিতার উপর বেশ সতর্কীকরণ ও ভীতি প্রদর্শন করার উপদেশ দেয়া হয়েছে। চতুর্থতঃ উপরোক্ত পদক্ষেপেও যদি কোনো ফল না হয়, তবে উভয় পক্ষের কয়েক ব্যক্তিকে সালিস সাব্যস্ত করে ব্যাপারটির মীমাংসা করতে হবে বলে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল কুরআনের নির্দেশ ঃ حَكَمًا مِنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِنْ اَهْلِهَا অর্থাৎ স্বামীর পরিবারের মধ্য হতে সালিস ও স্ত্রীর পরিবারের মধ্য হতে সালিস স্থির করে সমাধানের চেষ্টা করা। এখানে উভয়ের পরিবার থেকে সালিস স্থির করার নির্দেশটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, বিষয়টিকে যদি পরিবারের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়, তাহলে তিক্ততা ও মনের দূরত্ব আরও বেশী বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। পঞ্চমতঃ যদি দুর্ভাগ্য বশতঃ অবস্থা এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছে যে সংশোধনের কোনো চেষ্টাই কাজে না লাগে এবং বৈবাহিক সম্পর্কের আকাংখিত ফল লাভের পরিবর্তে উভয়ের মিলেমিশে থাকাও মস্তবড় আযাবের কারণ হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় এ সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়াই উভয় পক্ষের জন্যে শান্তি ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা হতে পারে। এ অসহনীয় অবস্থা ও শ্বাসরুদ্ধকর

পরিস্থিতি থেকে বাঁচার জন্যেই ইসলামে তালাক ও বিবাহ বিচ্ছেদের বিধান রয়েছে। তালাক হচ্ছে আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম হালাল কাজ। হাদীসের ঘোষণা হলো ঃ اَبْغَضُ الْحَلاَلِ اِلَى اللّٰهِ اَلطَّلاَقُ অর্থাৎ আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম হালাল বিষয় হচ্ছে 'তালাক'।

তালাক দেয়ার শরীয়তসম্মত বিধান হলো বড়জোর দুই তালাক পর্যন্ত দেয়া যাবে। তৃতীয় তালাক দেয়া উচিত হবে না বলে কতিপয় বিশিষ্ট ফকীহ মতামত ব্যক্ত করেছেন। এজন্যেই ইমাম মালেক ও অন্যান্য অনেক ফকীহ তৃতীয় তালাক দেয়ার অনুমতি দেননি। তাঁরা একে তালাকে বেদআত বলেছেন। অবশ্য অন্যান্য ফকীহগণ তিন তহুরে তিন তালাক পৃথক পৃথকভাবে দেয়া জায়েয বলেন। এসব ফকীহ একেই সুন্নাত তালাক বলেছেন।

আল কুরআনে اَلطَّلاَقُ مَرَّتَانِ তালাক দু'বার বলে পরবর্তী পর্যায়ে বলেছে فَاِنْ طَلَّقَهَا অর্থাৎ তৃতীয়বার যদি তালাক দিয়ে দেয় তখন বৈবাহিক সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে ছিন্ন হয়ে যাবে। এবং তা প্রত্যাহার করার কোনো অধিকার থাকবে না। তবে দ্বিতীয় বিবাহ করার পর সেই স্বামী কোনো কারণে তালাক দিয়ে দিলে তখন প্রথম স্বামী তাকে পুনরায় গ্রহণ করতে পারবে। অবশ্য দ্বিতীয় স্বামীর সাথে তার সহবাস হওয়া শর্ত। এটি হচ্ছে তাদের শাস্তি স্বরূপ। আর এ জায়েয কাজটি মূলত হারামের একান্ত নিকটবর্তী।

পনের

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّآ اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ط فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ط فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ ط تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ج وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ○ (البقرة : ٢٢٩)

"আর নিজেদের দেয়া কোনো কিছু স্ত্রীদের থেকে ফিরিয়ে নেয়া তোমাদের জন্যে জায়েয নেই। কিন্তু যে ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই এ ব্যাপারে ভয় করে যে, তারা আল্লাহর নির্দেশ বজায় রাখতে পারবে না, তাহলে সে ক্ষেত্রে স্ত্রী যদি বিনিময় স্বরূপ কিছু দিয়ে অব্যাহতি পেতে চায়, তবে উভয়ের কারোই কোনো গুনাহ নেই। এই হলো আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা। কাজেই একে অতিক্রম করো না। যারা আল্লাহর সীমালংঘন করবে তারাই যালিম।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২২৯)

সম্পর্ক ছিন্ন করার নিয়তে নিজেদের দেয়া কোনো কিছু স্ত্রীদের থেকে ফেরত নেয়া হারাম

কোনো কোনো অত্যাচারী স্বামী তার স্ত্রীকে রাখার নিয়ত রাখে না। এমতাবস্থায় তাকে তালাকও দেয় না আবার তার অধিকার আদায় করারও চিন্তা করে না। এতে স্ত্রী যখন অতীষ্ঠ হয়ে পড়ে, সেই সুযোগ নিয়ে স্ত্রীর নিকট থেকে কিছু অর্থকড়ি আদায় করার বা মোহর মাফ করিয়ে নেয়ার বা ফেরত নেয়ার দাবী করে বসে। অনেক সময় কলে-কৌশলে স্ত্রীকে দেয়া গহনা বা কাপড়-চোপড় কেড়ে নিয়ে তাকে খালি হাতে বিদায় দেয়। আল কুরআন এ ধরনের কাজকে হারাম ঘোষণা করেছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا ـ

"আর তোমাদের স্ত্রীদের দেয়া কোনো কিছু তাদের থেকে ফেরত নেয়া তোমাদের জন্যে হালাল নয়।"

অর্থাৎ তালাকের পরিবর্তে তোমাদের দেয়া অর্থ-সম্পদ বা মোহর ফেরত নেয়া হারাম।

অবশ্য একটি ব্যাপারে তা থেকে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যাতে মোহর ফেরত নেয়া বা ক্ষমা করিয়ে নেয়া যেতে পারে। তা হচ্ছে এই যে, যদি স্ত্রী এমন অনুভব করে "মনের গরমিলের কারণে আমি স্বামীর হক আদায় করতে পারিনি" এবং স্বামীও যদি তাই বোঝে, তবে এমতাবস্থায় মোহর ফেরত নেয়া বা তা ক্ষমা করিয়ে নেয়া এবং এর পরিবর্তে তালাক নেয়া জায়েয হবে।

–(মাআরেফুল কুরআন)

স্ত্রীদের নিকট থেকে নিজের দেয়া সম্পদের কিছু ফেরত নেয়া জায়েয নেই। কিন্তু যে ক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ই এ ব্যাপারে ভয় করে যে, তারা আল্লাহর নির্দেশ বজায় রাখতে পারবে না, আর সে ক্ষেত্রে স্ত্রী যদি বিনিময় দিয়ে অব্যাহতি নিয়ে নেয়, তবে এতে কারো পাপ নেই।

অবশ্য স্ত্রী যদি স্বামীর কোনো অপরাধ ছাড়া তার থেকে অব্যাহতি চায়, তবে তাতে গুনাহ রয়েছে। হযরত ইবনে জারীর থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "স্বামীর বিনা অপরাধে স্ত্রী যদি তার কাছে তালাক প্রার্থনা করে তাহলে জান্নাতের ঘ্রাণও তার নসীব হবে না।"

–(ইবনে কাসীর)

হাবীবা বিনতে সহল (রা) সাবিত ইবনে কায়েস (রা)-এর স্ত্রী ছিলেন। কিন্তু সাবিত (রা) ছিলেন অত্যন্ত কুৎসিত ব্যক্তি। তাই হাবীবা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বামীর ব্যাপারে অভিযোগ করে বললেন, আল্লাহর কসম, আমার যদি আল্লাহর ভয় না থাকতো তাহলে তিনি আমার কাছে আসলেই আমি তার মুখে থু থু মেরে দিতাম। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমাকে দেয়া তার বাগানটি কি তাকে ফিরিয়ে দিতে রাজি আছ? তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ, রাজি আছি। তিনি বাগানটি তাকে ফিরিয়ে দেন। অতপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের উভয়কে বিচ্ছিন্ন করে দেন। ইসলামের পরিভাষায় এ বিচ্ছিন্নতাকে 'খোলা' خُلْعٌ বলে। অবশ্য খোলার ব্যাপারে স্বামীর স্ত্রীকে দেয়া বস্তুর চেয়ে বেশী নেয়া জায়েয কিনা সে বিষয়ে ইমামগণের মধ্যে মতপার্থক্য আছে।

অল্প-বেশী, তুচ্ছ-মূল্যবান যাকিছু স্ত্রীর আছে তা সবই গ্রহণ করা যাবে একমাত্র চুলের বেণী ছাড়া। ইমাম আবু হানিফা (র)-এর সহচরবৃন্দের অভিমত হলো, স্ত্রীর দোষে খোলা হয়ে থাকলে স্বামী তার প্রদত্ত সব সম্পদই

গ্রহণ করতে পারবে। তার অতিরিক্ত গ্রহণ বৈধ নয়। হ্যাঁ, স্ত্রী স্বেচ্ছায় অতিরিক্ত দান করলে তা জায়েয হবে। পক্ষান্তরে স্বামীর দোষে খোলা হয়ে থাকলে স্বামী কিছুই ফেরত পাবে না। তবে স্ত্রী স্বেচ্ছায় দান করলে তা স্বামীর জন্যে বৈধ। ইমাম আহমদ (র), আতা, সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব প্রমুখের মতে যে কোনো অবস্থায় স্বামী নিজের দেয়া বস্তুর অতিরিক্ত গ্রহণ করা জায়েয নেই। হযরত আলী (রা) বলেন, খোলা গ্রহণকারী মহিলা থেকে তাকে প্রদত্ত বস্তুর চেয়ে অধিক কিছু গ্রহণ করো না। ইমাম আওযাঈ বলেন, বিচারকগণ স্ত্রীর নিকট থেকে স্বামীর প্রদত্ত বস্তুর অধিক কিছু গ্রহণ করা স্বামীর জন্যে বৈধ মনে করেন না।–(তাফসীরে ইবনে কাসীর)

মোটকথা, মোহরানা, অলংকার ও কাপড় ইত্যাদি যাকিছু স্বামী স্ত্রীকে দিয়েছে, তার কোনো একটি জিনিসও সে ফিরে পেতে পারে না—সে অধিকার তার নেই। কেউ কোনো ব্যক্তিকে উপহার, হেবা ইত্যাদি বাবদ কিছু দিয়ে থাকলে তা পুনরায় ফেরত নেয়া ইসলামের সাধারণ নৈতিক নিয়মের বিপরীত। এরূপ হীন ও নিকৃষ্ট কাজকে হাদীস শরীফে এমন কুকুরের সাথে তুলনা করা হয়েছে, যে নিজের বমি নিজে ভক্ষণ করে। বিশেষত নিজ স্ত্রীকে তালাক দিয়ে বিদায় করার সময় তাকে প্রদত্ত সবকিছু কেড়ে নেয়া স্বামীর পক্ষে বাস্তবিকই অত্যন্ত লজ্জাস্কর কাজ। বরং ইসলাম তো এ চরিত্র শিক্ষা দিয়েছে যে, তালাক দিয়ে বিদায় করার সময় স্ত্রীকে কিছু না কিছু দিয়েই বিদায় করা উচিত।

–(তাফহীমুল কুরআন)

ষোল

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْۢ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ ؕ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يَّتَرَاجَعَآ اِنْ ظَنَّآ اَنْ يُّقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ؕ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ○ (البقرة : ٢٣٠)

"অতপর যদি স্বামী (তৃতীয়) তালাক দিয়ে বসে, তাহলে অন্য স্বামীর ঘর করার পূর্বে সে এই ব্যক্তির জন্যে হালাল হবে না। দ্বিতীয় স্বামী যদি তাকে তালাক দিয়ে দেয় (অথবা মৃত্যুবরণ করে) তাহলে প্রথম স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে। এতে তাদের কোনো গুনাহ হবে না, যদি তাদের আত্মবিশ্বাস থাকে যে, তারা আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখায় থাকতে পারবে। এ হচ্ছে আল্লাহর নির্ধারিত সীমা, যা আল্লাহ বুঝের লোকের জন্যে বর্ণনা করেন।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৩০)

যখন তালাক প্রত্যাহারের সুযোগ থাকে না

এ আয়াতটি পূর্ববর্তী আয়াতসমূহেরই শেষাংশ বা ধারাবাহিকতার শেষ সীমা। কেউ তার স্ত্রীকে দুই তালাক দেয়ার পর যদি পুনরায় তৃতীয় তালাক দিয়ে বসে তবে বৈবাহিক বন্ধন সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হয়ে যায়। দ্বিতীয় তালাকের পরে ইদ্দতের মধ্যে প্রত্যাহার করার অথবা ইদ্দত শেষ হওয়ার পর বিবাহ নবায়ন করার যে সুযোগ ছিল, এখন (তৃতীয় তালাকের পর) আর ঐ সুযোগ থাকলো না। কেননা এমতাবস্থায় ধরা যায় যে, স্বামী সবকিছু বুঝে শুনেই স্ত্রীকে তৃতীয় তালাক দিয়েছে। তাই এখন তার শাস্তি হলো তারা উভয়ে একমত হলেও বিবাহের নবায়নও করতে পারবে না। তাদের পুনর্বিবাহের শর্ত হলো স্ত্রী ইদ্দত শেষে অন্য স্বামী গ্রহণ করবে। দ্বিতীয় স্বামীর সাথে সহবাসের পর যদি সেও তাকে তালাক দিয়ে দেয় অথবা সে মারা যায়, তাহলে ইদ্দত শেষ হওয়ার পর প্রথম স্বামীর সাথে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে।

কুরআন ও হাদীসের বাণী এবং সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেয়ীগণের কার্যপদ্ধতিতে দেখা যায়, যখন কোনো দম্পতির তালাক ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প থাকে না, তখনই কেবল তালাক দেয়ার পথে এগুবে। আর তখন উত্তম পন্থাই অবলম্বন করবে। তা হচ্ছে এমন তহুরে তালাক দিবে যাতে সহবাস করা

হয়নি। এক তালাক দিয়েই ছেড়ে দেবে। ইদ্দত শেষ হলে বিবাহ সম্পর্ক এমনিতেই ছিন্ন হয়ে যাবে। এটাই তালাকের উত্তম পন্থা। আর তারা ভাল মনে করলে ইদ্দতের মধ্যে তালাক প্রত্যাহার করলেই চলবে। ইদ্দত শেষে বিবাহ ভঙ্গ হয়ে গেলেও তারা ইচ্ছা করলে তা নবায়ন করতে পারে।

কেউ যদি উত্তম পন্থার ভ্রূক্ষেপ না করে ইদ্দতের মধ্যে আরো এক তালাক দিয়ে বসে, তবে সে বিবাহ ছিন্ন করার দ্বিতীয় পর্যায়ে এগিয়ে গেল। এবারও সে পূর্বের মত ইদ্দতের মধ্যে তালাক প্রত্যাহার অথবা ইদ্দত শেষে বিবাহ নবায়ন করতে পারে। অবশ্য দ্বিতীয় পর্যায়ে সম্পর্ক রক্ষার সর্বশেষ স্তরে উপনীত হয়ে গেলো। এখন সে এমন এক সীমারেখায় পদার্পণ করলো যে, আর এক তালাক দিলে তাদের সম্পর্ক চিরতরে ছিন্ন হয়ে যায় এবং স্বামী তার অধিকারের পথ চিরতরে রুদ্ধ করে দিলো।

তালাকের নিকৃষ্ট পন্থা

ইসলামে তালাক মূলত একটি অপসন্দনীয় কাজ। জায়েয কাজসমূহের মধ্যে এটি হচ্ছে নিকৃষ্টতম। এতদসত্ত্বেও এছাড়া কোনো উপায় না থাকলে তখন উপরোক্ত উত্তম পন্থায়ই এ কাজ করা যেতে পারে। কিন্তু কেউ যদি এক সাথে তিন তালাক দিয়ে বসে তবে তাতেও তালাক কার্যকর হবে সত্য, তবে তা হচ্ছে সমস্ত উম্মতের দৃষ্টিতে নিকৃষ্ট পন্থা। কেউ কেউ একে নাজায়েযও বলেছেন। এতে তিন তালাকই হয়ে যাবে এবং তালাক প্রত্যাহার তো দূরের কথা বিবাহ নবায়ন করার সুযোগটুকুও আর থাকবে না। মাওলানা আবু যাহেদ সরফরাজ তাঁর "উমদাতুল আসার" গ্রন্থে এ মাসআলা বিষদভাবে উল্লেখ করেছেন।

মাহমুদ ইবনে লবীদের ঘটনা নাসাঈর উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিন তালাক এক সাথে দেয়াতে হুজুর খুব অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। এমনকি কোনো কোনো সাহাবী তাকে হত্যার যোগ্য বলেও মনে করেছেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও হুজুর একে প্রত্যাহারযোগ্য তালাক ঘোষণা করার কোনো বর্ণনা কোথায়ও পাওয়া যায়নি।–(মুফতী মুহাম্মদ শফী (র)–মাআরেফুল কুরআন)

[অধিক জানার জন্যে ফিক্‌হর কিতাবসমূহের সংশ্লিষ্ট অধ্যায় দেখা যেতে পারে।]

পুনর্বিবাহের একটি ঘৃণ্যতম ও অভিশপ্ত পন্থা

স্ত্রীকে তালাক দেয়ার পর তাকে পুন গ্রহণ করার একটি কঠিন পথ হলো দ্বিতীয় স্বামী ঐ মহিলাকে স্বেচ্ছায় তালাক দেয়ার পর ইদ্দত সমাপান্তে প্রথম

স্বামী তাকে পুন বিবাহ করা। শরীয়তের পরিভাষায় যা হাল্লালা বা হীলা নামে পরিচিত। এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিবাহ সম্পর্কে কোনো ষড়যন্ত্র কিংবা কোনো পূর্বশর্ত আরোপ সম্পূর্ণ হারাম। কেউ যদি তার তালাক দেয়া স্ত্রীকে পুন হালাল করার উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্র কিংবা পূর্ব প্রস্তুতি সহকারে অথবা তালাক দেয়ার শর্ত আরোপ করে অন্য কারো কাছে বিবাহ দেয় তবে তা সম্পূর্ণ না-জায়েয হবে। তাদের বিবাহ ও তালাক দু'টোই হতে হবে স্বাভাবিক নিয়মে। হাল্লালার জন্যে কেউ বিবাহ করলেও তালাক দিলে উভয়ই গুনাহগার ও অভিশপ্ত হবে। হযরত ওমর (রা) বলেন, যে নারী-পুরুষ হাল্লালার শর্তে বিয়ে করবে আমি এরূপ স্বামী-স্ত্রীকে রজম (পাথর নিক্ষেপ) করে ছাড়বো। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরূপ হাল্লালাকারী ও যার জন্যে হাল্লালা করা হয়েছে উভয়কে কঠোর লা'নত করেছেন।

মূলতঃ শর্তারোপ, চাপ প্রয়োগ, ষড়যন্ত্র যে কোনোভাবে হাল্লালার জন্যে বিবাহ দিলে তাকে বিবাহই বলা যাবে না। বরং এতে ব্যভিচারই হবে। তাই এরূপ বিবাহ ও তালাক দ্বারা স্ত্রীলোকটি প্রথম স্বামীর জন্যে কিছুতেই হালাল হবে না।–(সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী–তাফহীমুল কুরআন ও মুজীবুল্লাহ নদভী–ইসলামী ফিক্‌হ)

সতের

وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ سَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ ص وَّلَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا ج وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ط وَلَا تَتَّخِذُوْا اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا ز (البقرة : ٢٣١)

"যখন তোমরা স্ত্রীদের তালাক দিয়ে দাও, তারপর তারা নির্ধারিত ইদ্দত শেষ করে নেয়। তখন তোমরা হয়ত নিয়মানুযায়ী তাদেরকে রেখে দাও, না হয় সহানুভূতির সাথে মুক্ত করে দাও। তোমরা তাদের জ্বালাতন করার উদ্দেশ্যে রেখে দিয়ে বাড়াবাড়ী করো না। আর যে ব্যাক্তি এমনটি করবে সে অবশ্য তার নিজের উপরই যুলুম করবে। আল্লাহর বাণীকে তামাশার বিষয়ে পরিণত করো না।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৩১)

স্ত্রীকে কষ্ট ও যন্ত্রণা দেয়ার উদ্দেশ্যে বিবাহ বন্ধনে আটকে রাখা নিষেধ

তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী যখন ইদ্দত অতিক্রম করার কাছাকাছি পৌঁছে যায়, তখন স্বামীর দু'টো অধিকার থাকে। একটি হচ্ছে তালাক প্রত্যাহার করে বিবাহ বন্ধনে রেখে দেয়া। দ্বিতীয়টি হচ্ছে তালাক প্রত্যাহার না করে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করা। এ দু'টি অধিকার বা ভূমিকা পালনে সে মুক্ত নয়, বরং কুরআন এ ক্ষেত্রে উভয় অবস্থায়ই শর্ত আরোপ করেছে। এখানে আল্লাহ তা'আলা "বিল-মারূফ" শব্দ প্রয়োগ করে উভয় অবস্থাতেই শর্ত ও নিয়ম-নীতি অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন। উভয় অবস্থায় যেটাই করা হোক তা করতে হবে শরীয়তের নিয়মানুযায়ী। কেবল সাময়িক খেয়াল খুশী বা আবেগের তাগিদে কোনো কিছু করা চলবে না।

যেমন তালাক দেয়ার পর বিচ্ছিন্নতার ভয়াবহতা ও পরিণাম সম্পর্কে চিন্তা করে যদি তালাক প্রত্যাহার করে স্ত্রীকে বিয়েতে বহাল রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, তবে সে জন্যে শরীয়তের নিয়ম হচ্ছে মনোমালিন্যতাকে অন্তর থেকে ধুয়ে মুছে সুন্দর সুখী জীবন-যাপন এবং পরস্পরের অধিকার ও কর্তব্য যথাযথভাবে

আদায় করার মনোভাব থাকতে হবে। স্ত্রীকে যন্ত্রণা ও কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে তা করা যাবে না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, লোকেরা তাদের স্ত্রীদের হাস্যচ্ছলে তালাক দিতো, আসলে তাদের অন্তরে তালাক দেয়ার নিয়ত রাখতো না। অতপর আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেন, وَلَا تَتَّخِذُوْا اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا "তোমরা আল্লাহর আয়াত নির্দেশকে হাস্যকর বিষয়ে পরিণত করো না।" আল্লামা ইবনে কাসীর তাঁর বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থে হযরত ইবাদাহ ইবনে সামিত (রা) উপরোক্ত আয়াতের প্রসংগ লিপিবদ্ধ করেছেন। তা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময় লোকেরা একে অপরকে বলতো, আমি তোমার বোনকে বিবাহ করলাম। কিন্তু পরে বলতো, তা তো তামাশা করে বলেছিলাম। আবার কেউ কেউ বলতো তোমাকে আযাদ করে দিলাম। পরে বলতো তাতো হাসি-ঠাট্টা করে বলেছিলাম। তারপর আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত আছে ঃ ثَلٰثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جَدٌّ اَلنِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ তিনটি বিষয় এমন আছে যেগুলো ইচ্ছা করে বলা আর হাসি তামাশা করে বলা সমান। (১) বিবাহ, (২) তালাক ও (৩) রাজয়াত বা তালাক প্রত্যাহার। সুতরাং দু'জন স্ত্রী ও পুরুষ বিয়ের ইচ্ছা ছাড়াও যদি হাসতে হাসতে ইজাব কবুল করে নেয়, তবে বিবাহ হয়ে যাবে। তেমনিভাবে তালাক তালাক প্রত্যাহার ও দাস মুক্তির ব্যাপারেও একই বিধান।-(মাআরেফুল কুরআন)

আঠার

وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ
اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ـ ذٰلِكَ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكُمْ اَزْكٰى لَكُمْ وَاَطْهَرُ ـ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لاَتَعْلَمُوْنَ ○

"যখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের তালাক দিয়ে দাও, তারপর তারা নির্ধারিত ইদ্দত পালন করে, তখন তাদের পূর্ব স্বামীর সাথে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে নিয়মানুযায়ী বিয়ে করতে বাধা দান করো না। এ উপদেশ তাদেরকে দেয়া যাচ্ছে যারা আল্লাহ ও আখিরাতকে বিশ্বাস করে। তোমাদের জন্যে এতে রয়েছে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা। আল্লাহ (তোমাদের পবিত্রতা ও মঙ্গল) ভালভাবেই জানেন, তোমরা তা জান না।"

–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৩২)

অভিভাবক বা পূর্ব স্বামী মহিলার নির্বাচিত স্বামী গ্রহণে বাধা দিতে পারবে না

কোনো স্ত্রীলোককে তার স্বামী যদি তালাক দেয় এবং ইদ্দত পালনের মধ্যে তাকে ফিরিয়ে না লয় এবং ইদ্দত শেষ হওয়ার পর উভয়ই যদি পুনর্বিবাহিত হতে রাজি হয়, তবে স্ত্রীলোকটির অভিভাবক বা আত্মীয়-স্বজনগণ এ কাজে তাকে বাধা দেয়া উচিত নয়। আয়াতের দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, স্ত্রী ইদ্দত পালন শেষ করে পূর্ব স্বামীর বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার পর যদি অন্য কোনো স্থানে নিজের বিবাহ ঠিক করতে চায়, তখন পূর্ব স্বামীর পক্ষে এটা কিছুতেই উচিত হবে না যে, সে ঐ মহিলার দ্বিতীয় বিবাহ বন্ধ করে রাখার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়।

উপরোক্ত আয়াতের শানেনুযুল বর্ণনা করতে গিয়ে মাওলানা মুফতী শফী (র) বুখারী শরীফের একটি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার তাঁর বোনকে এক ব্যক্তির সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন। সে ব্যক্তি তাকে তালাক দেয় এবং পরে কৃতকর্মের জন্যে অনুতপ্ত হয়ে তাকে পুনরায় বিবাহ করতে মনস্থ করে। তার তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীও তাতে সম্মত হয়। কিন্তু যখন লোকটি এ প্রস্তাব মা'কালের নিকট পেশ করে, তখন তিনি যেহেতু তালাক

দেয়াতে তার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন, তাই তিনি উত্তর দিলেন, আমি তোমাকে সম্মান করেই তোমার নিকট আমার বোনকে বিয়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু তুমি সে সম্মানের মূল্য না দিয়ে তাকে তালাক দিয়ে দিলে। এখন তাকে পুনরায় বিয়ে করতে চাইছো ! জেনে রেখ, আল্লাহর কসম সে আর তোমার বিবাহাধীন যাবে না।

সাহাবীগণ আল্লাহ ও রাসূলের অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। আয়াত শোনা মাত্রই হযরত মা'কালের সমস্ত ক্রোধ পড়ে যায় এবং তিনি স্বয়ং ঐ ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হয়ে বোনের পুনর্বিবাহ তারই সাথে দিয়ে দেন। আর কসমের কাফ্ফারাও আদায় করেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, কোনো মহিলার পসন্দমত ব্যক্তির সাথে বিয়ের বাধা সৃষ্টি করা যাবে না তখন ; যদি তাদের সম্মতিটা হয় শরীয়ত সম্মত পদ্ধতিতে। অন্যথায় বাধাদান বরং শক্তি প্রয়োগও উচিত হবে। যেমন, বিয়ে ছাড়াই পরস্পর স্বামী-স্ত্রীর মত বসবাস করতে শুরু করলে, তিন তালাকের পর অন্যত্র বিয়ে ছাড়াই যদি পুনর্বিবাহ করতে চায়, অথবা ইদ্দতের মধ্যেই অন্যের সাথে বিয়ের ইচ্ছা করে, তখন সকল মুসলমানের বিশেষত তাদের সাথে সম্পর্কিত লোকদের সম্মিলিতভাবে বাধা দিবে ও প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগ করে তা প্রতিহত করবে। তেমনিভাবে কোনো মেয়ে যদি স্বীয় অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া কুফু হীনতার স্থানে বা বংশের প্রচলিত মোহরের কমে বিয়ে করতে চায় যাতে এর কুপ্রভাব বংশের উপর পড়তে পারে, তবে এমন ক্ষেত্রেও তারা বাধা প্রদান করতে পারে।

এটা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসীদের জন্য গ্রহণীয় উপদেশ বলার অর্থ, ঈমানদারদের এর ব্যতিক্রম করা বা এতে শিথিলতা প্রদর্শন করা উচিত নয়।

এ উপদেশ সম্বলিত নির্দেশের ব্যতিক্রম করা পাপ মগ্নতা ও ফিতনা ফাসাদের কারণ হতে পারে। কারণ প্রাপ্তবয়স্কা বুদ্ধিমতি যুবতী মেয়েকে সাধারণভাবে বিয়ে থেকে বিরত রাখা একদিকে তার প্রতি অত্যাচার করা, তাকে অধিকার থেকে বঞ্চিত করা ; অপরদিকে তার সতিত্ব পবিত্রতা ও মান-ইজ্জতকে আশংকায় ফেলে রাখার নামান্তর।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে, পবিত্রতা ও কল্যাণ সম্পর্কে আল্লাহই সম্যক অবগত আছেন। মানুষ তার ভবিষ্যত কল্যাণ সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ। সুতরাং মানুষ আল্লাহর নির্দেশের কাছে আত্মসমর্পণ করার মধ্যে তার ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

–(মাআরেফুল কুরআন, তাফহীমুল কুরআন ও তাফসীরে ইবনে কাসীর)

উনিশ

وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ط
وَعَلَى الْمَوْلُوْدِلَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ط لَاتُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ج
وَلَا تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ ق (البقرة : ٢٣٣)

"সন্তানবতী নারীরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু' বছর দুধ খাওয়াবে, যারা দুধ খাওয়ানোর মুদ্দত পূর্ণ করতে চায়। আর সন্তানের অধিকারী পিতার দায়িত্ব হলো নারীকে যথারীতি খোরপোষের ব্যবস্থা করা। কাউকেও তার সামর্থের অধিক চাপ দেয়া যাবে না। সন্তানের জন্যে না জননীকে ক্ষতির সম্মুখীন করা যাবে, না পিতাকে।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৩৩)

শিশুকে দুধ খাওয়াবে মাতা, আর মাতার ভরণ-পোষণ দিবে পিতা

আয়াতের প্রথমাংশে শিশুদের দুধ পান করানোর মেয়াদ সম্পর্কিত হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে। অধিকাংশ ইমামের মতে দুধ খাওয়ানোর মেয়াদ দু' বছর। ইমাম মালিক (র) থেকে দু'টো বর্ণনা পাওয়া যায়। একটিতে দু' বছর দু' মাস, আরেকটি হলো দু' বছর তিন মাস। ইমাম আবু হানিফা (র)-এর মতে এর মেয়াদ হলো দু' বছর ছয় মাস। এ ব্যাপারে ফিক্‌হের কিতাব দেখে বিস্তারিত জ্ঞান হাসিল করা যেতে পারে। [বর্তমানে ফিক্‌হ শাস্ত্রের উপর বাংলা ভাষায় অনুদিত তিনটি কিতাব আছে। (১) বেহেশতী জেওর। (২) আসান ফিকাহ (৩) ইসলামী ফিকাহ। তাছাড়া হেদায়া এবং ফতোয়ায়ে আলমগীরীও বাংলায় অনুদিত হয়েছে।]

প্রকৃতপক্ষে উপরিউক্ত আয়াতে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার পর সন্তানের দুধ পান করানো সম্পর্কিত হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে। মাআরেফুল কুরআন ও তাফহীমুল কুরআনে এভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে। শিশুকে দুধ খাওয়ানোর দায়িত্ব মাতার উপর আর মাতার ভরণ-পোষণ ও জীবন ধারণের অন্যান্য যাবতীয় খরচ বহন করা পিতার দায়িত্ব। এ হুকুম প্রযোজ্য হবে যখন স্বামী-স্ত্রীর বিবাহ সম্পর্ক ঠিক থাকবে অথবা তালাক পরবর্তী ইদ্দতের মধ্যে থাকবে।

কিন্তু তালাক ও ইদ্দত অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পর স্ত্রীকে স্ত্রী হিসেবে ভরণ পোষণের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় সত্য। তবে শিশুকে দুধ খাওয়ানোর পরিবর্তে মাতাকে পারিশ্রমিক দিতে হবে। কারণ শিশুর মালিক পিতা।

এ ক্ষেত্রে স্বামীর সামর্থ ও স্ত্রীর মর্যাদার বিবেচনা

স্বামী-স্ত্রী উভয়ই যদি ধনী হয় তবে ভরণ-পোষণও হবে ধনীদের ষ্টাণ্ডারে। আর দু'জনই গরীব হলে ভরণ-পোষণও হবে গরীবদেরই মানে। আর যদি দু'জনের অবস্থা এক রকম না হয় তবে ভরণ-পোষণের মান নির্ধারণে ইমামগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। হেদায়া প্রণেতা বলেছেন, যদি পুরুষ ধনী হয় আর স্ত্রী গরীব হয়, তবে এমন মানের খোরপোষ দিতে হবে যা দরিদ্রদের চেয়ে বেশী ও ধনীদের চেয়ে কম মানের হয়। ইমাম কারখীর মতে স্বামীর আর্থিক অবস্থার ভিত্তিতে মান নির্ণিত হবে।

উৎস ঃ -তাফসীর ইবনে কাসীর।
-তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন।
-তাফহীমুল কুরআন।

বিশ

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا ج فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِىْ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ○ (البقرة : ٢٣٤)

"আর তোমাদের মধ্যে যারা মারা যায় এবং তাদের স্ত্রীদের রেখে যায়। তবে তারা নিজেদেরকে চার মাস দশ দিন (বিবাহ থেকে) বিরত রাখবে। যখন তাদের ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যাবে তখন নিজের ব্যাপারে নীতি সংগত ব্যবস্থা নিতে কোনো দোষ বা গুনাহ নেই। আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজ-কারবারের ব্যাপারে সম্যক অবগত আছেন।"

-(সূরা আল বাকারা ঃ ২৩৪)

সহবাসের পূর্বেও যদি স্বামী মারা যায় তবুও স্ত্রীকে ইদ্দত পালন করতে হবে

যেসব স্ত্রীলোকের বিবাহের পর স্বামীর সাথে নির্জনবাস সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই স্বামী মারা গেছে, স্বামীর মৃত্যুজনিত ইদ্দত তাদেরও পালন করতে হবে। আয়াতে يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ "নিজেদেরকে বিরত রাখতে হবে"-এর অর্থ কেবল এটাই নয় যে, এ সময়ে বিবাহ করবে না। বরং সেই সাথে নিজেকে সকল প্রকার অলংকার ও সাজগোজ থেকেও বিরত রাখতে হবে। হাদীস শরীফে স্পষ্ট ভাষায় সে সম্পর্কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং ইদ্দত পালনকালে স্ত্রীদের রঙ্গীন পোশাক, অলংকার সুরমা, সুগন্ধি, মেহেদী ও খেজাব ব্যবহার না করতে এবং কেশ বিন্যাস থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে।

অবশ্য এ সময় স্ত্রীদের ঘর থেকে বাইরে যাওয়া সম্পর্কে কিছুটা মতভেদ আছে। হযরত ওমর (রা), উসমান (রা), ইবনে ওমর (রা), যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) ও ইবনে মাসউদ (রা) প্রমুখ সহ বারো ইমাম এ মত প্রকাশ করেছেন যে, যেই ঘরে স্বামী মারা গেল, তার বিধবা স্ত্রী সে ঘরেই ইদ্দত পালন করবে। অবশ্য তখনও দিনের বেলায় প্রয়োজনে বাইরে যেতে পারবে। কিন্তু সে ঘরেই তাকে বসবাস করতে হবে। পক্ষান্তরে হযরত আলী (রা),

হযরত আয়েশা (রা), হযরত ইবনে আব্বাস (রা) প্রমুখের মতে স্ত্রীলোকটি যেখানে ইচ্ছা ইদ্দত পালন করতে পারবে এবং প্রয়োজনে দেশান্তরেও গমন করতে পারবে।–(তাফহীমুল কুরআন)

ইদ্দত সংক্রান্ত কতিপয় হুকুম ঃ ১. স্বামী মারা গেলে ইদ্দতের মধ্যে সুগন্ধি ব্যবহার, সাজ-সজ্জা, সুরমা-তৈল ব্যবহার নিষ্প্রয়োজনে ঔষধ সেবন করা, অলংকার ব্যবহার করা, রঙিন কাপড় পরিধান করা জায়েয নয়। বিয়ের জন্য আলোচনা করাও দুরস্ত নেই। রাতে অন্য ঘরে থাকাও জায়েয নেই। যে স্ত্রীলোক বায়েন তালাক প্রাপ্তা অর্থাৎ যার তালাক প্রত্যাহারযোগ্য নয়, তাদের ক্ষেত্রে স্বামী গৃহে ইদ্দত পালনকালে দিনের বেলায় অতি প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের হওয়াও সম্পূর্ণ রূপে নিষিদ্ধ। ২. চাঁদ রাতে যদি স্বামীর মৃত্যু হয়, তবে এ মাসটি ৩০ দিনের হোক অথবা ২৯ দিনের হোক অবশিষ্ট চাঁদের হিসেবেই ইদ্দত পূরণ করতে হবে। আর যদি চাঁদ রাতের পরে মৃত্যু হয় তবে প্রত্যেক ৩০ দিনে এক মাস ধরে ৪ মাস ১০ দিন ইদ্দত পালন করতে হবে। তাতে মোট ১৩০ দিন পূর্ণ হবে। এ সময় অতিবাহিত হয়ে যখন মৃত্যুর তারিখটি ঘুরে আসবে তখনই ইদ্দত শেষ হবে। আর কেউ যদি শরীয়ত বিরোধী কোনো কাজ করে, তবে অন্যকেও সাধ্যানুযায়ী বাধা দেয়া ওয়াজিব। কেউ যদি বাধা না দেয় তবে তারাও গুনাহগার হবে।–(মাআরেফুল কুরআন)

হযরত ইবনে মাসউদ (রা) জিজ্ঞাসিত হন যে, একটি লোক বিবাহ করার পর স্ত্রীর সাথে সহবাস হওয়ার আগেই সে মারা যায়। তার জন্য কোনো মোহরও ধার্য হয়নি। এ স্ত্রীলোকটির ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত হবে ? তারা কয়েকবার তাঁর কাছে যাওয়ার পর তিনি বলেন, এর সিদ্ধান্ত আমি আমার নিজের মতানুসারে দিচ্ছি। ঠিক হলে বুঝবে আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়েছে আর ভুল হলে বুঝবে আমার ও শয়তানের পক্ষ থেকে হয়েছে—এ ক্ষেত্রে আল্লাহ ও রাসূল তা থেকে পবিত্র। শোন ! সে স্ত্রীকে পূর্ণ মোহর দিতে হবে। তবে এটা স্বামীর আর্থিক অবস্থার উপর বিবেচ্য। এতে কোনো রকম বেশকম করা যাবে না। স্ত্রীকে ইদ্দত পালন করতে হবে। আর সে স্বামীর উত্তরাধিকারীও হবে। এটা শুনে মা'কাল ইবনে ইয়াসার আল-আশজায়ী (রা) উঠে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বারু বিনতে ওয়াশিক সম্পর্কেও এরূপ ফায়সালা দিতে শুনেছি। এটা শুনে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) খুব খুশী হলেন।

তবে স্বামীর মৃত্যুর সময় স্ত্রী গর্ভবতী থাকলে এ হুকুম নয়। কারণ, তার ইদ্দত হলো সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত সময়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে

বর্ণিত আছে, গর্ভবতীর ইদ্দত হলো সন্তান প্রসবের পর আরও ৪ মাস ১০ দিন। তাই সবচেয়ে দীর্ঘ ও প্রলম্বিত ইদ্দত হচ্ছে গর্ভবতীদের ইদ্দত। এ বর্ণনাটি বেশ উত্তম এবং শক্তিশালীও বটে। মুহাম্মদ ইবনে সহ বহু আলিম এবং আহলে যাহেরদের অনেকের মতে এ আয়াত দ্বারা আযাদ ও দাসীদের ইদ্দতকাল সমান বলে প্রমাণিত। কেননা ইদ্দত একটি হুকুম আর তা সকল মানুষের বেলায় সমানভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু জমহুর উলামার মতে আযাদ মহিলা থেকে দাসীদের হুকুম ভিন্ন। তাদের ইদ্দত হচ্ছে আযাদ মহিলাদের অর্ধেক অর্থাৎ দু' মাস পাঁচ দিন। দাসীদের শাস্তি যেমন আযাদের অর্ধেক তাদের ইদ্দতও অর্ধেক।–(তাফসীরে ইবনে কাসীর)

একুশ

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ

"আর তোমরা যদি (বিধবাদের) ইদ্দত পালনকালে সেই নারীদের বিবাহ করার ইচ্ছা ইশারা-ইংগিতে প্রকাশ কর অথবা তা মনের মাঝে লুকিয়ে রাখ, তবে উভয় অবস্থায় তা দোষের কাজ নয়। আল্লাহ জানেন তাদের কথা তোমাদের মনে জাগবেই। কিন্তু সাবধান ! তাদের সাথে গোপনে কোনো চুক্তি-প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখো না। তবে হ্যাঁ, কিছু বলতে হলে প্রথানুসারে বিধিসম্মতভাবে বলবে। আর ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বিবাহ বন্ধনের সিদ্ধান্ত নিবে না।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৩৫)

ইশারা-ইংগিতে বিধবাদের বিবাহ পয়গাম জায়েয কিন্তু গোপনে বিবাহ-চুক্তি বৈধ নয়

আলোচ্য আয়াতে ইদ্দত পালনরত বিধবাদের ইশারা-ইংগিতে বিবাহ প্রস্তাব প্রদান সম্পর্কে বলা হয়েছে। এ ধরনের প্রস্তাব জায়েয হলেও বিবাহ কার্যের গোপন চুক্তি জায়েয নয় এবং ইদ্দতের মধ্যে যথারীতি প্রকাশ্যে প্রস্তাব দিয়েও বিবাহ জায়েয নয়। ইদ্দত শেষ হওয়ার পর ইসলামী শরীয়তের নিয়ম-রীতি অনুযায়ী বিবাহ কার্য সম্পাদন করা যেতে পারে। সকল ইমামের এ বিষয়ে ইজমা রয়েছে যে, ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বে বিবাহ শুদ্ধ নয়।

মৃত স্বামীর বিধবা স্ত্রীকে অস্পষ্ট ভাষায় বিবাহের প্রস্তাব দেয়া জায়েয আছে। তেমনিভাবে তালাক প্রাপ্তাকেও এভাবে বিবাহ প্রস্তাব দেয়া বৈধ।

এ প্রসংগে তাফসীরে ইবনে কাসীরে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সময়কার একটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে।

ফাতিমা বিনতে কায়েস (রা)-কে যখন তার স্বামী আবু আমর ইবনে হাফ্স (রা) তৃতীয় তালাক দিয়েছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (স) তাকে বললেন,

তুমি ইবনে মাকতুমের ঘরে ইদ্দত পালন কর। তিনি আরো বললেন, ইদ্দত পালন শেষ হলে আমাকে জানাবে। অতপর ইদ্দত পালন শেষ হলে উসামা ইবনে যায়েদ (রা) তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন এবং উসামার সাথে তার বিবাহ সম্পন্ন হয়।–(ইবনে কাসীর)

এখানে স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, উপরিউক্ত বিধানাবলী হলো বিধবা অথবা বায়েন তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীর ব্যাপারে। সুতরাং তালাকে রাজঈর ইদ্দত চলাকালে স্বামী ছাড়া অন্য কারো জন্যে পয়গাম দেয়া জায়েয নয়।

উৎস ঃ –তাফসীর ইবনে কাসীর।
–তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন।
–তাফহীমুল কুরআন।

বাইশ

لَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَالَمْ تَمَسُّوْهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً ج وَمَتِّعُوْهُنَّ ج عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗ ج مَتَاعًا بِالْمَعْرُوْفِ ج حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ○ (البقرة : ٢٣٦)

"তোমরা নিজ স্ত্রীদের স্পর্শ করার পূর্বে অথবা তাদের মোহরানা নির্ধারণ করার পূর্বে যদি তাদের তালাক দাও তাতে তোমাদের দোষ নেই। তবে তাদের কিছু দিয়ে দিতে হবে। সচ্ছল ব্যক্তি তার সামর্থানুয়ায়ী এবং দরিদ্র ব্যক্তি তার সামর্থানুযায়ী ন্যায়সংগতভাবে অবশ্যই আদায় করবে। এটা মুহসিনদের (পুণ্যবানদের) উপর আরোপিত বিশেষ দায়িত্ব।"

–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৩৬)

স্ত্রীকে স্পর্শ না করলেও এবং মোহরানা ধার্য না হলেও তাকে তালাক দিলে অবশ্যই কিছু সম্পদ দিতে হবে

আলোচ্য আয়াতে বিয়ে ও তালাক সম্পর্কিত একটি বিধান বর্ণিত হয়েছে। তা হচ্ছে বিয়ের আক্‌দ হয়েছে ঠিক কিন্তু আক্‌দ হওয়ার সময় মোহর নির্ধারণ করা হয়নি। এমতাবস্থায় যদি স্ত্রীর সাথে নির্জনবাস ও সহবাস হওয়ার পূর্বেই তালাক হয়ে যায় তবে ঐ স্ত্রীকে মোহর দেয়া ওয়াজিব নয়। কিন্তু তবুও সামর্থানুযায়ী ঐ স্ত্রীকে অবশ্যই কিছু সম্পদ দিতে হবে। নেক্‌কার লোকদের উপর সামর্থ অনুসারে কিছু সম্পদ তাকে দিয়ে দেয়া ওয়াজিব। কতটুকু সম্পদ দিতে হবে কুরআন মজীদ তা নির্ধারণ করে দেয়নি। বরং তা লোকদের শিষ্টাচার ও ঈমানী মর্যাদার উপর ছেড়ে দিয়ে এতটুকু সীমা বলে দিয়েছে যে, ধনী ব্যক্তি তার আর্থিক সংগতি অনুযায়ী আর দরিদ্র ব্যক্তি তার সামর্থ অনুযায়ী কিছু দিয়ে দেবে।

এ ব্যাপারে মুসলিম সমাজের ঐতিহাসিক ও ব্যবহারিক কয়েকটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। হযরত হাসান (রা) এমনি ব্যাপারে বিশ হাজারের উপঢৌকন দিয়েছিলেন। কাজী শোরাইহ পাঁচ শত দেরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) দিয়েছিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, নিম্নতম পরিমাণ হচ্ছে একজোড়া কাপড়।–(কুরতুবী-মাআরেফুল কুরআন)

ইসলামী শরীয়ত নারীদের ইজ্জত সম্ভ্রমের যে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং যা ইসলামী সমাজ ছাড়া আর কোথায়ও নেই তারই একটা ন্যূনতম নিদর্শন হচ্ছে উপরিউক্ত বিধান। নারীর সাথে কেবল বিয়ের শরীয়তসম্মত চুক্তি বা আক্‌দ হওয়ার কারণেই তাকে কিছু সম্পদ দিতে হবে। তার সাথে বিয়ে উত্তর দৈহিক সম্পর্ক না হলেও এবং বিয়ের সময় মোহর ধার্য না হয়ে থাকলেও ইসলামী শরীয়তের এ নির্দেশ। কারণ, সম্পর্ক স্থাপনের পর তা ছিন্ন করলে স্ত্রীগণ কিছু না কিছু ক্ষতিগ্রস্ত অবশ্যই হয়ে থাকে। তাই সামর্থানুসারে সে ক্ষতিপূরণের জন্য আল্লাহর এ নিদের্শ।–(তাফহীমুল কুরআন)

আর যদি আক্‌দ হওয়ার সময় মোহর নির্ধারণ করা হয়ে থাকে এবং নির্জনবাসের পূর্বেই তালাক সংঘটিত হয়। তবে নির্ধারিত মোহরের অর্ধেক দেয়া ওয়াজিব। অবশ্য স্ত্রী যদি ক্ষমা করে দেয় অথবা স্বামী যদি সম্পূর্ণ মোহর দিয়ে দেয়, তবে তা তাদের বদান্যতা। অবশ্য ক্ষমা করার বিষয়টি বর্তমানে অত্যন্ত জটিল অবস্থায় পরিণত হয়েছে। স্ত্রীর ক্ষমা করে দেয়াটা কোনো চাপে পড়ে অথবা আবেগে আতিসহ্যে কিনা তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। স্ত্রী সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় ক্ষমা করলে তবেই তা ক্ষমা হিসেবে গণ্য হতে পারে, অন্যথায় নয়।

আমাদের সমাজে 'মোহর' মাফ করে দেয়ার বিষয়টি স্ত্রীর সাথে সম্পৃক্ত বলে মনে করা হয়। উপরিউক্ত অবস্থায় স্বামীর পক্ষ থেকেও ক্ষমা হতে পারে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

পুরুষের পূর্ণ মোহর দিয়ে দেয়াকেও মাফ করে দেয়া বলা হয়েছে হয়তো এজন্যে যে, আরব দেশে সাধারণ প্রথানুযায়ী বিয়ের সংগে সংগেই মোহর দিয়ে দেয়া হতো। সুতরাং সহবাসের পূর্বে তালাক দিলে প্রদত্ত মোহরের অর্ধেক স্বামীর প্রাপ্য হয়ে যেতো। কাজেই সে যদি এই অর্ধেক না নেয়, তবে তাও ক্ষমার পর্যায়ে পড়ে। ক্ষমা বা মাফ করা উত্তম ও তাক্‌ওয়ার অনুকুল। কেননা তালাক যে ভদ্রোচিত পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে এ ক্ষমা তারই নিদর্শন—যা শরীয়াতের দৃষ্টিতে উত্তম ও সওয়াবের কাজ। সুতরাং ক্ষমা স্ত্রীর পক্ষ থেকেও হতে পারে আর তা হতে পারে স্বামীর পক্ষ থেকেও।–(মাআরেফুল কুরআন)

তেইশ

وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ج فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰهُمَا الْاُخْرٰى -

"আর তোমাদের পুরুষদের মধ্য হতে দু'জনকে সাক্ষী বানাও। যদি দু'জন পুরুষ না পাওয়া যায়, তবে একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলাকে সাক্ষী বানাবে। অবশ্য সাক্ষীরা হবে এমন যাদের সাক্ষ্যদানে তোমরা বিশ্বাস রাখতে পার। মহিলা দু'জনের একজন যদি ভুলে যায় তবে যেন অপরজন স্মরণ করিয়ে দিতে পারে।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৮২)

নারীরাও সাক্ষী হিসেবে গণ্য

আলোচ্য আয়াতাংশে লেনদেনে দলীল লেখা ও লেখানোর জরুরী মূলনীতি ব্যক্ত করা হয়েছে। ইসলামে লেনদেনে দলীল সম্পাদনার সাথে সাথে সাক্ষ্য রাখার জন্যে বিধান দেয়া হয়েছে। যেন কখনো কোনো পারস্পরিক কলহ দেখা দিলে আদালতে সাক্ষীদের সাক্ষ্য দ্বারা ফায়সালা করা যেতে পারে। কিন্তু ফিক্‌হ শাস্ত্রবিদগণের মতে কেবল লেখা শরীয়ত সম্মত প্রমাণ নয় সাথে সাথে সাক্ষীও থাকতে হবে। সাক্ষী ছাড়া কেবল লেখার উপর ভিত্তি করে বিচার ফায়সালা করা শরীয়তসম্মত নয়।

শরীয়ত সাক্ষীর সংখ্যাও নির্ধারণ করে দিয়েছে, সমাজে গ্রহণযোগ্য দু'জন মুসলমান পুরুষ সাক্ষী থাকতে হবে। যদি দু'জন পুরুষ না পাওয়া যায় তবে অন্ততঃ একজন পুরুষ ও দু'জন নারীকে সাক্ষ বানাতে হবে। যাতে করে একজন নারী বিষয়টি ভুলে গেলে অপরজন তা স্মরণ করিয়ে দিতে পারে।

আলোচ্য আয়াতে সাক্ষ্য গ্রহণের কতিপয় জরুরী নীতিমালা বর্ণিত হয়েছে। যেমন ঃ

(১) সাক্ষীর সংখ্যা হবে দু'জন পুরুষ। (২) সাক্ষীদ্বয় মুসলিম হতে হবে। (৩) দু'জন পুরুষ না পেলে অন্ততঃ একজন পুরুষ ও দু'জন নারী সাক্ষী হবে। (৪) সাক্ষী করতে হবে এমন সব লোককে যারা নিজেদের নৈতিক চরিত্র ও বিশ্বস্ততার কারণে লোক সমাজে নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত। (৫) একা একজন পুরুষ অথবা কেবল দু'জন স্ত্রীলোক সাক্ষীর জন্য যথেষ্ট নয়।

চব্বিশ

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِى الْأَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ ۝ هُوَ الَّذِىْ يُصَوِّرُكُمْ فِى الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ ط لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

"নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে পৃথিবী ও আকাশের কোনো কিছুই গোপন নেই। তিনি তোমাদেরকে মাতৃগর্ভে যেমন ইচ্ছা আকৃতিদান করেন। তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই তিনি প্রবল পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।"

–(সূরা আলে ইমরান ঃ ৫-৬)

মাতৃগর্ভে আল্লাহই নিজের ইচ্ছানুযায়ী মানুষের আকৃতি গঠন করেন

আলোচ্য আয়াত্বদ্বয়ে আল্লাহর সর্বশক্তিমান হওয়ার বিষয় বর্ণনা প্রসংগে মানব সৃষ্টির ব্যাপারে তার সৃষ্টি নৈপুণ্যের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি মানুষকে মায়ের উদরে তিনটি অন্ধকার পর্যায়ে অত্যন্ত সুনিপুণতার সাথে সৃষ্টি করেন। মানুষের আকার-আকৃতি ও বর্ণনা বিন্যাসে তিনি এমন সুদক্ষ শিল্পীর পরিচয় দিয়েছেন যা মানুষের ধারণার অতীত। একই অংগ-প্রত্যঙ্গ হলেও একজনের সাথে অন্যজনের মিল নেই। সর্বাংগে সামগ্রিক মিলের কোনো দু'জন মানুষ কোথায়ও পাওয়া যাবে না।

কোনো মানব সন্তান মাতা-পিতার ইচ্ছায় যেমন জন্মগ্রহণ করে না তেমনি আকার-আকৃতিতেও মাতা-পিতার কোনো হাত নেই। নারী জাতির উদর থেকে আল্লাহ নিজ ক্ষমতায় ও স্ব-ইচ্ছায় মানব জাতির রূপরেখা, স্বভাব-চরিত্র, স্থায়িত্ব, আয়ু ইত্যাদি নির্ধারণ করে থাকেন। অতএব যার হাতে এসব কিছুই নিবদ্ধ একমাত্র তিনিই মানব জাতির ইলাহ মাবুদ হওয়ার যোগ্য। অন্য আয়াতে রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন। তিনি কাউকে ছেলে দান করেন কাউকে দিয়ে থাকেন মেয়ে, আর কাউকে রাখেন আকীম অর্থাৎ বন্ধা— নিঃসন্তান। আবার তিনি কাউকে দু' ধরনের সন্তান—ছেলে ও মেয়ে উভয়টিই দিয়ে থাকেন।

যদিও মাতা-পিতার যৌন মিলনের ফলে সন্তান জন্মগ্রহণ করে কিন্তু এমন অনেক দম্পতি আছেন যারা শেষ বয়সে উপনীত হয়েও কোনো সন্তান লাভে সক্ষম হন না। অনেকে অনেক চেষ্টা-তদবীর করেও সন্তান লাভ করতে পারেন না। অথচ অনেক দম্পতি এমন আছে তারা আর সন্তান কামনা করে না—জন্ম নিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণের পরেও দেখা যায় স্বামী-স্ত্রীর অজান্তে গর্ভে সন্তান এসে গেছে। মোটকথা সন্তান হওয়া না হওয়ার মূল চাবিকাঠি রাব্বুল আলামীনের কুদরতি হাতে।

পঁচিশ

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ط ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ ○(ال عمران : ١٤)

"মানুষের জন্যে আকর্ষণীয় করা হয়েছে নারী, সন্তান-সন্ততি, সোনা-রূপার স্তুপ, বাছাই করা ঘোড়া, গবাদি পশু ও কৃষি ভূমি। এসবই হচ্ছে পার্থিব জীবনের ভোগ্যবস্তু। আর একমাত্র আল্লাহরই কাছে রয়েছে উত্তম আশ্রয়।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৪)

পার্থিব নেয়ামতসমূহের মধ্যে নারীর স্থান শীর্ষে

আলোচ্য আয়াতে দুনিয়ার ছয়টি প্রধান নেয়ামতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। (১) নারী, (২) সন্তানাদি, (৩) সোনা-রূপার ভাণ্ডার, (৪) উৎকৃষ্ট ঘোড়া (বাহন), (৫) গৃহপালিত জন্তু, (৬) শষ্য ক্ষেত। এসব উল্লেখযোগ্য প্রধান নেয়ামতসমূহের মধ্যে নারী হচ্ছে শীর্ষস্থানীয়। হাদীস শরীফের ভাষায় خَيْرُ مَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ اَلْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ অর্থাৎ "মানুষ যাকিছু সঞ্চয় করে তন্মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট হচ্ছে সতী নারী।"

নারীর সতীত্বের ব্যাখ্যায় হাদীস শরীফে বলা হয়েছে—"স্বামী যখন তার প্রতি দৃষ্টিপাত করে তখন সে তাকে সুখী করে, তাকে কোনো আদেশ করলে সে আনুগত্য স্বীকার করে, তাকে ঘরে রেখে গেলে সে নিজের পবিত্রতা রক্ষা করে ও স্বামীর ধন-সম্পদের হেফাজত করে।" অন্য এক হাদীসে আছে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আমার কাছে নারী ও সুগন্ধি খুবই প্রিয় বস্তু। তবে নামাযে আমার হৃদয় মনে প্রশান্তি আসে।"

মানুষকে দুনিয়ার জীবনে আল্লাহর দেয়া উক্ত ছয়টি নেয়ামতের মধ্যে সর্বপ্রথম ও প্রধান হলো নারী। বাকীগুলো মূলতঃ নারীকে কেন্দ্র করেই এবং নারীর কারণেই। আল্লাহ তা'আলা মানুষের মনে এসব নেয়ামতের প্রতি স্বভাবগতভাবেই আশক্তি ও আকর্ষণ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। মানব স্বভাবের মধ্যে এসবের আশক্তি সৃষ্টির পেছনে আল্লাহ তা'আলার অনেক রহস্য বিদ্যমান

রয়েছে। যেমন, (১) এসবের প্রতি আশক্তি ও আকর্ষণ না থাকলে পৃথিবীর সমস্ত ব্যবস্থাপনা ও শৃঙ্খলা ধ্বংস হয়ে যেত। মানুষকে দুনিয়াতে আল্লাহর প্রতিনিধি করে পাঠানোর কোনো মূল্য হতো না আর পৃথিবী বে-আবাদ হয়ে পড়তো। (২) মানুষের মনে জাগতিক নেয়ামতের প্রতি আশক্তি ও ভালবাসা না থাকলে তারা পরকালীন প্রশান্তি কামনার্থে সৎকাজে উদ্বুদ্ধ হতো না এবং অসৎকাজ থেকে বিরত থাকার মানসিকতা অর্জন করতে পারতো না। (৩) এসব আকর্ষণীয় নেয়ামতের প্রতি মানুষের অন্তরে ভালবাসা ও আশক্তি সৃষ্টি করে মূলত তাদের পরীক্ষা নেয়া হয়ে থাকে। আল্লাহ্ দেখতে চান কারা এসবের মধ্যে ডুবে থেকেও আল্লাহর সাথে সাক্ষাত হওয়ার কথা স্মরণ রেখে এগুলোকে আল্লাহর দেয়া সীমারেখার মধ্যে রেখে ব্যবহার করে ও নির্ধারিত গণ্ডীর মধ্য থেকে নশ্বর দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবন অতিবাহিত করে। পক্ষান্তরে কারা দুনিয়ার এসব চাকচিক্য ও তাল-তামাশার মোহে আচ্ছন্ন হয়ে নিয়ন্ত্রণবিহীন জীবনযাপন করে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً ○

"আমি পৃথিবীর সমস্ত বস্তু পৃথিবীর সৌন্দর্যের জন্যে সৃষ্টি করেছি। যাতে তাদের মধ্যে কে সৎকাজ করে তা পরীক্ষা করে দেখতে পারি।"

–(সূরা আল কাহাফ ঃ ৭)

পৃথিবীতে যেসব বস্তুকে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের চোখে সুশোভিত করে দিয়েছেন শরীয়তসম্মত পন্থায় সেগুলো প্রয়োজন অনুযায়ী পরিমিত উপার্জন ও যথাবিধি ব্যবহার করলে উভয় জাহানেই সাফল্য নিশ্চিত। পক্ষান্তরে ওসব বস্তু অবৈধ পন্থায় উপার্জন ও ব্যবহার করলে সামগ্রিক ধ্বংস অনিবার্য।

উদাহরণ স্বরূপ প্রধান আশক্তির বস্তু হিসেবে নারীকে নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। নারীর প্রতি আশক্তি পুরুষের স্বভাবজাত কামনা বাসনা আল্লাহ্ নিজেই সৃষ্টি করে দিয়েছেন। যার মূলে রয়েছে পৃথিবীর সামগ্রিক শৃংখলা ও সৌন্দর্য রক্ষা ও বিশ্বের উৎকর্ষ সাধনের নিয়ামক স্বরূপ ভূমিকা রাখা। এখন কেউ যদি এ কামনা বাসনাকে বিধি বহির্ভূত পন্থায় ও শরীয়ত বিরোধী উপায়ে ব্যবহার করে সামাজিক কাঠামো ভেঙ্গে দেয়ার পরিবেশ সৃষ্টিতে মত্ত হয়ে পড়ে তবে তাদের আল্লাহ্ স্বয়ং তা থেকে প্রতিহত করবেন না। আল্লাহ্ তো তাদের একদিকে হক-বাতিল, ভাল-মন্দ, নেক-বদ ইত্যাদির পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন অন্যদিকে মানুষকে দিয়েছে ইচ্ছার স্বাধীনতা। কর্মের স্বাধীনতা নির্বাচন স্বাধীনতা। আল্লাহ্ পরীক্ষা করছেন মানুষ এসব স্বাধীনতা কিভাবে ভোগ করে।

নর-নারীর পারস্পরিক যৌন সম্পর্ক যখন নিয়ন্ত্রণহীনভাবে পরিচালিত হয় তখন তা পশুত্ব ছাড়া আর কিছু নয়। পক্ষান্তরে শরীয়তসম্মত পন্থায় যদি তা সুনিয়ন্ত্রিত থাকে তবেই তাতে যেমন সেরা সৃষ্টি মানুষের সম্ভ্রম বজায় থাকে তেমনি তাতে সামাজিক ভিত্তিমূল সুদৃঢ় থেকে বিশ্ব সভ্যতায় সূচিত হয় সত্যিকারের প্রগতি ও সমৃদ্ধি। আজকের পাশ্চাত্য জগতও তাদের সম্পর্কে প্রকাশিত সমকালীন পত্র-পত্রিকা যে অবাধ যৌন আচরণে অশুভ পরিণতির সাক্ষ্য বহন করছে তা আজকের পৃথিবীর অজানা নয়।

আলোচ্য আয়াতে কারিমায় উপরোক্ত কয়েকটি বিশেষ লোভনীয় বস্তুর উল্লেখ করার পর এগুলো সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা হলো ঃ

ذَالِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاٰبِ-

অর্থাৎ "এসব নেয়ামত সামগ্রী হচ্ছে পার্থিব জীবনে ব্যবহার করার জন্যে। (এগুলোকে জীবনের লক্ষ্য হিসেবে স্থির করার জন্যে নয়।) আর আল্লাহর কাছে রয়েছে উত্তম ঠিকানা।" অন্য কথায় দুনিয়ার নেয়ামতসমূহ ঠিক তেমনি অস্থায়ী যেমন অস্থায়ী দুনিয়ার জীবন। পক্ষান্তরে পরকালীন জীবন যেমন স্থায়ী তেমনি স্থায়ী সে জীবনের নেয়ামতসমূহ। এজন্যেই আল্লাহর ঘোষণা হলো একমাত্র আল্লাহর কাছেই রয়েছে উত্তম ঠিকানা যার নিয়ামতসমূহ না ধ্বংস হবে না হ্রাস পাবে। বুদ্ধিমান তো সে ব্যক্তি, যে অস্থায়ী সুখ-শান্তি ও চাকচিক্যে মত্ত না হয়ে স্থায়ী শান্তি ও সার্বিক সাফল্য প্রাপ্তির চেষ্টায় নিজেকে নিয়োজিত রাখে।

ছাব্বিশ

قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَٰلِكُمْ ۚ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ ۗ

"বল, আমি কি তোমাদের (দুনিয়ার) ওসবের চেয়েও উত্তম বিষয়ের সন্ধান দেব ? (তা হচ্ছে) মুত্তাকীদের জন্যে তাদের রবের কাছে রয়েছে এমন জান্নাত যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে ঝর্ণাসমূহ, তারা সেখানে অনন্তকাল থাকবে। আর রয়েছে পবিত্র যুগল এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি।"

–(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৫)

বেহেশতের নেয়ামতসমূহের মধ্যে নারীও অন্তর্ভুক্ত

এ আয়াত অনুধাবন করার জন্যে অত্র গ্রন্থের প্রথম বিষয়সূচী "জান্নাতে নরের জন্য পবিত্র নারী আর নারীর জন্যে নিষ্কলুষ নর" দেখা যেতে পারে।

দুনিয়ার জীবনে আল্লাহর দেয়া নেয়ামতসমূহের মধ্যে পূর্বোক্ত আয়াতে যে ছয়টি বস্তুর উল্লেখ করা হয়েছে পৃথিবীর মানুষ স্বভাবতই নগদ প্রিয় হওয়ায় ওসব বস্তুও আহরণে মত্ত থাকে। যারা ঈমানের মত অমূল্য ধন থেকে বঞ্চিত তারা তো দুনিয়ার জীবন ও বস্তু সামগ্রীকে প্রাধান্য দেয়। দুনিয়া উপার্জনের জন্যে মহামূল্যবান আয়ূ পর্যন্ত শেষ করে দেয়। আল্লাহ দুনিয়ার মানুষকে এসব মোহ থেকে মুক্তির জন্যে এবং নশ্বর পৃথিবী থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে চিরস্থায়ী শান্তি সামগ্রীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে উক্ত আয়াতে পরকালীন জীবনের স্থায়ী নিয়ামত ও প্রকৃত শান্তির সন্ধান দিয়েছেন। পূর্বে দুনিয়ার ছয়টি প্রধান নেয়ামতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ আয়াতে তার বিপরীতে পরকালীন নেয়ামত সমূহের মধ্য থেকে প্রধান তিনটি নেয়ামতের উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে (১) জান্নাতের সবুজ বাগানসমূহ, (২) পবিত্র যুগল এবং (৩) আল্লাহর সন্তুষ্টি।

দুনিয়ার ছয়টি নেয়ামতের আলোচনার পরে আল্লাহ তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেছেন। "বল, আমি কি তোমাদের এর চেয়ে উৎকৃষ্টতর নেয়ামতের সন্ধান দেব ? যারা আল্লাহকে ভয় করে, তার আনুগত্য করে তাদের জন্যে তাদের রবের কাছে রয়েছে এমন সবুজ বাগিচা

যার তলদেশে ঝর্ণাসমূহ প্রবাহিত থাকবে। আর থাকবে পবিত্র যুগল এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি।

এখানে লক্ষণীয় যে পরকালীন নেয়ামতসমূহের মাঝেও পবিত্র যুগল তথা সকল প্রকার আবিলতা ও কলুষতা মুক্ত নারীর কথাও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ পরকালীন জীবনে জান্নাত ও আল্লাহর সন্তুষ্টির মত অতুলনীয় নেয়ামত-সমূহের সাথে দুনিয়ার নেয়ামতসমূহ থেকে যে একটি নেয়ামতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা হচ্ছে পবিত্র নারী। আয়াতে পবিত্র যুগল বলা হয়েছে। যুগল নর-নারী উভয়কে বুঝায়। সে ক্ষেত্রে নরের পবিত্রতা হলো মানসিক আর নারীর পবিত্রতা হলো দৈহিক ও মানসিক। অবশ্য ঈমান ও আমল ছাড়া এ পবিত্রতা অর্জন সম্ভব নয়। যেমন সম্ভব নয় বেহেশত লাভ করা। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

সাতাইশ

اِذْ قَالَتِ امْرَاَتُ عِمْرٰنَ رَبِّ اِنِّىْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِىْ بَطْنِىْ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّىْ ج اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ○ (ال عمران : ٣٥)

"স্মরণ কর যখন ইমরানের স্ত্রী বললো, হে রব ! আমার গর্ভস্থিত সন্তানকে তোমার জন্যে একান্তভাবে মান্নত করলাম। তুমি মেহেরবানী করে তা কবুল করে নাও। নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।"

–(সূরা আলে ইমরান ঃ ৩৫)

নারীর গর্ভস্থ সন্তানকে আল্লাহর রাহে মান্নত করার ইতিহাস প্রসংগ

পূর্ববর্তী নবীদের যুগে তাঁদের শরীয়ত অনুযায়ী আল্লাহর নামে সন্তান উৎসর্গ করার রীতি প্রচলিত ছিল। কোনো একটি সন্তানকে আল্লাহর কাজের জন্যে নির্দিষ্ট করে দেয়া হতো এবং তাকে কোনো পার্থিব কাজে ব্যবহার করা হতো না। এ প্রথানুসারে মরিয়মের মাতা নিজের গর্ভস্থ সন্তান সম্পর্কে মান্নত করলেন যে, তাকে বিশেষভাবে বায়তুল মুকাদ্দাসের খেদমতে নিয়োজিত করা হবে এবং অন্য কোনো জাগতিক কাজে নিযুক্ত করা হবে না। কিন্তু প্রসবান্তে যখন দেখলেন যে এটা তো কন্যা সন্তান। কন্যাকে কি আল্লাহর ঘরের খেদমতে নিয়োজিত করা যাবে ? এই ভেবে তিনি আক্ষেপ করে বললেন ঃ رَبِّ اِنِّىْ وَضَعْتُهَا اُنْثٰى "হে রব ! আমি তো প্রসব করলাম একটা কন্যা সন্তান।"

একজন ঈমানদার নিজের জান-মাল ও সন্তান সন্ততিকে আল্লাহর রাহে উৎসর্গ করার বাসনা থাকা তার ঈমানেরই দাবী। যুগে যুগে মানব ইতিহাস থেকেও তাই প্রমাণিত। তাছাড়া সন্তানাদিকে সৎপথে চলার উপযোগী করে গড়ে তোলায় মাতা-পিতার ভূমিকাই কার্যকরী হয়ে থাকে অধিক। তবে মাতার যোগ্যতা ও মানসিকতা এ ক্ষেত্রে অধিকতর দায়ী ও ফলপ্রসূ। সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষা ও লালন-পালনে যেমন মাতার দায়িত্ব ও ভূমিকা বেশী তেমনি তাদের উপর অধিক প্রভাব থাকে মাতার। কারণ তারা পিতার তুলনায় মাতার সাহচর্য পায় অনেক বেশী। মরিয়ম জননীর এ ইতিহাস থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে,

মাতারাও সন্তানাদির জীবন গঠনের পরিকল্পনা করতেন। সুতরাং আধুনিক নারী সমাজ প্রাচীন নারী সমাজের চেয়ে অগ্রসরতার দাবী করবে কিসের ভিত্তিতে ?

ইমরানের স্ত্রী মরিয়মের মাতা গর্ভস্থ সন্তান (অর্থাৎ মরিয়ম)-কে আল্লাহর জন্যে উৎসর্গ করে আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন, "তুমি মেহেরবানী করে এ মান্নত কবুল কর। নিশ্চয়ই তুমি সবকিছু শুন ও জান।"

কিন্তু আজকের মুসলিম সমাজে দেখা যায়, জনক-জননীরা সন্তান পাওয়ার জন্যে যেমন শিরকের পথ ধরে, তেমনি সন্তান লালন-পালনেও শিরকে লিপ্ত হয়ে পড়ে। সন্তান কামনা করে কোনো মাযার বা কোনো অলীর কাছে। আবার সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তার নাম রাখা থেকে তার শিক্ষা-দীক্ষা ইত্যাদিতেও প্রকাশ্য শিরকে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। হাদীস শরীফের ভাষায় সন্তানাদি স্বভাব ধর্ম ইসলামের উপর জন্ম নেয়, কিন্তু মাতা-পিতা তাকে ইয়াহুদী, নাসারা ও মাজুসী (অগ্নিপূজক) বানিয়ে ছাড়ে। অথচ প্রাচীনকালের ইতিহাসে দেখা যায়, মরিয়মের মাতা পুরো তাওহীদী আকীদায় সন্তান কামনা করেছিলেন। এভাবে মান্নত মানার ব্যাপারেও মুসলমানদের প্রাচীন ইতিহাসে তাওহীদের শিক্ষা পাওয়া যায়।

আটাইশ

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّىْ وَضَعْتُهَآ اُنْثٰى ط وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ ط وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰى ج وَاِنِّىْ سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَاِنِّىْ اُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ○ (ال عمران : ٣٦)

"তারপর যখন সে প্রসব করলো, তখন বললো, হে আমার রব ! আমি তো কন্যা সন্তান প্রসব করলাম। অথচ আল্লাহ ভালভাবেই জানেন, কি সে প্রসব করেছিল। পুত্র কন্যার মত নয়। আমি তার নাম রাখলাম মারইয়াম। আমি তার ও তার সন্তানাদির জন্যে তোমার আশ্রয় চাচ্ছি অভিশপ্ত শয়তানের কবল থেকে।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ৩৬)

পুত্রের চেয়ে যে কন্যার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষিত হয়েছিল

আলোচ্য আয়াতে হযরত মারইয়াম (আ)-এর জন্ম বৃত্তান্তের প্রতি ইংগিত রয়েছে। তাঁর মাতা ইমরানের স্ত্রী ছিলেন নিঃসন্তান। একদা তিনি একজন পথিককে দেখলেন, সে তার বাচ্চাকে দুধ পান করাচ্ছে। এতে তাঁর অন্তরে সন্তান লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও আকুতি জাগ্রত হয়। তিনি কায়মনো বাক্যে আল্লাহর কাছে সন্তান প্রাপ্তির আবেদন জানালেন। আল্লাহ তাঁর দোয়া কবুল করলেন এবং তিনি গর্ভধারণ করেন।

তখনকার শরীয়তে প্রচলিত ইবাদাত পদ্ধতির মধ্যে আল্লাহর নামে সন্তান উৎসর্গ করার রেওয়াজও ছিল। কোনো সন্তানকে আল্লাহর নামে নির্দিষ্ট করে দেয়া হতো এবং তাকে কোনো পার্থিব কাজে লাগানো হতো না। এ পদ্ধতি মোতাবেক হযরত মারইয়ামের মাতা নিজের গর্ভস্থ সন্তানকে বিশেষভাবে বায়তুল মোকাদ্দাসের খেদমতে নিয়োজিত করার মান্নত করলেন। গর্ভস্থ সন্তান ছেলে হবে কি মেয়ে হবে তা তাঁর জানা ছিল না। সন্তান প্রসব করার পর যখন দেখলেন যে, তিনি তো একটি কন্যা সন্তান প্রসব করেছেন। তখন আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করে বললেন, আয় আল্লাহ ! আমি তো আমার গর্ভস্থ সন্তানকে তোমার ঘরের খেদমতের জন্যে মান্নত করেছিলাম। কিন্তু এ কি ব্যাপার ! এযে একটা কন্যা সন্তান !

আল্লাহর তো জানা আছেই যে, তিনি কন্যা সন্তান প্রসব করেছেন। কন্যাকে দিয়ে বায়তুল মোকাদ্দাসের খেদমত করানো যাবে কিভাবে ? মারইয়ামের মাতার এ সংশয়ের জবাবে আল্লাহ তা'আলা বললেন ঃ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى "এ কন্যা সন্তানের মত কোনো পুত্র সন্তান নেই।" অর্থাৎ তুমি যে পুত্র চেয়েছিলে সে তো তোমাকে দেয়া কন্যার সমকক্ষা নয়। বরং তোমার আন্তরিকতার বরকতে এ কন্যা বিশ্বের কন্যাদের মধ্যে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। তার এমন সব গুণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে, অনেক পুত্র সন্তান তার সমকক্ষ নয়। আয়াতের তরজমা করতে গিয়ে তাফসীর কারকগণ বলেছেন ঃ

وَلَيْسَ الذَّكَرُ الَّذِىْ طَلَبْتِ كَالْأُنْثَى الَّتِىْ وُهِبَتِ ـ

"যে পুত্র সন্তান তুমি চেয়েছো সেতো এ কন্যা সন্তানের মত নয়। অর্থাৎ তোমার চাহিত পুত্র সন্তানের চেয়ে তোমাকে প্রদত্ত কন্যা সন্তান আরও বেশী গুণাবলী ও মর্যাদার অধিকারী।"

মারইয়ামের মাতা কন্যাকে আল্লাহর ঘরের খেদমত করার অযোগ্য মনে করেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন তার মান্নত মতে নিজের কন্যাকে দিয়ে বায়তুল মোকাদ্দাসের খেদমতের কাজ করানো কি সম্ভব ? ছেলে হলেই সে তার মান্নত পূরণ করা যেতো। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ছিল বিপরীত। সেই কন্যাকে দিয়েই আল্লাহ তার মাতার মান্নত পূরণ করার মত যোগ্যতা ও গুণ বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে দিলেন। আল্লাহ তা'আলা মাতার আন্তরিকতার প্রতি তাকিয়ে কন্যাকেই কবুল করে নিলেন।

"আমি তার নাম রাখলাম মারইয়াম।" কথাটি–মারইয়ামের মাতার। এ প্রসংগে মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) বলেন, এ থেকে বুঝা যায় যে, সন্তানের নাম রাখার অধিকার মাতারও রয়েছে। সন্তানের লালন-পালন ও শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে মাতার ভূমিকা যথার্থ ও কাম্য। এ বিষয়ে তার অধিকার স্বীকৃত।

ইমরানের স্ত্রী নিজের কন্যা মারইয়ামকে শয়তানের আক্রমণ থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করে ছিলেন। আল্লামা ইবনে কাসীর হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে একটি হাদীস নকল করেছেন। যাতে বলা হয়েছে যখনই কোনো সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তখনই শয়তান তাকে স্পর্শ করে। এবং শয়তানের স্পর্শের কারণে সন্তান চিৎকার করে। তবে হযরত মারইয়াম এবং তার সন্তান এর ব্যতিক্রম। তাদেরকে শয়তান স্পর্শ করতে পারেনি। এটা তাদের প্রতি আল্লাহর বিশেষ করুণা স্বরূপ।

উনত্রিশ

قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلٰمٌ وَّقَدْ بَلَغَنِىَ الْكِبَرُ وَامْرَاَتِىْ عَاقِرٌ ط قَالَ كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ○ (ال عمران : ٤٠)

তিনি বললেন, হে আমার রব ! আমার ছেলে হবে কিভাবে ? আমি যে বার্ধক্যে পৌঁছে গেছি ! আর আমার স্ত্রীও যে বন্ধ্যা ! আল্লাহ বললেন, এ অবস্থায়ই, আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন।"

–(সূরা আলে ইমরান ঃ ৪০)

বন্ধা নারী ও বৃদ্ধ স্বামীর সন্তান লাভ

প্রসংগ ঃ বায়তুল মুকাদ্দাসের খেদমতে নিবেদিত শিশু মারইয়ামের লালন-পালনের দায়িত্বে ছিলেন হযরত যাকারিয়া (আ)। তিনি ছিলেন মারইয়াম (আ)-এর খালু। হযরত যাকারিয়া (আ) যখনই মারইয়ামের কক্ষে প্রবেশ করতেন তিনি সেখানে আশ্চর্য ধরনের খাবার অসময়ের ফল দেখতে পেতেন। তালাবদ্ধ কক্ষে এসব খাবার দেখে হযরত যাকারিয়ার মনে সন্তান পাওয়ার আকঙ্ক্ষা জাগলো। তিনি ভাবলেন যে, আল্লাহ তালাবদ্ধ কক্ষে এ বাচ্চাকে আশ্চর্য ধরনের খাবার দিতে পারেন, তিনি আমার এ বৃদ্ধাবস্থায় আমাকেও তো একটা সন্তান দিতে পারেন। হযরত মারইয়ামের লালন-পালনে অসাধারণ খোদায়ী নিদর্শন দেখে তিনি নিজের জন্যে দোয়া করে বললেন, 'হে রব ! তোমার পক্ষ থেকে আমাকে পবিত্র সন্তান দান কর। তুমি নিশ্চয়ই দোয়া শ্রবণকারী।"

অতপর একদিন হযরত যাকারিয়া (আ) মেহরাবে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলেন। ফেরেশতারা তখন তাঁকে ডেকে বললো, আল্লাহ আপনাকে একটা পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছেন। সে সন্তান অনেকগুলো গুণেরও অধিকারী হবেন। আল্লাহর পাঠানো এ সুসংবাদের জবাবে উপরোক্ত আয়াতে বর্ণিত কথাগুলো বলেছিলেন। হযরত যাকারিয়া (আ) সন্দেহের কারণে এসব প্রশ্ন করেননি ; বরং তাঁর তো আল্লাহর শক্তি-সামর্থের উপর যথেষ্ট বিশ্বাস এবং আল্লাহর কুদরতের উপর প্রগাঢ় ঈমান ছিলই। তবুও তিনি জানতে চাইলেন যে, তাদের স্বামী-স্ত্রীর বার্ধক্য ও বন্ধাত্ব বহাল রেখেই সন্তান দেয়া হবে, না এতে কোনোরূপ পরিবর্তন করা হবে ? আল্লাহ বললেন, অবস্থা যা আছে তাই থাকবে। এ অবস্থায়ও আল্লাহর ইচ্ছায় সন্তান হবে।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহর কুদরতের ঐতিহাসিক সত্যতা বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত যাকারিয়া (আ) ছিলেন বৃদ্ধ আর তাঁর স্ত্রী ছিলেন বন্ধা। সন্তান লাভের জাগতিক অবস্থা তখন তাদের ছিল না। সেই অসম্ভব অবস্থায়ও হযরত যাকারিয়া মারইয়ামের কাছে অসম্ভব পরিবেশে অলৌকিকভাবে অসময়ের ফল দেখে আল্লাহর কুদরতের উপর প্রগাঢ় ঈমান থাকায় তিনি সন্তান প্রার্থনা করলেন। আজকের সমাজে একদিকে নিঃসন্তানেরা সন্তান পাওয়ার জন্যে ধর্ণা দেয় পীর, বুজর্গদের মাজারে, পথ ধরে শিরকের, সর্বশক্তিমান আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাওহীদ পরিপন্থী বিশ্বাস ও কর্মের দিকে তারা এগিয়ে যায়। অন্যদিকে জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সন্তান উৎপাদনক্ষম যুগলেরা জন্মনিয়ন্ত্রণের পথ ধরে। সন্তান দেয়ার ব্যাপারে আল্লাহর যে পূর্ণ কুদরত বিরাজিত তা যেমন মরিয়ম (আ)-এর বিশ্বাস তেমনি হযরত যাকারিয়া (আ) এ বিষয়ে পূর্ণ ঈমান রাখতেন, কিন্তু আমাদের সমাজের লোকেরা এ ধরনের কাজে শিরকের পথে ধাবিত হয় অহরহ। অথচ হযরত যাকারিয়া (আ) বাহ্যিক অবস্থায় সন্তান প্রাপ্তির বয়স না থাকলেও সর্বশক্তিমান আল্লাহর কুদরতের উপর প্রগাঢ় বিশ্বাস থাকায় তিনি একমাত্র তারই নিকট সন্তান প্রার্থনা করেছিলেন। হযরত যাকারিয়া (আ) যখন দেখলেন যে, আল্লাহ তা'আলা মারইয়ামকে শীতকালে গ্রীষ্মকালের ফলমূল এবং গ্রীষ্মকালে শীতকালীন ফলমূল দিয়ে জীবিকা দান করছেন, তখন তাঁর বার্ধক্যেও সন্তান লাভের আকাঙ্ক্ষা জন্মিল। যদিও তাঁর সার্বিক অবস্থা ছিল সন্তান লাভের সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি নিজে বার্ধক্য জনিত দুর্বলতার সম্মুখীন ছিলেন, চুলগুলো সাদা হয়ে গিয়েছিল আর তাঁর স্ত্রীও ছিল বন্ধা। এতদসত্ত্বেও সন্তান লাভের আকুতি তাঁর অন্তরের গভীরে দানা বেঁধে উঠলে তিনি নিবৃত্তে আকুল কণ্ঠে নিবেদন করতে থাকেন।

رَبِّ هَبْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاءِ-

"হে রব ! আপনি দয়া করে আপনার পক্ষ থেকে আমাকে একটা নেক সন্তান দিন। নিশ্চয়ই আপনি দোয়া শ্রবণকারী।" উত্তরে আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতা মারফত সুসংবাদ পাঠালেন ঃ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى "আল্লাহ আপনাকে ইয়াহইয়া নামক সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছেন।" অর্থাৎ সন্তান তো দিচ্ছেন—তার নামও আল্লাহই নির্ধারণ করে দিলেন। আল্লাহ তা'আলা সর্ব যুগে সর্বাবস্থায়ই তাঁর কুদরতের রহস্য দেখাতে পারেন। প্রয়োজন কেবল প্রগাঢ় ঈমানের।

وَاِذْ قَالَتِ الْمَلٰئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفٰكِ عَلٰى نِسَاءِ الْعٰلَمِيْنَ ○ (ال عمران : ٤٢)

"তারপর এমন সময় উপস্থিত হলো যখন ফেরেশতাগণ বললো, হে মারইয়াম আল্লাহ তা'আলা তোমাকে উচ্চ সম্মানে মহিমান্বিত করেছেন, তোমাকে পবিত্রতা দান করেছেন, আর তোমাকে পৃথিবীর নারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ৪২)

পবিত্রতা নারীদের উচ্চ-মর্যাদায় উন্নীত করে

হযরত মারইয়ামের মাতার মান্নত অনুযায়ী তৎকালীন শরীয়তের রীতি অনুসারে তিনি বায়তুল মোকাদ্দাসের খাদেমা ছিলেন। তিনি ছিলেন পূত-পবিত্র চরিত্রের অধিকারিনী। তিনি সারা রাত আল্লাহর ইবাদাতে রত থাকতেন। মুজাহিদ বলেন ঃ হযরত মারইয়াম (আ) রাত্রিতে দীর্ঘ সময় ইবাদাতে মশগুল থাকার কারণে উভয় পাঁয়ে খুঁত এসে গিয়েছিল। আল্লাহ তাঁকে তৎকালীন বিশ্বের নারীদের মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করেছিলেন। এবং আল্লাহ যে দুনিয়ার যাবতীয় শৃংখলা ও কার্যাবলী আনজাম দান করেন এবং কোনো কিছুই আপনা আপনি যেমন সংগঠিত হয় না ; তেমনি প্রাকৃতিক নিয়মেই সবকিছু হয় না ; বরং প্রাকৃতিক নিয়ম-নীতিও আল্লাহই নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। তারই নিদর্শন স্বরূপ হযরত ঈসা (আ) মারইয়ামের গর্ভে স্বাভাবিক নিয়মের বাইরে আল্লাহর অসীম কুদরতে পিতা ছাড়াই জন্ম নিলেন। এবং জন্মের পরেই নিজের পরিচয় দিয়ে লোকদের সাথে কথা বলতে থাকেন।

আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ)-কে তৈরী করেছেন মাতা-পিতা ছাড়া। আর হযরত ঈসা (আ)-কে সৃষ্টি করলেন পিতা ছাড়া কেবল মাতা থেকে। আল্লাহর এ কুদরতের নিদর্শন দেখানোর জন্যে এমন এক নারী অর্থাৎ হযরত মারইয়ামকে নির্বাচন করলেন যিনি রাতভর আল্লাহর ইবাদাতে মশগুল থাকতেন এবং তিনি ছিলেন নির্মল নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারিণী।

আল্লামা ইবনে কাসীর হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস এ প্রসংগে উদ্ধৃত করেছেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, বিশ্বে চারজন মহিলা শ্রেষ্ঠ।

মারইয়াম বিনতে ইমরান, ফিরাউনের স্ত্রী আসিয়া, খাদিজা বিনতে খুওয়াইলাদ এবং ফাতেমা বিনতে রাসূলুল্লাহ (স)। তিরমিযি একাই এ হাদীস রেওয়াত করেছেন আর একে বিশুদ্ধ বলে দাবী করেছেন।

এ আয়াতের অবতারণা হয়েছে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ সম্পর্কে ফেরেশতাগণ হযরত মারইয়ামের সাথে যে সমস্ত কথাবার্তা বলেছেন তা হুজুর (স)-কে অবহিত করার উদ্দেশ্যে অর্থাৎ মহান আল্লাহ তার অধিক ইবাদাত, দুনিয়া বিরাগ ও পূত-পবিত্রতার দরুন তাকে সর্বপ্রকার মলীনতা ও অপবিত্রতা থেকে পাক-সাফ করে নির্বাচন করেছেন আর তাঁর এসব মহত্বের দরুন তাকে বিশ্ব নারী সমাজের উপর মর্যাদা দিয়েছেন।–(ইবনে কাসীর)

একত্রিশ

يٰمَرْيَمُ اقْنُتِىْ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِىْ وَارْكَعِىْ مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ○

"হে মারইয়াম ! তোমার রবের আনুগত্য কর, তাঁকে সিজদা কর এবং রুকূ'কারীদের সাথে তুমিও রুকূ' কর।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ৪৩)

মর্যাদাবান নারীরা সমাজ বিমুখ থাকে না

পূর্বের আয়াতে হযরত মারইয়াম (আ)-কে তৎকালীন নারী কুলের শ্রেষ্ঠতম মর্যাদা দানের ঘোষণা করা হয়েছে। এখানে তাঁকে স্বীয় রবের অনুগত হওয়ার জন্যে, রবের সিজদা করার জন্যে এবং রুকূ'কারীদের সাথে রুকূ' করার জন্যে স্বয়ং রাব্বুল আলামীন নির্দেশ দিয়েছেন। মানব সমাজের প্রত্যেক পর্যায়ে সকল কালের নর-নারীরা জীবনের সামগ্রিক কার্যাবলীতে হয়ত সত্য পথে চলেছে নয়ত চলেছে বাতিলের পথে। সকল নর-নারীকে নিজ নিজ কর্ম অনুযায়ী হকপন্থী ও বাতিল পন্থী—এ দু' ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। মর্যাদাবান নারীরা বাস্তবে অন্যান্য মর্যাদার অধিকারীদেরই দলভুক্ত হয়ে চলবে এটাই স্বাভাবিক। রুকূ'কারীদের সাথে রুকূ' করার অর্থ সমাজের সৎপন্থীদের দলভুক্ত থাকা এবং ব্যক্তিগতভাবেও সৎকাজ করা। দ্বিতীয়তঃ এর অর্থ এও হতে পারে যে, নামাযীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে নামায আদায়ে অভ্যস্থ হও। তৃতীয়তঃ সমাজের অন্যান্য নারীদের সাথে সদাচরণ ও নম্রব্যবহার করার নির্দেশ দেয়াও এ আয়াতের অর্থ হতে পারে। অর্থাৎ সমাজে যারা সদাচারী ও নম্র ব্যবহারে অভ্যস্থ—যাদের দ্বারা সমাজের লোকেরা কোনো কষ্ট পায় না, তুমিও তাদের দলভুক্ত হও। সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠাকামীদের সাথী হয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠায় পরস্পরকে সহযোগিতা কর। যেমন আরেকটি আয়াতে রুকূ'র এ অর্থই গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে ঃ

اَلَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رَاكِعُوْنَ ـ(المائدة : ٥٥)

এখানে প্রথমে সালাতের কথা বলা হয়েছে বিধায় পরবর্তীতে রুকূ' করা বলতে অনেক মুফাস্‌সির উপরোক্ত অর্থ গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ তারা সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং সমাজে শান্তি-শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করে থাকে।

সমাজের জনসংখ্যার অর্ধেক যেমন নারী তেমনি বিশ্ব সৌন্দর্য সংস্থাপনে নরের মত নারীর ভূমিকাও কম নয়। ইসলাম নারীদেরকেও নির্ধারিত

পরিমণ্ডলে ও নির্দিষ্ট গণ্ডীতে থেকে সামাজিক শান্তি স্থাপনে ও সমাজের উন্নতি বিধানে সম্ভাব্য ভূমিকা রাখার অবকাশ দিয়েছে। এমন নয় যে, কেবল নরেরাই সমাজে সক্রিয় থাকবে আর নারীরা থাকবে নিষ্ক্রীয় হয়ে। বস্তুত নারীদের নিষ্ক্রীয় থাকা বা সমাজ বিমুখ থাকা বা সার্বিক কর্মকাণ্ডে কোনো ভূমিকা না রাখা, কখনো কোনো মর্যাদাশীল জাতি মাত্রেরই কাম্য হতে পারে না। ইসলামের গৌরবময় যুগেও নারীদের ভূমিকা ছিল সমাজের সার্বিক কল্যাণধর্মী কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত। রাসূলের যুগে নারীরা জিহাদের জন্য যুদ্ধ ময়দানেও গিয়েছিলেন।

বত্রিশ

قَالَتْ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ وَلَدٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِىْ بَشَرٌ ط قَالَ كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ط اِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَه كُنْ فَيَكُوْنُ ○(ال عمران : ٤٧)

"মারইয়াম (আ) বললেন, হে রব ! আমার পুত্র হবে কোত্থেকে ? আমাকে তো কোনো লোক স্পর্শ করতেও পারেনি ! বললেন, এভাবেই আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। তিনি কোনো কিছু সৃষ্টির ইচ্ছা করলে বলেন, "হয়ে যাও। অমনি তা হয়ে যায়।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ৪৭)

মহান আল্লাহ নর ছাড়া শুধু নারী থেকে সন্তান দিয়েছেন

ফেরেশতারা হযরত মারইয়ামকে বললেন, "হে মারইয়াম আল্লাহ তাঁর পক্ষ থেকে একটা বাণীর সুসংবাদ দিচ্ছেন, যার নাম হবে 'ঈসা ইবনে মারইয়াম।' তিনি ইহ-পরকালের সম্মানিত ও আল্লাহর ঘনিষ্টদের অন্তর্ভুক্ত। যিনি দোলনায় ও কোলে থেকে মানুষের সাথে কথা বলবেন। আর যিনি পুণ্যবানদের একজন। তখন হযরত মারইয়াম আশ্চর্য হয়ে বললেন, "আমার গর্ভে কি করে সন্তান জন্মিবে ! আমি তো বিবাহিতা নই। আমি ব্যভিচারিণীও নই।" কারণ স্বাভাবিক নিয়মে তো নর-নারীর যৌন মিলনের ফলে সন্তানের জন্ম হয়ে থাকে। তিনি বলেন, "আমাকে তো কখনো কোনো নর স্পর্শ পর্যন্ত করেনি। নাকি আমাকে বিবাহের নির্দেশ দেয়া হবে !" আল্লাহর পক্ষ থেকে জবাব আসলো। "অবস্থা এমনিই থাকবে।" ঠিক অমনিভাবে বলা হয়েছিল হযরত যাকারিয়া (আ)-কে। তাঁকেও বলা হয়েছিল তোমার বার্ধক্য ও তোমার স্ত্রীর বন্ধাত্ব অবস্থা বহাল থাকা অবস্থায়ই তোমাদের সন্তান দান করা হবে।

অতপর আল্লাহর সৃষ্টির পদ্ধতি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তিনি কোনো কিছু সৃষ্টি করার ইচ্ছা করলেই তা সৃষ্টি হয়ে যায়। তিনি বলেন, كُنْ (হয়ে যাও) অমনি তা হয়ে যায়। আল্লাহর দেয়া স্বাভাবিক নিয়ম-নীতির মধ্যে তো তা হয়ে থাকে। আর স্বাভাবিক নিয়মের বাইরেও তাঁর অসীম কুদরাতের দ্বারা কোনো কিছুর সৃষ্টি হতে পারে। এ ক্ষেত্রে ইয়াহুদী ও খৃষ্টানগণ আল্লাহর কুদরতে বিশ্বাসী হতে পারেনি।

খৃষ্টানগণ হযরত ঈসা (আ)-কে খোদার পুত্র ও খোদা বলে বিশ্বাস করে থাকে। এ আয়াতে তাদের এ ভুল ধারণার নিরসন করা হয়েছে। মাত্র ছয় মাস

পূর্বে হযরত ইয়াহইয়া (আ)-এর জন্ম যেমন একটা মুযিজা ছিল ; ঠিক তেমনি হযরত ঈসা (আ)-এর জন্মও অপর একটি মুযিজা। ইয়াহ্ইয়া যদি অস্বাভাবিক ও আশ্চর্যজনকভাবে জন্মগ্রহণ করে খোদা না হয়ে থাকেন, তাহলে ঈসা কেন অস্বাভাবিক নিয়মে জন্মগ্রহণ করায় খোদা বা খোদার পুত্র হতে পারেন ? এ ভাষণে খৃষ্টানদের সেই ভুল বুঝিয়ে দেয়াই উদ্দেশ্য।

আল্লাহর জাত ও সিফাতে যে কাউকে সমকক্ষ মনে করা শিরক তেমনি মানুষের কোনো সিফাত-বৈশিষ্ট্যকে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করাও শিরক। ইয়াহুদীরা বলতো ওযায়ের আল্লাহর বেটা আর খৃষ্টানরা বলতো ঈসা আল্লাহর বেটা। এভাবে আল্লাহর কিতাবের আহল হয়েও এ দু'টো সম্প্রদায়—ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা আল্লাহর সাথে মানুষের একটা বৈশিষ্ট্য জন্মদান ও যৌন কর্মকে সম্পৃক্ত করে আল্লাহর মর্যাদা ক্ষুণ্ন করে শিরকে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

আল্লাহর সৃষ্টি পদ্ধতির একটা দিক উক্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। কোনো কিছু সৃষ্টিতে আল্লাহ কোনো কারণ উপকরণের মুখাপেক্ষী নন। বরং তিনি কিছু সৃষ্টির ইচ্ছা করলে বলেন, 'হও' তখনই তা হয়ে যায়। মুফাস্সির ও মুহাক্কিক আলিমগণের মতে আল্লাহকে কোনো কিছু সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে 'কুন্' শব্দটিও বলতে হয় না। তাঁদের মতে 'কুন্' বলতে যতটুকু সময় লাগে আল্লাহর ইচ্ছা বলে কোনো কিছু ততটুকু সময়ের মধ্যেই সৃষ্টি হয়ে যায়। অর্থাৎ কোনো কিছু সৃষ্টি করার জন্য আল্লাহ তা'আলা 'কুন্' বলার প্রতিও মুহতাজ নন। বরং সে জন্যে তাঁর ইচ্ছা করাই যথেষ্ট। আল্লাহর অসীম কুদরতে তিনি আদম (আ)-কে সৃষ্টি করেছেন পুরুষ-স্ত্রী ছাড়া, হাওয়াকে সৃষ্টি করেছেন পুরুষ (আদম) থেকে, আর ঈসা (আ)-কে সৃষ্টি করেছেন নারী (মারইয়াম) থেকে। এটা আল্লাহর কুদরত। কিন্তু আল্লাহর কুদরত প্রকাশ পায় বিশেষ কোনো কারণে, বিশেষ কোনো সময়ে। তাছাড়া সবকিছুই সাধারণত আল্লাহর আদত অনুসারেই প্রকাশ পায়। দুনিয়ার সাধারণ নিয়মই হলো আল্লাহর আদত। নাস্তিকরা যাকে বলে প্রকৃতি। বস্তুত প্রকৃতি বলতে কোনো কিছুরই অস্তিত্ব নেই। আল্লাহই ভাল জানেন।

তেত্রিশ

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ ۚ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ ۚ (ال عمران : ١٩٥)

"অতপর তাদের পালনকর্তা তাদের দোয়া এই বলে কবুল করে নিলেন, আমি তোমাদের মধ্য হতে কোনো আমলকারীর আমল বৃথা যেতে দেই না ; চাই আমলকারী নর হোক বা নারী। তোমরা তো পরস্পরের সম্পূরক।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯৫)

আমলের ক্ষেত্রে আল্লাহর কাছে নর-নারীর কোনো পার্থক্য নেই

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আমলী ঈমানদার লোকদের কতিপয় দোয়া-মুনাযাতের বর্ণনা ছিল। আলোচ্য আয়াতে সে দোয়ার মনজুরী এবং আমলী লোকদের নেক আমলের বিপুল প্রতিদানের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে।

সৎকাজ যেই করুক না কেন সেই তার পুরোপুরি প্রতিদান ও সওয়াব পাবে। কাজটি চাই কোনো পুরুষই করুক অথবা কোনো নারীই করুক। প্রতিদান প্রাপ্তিতে উভয়ের জন্যে একই নিয়ম। আল্লাহর দরবারে এমন কোনো নিয়ম নেই যে, একই কাজ যদি পুরুষ করে তবে এক প্রকার ফল পাবে, আর যদি স্ত্রীলোকেরা করে তবে অন্য প্রকারের ফল পাবে। আল্লাহ নর ও নারীর পার্থক্যের দরুন তাদের আমলের প্রতিফলের মধ্যে কোনো পার্থক্য করেন না। এ ক্ষেত্রে আল্লাহর কথা হলো– بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ "তোমরা (নর-নারী) পরস্পরের অংশ বিশেষ।" কাজেই আমলের ফলাফলের দিক থেকেও কোনো তারতম্য নেই বা থাকবে না।

ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ বা স্বল্প ধারণার লোকেরা মনে করে থাকে যে, ইসলাম কেবল পুরুষদের প্রাধান্য ও গুরুত্ব দেয়। নারীদের কোনো মর্যাদা বা অধিকার ইসলামে নেই। এমনকি আজকের সমাজে কিছু নামধারী মুসলিম যুবক-যুবতীদেরও এমনি ধারণা রয়েছে। উপমহাদেশের মুসলিম সমাজে ইসলামী তাহজীব-তমদ্দুনের যথার্থ ধারণা ও আমল না থাকার কারণে এবং

আন্তর্জাতিক ইসলাম বিদ্বেষীদের ষড়যন্ত্রের ফলে মুসলমানদের একটি অংশের মধ্যে অতি সুকৌশলের এ জাতীয় বিষক্রিয়ার সংক্রমন ঘটেছে।

ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে সত্যিকার ধারণা না থাকার কারণে মুসলিম সমাজের কতিপয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দও বিশ্বের অমুসলিমদের ইসলাম বিরোধী শ্লোগান নিজেদের মধ্যে প্রচলন বরং নিজেরা তা গ্রহণ ও বরণ করে নিচ্ছে। যেমন 'সাম্প্রদায়িকতা'। যে ইসলাম সাম্প্রদায়িকতার মূলোৎপাটনকারী সার্বজনীন আদর্শ। সে ইসলামকেই দুর্নাম করা হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতার নামে।

আল-কুরআনের উপস্থাপিত নারী পুরুষের মর্যাদার পার্থক্যহীনতা বরং নর-নারীদের যথোপযুক্ত মর্যাদার ঘোষণা আজকের বিশ্বে কার্যকর না থাকার দরুণ উদ্ভূত পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে নারী দিবস শিশু দিবস ইত্যাদি দিবসগুলো আন্তর্জাতিকভাবে উদযাপন করা হচ্ছে। কিন্তু ইসলামের বিধি-বিধানগুলো সমাজে বাস্তবায়িত হলে এসব দিবস পালনের কি প্রয়োজন হতো ?

তেমনি তাদের আরেকটি শ্লোগান 'ধর্মনিরপেক্ষতা'। মুসলিম রাষ্ট্রে অমুসলিমদের অধিকার ও নিরাপত্তার স্বার্থে তারা এ শ্লোগানটি উচ্চারণ করেন। কিন্তু ইসলামী জীবন বিধানে অমুসলিমদেরকে অধিকার ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা রয়েছে, তা তথাকথিত কোনো ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রেও যে নেই, সেই সত্যটুকু জানা না থাকার কারণেই অথবা জেনে বুঝে বিদ্বেষবশতঃ এ শ্লোগানটি উচ্চারণ করা হচ্ছে।

এভাবে নারীর অধিকার ও মর্যাদার বিষয়, দাদার বর্তমানে পিতার মৃত্যুতে দাদার সম্পত্তিতে নাতির অংশ, নারীদের পর্দা ব্যবস্থা—ইত্যাদি বিষয়ে ইসলামের বিধি-বিধান নিয়ে এদের আপত্তি ! এসব বিষয়ে এরা অমুসলিম, নারী ও ইয়াতীম নাতির নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে অস্থির ! এ যেন মায়ের চেয়ে মাসীর দরদ। যে আল্লাহ সৃষ্টিকর্তা ও পালনকারী, তাঁর চেয়ে যেন সৃষ্টির জন্য এদের দরদ বেশী !

চৌত্রিশ

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّنِسَاءً ج -(النساء : ١)

"হে মানব সমাজ ! তোমাদের রবের বিষয়ে সতর্ক থাক। যিনি তোমাদেরকে একটি প্রাণী থেকে সৃষ্টি করেছেন, এবং তার থেকে তৈরী করেছেন তার স্ত্রীকে। আর তাদের দু'জন থেকে বিস্তার করিয়েছেন অগণিত নারী পুরুষ।"-(সূরা আন নিসা ঃ ১)

যৌন আকর্ষণ সৃষ্টির মূল লক্ষ্য মানব বংশের বিস্তার সাধন

পৃথিবীর প্রথম মানুষ হযরত আদম (আ)। আর তারই দেহ থেকে সৃষ্টি তাঁর সংগিনী বিবি হাওয়া (আ)। আল্লামা ইবনে কাসীর (রহ) তাঁর তাফসীরে ইবনে কাসীরে বলেন, হাওয়া (আ)-কে হযরত আদম (আ)-এর বাম পাঁজর থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আদম (আ) তখন ঘুমে ছিলেন। জেগে দেখেন তাঁর পার্শ্বে এক মহিলা শায়িত আছে। তিনি আশ্চর্যান্বিত হন। অতপর জৈবিক চাহিদায় স্বাভাবিকভাবে একে অপরের প্রতি আকৃষ্ট হন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, পুরুষ থেকে মহিলা সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং তার প্রয়োজনও রাখা হয়েছে পুরুষের প্রতি।

পৃথিবীর সকল মানুষের মূল উৎস হলো হযরত আদম (আ)। সকল মানুষ তাঁরই সন্তান। সুতরাং দুনিয়ার জীবনে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ সৃষ্টি করা অসংগত ও অযৌক্তিক। ইসলামে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা মারাত্মক গুনাহ। মানুষ মূলত জন্মসূত্রেই পারস্পরিক সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ। আত্মীয় স্বজনের পারস্পরিক সম্পর্কের বুনিয়াদকে ইসলামী পরিভাষায় 'সেলায়ে রেহমী' বলা হয়। হাদীস শরীফে আত্মীয়তার সম্পর্কের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। মহানবী (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার রিযিকের প্রাচুর্য এবং দীর্ঘ জীবন প্রত্যাশা করে, তার উচিত আত্মীয়-স্বজনের সাথে সু-সম্পর্ক গড়ে তোলা।

কুরআনের আয়াতে আদম (আ) থেকে তাঁর জুড়ি তৈরী করার কথা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। কিন্তু জুড়ি তৈরীর বিস্তারিত বিবরণ পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়নি। তাফসীরে ইবনে কাসীরের পূর্বোক্ত বর্ণনা অন্য কতিপয় তাফসীরেও বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া বাইবেলেও এ ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। পবিত্র কুরআন এ সম্পর্কে নিরব বিধায় অনেক তাফসীর কারক এ বিষয়ে নিরব থাকারই পক্ষপাতি। আর এটাই যুক্তিযুক্ত ও অধিকতর সত্যের নিকটবর্তী। আল্লাহই ভাল জানেন।

আয়াতের শেষাংশে আদম-হাওয়ার মধ্য থেকে অসংখ্য নারী-পুরুষ সৃষ্টির কথা বর্ণিত হয়েছে। আর পৃথিবীর প্রথম যুগলের পরবর্তী যুগলসমূহ থেকেও ক্রমিক ধারায় মানব বংশ বিস্তার লাভ করেছে। মূলত নর-নারীর সৃষ্টি ও তাদের পরস্পরের প্রতি স্বভাবগত আকর্ষণ সৃষ্টির পেছনে রয়েছে পৃথিবীতে মানব বংশ বৃদ্ধির প্রক্রিয়া চালু রাখা। মহান রাব্বুল আলামীন ঐ স্বভাবগত আকর্ষণ নিয়ন্ত্রণে রেখে মানব সমাজে নিষ্কলুষ ও সুশৃংখলিত রাখার ব্যবস্থাও দিয়েছেন। কিন্তু স্থূল দৃষ্টির মানুষ স্রষ্টার দেয়া ভারসাম্য হারিয়ে নিছক পশুত্ব প্রবণতার প্রতি ঝুঁকে গিয়ে সমাজে নানাবিধ যৌন অনাচার সৃষ্টিতে মত্ত হয়ে পড়ে। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো সভ্যতার নামে অনেকে এ ঝোঁক প্রবণতাকে প্রকাশ্যে লাইসেন্স দিয়ে পশুত্বের স্তরে নামিয়ে দিয়ে সেরা সৃষ্টির মর্যাদাকে ভুলুণ্ঠিত করেছে।

আল্লাহ তা'আলা সূরা আন নিসার উপরোক্ত প্রথম আয়াতে সমগ্র মানব জাতিকে সম্বোধন করে বলেছেন, হে মানব মণ্ডলী ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার বিরুদ্ধাচারণকে ভয় কর। এমন মহান সত্বাকে ভয় কর, যিনি তোমাদের সবাইকে একই মানুষ আদম (আ) থেকে সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ প্রথমত আদম (আ) থেকে তাঁর স্ত্রীকে এবং পরবর্তীতে সেই যুগল থেকে পৃথিবীর সকল মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।

এখানে মানব মণ্ডলী বলে পুরুষ-স্ত্রী এবং রাসূল (সা)-এর সময়কার ও কিয়ামত পর্যন্ত আগত নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মানুষকে বুঝানো হয়েছে। সকল যুগের সকল মানুষকে আল্লাহর ব্যাপারে তাকওয়া অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেহেতু তিনিই একমাত্র 'রব' বা প্রতিপালক। তাঁর রবুবিয়ত বা প্রতিপালন কার্যে অন্য কোনো শক্তির বিন্দুমাত্র দখল নেই। সুতরাং একমাত্র তাঁর ব্যাপারে তাকওয়া বা সতর্কতা অবলম্বন করে একই আদমের বংশোদ্ভূত

হওয়ার কারণে সকল মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার করার প্রতি উক্ত আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

এ আয়াতটি বিয়ের খুতবায় পাঠ করা সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (স) বিয়ের খুতবায় এ আয়াতটি পাঠ করতেন। যেন আলোচ্য আদম সন্তানদ্বয় তাদের দাম্পত্য জীবনের শুরুতেই আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করতে পারে।

পঁয়ত্রিশ

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاۤءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ

"আর তোমরা যদি ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি ইনসাফ করতে না পারার আশংকা কর, তবে অন্যান্য স্ত্রীলোকদের মধ্য হতে তোমাদের পসন্দসই দু'জন অথবা তিনজন অথবা চারজনকে বিয়ে করতে পার। যদি তাদের মধ্যে ইনসাফ করতে পারার ব্যাপারে আশংকা থাকে, তবে মাত্র একজনকে নিয়েই তুষ্ট থাকবে, অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীদের নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবে।"–(সূরা আন নিসা ঃ ৩)

একজন পুরুষ শর্ত সাপেক্ষে সর্বাধিক চারজন নারীকে বিয়ে করতে পারবে

ইসলাম পূর্ব জাহেলী যুগে ইয়াতীম মেয়েদের অধিকার চরমভাবে ক্ষুণ্ন করা হতো। তাদের সৌন্দর্য ও সম্পদের মোহে অভিভাবকরা নামে মাত্র মোহর দিয়ে তাদেরকে বিয়ে করে নিতো অথবা সন্তানদের সাথে বিয়ে দিয়ে সম্পত্তি আত্মসাৎ করার ব্যবস্থা করতো। উক্ত আয়াত ও তৎপূর্ব আয়াতে তাদের এ হীন লালসাবৃত্তি থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

বুখারী শরীফে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, মহানবী (স)-এর যুগে ঠিক এমনি ধরনের একটি ঘটনা ঘটেছিল। জনৈক ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে একটি ইয়াতীম মেয়ে ছিল। সে ব্যক্তির একটি বাগান ছিল, যার মধ্যে উক্ত ইয়াতীম বালিকাটিরও অংশ ছিল। সে ব্যক্তি বালিকাটিকে বিয়ে করলো। তাকে মোহর তো দিলই না, বরং মেয়েটির বাগানের অংশও সে আত্মসাত করে নিলো। এ ঘটনার প্রেক্ষিতেই উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়েছে।

ইসলাম পূর্ব যুগে দুনিয়ার প্রায় সকল ধর্মমতেই বহু বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। ইউরোপের বিশিষ্ট চিন্তাবিদ মিঃ ডিউন পোর্ট বহু বিবাহের একজন বড় প্রবক্তা। তিনি তার মত প্রতিষ্ঠায় পবিত্র ইনজীল গ্রন্থের অনেক শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন। তেমনি ইউরোপের পাদরী নিকসন, জন মিল্টন এবং আইজাক

টেইলর প্রমুখ চিন্তাশীল ব্যক্তিরা বহু বিবাহ প্রথা চালু করার জন্যে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। এমনকি পণ্ডিত ডিরাক অসংখ্য স্ত্রী রাখার পক্ষপাতি। তাঁর মতে একজন পুরুষ দশ থেকে সাতাইশজন স্ত্রী রাখতে পারবে। যে কৃষ্ণকে হিন্দুরা দেবতা বলে স্বীকার করে সেই কৃষ্ণেরও দশাধিক স্ত্রী ছিল। আজকের বিশ্বে যেসব জাতির মধ্যে বহু বিবাহ প্রথার উপর বিধি-নিষেধ রয়েছে তাদের মধ্যেও নারী-পুরুষের বন্ধুত্ব এবং নর-নারীর অবাধ মেলামেশার আবরণে ব্যভিচার ও অসামাজিক কার্যকলাপ চরমভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ জাতীয় সমাজে বহু বিবাহের সুযোগ নেই ঠিকই কিন্তু প্রমোদবালাদের দৌরাত্ম সীমা ছাড়িয়ে গেছে। তাছাড়া ব্যভিচার মাথাচাড়া দিয়ে উঠাই এ সমাজের বৈশিষ্ট্য। আজকের পাশ্চাত্য সমাজ এদিক থেকে শীর্ষে। তারা পরিবার ভাংগা জাতিতে পরিণত হয়ে চরম উৎকণ্ঠায় জীবন-যাপন করছে।

মোটকথা, ইসলাম পূর্ব যুগে অবাধেই বহু বিবাহ প্রথা চালু ছিল। বিভিন্ন ধর্ম ও দেশের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, এর প্রতি কোনো বাধা-নিষেধও ছিল না। ইয়াহুদী, খ্রীষ্টান, হিন্দু, আর্য ও পারসিকদের মধ্যে বহু বিবাহ প্রচলিত ছিল। ইসলামী শরীয়তের প্রাথমিক স্তরে কোনো সংখ্যা নির্ধারণ ছাড়াই এ প্রথা চালু ছিল। অধিকন্তু তারা এসব স্ত্রীদেরও বাদী-দাসীদের মত রাখতো। তাদের প্রতি কোনো ইনসাফ করা হতো না। তাদের অধিকার চরমভাবে ক্ষুণ্ন করা হতো। দু' একজনের প্রতি কিছু লক্ষ্য রাখা হতো আর বাকী সবাইর প্রতি প্রদর্শন করা হতো চরম অবহেলা ও যুলুম-অত্যাচার।

ইসলাম নারীদের প্রতি এসব যুলুম-অনাচারের প্রতিরোধ করেছে। বহু বিবাহের প্রতি আরোপ করেছে প্রয়োজনীয় বিধি-নিষেধ। ইসলামী শরীয়ত একই সময়ে চারজনের অধিক স্ত্রী রাখাকে হারাম ঘোষণা করেছে। একাধিক স্ত্রীর ক্ষেত্রে ইনসাফ কায়েমের জন্যে ইসলাম বিশেষ তাকীদ দিয়েছে এবং ইনসাফের পরিবর্তে যুলুম করে থাকলে তার বিরুদ্ধে শাস্তির ঘোষণা দিয়েছে।

উপরোক্ত আয়াত একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দেয় বিচার-ইনসাফের শর্তে। যে ব্যক্তি এ ইনসাফ ঠিক রাখতে পারবে না তাকে এক স্ত্রীতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। যে ব্যক্তি এ শর্ত পূরণ করতে সক্ষম হবে না ইসলামী আদালত তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

আধুনিক সমাজে যারা একাধিক স্ত্রী রাখার চরম বিরোধী বরং এটাকে স্ত্রীদের প্রতি যুলুম মনে করে। এমনকি কিছু নব্য চিন্তাধারার তথাকথিত উদার নীতির ধ্বজাধারীরা ইসলামী শরীয়তের সংখ্যা নির্ধারণকেও নারীর প্রতি

অবিচার মনে করে থাকে। তাদের উচিত ইসলাম পূর্ব অবস্থার পূর্ণ ইতিহাস জেনে নেয়া, অন্যান্য ধর্মমতের বক্তব্য জানা এবং তাদের সম মতাবলম্বীদের সার্বিক অবস্থা অবলোকন করা ও তাদের স্ত্রীদের কাছে তাদের খবর নেয়া। এরা বৈধ পত্নী রাখার প্রতি ঘোর প্রতিবাদকারী হলেও অবৈধ উপপত্নী বা বান্ধবীর সাথে অবাধ মেলামেশায় কিন্তু কোনো আপত্তি তোলে না। একজন স্ত্রী ঠিক রেখে একাধিক নারী গমনে তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই।

ইসলামী শরীয়ত উপরোক্ত সামাজিক ও নৈতিক পরিণতিকে বহু বিবাহের চেয়েও মারাত্মক মনে করে। তাই যৌন অরাজকতা ও সামাজিক উচ্ছৃংখলতা যাতে প্রশ্রয় না পায়, সে জন্য ইনসাফের শর্ত সংরক্ষণ সাপেক্ষে সর্বোচ্চ চারজন স্ত্রী রাখার অনুমতি ইসলামে রয়েছে। আবার ইনসাফ ভঙ্গের ক্ষেত্রে ইসলামী আদালতের ব্যবস্থা গ্রহণেরও বিধান রয়েছে। আদালত ইনসাফ কায়েমের জন্য স্বামীকে শাস্তির নির্দেশ দিতে পারবে।

স্ত্রীর সংখ্যা সর্বোচ্চ চার পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করার জন্যে কুরআনে যেমন সুস্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে তেমনি হাদীসেও তার বহু প্রমাণ রয়েছে।

গায়লান ইবনে আসলামা সাকাফী নামে এক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন তাঁর দশজন স্ত্রী ছিল। তাঁর স্ত্রীরাও তাঁর সাথে মুসলমান হয়ে গেলেন। মহানবী (স) নির্দেশ দিলেন এ দশজন স্ত্রীর মধ্য থেকে যে কোনো চারজনকে রেখে বাকীদের তালাক দিয়ে দিতে। তিনি রাসূল (স) নির্দেশ মোতাবেক তাই করলেন।-(মেশকাত ২৭৪ পৃঃ)

কায়েস ইবনুল হারিস আসাদী (রা) বলেন, আমি যখন মুসলমান হলাম, তখন আমার আট স্ত্রী ছিল। আমি বিষয়টি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গোচরীভূত করলাম। তিনি আমাকে চারজন স্ত্রী রেখে বাকী সবাইকে বিদায় করে দিতে বললেন।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর বহু বিবাহ

ইউরোপীয় নাস্তিক ও বস্তুবাদীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বহু বিবাহের বিষয়টিকে অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে আসছে। তাদের মতে (নাউযুবিল্লাহ) তিনি যৌন স্পৃহা দমন করার জন্যেই এমনটি করেছেন। কিন্তু দুনিয়ার ভোগবাদী মানুষের সাথে তো মহানবী (স)-এর কোনো তুলনাই চলে না। যে কোনো নিরপেক্ষ চিন্তার বুদ্ধিজীবি লোক মহানবীর জীবন-পদ্ধতির প্রতি লক্ষ্য করলে এরূপ চিন্তা করতে পারে না। কারণ তাঁর জীবন-পদ্ধতিই প্রমাণ করবে যে, তিনি এ উদ্দেশ্যে তা করেননি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন তৎকালীন আরব জাহানের সামনে উন্মুক্ত ছিল। বাল্য জীবন থেকে তিনি সবাইর কাছে ছিলেন নির্মল চরিত্রের অধিকারী আল আমীন বা বিশ্বাসী হিসেবে। পঁচিশ বছর বয়সে তিনি বিয়ে করেন চল্লিশ বছর বয়স্কা এমন এক বিধবাকে যার ইতিপূর্বে আরও দু'জন স্বামী মারা গিয়েছে। মজার ব্যাপার হলো তাঁকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করার পর মহানবী (স) হেরা গুহায় মাসের পর মাস সময় ধরে আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। আরবের কে এ ঘটনা জানতো না ? তাঁর সেই প্রথমা স্ত্রী বিবি খাদিজা (রা)-এর সাথে তিনি সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করেন।

এ পঞ্চাশ বছর বিশেষ করে তাঁর যৌবনকাল সবটাই মক্কাবাসীদের চোখের সমানেই অতিক্রান্ত হয়েছে। মক্কায় কোনো শত্রুও তাঁর চরিত্রের ব্যাপারে কোনো প্রকার সন্দেহ পোষন করতো না। শত্রুরা তাঁকে যাদুকর, উন্মাদ ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত করেছে সত্য, কিন্তু কখনো তাঁকে ভোগ সর্বস্ব বা যৌন বিকার গ্রস্ত হওয়ার মিথ্যা দাবী করতে পারেনি।

আমরা দেখতে পাচ্ছি ৫৪ বছর বয়স পর্যন্ত মহানবী (স) একজন স্ত্রী নিয়েই ঘর সংসার করেছিলেন। অর্থাৎ পঁচিশ বছর হযরত খাদিজা (রা)-কে নিয়ে এবং চার বছর হযরত সাওদা (রা)-কে নিয়ে তিনি দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করেছেন। তারপর আটান্ন বছর বয়সে তাঁর চারজন স্ত্রী একত্রিত হন। অন্যান্যদেরকে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ করেন পরবর্তী দু' তিন বছরে। আমরা জানি সাহাবায়ে কিরাম পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে সবাই ছিলেন মহানবী (স)-এর উপর নিবেদিত প্রাণ। এমতাবস্থায় তিনি তো ইচ্ছা করলে অনেক সংখ্যক কুমারী মেয়েকেই স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। একমাত্র হযরত আয়েশা (রা)-কে কুমারী স্ত্রী হিসেবে নবী (স)-এর সান্নিধ্যে আসেন। কাজেই তথাকথিত বুদ্ধিজীবিদের সমালোচনার কোনো ভিত্তিই ধোপে টিকে না। ইতিহাস তার জীবন্ত সাক্ষী।

ছত্রিশ

وَاٰتُوا النِّسَاۤءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ؕ فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْٓـًٔا مَّرِيْٓـًٔا ۝ (النساء : ٤)

"তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের মোহর খুশী মনে আদায় করে দাও। অবশ্য তারা যদি নিজেদের খুশীতে মোহরানার কিছু অংশ তোমাদের মাফ করে দেয়, তবে তোমরা তা স্বাচ্ছন্দে ভোগ করতে পার।"–(সূরা নিসা ঃ ৪)

স্ত্রীদের মোহর তাদেরকেই দিতে হবে সন্তুষ্টি চিত্তে উদার মনে

স্ত্রীদের মোহরানার টাকা পরিশোধের ব্যাপারে তখনকার দিনে নানা ধরনের যুলুম অত্যাচার চলতো। যেমন মোহরানার টাকা স্ত্রীদের হাতে না পৌঁছিয়ে পৌঁছানো হতো অভিভাবকদেরকে। আর অনেক সময় অভিভাবকরা তা আদায় করে নিজেরাই আত্মসাত করতো। তাই উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা স্বামীর প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন যে, মোহরানার টাকা তাকেই পরিশোধ কর, অন্যকে নয়। এখানে অভিভাবকদের প্রতিও এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, মোহরানা আদায় করে তা যার প্রাপ্য তার হাতেই অর্পণ কর। তার অনুমতি ছাড়া অন্য কেউ যেন তা খরচ না করে।

দ্বিতীয়তঃ স্ত্রীর মোহরানা পরিশোধ করার ব্যাপারে কোনো প্রকার সংকীর্ণতা ও তিক্ততা থাকতে পারবে না। তখনকার দিনে মোহরানা পরিশোধ করাকে জরিমানা দেয়ার মতো মনে করা হতো। স্বামীর এ অনাচার ও অভিভাবকদের সংকীর্ণতা রোধ করার লক্ষ্যেই রাব্বুল আলামীন نِحْلَةً (নিহ্লাতান্) শব্দ ব্যবহার করেছেন।

অভিধানে نِحْلَةً বলতে ঐ দানকে বলা হয় যা অত্যন্ত খুশীমনে ও আন্তরিকতা সহকারে প্রদান করা হয়। মূলত স্ত্রীদের মোহরানা অবশ্য পরিশোধ ঋণ বিশেষ। এ ঋণ পরিশোধ করা অত্যন্ত জরুরী। অন্যান্য ঋণ যেমন সন্তুষ্টচিত্তে অবশ্য দেনা হিসেবে পরিশোধ করা হয়, স্ত্রীর মোহরানাও তেমনি হৃষ্টচিত্তে ও উদারমনে পরিশোধ করা কর্তব্য।

তৃতীয়তঃ অনেক স্বামী স্ত্রীকে অসহায় অবলা পেয়ে নানাভাবে চাপ প্রয়োগ করে বা কৌশল অবলম্বন করে মোহরানা মাফ করিয়ে নিয়ে থাকে। তখনকার দিনেও এমনটি করা হতো। কিন্তু এভাবে মাফ করিয়ে নিলে প্রকৃতপক্ষে তা মাফ হয় না। কারণ এ ধরনের মাফ করা তো স্বেচ্ছায় না হয়ে পরিবেশ পরিস্থিতির চাপের মুখে হয়ে থাকে। এ ধরনের যুলুম প্রতিরোধ করার জন্যে আল্লাহর নির্দেশ হলো ঃ

فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْئًا مَّرِيْئًا ـ

অর্থাৎ "যদি স্ত্রী নিজের পক্ষ থেকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মোহরানার কিছু অংশ ক্ষমা করে দেয়, তবেই তোমরা হৃষ্টমনে তা ভোগ করতে পার।" সুতরাং চাপ প্রয়োগ কিংবা কোনো প্রকার জোর-জবরদস্তি করে ক্ষমা করিয়ে নেয়ার অর্থ কোনোক্রমেই ক্ষমা হিসেবে গণ্য হবে না।

এ ধরনের বহু নির্যাতন মূলক প্রথা তৎকালীন জাহেলী যুগে প্রচলিত ছিল। কুরআন সেসব জুলুমের উচ্ছেদ করেছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় আজও মুসলিম সমাজে অনুরূপ নির্যাতন দেখা যায়। আল-কুরআন সর্বপ্রকার নারী নির্যাতনসহ মোহর সংক্রান্ত জুলুমকেও পরিহার করার নির্দেশ দিয়েছে।

হযরত মাওলানা মুফতি শফী (র) তাঁর তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআনে বলেন, "আজকের যুগে স্ত্রীরা মনে করেন যে, স্বাভাবিকভাবে যেহেতু মোহরানা পাওয়াই যাবে না, বরং দাবী করলে তিক্ততা সৃষ্টি এমনকি সম্পর্কের ফাটল সৃষ্টি হওয়াও বিচিত্র নয় সেহেতু তারা মোহরানার দাবী মাফ করে দিয়ে থাকেন। কিন্তু এ ধরনের ক্ষমার দ্বারা মোহরানা ঋণ কখনো মাফ হয় না।

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) বলতেন, মোহরানার অর্থ স্ত্রীর হাতে দেয়ার পর স্ত্রী যদি তা ইচ্ছা মত খরচ করার সুযোগ লাভ করা সত্ত্বেও স্বামীকে দিয়ে দেয়। কেবলমাত্র তখনই সেটাকে মাফ করার পর্যায়ে গণ্য করা যেতে পারে।

মীরাসের বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় পিতার মৃত্যুর পর পরিত্যক্ত সম্পত্তি ছেলেরাই দখল করে বসে। বোনদের অংশ দেয়া প্রয়োজন মনে করে না, কেউ কেউ দ্বীনদারীর খেয়ালে বোনদের থেকে মাফ চেয়ে নেয়। বোনরা যেহেতু মনে করে তাদের পাওনা আদায় করা সহজ নয়, তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভাইদের মন রক্ষার জন্যে মুখে মাফ করে দেয়। পিতার মৃত্যুর পর মায়ের অংশ বিশেষত বিমাতার প্রাপ্য অংশ নিয়েও একই অবস্থার

সৃষ্টি হয়। এসব অংশীদারের প্রাপ্য যে আন্তরিক তুষ্টির সাথে ক্ষমা করা হয় না বিধায় যুলুমের অন্তর্ভুক্ত, তা স্বতঃসিদ্ধ।

স্ত্রীর মোহরানা পরিশোধের বিষয়টি ইসলামী শরীয়তে অনেক গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত। কিন্তু মুসলিম সমাজ অন্যান্য জরুরী বিষয়ের ব্যাপারে যেমন উদাসীনতা প্রদর্শন করে ঠিক স্ত্রীর মোহরানার বেলায়ও তাই করে আসছে। অধিকন্তু আজকের মুসলিম সমাজে বিজাতীয়দের অনুকরণে যৌতুকের অভিশাপ জেঁকে বসেছে অত্যন্ত ব্যাপকভাবে। মেয়েদের মীরাস থেকে বঞ্চিত করার মত জঘন্য তৎপরতাও এজন্যে কম দায়ী নয়। এমনকি ইসলামের মৌলিক ইবাদাত পালনে অভ্যস্ত দীনদার ব্যক্তিরাও দীনের সঠিক তাৎপর্য অনুধাবনে পশ্চাদপদ বিধায় এমনিভাবে দীনের বহু মৌলিক বিষয় সম্পর্কে উদাসীনতা প্রদর্শন করে থাকে। ফলে সমাজে দেখা দিয়েছে নানান অনাচার ও ইসলামী শরীয়ত পরিপন্থী রীতিনীতি। আর বাস্তব জীবনে মুসলিম-অমুসলিমের জীবন ধারা একাকার হয়ে পড়েছে। পরিণামে পৃথিবীর মানব সাধারণ বঞ্চিত হচ্ছে ইসলামী জীবন বিধানের অনিবার্য সুফল থেকে।

বস্তুত আল্লাহ, রাসূল ও আখিরাতে বিশ্বাসী লোকদের ঈমানী দায়িত্ব হলো সমাজে প্রচলিত এসব যুলুম-অত্যাচার থেকে দূরে থাকা। স্ত্রীর মোহরানার টাকা ও বোনদের প্রাপ্য মীরাস এবং ভাইদের মৃত্যুর পর ভাতিজা ও ভাইঝীদের মীরাস ও যাবতীয় সম্পদ সংরক্ষণ করা এবং প্রাপকদের পাওনা হিসাব-নিকাশ করে পুরোপুরি তাদের পরিশোধ করা। নামায-রোযার চেয়ে এসবের গুরুত্ব দেয়া উচিত। কারণ নামায-রোযা তো আল্লাহর হক, অথচ এসবই হচ্ছে বান্দার হক। আল্লাহ সবাইকে সহীহ সমুঝ দান করুন।

সাঁইত্রিশ

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ص وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ ط نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا ○

"পুরুষদের জন্যে পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে যেমন প্রাপ্য অংশ রয়েছে। তেমনি নারীদের জন্যেও পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে অংশ রয়েছে। চাই তা কম হোক অথবা বেশী হোক, উভয়ের এ অংশ (আল্লাহর পক্ষ থেকেই) নির্ধারিত।"

–(সূরা আন নিসা ঃ ৭)

পূর্বপুরুষদের সম্পত্তিতে নারী-পুরুষ উভয়েরই অংশ নির্ধারিত

আলোচ্য আয়াতে পূর্বপুরুষদের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার আইনের সুস্পষ্ট বিধান প্রদানের পূর্বে তার ভিত্তি ঘোষণা করা হয়েছে। এখানে দু'টো আইনগত নির্দেশ ঘোষিত হয়েছে। একটি নির্দেশ হলো মীরাস কেবল পুরুষদেরই প্রাপ্য নয়, নারীরাও মীরাসের হকদার। দ্বিতীয় নির্দেশটি হলো মীরাসের পরিমাণ যা-ই হোক না কেন, তা অবশ্যই ওয়ারিশদের মাঝে বণ্টিত হতে হবে। তাছাড়া এ আয়াতে একথাও সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, মীরাস আইন সকল প্রকার ধন-সম্পত্তির উপর কার্যকর হবে—স্থাবর, অস্থাবর, কৃষি-শিল্প সর্বপ্রকার সম্পত্তিই এর আওতায় আসবে।

ইসলামের মীরাস-আইন প্রবর্তনের পূর্বে আরব-অনারব জাতিসমূহের মধ্যে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টনের ক্ষেত্রে চলতো নানা ধরনের যুলুম-অত্যাচার। মুশরিকদের নিয়মে পিতার বড় ছেলে সকল সম্পত্তির মালিক হতো। মেয়েরা ও ছোট ছেলেরা হতো সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত। আবার কোনো কোনো জাতির নিয়মে এতীম বালক-বালিকা ও নারীগণ মীরাসের বিষয়ে চরম যুলুমের শিকার হতো। আরবদের নিয়ম ছিলো, যারা অশ্বারোহণ করে ও শত্রুদের মোকাবিলা করে অর্থ-সম্পদ লুট করে আনার যোগ্যতা রাখতো, কেবল তারাই উত্তরাধিকার হতে পারতো। কোনো কোনো জাতির মধ্যে স্ত্রীরা স্বামীর কোনো অংশই পাওয়ার যোগ্য ছিল না। ইসলাম উপরোক্ত আয়াতের

ঘোষণা দিয়ে পূর্বপুরুষদের রেখে যাওয়া সম্পত্তি বণ্টন সংক্রান্ত যাবতীয় জুলুম অত্যাচার রহিত করে পুরুষের ন্যায় নারীকেও অংশীদার ঘোষণা করে। ইসলাম দুর্বল ও নারীদের ন্যায্য অধিকার প্রদান করে, আর সে অধিকার সংরক্ষণেরও চমৎকার ব্যবস্থা করে দেয়।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর সময়কার একটি ঘটনা এখানে উল্লেখযোগ্য। আউস ইবনে সাবেত (রা) তার স্ত্রী, দুই কন্যা ও এক নাবালেগ পুত্র সন্তান রেখে মৃত্যু মুখে পতিত হন। প্রাচীন আরবীয় প্রথানুসারে তাঁর দুই চাচাত ভাই সমস্ত সম্পত্তি দখল করে নিয়ে গেল—স্ত্রী ও সন্তানদের কিছুই দিল না। কারণ তাদের মীরাসী আইনে নারীগণ কোনো অবস্থাতেই মীরাস পেত না। ফলে স্ত্রী ও দুই কন্যা এমনিতেই বঞ্চিতা হয়ে গেল। আর প্রাপ্ত বয়স্ক না হওয়ার কারণে পুত্রও বাদ পড়ে গেল। আউস ইবনে সাবেতের স্ত্রী রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এ অবস্থার বর্ণনা করে সন্তানদের অসহায়ত্বের অভিযোগ করলো। তখন পর্যন্ত উত্তরাধিকার সম্পর্কিত কুরআন পাকের কোনো হুকুম নাযিল হয়নি। তাই রাসূলুল্লাহ (স) উত্তর না দিয়ে ওহীর অপেক্ষায় রইলেন। তখন উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়।

আলোচ্য আয়াতে কুরআন পাকের বাচনভংগী লক্ষণীয়। এখানে মৃত ব্যক্তির মীরাস বণ্টনের মৌলিক আলোচনায় পুরুষ ও নারীদের ওয়ারিশ হওয়ার কথা পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যান্য স্থানের ন্যায় পুরুষ ও নারীকে একত্রে উল্লেখ করা হয়নি। বরং এখানে পুরুষদের হক যেভাবে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে ; নারীদের হকও পৃথকভাবে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এতে করে পুরুষদের হক যেমন স্বাতন্ত্র ও গুরুত্বের দাবী রাখে, তেমনি নারীদের হকও স্বাতন্ত্র ও গুরুত্বের দিক থেকে কোনো অংশে কম নয় বলে প্রতিভাত হয়েছে। এভাবে ইসলাম নারীদের অধিকার ও মর্যাদার যথার্থতার ঘোষণা দিয়েছে। অন্যসব গোত্রের ও সম্প্রদায়ের ন্যায় ইসলাম কেবল বড় ছেলেকে অথবা কেবল ছেলেদেরকে অথবা শুধু কর্মক্ষম ছেলেদেরকে পৈত্রিক সম্পত্তির অধিকারী ঘোষণা করেনি বরং ছেলে ও মেয়েদের হক পৃথকভাবে নির্ধারণ করে দিয়েছে। আবার এ মেয়েরা তাদের স্বামীদেরও মীরাসের মালিক বলে ইসলাম ঘোষণা দিয়েছে।

মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির এ বণ্টন মূলনীতি বর্ণনার শেষ দিকে বলা হয়েছে "চাই তা কম হোক অথবা বেশী হোক।" এই বলে মানুষের মূর্খতাসূলভ যুলুমপূর্ণ প্রথার নিরসন করা হয়েছে। কেননা কেউ কেউ নির্দিষ্ট কিছু সম্পদ কেবল যুবক পুরুষদের জন্যে নির্ধারিত বলে সেভাবেই তা বণ্টন করতো।

আটত্রিশ

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ ق لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ج فَاِنْ كُنَّ نِسَاۤءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ج وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ط وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ ج فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّوَرِثَهٗٓ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ ج فَاِنْ كَانَ لَهٗٓ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ط (النساء : ١١)

"আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে তোমাদের এ বিধান দিচ্ছেন যে, একজন পুরুষের অংশ দু'জন নারীর অংশের সমান। যদি (মৃতের ওয়ারিশ) কন্যা হয় দু'য়ের অধিক, তবে তাদের জন্যে পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ। আর যদি একজন কন্যা থাকে তবে তার জন্যে মোট সম্পত্তির অর্ধেক। মৃতের মাতা-পিতা প্রত্যেকে পাবে ত্যাজ্য সম্পত্তির এক-ষষ্ঠাংশ, যদি তার সন্তান থাকে। যদি তার সন্তান না থাকে এবং তাঁর ওয়ারিশ থাকে কেবল মাতা-পিতা। তবে সে ক্ষেত্রে মাতা পাবে এক-তৃতীয়াংশ। ভাই-বোন থাকলে মাতা পাবে এক-ষষ্ঠাংশ। উপরোক্ত বিধান তখন কার্যকর হবে যখন মৃতের অসিয়ত ও করয পরিশোধ করার পর তার সম্পত্তি বাকী থাকে।"–(সূরা আন নিসা ঃ ১১)

সম্পত্তি বণ্টনে কন্যার অংশই হলো মূল ভিত্তি

আলোচ্য আয়াতে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি বণ্টনের বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। কুরআনুল কারীমে কন্যাদের অংশ দেয়ার প্রতি এতবেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে যে, কন্যাদের অংশকে আসল ভিত্তি সাব্যস্ত করে এর অনুপাতে পুত্রদের অংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ "এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সম পরিমাণ" এভাবে বলা হয়নি যে, দুই কন্যার অংশ এক পুত্রের অংশের সমপরিমাণ। সূরা নিসার ১৭৬নং আয়াতেও এ বিষয়ে একই হুকুম দেয়া হয়েছে।

মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি সম্পর্কে ইসলামী শরীয়তের বিধান হলো, প্রথমতঃ সমস্ত সম্পত্তি থেকে মৃতের কাফন ও দাফনের খরচ নির্বাহ করা হবে। এতে অপব্যয় ও কৃপণতা–উভয়ই নিষিদ্ধ। তারপর দ্বিতীয় পর্যায়ে মৃতের ঋণ পরিশোধ করা হবে। ঋণ পরিশোধে সমস্ত সম্পত্তি নিঃশেষ হয়ে গেলে কেউ ওয়ারিশী স্বত্ব পাবে না এবং কোনো অসিয়তও কার্যকর হবে না। যদি কোনো ঋণ না থাকে অথবা ঋণ শোধ করার পরও সম্পত্তি বাকী থাকে তবে তৃতীয় পর্যায়ে অবশিষ্ট সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ দিয়ে বৈধ অসিয়ত কার্যকর করা হবে। তার সমস্ত সম্পত্তি অসিয়ত করলে তা এ এক-তৃতীয়াংশ দিয়েই পালন করা যাবে—এর অধিক দিয়ে অসিয়ত পালন করা জায়েয নেই। ওয়ারিশদের বঞ্চিত করার নিয়তে অসিয়ত করা গুনাহের কাজ। চতুর্থ পর্যায়ে বাকী সম্পত্তি নির্দিষ্ট ওয়ারিশদের মধ্যে কুরআন-হাদীস অনুযায়ী বণ্টন করা হবে।

আমাদের সমাজে পিতার মৃত্যুর পর ছেলেরা মেয়েদের অংশ দেয় না বা দিতে গড়িমসি করে বা যথার্থ অংশ দেয় না। অনেক সময় বোনেরা ভাইদের সাথে তাদের প্রাপ্য অংশের জন্যে কিছু বলে না। কারণ তারা অংশ তো পাবেই না, শুধু শুধু ভাইদের সাথে সম্পর্ক নষ্ট করে কি লাভ ? বোনেরা একথা চিন্তা করে অনিচ্ছা সত্ত্বেও চক্ষু লজ্জায় তাদের প্রাপ্য ক্ষমা করে দেয় বা তাদের দাবী উত্থাপন করে না। এ জাতীয় ক্ষমা করা বা দাবী না করা প্রকৃতপক্ষে শরীয়তী ক্ষমা নয়। বরং ভাইদের জিম্মায় বোনদের অংশ ও হক পাওনা থেকে যায়। যারা এভাবে ওয়ারিশী সম্পত্তি না দিয়ে তা আত্মসাত করে, তারা কঠোর গুনাহগার হবে। এদের মধ্যে নাবালেগ কন্যাও থাকে। তাদের অংশ না দেয়া দ্বিগুণ গুনাহর কাজ। এক গুনাহ শরীয়তসম্মত ওয়ারিশের অংশ না দিয়ে তা আত্মসাত করার ; আর দ্বিতীয় গুনাহ ইয়াতীমের সম্পত্তি হজম করে ফেলার।

অতপর আলোচ্য আয়াতে কারিমায় কন্যাদের মীরাস সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যদি পুত্র সন্তান না থাকে, কেবল দুই বা দু'য়ের অধিক কন্যা সন্তান থাকে তবে তারা পাবে মোট সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ। বাকী এক-তৃতীয়াংশ পাবে মৃত ব্যক্তির মাতা-পিতা, স্ত্রী অথবা স্বামী প্রমুখ ওয়ারিশগণ। যদি পুত্র সন্তান মোটেই না থাকে আর কন্যা থাকে একজন। তখন সে পাবে অর্ধেক। অবশিষ্ট অর্ধেক পাবে অন্যান্য ওয়ারিশগণ।

উনচল্লিশ

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ج فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ج وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ج فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ط (النساء : ١٢)

"তোমাদের স্ত্রীদের সন্তান না থাকলে তোমরা তাদের অর্ধেক সম্পত্তি পাবে। যদি তাদের সন্তান থাকে তবে তোমরা তাদের ত্যাজ্য সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ পাবে। এ বিধান কার্যকর হবে তাদের করয ও অসিয়ত থাকলে, তা পরিশোধ করার পর। আর তারা পাবে তোমাদের ত্যাজ্য সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ, যদি তোমাদের কোনো সন্তান না থাকে। আর যদি তোমাদের সন্তান থাকে তবে তারা তোমাদের ত্যাজ্য সম্পত্তির এক-অষ্টমাংশ পাবে। এখানেও তোমাদের করয ও অসিয়ত কার্যকর করার পর এ হুকুম পালিত হবে।"–(সূরা আন নিসা ঃ ১২)

নারীরা যেমন বংশগত ওয়ারিশ তেমনি তারা বৈবাহিক ওয়ারিশও

আলোচ্য আয়াতে কারিমায় স্বামী ও স্ত্রীদের মীরাস সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী নারীগণও পুরুষদের মত বংশগত ও জন্মগত সম্পর্কের কারণে মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তির ওয়ারিশ হয়ে থাকে। মীরাস পাওয়ার ব্যাপারে যে যে অবস্থায় পুরুষদের অধিকার রয়েছে সে সে অবস্থায় নারীদেরও অধিকার রয়েছে। হযরত মাওলানা মুফতী মোহাম্মদ শফী (র) তাঁর তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআনে নারীদের মোহরানাকে করযের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। শরীয়তে স্ত্রীর মোহরানার সমস্ত অর্থ তার হাতে দেয়ার বিধান আছে। তাদের আন্তরিক ও স্বেচ্ছায় ক্ষমাকৃত অংশ ছাড়া বাকী সম্পূর্ণ মোহরানার টাকাই স্বামীর জিম্মায় স্ত্রীর পাওনা।

মীরাসী আইনের চারটি স্তর ঃ (১) দাফন-কাফন (২) ঋণ, (৩) অসিয়ত, (৪) মীরাস, ধারাবাহিকভাবেই বণ্টিত হয়ে থাকে। দাফন-কাফন ও ঋণ পরিশোধে যদি মৃত ব্যক্তির সমস্ত ত্যাজ্য সম্পত্তি নিঃশেষ হয়ে যায় তবে অসিয়ত ও মীরাস কার্যকর হবে না।

স্ত্রীর মোহরানার অর্থ পরিশোধ করা বাকী থাকলে তাও উপরে বর্ণিত ঋণের অন্তর্ভুক্ত হবে। সুতরাং অসিয়ত ও মীরাস বণ্টনের পূর্বেই স্ত্রীর প্রাপ্য মোহরানা অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে। এমনকি তাতে ত্যাজ্য সম্পদের সবটুকুই নিঃশেষ হলে অসিয়ত ও মীরাস কার্যকর হবে না। স্ত্রীগণ যদি স্বেচ্ছায় ও আন্তরিকভাবে মোহরানার অংশ বা সম্পূর্ণ ক্ষমা করে দিয়ে থাকে তবে তা স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু যেসব স্বামীরা কৌশলে মোহরানা মাফ করিয়ে নেয় বা স্ত্রীদের বাধ্য করিয়ে থাকে এবং স্ত্রীরা অগত্যা কোনো অকাম্য পরিস্থিতির উদ্ভবের ভয়ে বাধ্য হয়ে মাফ করার কথা প্রকাশ করে ; এমতাবস্থায় শরীয়তের বিধান অনুযায়ী ঐ মোহরানার অর্থ স্বামীর কাছে স্ত্রীর পাওনা থেকে যায়।

চল্লিশ

وَالّٰتِىْ يَاْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ج فَاِنْ شَهِدُوْا فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِى الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا ○ (النساء : ١٥)

"তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যারাই নির্লজ্জ কাজ ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের পুরুষদের চারজন সাক্ষী নাও। যদি চারজন লোক ব্যভিচারের সাক্ষ্য দেয় তবে তাদেরকে ঘরের মধ্যে বন্ধী করে রাখ— যতদিন না তাদের মৃত্যু হয় অথবা আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো ফায়সালা ঘোষিত হয়।"–(সূরা আন নিসা ঃ ১৫)

নারীকে অপরাধী সাব্যস্ত করার বিষয়ে কঠোরতা আরোপ

আলোচ্য আয়াতে ব্যভিচারে লিপ্ত নারীর বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগ করতে হলে চারজন পুরুষ সাক্ষী গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এখানে নারীকে অপরাধী সাব্যস্ত করার বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এবং এ ব্যাপারে শরীয়ত অত্যন্ত কঠোর বিধান দিয়েছে। প্রথমত এ জাতীয় ঘটনায় চারজন সাক্ষী তলবের নির্দেশ এবং তাদের সাক্ষ্য পাওয়া গেলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। চারজন সাক্ষী স্বচক্ষে দেখেছে এমন সাক্ষ্যই গ্রহণযোগ্য হবে। দ্বিতীয়তঃ ঐ চারজন সাক্ষী হতে হবে পুরুষ—কোনো নারীর সাক্ষ্য এতে গ্রহণযোগ্য নয়। এ জাতীয় কাজে চারজন সাক্ষী পাওয়া বড়ই দুরূহ। তাই বলে এর অর্থ এ নয় যে, শরীয়ত বুঝি ব্যভিচারকে তেমন একটা ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করে না। বরং এ ব্যাপারে নিরীহ নারী সমাজের প্রতি যাতে কোনো প্রকারের যুলুম-অত্যাচার করার কোনো অবকাশ না থাকে, সে জন্যেই এ কঠোরতা আরোপ করা হয়েছে। কারণ, এ কঠোরতা না থাকলে যে কেউ ব্যক্তিগত জিঘাংসার বশবর্তী হয়ে অহেতুক অপবাদ দিতে অথবা শত্রুতা উদ্ধারের সুযোগ খুঁজে পেতে পারে। অবলা-অসহায়া নারীকুলের রক্ষাকবচ স্বরূপ তাদের বিরুদ্ধে উত্থিত অভিযোগ প্রমাণিত করার পথে উপরোক্ত কঠোরতা আরোপ করা হয়েছে।

চারজন পুরুষ সাক্ষী যদি বাস্তবিকই যথারীতি সাক্ষ্যদান করতে পারে তবেই অভিযুক্ত মহিলাকে শাস্তি দেয়া যাবে। এ শাস্তি ঐ নারীকে গৃহের অভ্যন্তরে আবদ্ধ রেখে যন্ত্রণা দেয়া অথবা আল্লাহর কোনো চূড়ান্ত নির্দেশনার অপেক্ষা করার কথা আয়াতে বলা হয়েছে। উল্লেখ্য এ সম্পর্কে আল্লাহর চূড়ান্ত নির্দেশের বিষয়টি পরবর্তীকালে সূরা আন নূরে অবতীর্ণ হয়েছিল। বলা হয়েছে, ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণী উভয়কেই একশত বেত্রাঘাত করে শাস্তি দাও। অবশ্য এ একশত বেত্রাঘাত হলো অবিবাহিতের বিধান। আর বিবাহিতের বিধান হলো পাথর বর্ষণ করে হত্যা করা। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) উক্ত আয়াতে বর্ণিত أَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلاً অথবা "আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো ফায়সালা ঘোষিত হয়" এর তাফসীর প্রসংগে বলেন ঃ يَعْنِى الرَّجْمُ لِلثَّيِّبِ وَالْجِلْدُ لِلْبِكْرِ অর্থাৎ "বিবাহিতের জন্যে পাথর বর্ষণে হত্যা করা আর অবিবাহিতের জন্যে বেত্রাঘাত করা। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মায়েয ইবনে মালেক (রা) ও ইযদ গোত্রের জনৈকা মহিলার উপর ব্যভিচারের শাস্তি প্রয়োগ করেছিলেন। তারা উভয়ে বিবাহিত ছিল বিধায় তাদেরকে প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করা হয়েছিলো। তাছাড়া একজন ইয়াহূদীকেও ব্যভিচারের শাস্তি স্বরূপ প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করা হয়েছিল।

একচল্লিশ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَايَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ط وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّا اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ج (النساء : ١٩)

"হে তোমরা যারা ঈমান এনেছ ! জোরপূর্বক স্ত্রীলোকের উত্তরাধিকার হয়ে বসা তোমাদের জন্যে মোটেই হালাল নয়। আর তাদেরকে এজন্যে আটক করে রেখো না, যাতে করে তোমরা তাদের যে মোহরানা দিয়েছ তার কিছু অংশ আত্মসাত করে নিতে পার। অবশ্য তারা প্রকাশ্যে কোনো অশ্লিলতা করে বসলে সেটা ভিন্ন কথা। আর তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবন-যাপন কর।"–(সূরা আন নিসা ঃ ১৯)

নারীদের জান-মালে বলপ্রয়োগ অবৈধ

জাহেলী যুগে নারীদের উপর স্বামীদের পক্ষ থেকে যেমন উৎপীড়ন-নির্যাতন চলতো, তেমনি চলতো ওয়ারিশদের পক্ষ থেকেও। ইসলাম উভয় ধরনের উৎপীড়নকে হারাম ঘোষণা করেছে। আল কুরআন বৈবাহিক উৎপীড়ন ও ওয়ারিশী উৎপীড়ন—দু'টোকেই হারাম করে দিয়েছে আর নারীদের সাথে সদ্ভাবে জীবন যাপনের নির্দেশ দিয়েছে।

জাহেলী যুগে নারীদের প্রতি বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন চলতো। যেমন পুরুষ নিজেকে স্ত্রীর জান-মালের মালিক মনে করতো। নারীরা যার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতো, সে স্ত্রীর প্রাণকে নিজের মালিকানাধীন মনে করতো। স্বামীর মৃত্যুর পর তার ওয়ারিশরা যেমন তার ত্যাজ্য সম্পত্তির ওয়ারিশ ও মালিক হতো, তেমনি তারা তার স্ত্রীরও ওয়ারিশ ও মালিক হয়ে বসতো। ইচ্ছা করলে নিজেই তাকে বিয়ে করতো কিংবা অন্যের কাছ থেকে অর্থ নিয়ে তাকে বিয়ে দিয়ে দিতো। স্ত্রীর প্রাণের যখন এ অবস্থা তখন তার ধন-সম্পদের বিষয়টি তো বলার অপেক্ষা রাখে না। এ ধরনের ভ্রান্তির ফলে নারীদের উপর চলতো নানা ধরনের নির্যাতন। ঐসব উৎপীড়ন-নির্যাতনের কতিপয় উদাহরণ নিম্নে প্রদান করা হলো ঃ

এক ঃ স্ত্রীদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অথবা পিত্রালয় থেকে উপঢৌকন হিসেবে প্রাপ্ত অর্থ-সম্পদ হজম করে ফেলা হতো।

দুই ঃ কোনো নারী নিজের অর্থ-সম্পদের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারলেও পুরুষরা তাকে অন্যত্র বিয়ে করতে বাধা দিতো। যেন ধন-সম্পদ বাইরে না যায়।

তিন ঃ কোনো কোনো সময় স্ত্রীর কোনো দোষ না থাকলেও শুধু স্বভাবগত কারণে স্বামী তাকে অপসন্দ করতো, আবার তাকে তালাক দিয়ে মুক্তও করতো না ; যেন শেষ পর্যন্ত অতীষ্ঠ হয়ে প্রদত্ত টাকা ফেরত দেয় অথবা মোহরানা ক্ষমা করে দেয়।

চার ঃ কখনো কখনো স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিয়েও তাকে অন্যত্র বিয়ে করতে দিতো না। যেন প্রদত্ত মোহরানা ফেরত দেয় অথবা আদায়যোগ্য মোহরানা ক্ষমা করে দেয়।

পাঁচ ঃ কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বামীর মৃত্যুর পর ওয়ারিশরা বিধবাকে অন্যত্র বিয়ে করতে দিতো না।

আল কুরআন এসব নির্যাতনের প্রতিকার কল্পে ঘোষণা করেছে, তোমাদের জন্যে এটা মোটেই হালাল নয় যে, তোমরা বলপ্রয়োগে নারীদের মালিক হয়ে বসবে।

আলোচ্য আয়াতে كَرْهًا (কার্‌হান্) বা 'জোরপূর্বক' কথাটিকে শর্ত হিসেবে বলা হয়নি। কারণ, তখন অর্থ হবে নারীদের সম্মতিতে তাদেরকে নিজের মালিকানাধীন করে নেয়া ঠিক হবে। শরীয়তসম্মত ও যুক্তিসংগত কারণ ছাড়া নারীদের মালিক হয়ে যাওয়াটাই মূলতঃ তাদের বলপ্রয়োগে নিজের মালিকানাধীন করে নেয়ার সামিল। কোনো বুদ্ধিমতি, জ্ঞানী ও প্রকৃতিস্থ নারী এতে সম্মত হতে পারে না। কোনো নারী নির্বুদ্ধিতা বশত কারো মালিকানাধীন হতে রাজী হলেও ইসলামী আইন একে মোটেই স্বীকার করে না যে, কোনো স্বাধীন মানুষ কারো মালিকানাধীন চলে যাবে।

আয়াতে "তোমরা স্ত্রীদের মালিক হয়ে বসো না"–এভাবে সরাসরি নিষেধ আরোপ না করে বলা হয়েছে, 'জোরপূর্বক স্ত্রীদের উত্তরাধিকার হয়ে বসা মোটেই হালাল নয়।" এতে করে ব্যাপারটির কঠোরতা প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং যদি কেউ কোনো প্রাপ্ত বয়স্কা নারীকে তার সম্মতি ও অনুমতি ছাড়া বিয়ে করে তবে এ বিয়ের দ্বারা উভয়ের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক স্থাপিত হয় না

আর তাতে উত্তরাধিকার স্বত্ব ও বংশের বিধানাবলীও কায়েম হয় না। তেমনিভাবে কেউ যদি জোর করে তার স্ত্রী থেকে প্রদত্ত মোহরানা ফেরত গ্রহণ করে কিংবা আদায়যোগ্য মোহরানা মাফ করিয়ে নেয়, তবে এ জোরপূর্বক ফেরত গ্রহণ ও মাফ শরীয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয়। ফলে গ্রহণকৃত অর্থ-মাল স্বামীর জন্যে হালাল হয় না এবং কোনো প্রাপ্যও মাফ হয় না। অবশ্য স্ত্রী যদি ব্যভিচার ও অবাধ্যতা প্রদর্শন করে আর পুরুষ সে জন্যে বাধ্য হয়ে তালাক দিয়ে দেয়, তবে স্ত্রীর দোষের কারণে মোহরানা ফেরত গ্রহণ বা নির্ধারিত মোহরানা মাফ করানো পর্যন্ত স্ত্রীকে বিবাহে আবদ্ধ রাখার অধিকার স্বামীর রয়েছে। তবে সেটা নির্ধারণ করবে কোনো ইসলামী আদালত। কোনো ব্যক্তি নিজে ব্যক্তিগতভাবে করলে তাও গ্রহণযোগ্য হবে না।

বিয়াল্লিশ

وَاِنْ اَرَدْتُّمُ اِسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ ۙ وَّاٰتَيْتُمْ اِحْدٰهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَيْئًا ۭ اَتَاْخُذُوْنَهٗ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ۝ وَكَيْفَ تَاْخُذُوْنَهٗ وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ وَّاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ۝ (النساء : ٢٠ - ٢١)

"তোমরা যদি এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করতে চাও আর তাদের একজনকে প্রচুর অর্থ-সম্পদও দিয়ে থাক, তবে তা থেকে কিছুই ফেরত গ্রহণ করো না। তোমরা কি তা অন্যায়ভাবে ও প্রকাশ্য গুনাহর মাধ্যমে গ্রহণ করবে? তোমরা কিভাবে তা গ্রহণ করতে চাও? অথচ তোমাদের একজন অন্যজনের কাছে গমন করেছ, আর তারা তোমাদের কাছ থেকে দৃঢ় প্রতিশ্রুতিও গ্রহণ করেছে।"–(সূরা আন নিসা ঃ ২০-২১)

স্ত্রীদের দেয়া অর্থ-সম্পদ ফেরত নেয়া অন্যায় ও প্রকাশ্য গুনাহ

আলোচ্য আয়াতে স্ত্রীর পক্ষ থেকে প্রকৃতপক্ষে কোনো দোষ ছাড়াই যদি স্বামী নিছক নিজের বাসনা চরিতার্থ করার মানসে বর্তমান স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে দ্বিতীয় বিয়ে করতে চায়, এমতাবস্থায় যদি সে অগাধ অর্থ-সম্পদও তাকে দিয়ে থাকে, তবে তালাকের বিনিময়ে তার কোনো অংশ ফেরত নেয়া কিংবা আদায়যোগ্য দেনা মাফ করানো স্বামীর জন্যে হারাম। কারণ এ ক্ষেত্রে স্ত্রীর তো কোনো দোষ নেই। তাছাড়া মোহরানা ওয়াজিব হওয়ার কারণও পূর্ণতা লাভ করেছে। অর্থাৎ বিয়েও হয়েছে আবার উভয়ের মিলনও হয়েছে।

আয়াতের শেষার্ধে স্ত্রীকে তালাক দিয়ে তার থেকে প্রদত্ত অর্থ-সম্পদ ফেরত গ্রহণ যে কতবড় যুলুম ও গুনাহর কাজ তা তিনটি পর্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রথম পর্যায় বলা হয়েছে ঃ

اَتَاْخُذُوْنَهٗ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ۔

"তোমরা কি তা অন্যায়ভাবে ও প্রকাশ্য গুনাহর মাধ্যমে গ্রহণ করবে ?" অর্থাৎ তোমরা যদি স্ত্রীর প্রতি অশোভন আচরণ ও ব্যভিচারের অপবাধ আরোপ করে প্রদত্ত অর্থ-সম্পদ ফেরত নিতে পথ বের করতে চাও ? এ পর্যায়েও দু'টো অবস্থা হতে পারে ঃ এক. স্ত্রীর অশোভন কাজ বা ব্যভিচার করার মিথ্যা অজুহাত দাঁড় করিয়ে তাকে প্রদত্ত অর্থ-সম্পদ ফেরত নেয়ার ফন্দি আঁটা। দুই. মুখে তার প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ না করেও অর্থ-সম্পদ ফেরত নেয়া, যা মূলতঃ অপবাদ দেয়ারই একটা রূপ। উভয় অবস্থাতেই তা উক্ত আয়াতাংশের অন্তর্ভুক্ত ; প্রতারণা তথা অন্যায় ও প্রকাশ্য গুনাহর শামিল।

দ্বিতীয় পর্যায়ে বলা হয়েছে ঃ

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ-

"তোমরা কিভাবে তা ফেরত নিতে চাও ? অথচ তোমরা পরস্পর মিলিত হয়েছ !" কারণ, বিয়ের পর পরস্পর মিলিত হলে স্ত্রীকে দেয়া সমস্ত অর্থ-সম্পদের মালিকানা স্ত্রীরই হয়ে যায়, স্বামীর তা ফেরত নেয়ার কোনো অধিকারই বাকী থাকে না। এ ক্ষেত্রে প্রদত্ত অর্থ-সম্পদ যদি মোহরানা হয়ে থাকে তবে তা তো সম্পূর্ণ স্ত্রীরই অধিকার ও মালিকানা। স্বামীর হস্তক্ষেপের কোনো অধিকারই থাকে না। আর যদি প্রদত্ত সম্পদ ও অর্থ উপঢৌকন হয়ে থাকে, তবে তাও ফেরত নেয়া শরীয়তে জায়েয নেই, আইনতও তা কার্যকর হবে না।

তৃতীয় পর্যায়ে বলা হয়েছে ঃ

وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا .

"আর স্ত্রীরা তোমাদের থেকে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে।" এখানে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি বলতে 'বিবাহ বন্ধন' বুঝানো হয়েছে। এ প্রতিশ্রুতি বা অঙ্গীকারের দৃঢ়তা এজন্যে যে তা আল্লাহর নামে খুতবা পাঠ করে জনসমক্ষে স্বীকার করা হয়েছে। বস্তুত বিবাহ বাঁধন এমন মযবুত ও নির্ভরযোগ্য বাঁধন যার দৃঢ়তার উপর ভরসা করেই স্ত্রীরা একজন পুরুষের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সোপর্দ করে দেয়। অতপর পুরুষ যদি স্বেচ্ছায় সেই বাঁধন ছিন্ন করে তবে পাকা প্রতিশ্রুতির সময় স্ত্রীকে প্রদত্ত অর্থ-সম্পদ স্বামীর ফেরত নেয়ার কোনো অধিকারই থাকে না।

মোটকথা, বৈবাহিক অঙ্গীকার ও পরস্পর মিলনের পর স্ত্রীকে প্রদত্ত অর্থ-সম্পদ ফেরতদানের জন্যে স্ত্রীকে বাধ্য করা বা সে জন্যে যে কোনো কৌশল-ফন্দি আঁটা প্রকাশ্য যুলুম ও সম্পূর্ণ হারাম।

তেতাল্লিশ

وَلَا تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاۤءِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ط اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّمَقْتًا ط وَّسَاۤءَ سَبِيْلًا ○(النساء : ٢٢)

"তোমরা সেসব স্ত্রীলোককে বিবাহ করবে না যাদের বিবাহ করেছে তোমাদের বাপ-দাদারা। অবশ্য পূর্বে এরূপ কিছু হয়ে থাকলে তা ভিন্ন কথা। নিশ্চয়ই তা খুবই নির্লজ্জ ও ঘৃণ্য এবং অত্যন্ত খারাপ পথ।"

–(সূরা আন নিসা ঃ ২২)

পূর্ব পুরুষ ও অধস্তন পুরুষের স্ত্রীদের বিয়ে করা হারাম

জাহেলী যুগে পিতার মৃত্যুর পর তার স্ত্রীকে পুত্ররা নির্দ্বিধায় বিয়ে করে নিত। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এ নির্লজ্জ কাজটি নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। আর আল্লাহ একে আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ বলে অভিহিত করেছেন। এতো এক কুরুচী ও কুস্বভাবের কাজ। দীর্ঘদিন যাকে মা বলে সম্বোধন করা হয়ে আসছে, পিতার মৃত্যুর পর তাকে স্ত্রী করে রাখা মানব চরিত্রের জঘন্যতম অপমৃত্যু ছাড়া আর কি হতে পারে ?

মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআনে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, তোমরা ঐ নারীকে বিয়ে করো না যাদেরকে তোমাদের পিতা, দাদা, নানা বিয়ে করেছেন। তবে অতীতে এমন কিছু হয়ে থাকলে তা ধর্তব্য নয়। ভবিষ্যতে যেন এমনটি কিছুতেই না হতে পারে। নিশ্চয়ই এ কাজটি যুক্তির দিক থেকে অশ্লীল, সুস্থ বিবেকের লোকের পরিভাষায় অত্যন্ত ঘৃণ্য এবং শরীয়তের আইনেও নেহায়াত মন্দ পথ।

আয়াতে اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ "অবশ্য পূর্বে এরূপ কিছু হয়ে থাকলে তা ভিন্ন কথা"—তাফহীমুল কুরআনে বলা হয়েছে "এর দু'টো অর্থ হতে পারে—প্রথমতঃ অজ্ঞতা বা মূর্খতার সময়ে তোমরা যে ভুল-ভ্রান্তি করেছিলে তা ধর্তব্য হবে না যদি আল্লাহর বিধান নাযিলের পর তোমরা নিজেদের কর্মনীতি সংশোধন করে লও এবং ভুল কাজ পরিত্যাগ কর। দ্বিতীয়তঃ পূর্বের কোনো কাজকে বর্তমানে হারাম ঘোষণা করা হলে তার মানে এ নয় যে, পূর্বের প্রচলন বা অতীত আইনের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়,

পূর্বে যারা সৎমাকে বিবাহ করার কারণে তাদের ঔরসে যে সন্তানের জন্ম হয়েছিল তাকে অবৈধ ঘোষণা করা হবে না। কারণ সে কাজটি ছিল মূর্খতার কারণে অথবা শরীয়তের বিধান নাযিল হওয়ার পূর্বে।"

তাফহীমুল কুরআনে আরও বলা হয়েছে, 'ইসলামী আইনে এটা ফৌজদারী অপরাধ বিশেষ এবং পুলিশের সরাসরি হস্তক্ষেপের উপযোগী ব্যাপার। আবু দাউদ, নাসায়ী ও মুসনাদে আহমাদের সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবী করীম (সা) এমন অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আর সাথে সাথে তাদের সমস্ত সম্পত্তি (সরকার কর্তৃক) বাজেয়াপ্ত করার শাস্তিও দিয়েছেন। ইবনে মাযাহ গ্রন্থে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে যে হাদীস বর্ণিত হয়েছে তা থেকে জানা যায় নবী করীম (সা) মূলনীতি স্বরূপ বলেছেন ঃ

مَنْ وَقَعَ عَلٰى ذَاتِ مُحْرِمٍ فَاقْتُلُوْهُ-

"যে ব্যক্তি মুহাররাম আত্মীয়ার সাথে ব্যভিচার করে তাকে হত্যা কর।"

ইমাম আহমদ (র)-এর মতে এ অপরাধীকে হত্যা করা ও তার ধন-সম্পত্তি ক্রোক করা আবশ্যক। ইমাম মালেক (র) ও ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে তাকে ব্যভিচারির শাস্তি দিতে হবে।

আল্লামা ইবনে কাসীরের একটি বর্ণনায় তাফহীমুল কুরআনের উপরিউক্ত বর্ণনার সমর্থন পাওয়া যায়। তাফসীরে ইবনে কাসীরে বলা হয়েছে, কিনানা ইবনে খুযাইমা স্বীয় পিতার স্ত্রীকে বিবাহ করেছিল, সেই সূত্রে নযর ইবনে কিনানার জন্ম হয়েছিল। এ নযর ইবনে কিনানা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স)-এর মন্তব্য হলো, সে তো মাতা-পিতার বৈধ মিলনের মাধ্যমে জন্ম নিয়েছে—ব্যভিচারের মাধ্যমে নয়। এ থেকে বুঝা যায় এ প্রথা পূর্ব থেকে প্রচলিত ছিল আর তখন একে বৈধ বিবাহ বলে গণ্য করা হতো। প্রকৃতপক্ষে اِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ "অবশ্য পূর্বে এরূপ কিছু হয়ে থাকলে তা ভিন্ন কথা"—এ বাক্যের ব্যাখ্যায় তাফহীমুল কুরআনে বর্ণিত দু'টো অর্থ তাফসীরে ইবনে কাসীরের উপরিউক্ত আলোচনার সাথে সম্পূর্ণ মিল রয়েছে।

আতা ইবনে আবু রিবাহ (র) বলেন ঃ مَقْتًا শব্দের তাৎপর্য হলো এটা আল্লাহর রুচী বিরুদ্ধ আর سَاءَ سَبِيْلاً অর্থাৎ "রীতিনীতির দিক থেকে এটা সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্টতম রীতি।"

ছয়াল্লিশ

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ وَأَخَوٰتُكُمْ وَعَمّٰتُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ وَبَنٰتُ الْأَخِ وَبَنٰتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِيْ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهٰتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الّٰتِيْ فِيْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الّٰتِيْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ز فَإِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ز وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ لا وَأَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ـ(النساء : ٢٣)

"তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে তোমাদের মা, তোমাদের কন্যা, তোমাদের বোন, তোমাদের ফুফু, তোমাদের খালা, ভাইঝি, ভাগ্নী, আর তোমাদের সেসব মা—যারা তোমাদের দুধ খাওয়ায়েছেন, তোমাদের দুধ বোন, তোমাদের স্ত্রীদের মা, তোমাদের স্ত্রীদের কন্যা—যারা তোমাদের কোলে লালিত পালিত হয়েছে, সেসব স্ত্রীর কন্যারা যাদের সাথে তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। অবশ্য যদি স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক স্থাপিত না হয়ে থাকে তবে তোমাদের কোনো গুনাহ হবে না, আপন ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রীগণ, তাছাড়া দুই সহোদরা বোনকে একত্রে বিবাহ করাও (তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে।)"–(সূরা আন নিসা ঃ ২৩)

যে ১৪ প্রকার মহিলাকে বিয়ে করা হারাম

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, সাত প্রকারের মহিলা বংশগত কারণে আর সাত প্রকারের মহিলা বৈবাহিক সূত্রের কারণে বিবাহ করা হারাম হয়েছে। একথা বলে তিনি উক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেছেন।

উপরোক্ত আয়াতে তোমাদের 'মা' বলতে কেবল গর্ভধারিণী মাকেই বুঝায় না, বরং সাথে সাথে দাদী, নানীও أُمَّهٰتُ শব্দের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তেমনিভাবে بَنَاتُكُمْ তোমাদের কন্যা বলতে স্বীয় ঔরষজাত কন্যা, কন্যার কন্যা ও পুত্রের কন্যা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। أَخَوَاتُكُمْ মানে তোমাদের সহোদরা বোন। তেমনি বৈমাত্রেয়া ও বৈপিত্রেয় বোনকেও বিয়ে করা হারাম। عَمّٰتُكُمْ মানে তোমাদের ফুফু। অর্থাৎ পিতার সহোদরা বৈমাত্রেয়া বৈপিত্রেয়া–তিন প্রকারের ফুফুকেই

বিয়ে করা হারাম। خَالَاتُكُمْ খালাগণ। এখানেও মায়ের তিন প্রকার বোন অন্তর্ভুক্ত। بَنَاتُ الْاَخِ ভাইয়ের কন্যা বলতেও তিন প্রকার ভাইয়ের কন্যাকে বুঝাবে بَنَاتُ الْاُخْتِ বোনের কন্যাও ঐ তিন প্রকার বোনের কন্যা বুঝাবে।

যেসব মহিলার দুধ পান করা হয়েছে। তারা গর্ভধারিণী মা না হলেও মায়ের পর্যায়ভুক্ত বিধায় তাদের বিয়ে করা হারাম। এ দুধপান একবার হোক বা একাধিকবার হোক আর দুধ কম পান করুক অথবা বেশী পান করুক সর্বাবস্থায় দুধ মাকে বিয়ে করা হারাম। ফিক্‌হ শাস্ত্রের পরিভাষায় এ হারাম হওয়াকে حُرْمَتِ رِضَاعَةٌ "হুরমতে রাদায়াত" বলে।

দুধ পান বলতে কেবল শিশুকালীন দুধ পান করাকেই বুঝাবে। ইমাম আবু হানিফা (র)-এর মতে সেই সময় হলো শিশুর বয়স যখন আড়াই বছর পর্যন্ত থাকে। সুতরাং শিশুর বয়স আড়াই বছরের মধ্যে সে যেই মহিলার দুধ পান করবে তার সাথে সেই শিশুর বয়ঃপ্রাপ্ত অবস্থায় বিয়ে জায়েয নেই। কোনো বালক-বালিকা যদি উক্ত বয়সের পরে কোনো স্ত্রীলোকের দুধ পান করে, তবে এতে হুরমতে রাদায়াত বা দুধ পানজনিত অবৈধতা প্রমাণিত হবে না।

সকল প্রকার দুধ বোনকে বিয়ে করা হারাম। বংশগত সম্পর্কের কারণে যাদের বিয়ে করা হারাম হয়ে যায়, দুধ পানের সম্পর্কের কারণেও সেসব লোকদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা হারাম হয়ে যায়। হাদীস শরীফে আছে ঃ

يحرم من الرضاعة مايحرم من الولادة

ان الله حرم من الرضاعة ماحرم من النسب

"দুধ পানে বিয়ে হারাম হয়, যারা জন্মের কারণে হারাম হয়।"

"আল্লাহ তা'আলা দুধ পানে হারাম করেছেন যাদের বংশের কারণে হারাম করেছেন।"

স্ত্রীদের মাতা অর্থাৎ শ্বাশুড়ীকে বিয়ে করা হারাম। তেমনি স্ত্রীদের দাদী, নানী, বংশগত ও দুধ গত সবাই এর অন্তর্ভুক্ত।

যে মহিলাকে বিয়ে করে সহবাস করেছে সেই মহিলার অন্য স্বামীর ঔরষজাত কন্যা, পৌত্রী ও দৌহিত্রীও হারাম হয়ে যায়। তাদের কাউকে বিয়ে করা জায়েয নয়।

ঔরষজাত সন্তানের স্ত্রীকে বিয়ে করা হারাম। এখানে ঔরষজাত পুত্রের মধ্যে পৌত্র ও দৌহিত্র সবাই অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তাদের স্ত্রীকেও বিয়ে করা জায়েয নেই।

কিন্তু সন্তান বা পুত্র যদি ঔরসজাত না হয় অর্থাৎ পোষ্য বা পালক পুত্র হয়, তবে তার স্ত্রীকে বিবাহ করা হারাম নয়। এখানে স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, দুধপুত্র বংশগত পুত্রের পর্যায়ভুক্ত, কাজেই তার স্ত্রীকেও বিয়ে করা হারাম।

দুই বোনকে একই সময় স্ত্রী হিসেবে রাখা হারাম। চাই তারা বংশগত হোক, দুধ পানজনিত হোক অথবা বৈমাত্রেয় বা বৈপিত্রেয় হোক। একজনের মৃত্যু বা তালাকের পর অন্য বোনকে বিয়ে করা জায়েয।

উপরের আয়াতের ১৩জন মহিলা এবং পরবর্তী আয়াতের একজন সহ (অন্যের স্ত্রী) মোট ১৪জন স্ত্রীলোককে বিবাহ করা হারাম।

পঁয়তাল্লিশ

وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۚ كِتٰبَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ۚ

"আর সেসব নারীও তোমাদের জন্যে হারাম, যারা অন্য কারো বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ। অবশ্য তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীগণ এর ব্যতিক্রম। এটা তোমাদের জন্য আল্লাহর বিধান।"–(সূরা আন নিসা ঃ ২৪)

স্ত্রী গ্রহণ করার ব্যাপারে আল্লাহর মীমাংসা

যে চৌদ্দ প্রকার স্ত্রীলোককে বিবাহ করা হারাম করা হয়েছে উপরে তার তের প্রকারের বিবরণ দেয়া হয়েছে। এখানে চৌদ্দতম প্রকারের মহিলার উল্লেখ করা হয়েছে ; আর তারা হচ্ছে অন্যের বিবাহে আবদ্ধ স্ত্রীলোক। প্রকাশ থাকে যে, পূর্ববর্তী আয়াতে ও এ আয়াতের প্রথমাংশে যে চৌদ্দ প্রকারের স্ত্রী লোককে বিবাহ করা হারাম ঘোষণা করা হয়েছে, তাদের মধ্যে রয়েছে (১) বংশের কারণে হারাম, (২) দুধ পানের কারণে হারাম, (৩) বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে হারাম।–এ তিন কারণে হারাম ঘোষিত মহিলারা চিরদিনের জন্যে হারাম। এদের বলা হয় "মুহাররামাতে আবাদিয়া" مُحَرَّمَاتُ اَبَدِيَّةٌ বা চিরতরে হারাম। উক্ত চৌদ্দ প্রকারের নারীর মধ্যে শেষ দুই প্রকারের হারাম ঘোষিত মহিলা কোনো কোনো সময় হালাল হয়ে থাকে। যেমন, এক বোন বিবাহ বন্ধনে থাকা পর্যন্ত অপর বোন সেই ব্যক্তির জন্যে হারাম হলেও প্রথম বোন মারা গেলে অথবা তার সাথে বিবাহ সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেলে অপর বোনকে বিবাহ করা বৈধ। তেমনি পর স্ত্রী যতক্ষণ পর্যন্ত পর স্ত্রী থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে অন্য পুরুষ বিয়ে করতে না পারলেও সেই লোকের মৃত্যু অথবা সে তালাক দিলে ঐ মহিলাকে অন্য পুরুষ বিয়ে করতে পারে। সুতরাং চৌদ্দ প্রকারের শেষ দুই প্রকারের মহিলা "মুহাররামাতে আবাদিয়া" (চির হারাম) মহিলার অন্তর্ভুক্ত নয়।–(মা'আরেফুল কুরআন)

আয়াতে "অধিকারভুক্ত দাসী"গণকে হালাল ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়টি সম্পর্কে অধুনা এক শ্রেণীর মুসলিম চিন্তাবিদদের মধ্যেও বিভ্রান্তি বিরাজ করছে।

যেসব স্ত্রীলোক যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে বন্দী হয়ে আসে আর তাদের কাফের স্বামী যদি দারুল হরবে (বা কাফের শত্রু দেশে) থেকে যায়, তবে সেসব স্ত্রীলোককে

গ্রহণ করা হারাম নয়। কেননা দারুল হরব থেকে দারুল ইসলামে চলে আসার কারণে তাদের বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেছে। এ ধরনের স্ত্রীলোকদের বিবাহ করা যেতে পারে, কারো মালিকানাধীন দাসী হিসাবে থাকলে তার সাথে সঙ্গমও করা যেতে পারে। অবশ্য স্বামী-স্ত্রী উভয়ই একত্রে বন্দী হয়ে আসলে তাদের ব্যাপারে ফিকহবিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা (র) ও তাঁর শিষ্যদের মতে তাদের বিবাহ বহাল থাকবে। কিন্তু ইমাম শাফিঈ (র)-এর মতে তাদের বিবাহ বহাল থাকবে না।–(তাফহীমুল কুরআন)

দাসীর সাথে সংগম

অধিকারভুক্ত দাসীদের সাথে সঙ্গম করার বিষয়ে সৃষ্ট ভুল ধারণা নিরসনের জন্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো ভাল করে বুঝে নেয়া দরকার।

(১) যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে বন্দী হয়ে আসলেই তাদের সাথে কোনো লোক সঙ্গম করতে পারবে না। বরং তা হবে যিনার শামিল। ইসলামী শরীয়ত মতে এ জাতীয় মহিলারা (ইসলামী) সরকারের অধীন থাকবে। আর সরকার ইচ্ছা করলে তাদের স্বাধীন করে দিতে পারে। বিনিময় মূল্য নিয়ে রেহাই দিতে পারে, শত্রু পক্ষের হাতে বন্দী মুসলমানের সাথে বিনিময় করতে পারে। তাছাড়া মুসলিম সৈনিকদের মধ্যে বণ্টন করার ইখতিয়ার (ইসলামী) সরকারের আছে। মূলত একজন সৈনিক কেবলমাত্র সেই বন্দী স্ত্রীলোকের সাথেই সঙ্গম করতে পারে, যাকে সরকার যথারীতি তার মালিকানায় ছেড়ে দিয়েছে।

(২) এরূপ শরীয়ত সম্মত উপায়ে মালিকানাধীন স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করতে হলেও ইদ্দত পালনের পরই তা বৈধ হতে পারে। অর্থাৎ একবার মাসিক ঋতু হওয়া বা তার গর্ভ ধারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পরই কেবল তা বৈধ।

(৩) এরূপ বন্দী নারীর আহলে কিতাব হওয়া শর্ত নয়, বরং যে কোনো ধর্মের নারীর সাথে সঙ্গম জায়েয।

(৪) যার মালিকানাধীন বণ্টন করে দেয়া হয়েছে সে ছাড়া অন্য কেউ তার সাথে সঙ্গম করতে পারবে না।

(৫) এ মালিকানা হস্তান্তরযোগ্য।

(৬) সরকার কারো মালিকানায় সপর্দ করার পর পুনরায় তাকে ফেরত নেয়ার অধিকার সরকারের থাকবে না।

(৭) কোনো সেনাধ্যক্ষ এরূপ মহিলাকে তার কোনো সৈনিকের কাছে যৌন লালসা চরিতার্থ করতে দিলে তা ইসলামী শরীয়তে সম্পূর্ণ না-জায়েয

কাজ হবে। এটা প্রকাশ্য যিনা বা ব্যভিচারের শামিল। (অধিক জানার জন্যে মাআরেফুল কুরআন ও তাফহীমুল কুরআন দেখুন।)

কোনো মহিলা যদি দারুল হরবে মুসলমান হয়ে যায় আর তার স্বামী কাফের থাকে তবে শরীয়তের বিচারক তাকে ইসলাম গ্রহণ করতে বলবে। সে তা অস্বীকার করলে বিচারক তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ করে দিবে। এ বিচ্ছেদ তালাক বলে গণ্য হবে।–[মা'আরেফুল কুরআন ঃ মুফতী মুহাম্মদ শফী (র)]

একজন মহিলা একই সময় একাধিক স্বামী গ্রহণ করতে পারবে না

অধুনা মূর্খ ধর্মদ্রোহী ও ইসলাম বিদ্বেষীদের মতে একজন পুরুষ যেমন একাধিক নারী গ্রহণ করতে পারে, একজন নারীরও তেমনি একাধিক স্বামী গ্রহণের অধিকার থাকা চাই। তাদের এ দাবী আলোচ্য আয়াতের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তারা একথাটি বুঝে না যে, পুরুষের জন্যে একাধিক বিবাহ একটা নিয়ামত ও সামাজিক শৃংখলার চাবিকাঠি। এটা প্রত্যেক ধর্মেই স্বীকৃত এবং ঐতিহাসিক সত্য। পক্ষান্তরে একজন নারীর জন্যে একাধিক স্বামী স্বয়ং নারীর জন্যেই বিপদের কারণ, আর তা স্বামীদের জন্যেও নির্লজ্জতা এবং সামাজিক বিপর্যয়ের উৎস। কোনো সমাজে এ নীতি চালু থাকলে তা আর মানুষের সমাজ থাকে না। এতে মানব বংশ এক চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে বাধ্য। আজকের পাশ্চাত্যই তার উজ্জ্বলতম সাক্ষী।

স্বভাব-প্রকৃতি আর সাধারণ যুক্তিতেও এমন নারীর জন্যে একাধিক স্বামী থাকার কোনো বৈধতা দেখা যায় না। কারণ, বিয়ের বুনিয়াদী লক্ষ্য হলো বংশ বিস্তার ও সামাজিক শৃংখলা সংরক্ষণ। একজন পুরুষ দ্বারা তো একাধিক মহিলা গর্ভধারণ করতে পারে ; কিন্তু একজন নারী একাধিক পুরুষ দ্বারা গর্ভবতী হতে পারে না। সে তো গর্ভধারণ করে একজন থেকেই। তাই একাধিক স্বামীর অবশিষ্ট সব স্বামীর শক্তি বিনষ্ট হবে, কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ ছাড়া তাদের কোনো কাজ থাকবে না। দ্বিতীয়ত সৃষ্টিগতভাবেই নারী অবলা এবং অনেক সময় সে থাকে স্বামীর সহবাসের অযোগ্য। কোনো কোনো সময় একজন স্বামীর হক আদায় করাও তার দ্বারা সম্ভব হয় না। একাধিক স্বামীর তো প্রশ্নই উঠে না। তৃতীয়ত সাধারণ পুরুষ নারীর তুলনায় অধিক শক্তিশালী। এমতাবস্থায় কোনো স্বামীর যৌনশক্তি স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী হলে সে একজন নারী দ্বারা সন্তুষ্ট হতে পারে না। তখন তার আরেকজন স্ত্রী না থাকলে সে অবৈধ পথে গিয়ে গোটা সমাজকে দুষিত করে ছাড়বে। কিন্তু নারী দ্বারা এমনটি হওয়ার আশংকা কম।–(মাআরেফুল কুরআন)

ছেচল্লিশ

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّاوَرَاءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوا بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسَافِحِيْنَ ط
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً ط وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا
تَرَاضَيْتُمْ بِهٖ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ○ (النساء : ٢٤)

"উপরিউক্ত মহিলাগণ ছাড়া তোমাদের সকল নারী হালাল করা হলো ; তোমরা তাদেরকে তোমাদের সম্পদের বিনিময়ে তলব করবে বিবাহে আবদ্ধ করার জন্যে–যৌন কামনা চরিতার্থ করার জন্যে নয়। অতপর এতে করে তাদের দিয়ে দাম্পত্য জীবনের যে স্বাদ তোমরা লাভ করবে সে জন্যে তাদেরকে তাদের পাওনা (মোহরানা) ফরয হিসেবে আদায় করবে। অবশ্য মোহরানা নির্ধারণের পর পারস্পরিক সন্তুষ্টি সহকারে যদি তোমাদের মধ্যে সমঝোতা হয়ে যায়, তবে তাতে কোনো দোষ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, মহাবিজ্ঞানী।"–(সূরা আন নিসা ঃ ২৪)

বিবাহে মোহরানা নির্ধারণ করা ফরয

পূর্বোক্ত আয়াতে (চুয়াল্লিশ ও পঁয়তাল্লিশ ক্রমিকে) বর্ণিত নির্দিষ্ট মহিলাদের ছাড়া বাকী মহিলাদের মধ্য হতে মোহরানার বিনিময়ে বিয়ে করার হুকুম এ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে ওসব নারীগণ ছাড়া বাকীসব নারী তোমাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে। যেমন চাচার কন্যা, খালার মেয়ে, মামাত বোন, মামা ও চাচার স্ত্রী তাদের মৃত্যুর পর—যদি তারা অন্য কোনো সম্পর্ক দ্বারা হারাম না হয়। আর পালক পুত্রের স্ত্রী—যদি সে তাকে তালাক দিয়ে দেয়, কিংবা সে মারা যায়, স্ত্রী মারা গেলে তার বোন ইত্যাদি অসংখ্য প্রকারের মহিলাই مَاوَرَاءَ ذٰلِكُمْ -এর অন্তর্ভুক্ত।

তবে কুরআনের অন্য আয়াতে চারজনের অধিক সংখ্যক নারীকে বিবাহ করতে নিষেধ করা হয়েছে। অর্থাৎ সর্বোচ্চ চারজনকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ রাখা যেতে পারে। আয়াত থেকে বুঝা গেল মোহরানা ছাড়া বিবাহ হতে পারে না। এমনকি স্বামী-স্ত্রী উভয় যদি মোহরানা ছাড়া বিবাহে সম্মত হয়, তবুও মোহরানা অবশ্যই আদায় করতে হবে। তবে বিবাহের আকদ হওয়ার সময় যদি মোহরানার পরিমাণ উল্লেখ না করা হয়ে থাকে তবুও বিবাহ কার্যকর হয়ে

যাবে। আর সে অবস্থায় 'মোহরে মেছেল' ওয়াজিব হবে। কোনো অবস্থাতেই বিবাহ মোহরানা ছাড়া জায়েয হবে না। অবশ্য মোহরানা আদায়ের ব্যাপারে স্ত্রীর পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে। সে ইচ্ছা করলে কোনো প্রকার চাপ ছাড়া স্বেচ্ছায় মোহরানা আংশিক বা সম্পূর্ণ মাফ করে দিতে পারে। মাহরে মেছেল' বলতে মেয়ের অন্যান্য বোন, ফুফু, চাচাত, জেঠাতো বোনদের মাহরের সমপরিমাণ মোহরানা বুঝায়।

এ আয়াতে أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ (তোমাদের সম্পদের বিনিময়ে তলব করবে) বলে বুঝানো হয়েছে যে, বিবাহের উদ্দেশ্যে মহিলাদের সন্ধান কর তোমাদের সম্পদ তাদের মোহরানা হিসেবে দিয়ে (বায়যাবী)। অর্থাৎ মোহরানা প্রদান করে বিবাহ কর। ফকীহগণ এ আয়াত থেকে প্রমাণ পেশ করেছেন যে, 'মোহরানা' বিবাহের একটি অত্যাবশ্যকীয় অংশ বা উপাদান, তার পরিমাণ নির্দিষ্ট হোক বা না-ই হোক।

এ আয়াত থেকে প্রমাণ হয় 'মোহরানা' ছাড়া বিবাহ অনুষ্ঠিত হতে পারে না। তা অপরিহার্য, চাই তার পরিমাণ নির্দিষ্ট হোক বা না-ই হোক।–(মাদারিক)

মোহরানার উপর্যুপরি তাকীদ থেকে প্রতিভাত হয় যে, নারীদের অধিকার সংরক্ষণে যত্নবান হওয়া ইসলামী আইনে কতটা বাঞ্ছনীয়। মূল আর্থিক ব্যয় বিবাহ এবং যিনা উভয় ক্ষেত্রেই অভিন্ন। পার্থক্য এই যে, বিবাহের দ্বারা জীবনটা মানুষের মত সুশৃংখল ও অনুগত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যিনার দ্বারা মানুষ পশুর মত হীন পর্যায়ে উপনীত হয়।

আয়াতে বিবাহের জুড়ি তালাসের জন্য পুরুষকে সম্বোধন করে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেন বিবাহের প্রস্তাবটা হবে পুরুষের কাজ আর গ্রহণ বা অনুমোদন করা হবে নারীর কাজ।–(তাফসীরে মাজেদী)

সাতচল্লিশ

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيٰتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ط وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِكُمْ ط بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ج

"আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি স্বাধীন মুসলিম নারীকে বিয়ে করার সামর্থ রাখে না, সে তোমাদের অধিকারভুক্ত মুসলিম ক্রীতদাসীকে বিয়ে করবে। আল্লাহ তোমাদের ঈমান সম্পর্কে ভালভাবে ওয়াকিফ আছেন। তোমরা সবাই মূলত একই বংশীয়।"–(সূরা আন নিসা ঃ ২৫)

বিয়ে করবে স্বাধীন মুসলিম নারীকে

একজন মুসলিম বিয়ে করবে একজন স্বাধীন সম্ভ্রান্ত মুসলিম মহিলাকে। কিন্তু কেউ যদি সম্ভ্রান্ত বংশের মুসলিম পাত্রী (মুহসানাত)-কে বিয়ে করার পুরো সামর্থ না রাখে, তবে সে নিজেদের মধ্যকার শরীয়তসম্মত মালিকানাধীন দাসীদের বিয়ে করবে। কেননা অধিকাংশ দাসীর মোহরানা ও খরচাদি কম হয়ে থাকে এবং তাদের গরীবের ঘরে বিয়ে দিতে সংকোচ করা হয় না। আর দাসীকে বিয়ে করতে কোনো পুরুষের সংকোচ করাও উচিত নয়। কেননা ধার্মিকতা ও ঈমানদারীর দিক থেকে একজন দাসী একজন স্বাধীন নারীর চেয়েও উত্তম হতে পারে। ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তিই হলো ঈমান ও তাকওয়া। তোমাদের মধ্যে ঈমানের দিক থেকে কে শ্রেষ্ঠ আর কে নিকৃষ্ট, তা কেবল আল্লাহই ভাল জানেন। কারণ এটা তো অন্তরের সাথেই সম্পৃক্ত, আর অন্তরের পূর্ণ খবর তো আল্লাহরই ভাল জানা আছে। পার্থিব দিক থেকে সংকোচের বড় কারণ হচ্ছে বংশগত পার্থক্য থাকা অথচ বংশের মূল উৎস হলেন হযরত আদম ও হাওয়া (আ)। উৎসের অভিন্নতার কারণে তোমরা সবাই পরস্পর সমান, সবাই একই বংশোদ্ভূত। সুতরাং সংকোচের কোনো কারণ থাকা মোটেই সমীচীন নয়।

অবশ্য আয়াতের ভাষ্যে বলা হয়েছে স্বাধীন নারীকে বিয়ে করার অর্থ সামর্থ না থাকলে ঈমানদার দাসীদের বিয়ে করা যায়। সুতরাং যথাসম্ভব স্বাধীন নারীকেই বিয়ে করার চেষ্টা করতে হবে। আর যদি দাসীদেরই বিয়ে করতে হয়, তবে ঈমানদার দাসী খোঁজ করতে হবে। হযরত ইমাম আবু হানিফা (র)-

এর মত এটাই। তাঁর মতে স্বাধীন সম্ভ্রান্ত মুসলিম নারীকে বিয়ে করার সামর্থ থাকা সত্ত্বেও দাসী কিংবা ইয়াহুদী খৃষ্টান দাসীকে বিয়ে করা মাকরূহ। ইমাম শাফিঈ (র) ও অন্যান্য ইমামের মতে স্বাধীন নারীকে বিয়ে করার শক্তি সামর্থ থাকা সত্ত্বেও দাসীকে অথবা ইয়াহুদী খ্রীষ্টান দাসীকে বিয়ে করা সর্বাবস্থায় অবৈধ। চিন্তাশীল উলামায়ে কিরামের মতে স্বাধীন ইয়াহুদী-খ্রীষ্টান নারীকে বিয়ে করা বৈধ হলেও তা থেকে বেঁচে থাকা উত্তম। বর্তমান যুগে এর গুরুত্ব অত্যধিক।-(মাআরেফুল কুরআন)

আয়াতে বলা হয়েছে, "স্বাধীন মহিলাকে বিয়ে করার সামর্থ না থাকলে দাসী ঈমানদার মহিলাকে বিয়ে করবে।" সুতরাং মুতাআ বৈধ নয়। কারণ, স্বাধীন নারীকে বিয়ে করার সামর্থ না থাকা অবস্থায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্যে মুতাআ ছিল সহজতম পথ। এতে যৌন বাসনারও পরিতৃপ্তি হতো এবং আর্থিক বোঝাও বিয়ের তুলনায় অনেক কম হতো। অথচ আল্লাহ তা'আলা স্বাধীন নারীকে বিবাহ করতে অসমর্থ হলেও মুতাআর অনুমতি দেননি। কাজেই মুতাআ সর্বাবস্থায় হারাম।

আটচল্লিশ

فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ مُحْصَنٰتٍ غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ وَّلَا مُتَّخِذٰتِ اَخْدَانٍ ج فَاِذَآ اُحْصِنَّ فَاِنْ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنٰتِ مِنَ الْعَذَابِ ط ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ط وَاَنْ تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○ (النساء : ٢٥)

"তাদেরকে (দাসীদেরকে) তাদের মালিকের অনুমতিক্রমে বিয়ে কর এবং যথাবিধি তাদের মোহরানা আদায় কর। এমতাবস্থায় যে তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে—ব্যভিচারীণী কিংবা উপপতি গ্রহণকারিণী হবে না। অতপর তারা যখন বিবাহ বন্ধনে এসে যায় তখন যদি কোনো অশ্লীল কাজ করে, তবে তাদেরকে স্বাধীন নারীদের অর্ধেক শাস্তি ভোগ করতে হবে। এ হুকুম তাদের জন্য, তোমাদের মধ্যে যারা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়ার আশংকা করে। আর সবর করাই তোমাদের জন্য উত্তম। আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।"–(সূরা আন নিসা ঃ ২৫)

সম্ভ্রান্ত স্বাধীন মহিলাকে বিয়ে করার সামর্থ না থাকলে সবর করাই উত্তম

কোনো পুরুষ সম্ভ্রান্ত স্বাধীন মহিলাকে বিয়ে করতে সমর্থ না হলে এবং তার ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়ার আশংকা থাকলে, সে মুসলিম দাসী নারীকে বিয়ে করবে। কিন্তু তার জন্যে উত্তম যৌন সংযম অবলম্বন করা এবং সামর্থ হওয়ার অপেক্ষায় থাকা, যেন সে একজন স্বাধীন নারীকে বিয়ে করতে পারে। কেউ যদি যৌন সংযমে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও দাসী নারীকে বিয়ে করে বসে, তবে আল্লাহ তাকে পাকড়াও করবেন না, তাকে ক্ষমা করবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল করুণাময়।

দাসী বিয়ে করলে তিনটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে উক্ত আয়াতে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। (১) মালিকদের অনুমতি নিয়ে তাদের বিয়ে করতে হবে, অন্যথা বিয়ে শুদ্ধ হবে না। কারণ, দাসীদের নিজের উপরও কোনো

কর্তৃত্ব নেই। গোলামের অবস্থাও অনুরূপ, সে প্রভুর অনুমতি ছাড়া বিয়ে করতে পারবে না। (২) তাদের বিয়ে করতে হবে উত্তম পন্থায় মোহরানা আদায় করে দিয়ে। কোনো প্রকার টালবাহান করা, পুরোপুরি আদায় না করা কিংবা দাসী ভেবে কোনো প্রকার কষ্ট দেয়া যাবে না। (৩) তারা যেন সতী-সাধ্বী হয়, প্রকাশ্য ব্যভিচারিণী বা গোপন সম্পর্ক স্থাপনকারী না হয়। এমনকি স্বাধীন ব্যভিচারিণী নারী থেকেও বেঁচে থাকা উত্তম।

দাসী নারীদের বিয়ে হওয়ার পর যদি তাদের সতী-সাধ্বী থাকার ব্যবস্থা হয়ে যায়। তখনও যদি তারা যিনা করে বসে, তবে তারা স্বাধীন যিনাকারী নারীগণের নির্ধারিত শাস্তির অর্ধেক ভোগ করবে। এখানে অবিবাহিতা স্বাধীন নারীকে বুঝানো হয়েছে। অবিবাহিত স্বাধীন পুরুষ বা নারী যিনা করলে তাদের একশত বেত্রাঘাত করার বিধান রয়েছে।

ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ অর্থাৎ দাসীদের বিয়ে করার অনুমতি ঐ ব্যক্তির জন্য যার যিনায় লিপ্ত হওয়ার আশংকা থাকে। সুতরাং যিনায় লিপ্ত হয়ে পড়ার আশংকা না থাকলে দাসী বিয়ে করার প্রয়োজন নেই। অবশ্য তবুও কেউ করে ফেললে তো আল্লাহর অনুমতি রয়েছেই।

সর্বশেষে আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা হলো, যিনার আশংকা থাকা সত্ত্বেও সবর করা এবং নিজেকে পবিত্র ও সৎ রাখতে পারা দাসীকে বিয়ে করার চেয়ে উত্তম। যারা বিয়ে করার সামর্থ রাখে না, খোরপোষ দেয়ার মত যাদের আর্থিক সচ্ছলতা নেই তাদের উচিত সবর করা এবং নিজেকে সৎ ও পবিত্র রাখা। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে ব্যবস্থা হয়ে যাওয়ার অপেক্ষা করা।

উনপঞ্চাশ

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ط لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا ط وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ط وَاسْئَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ○ (النساء : ٣٢)

"তোমরা এমন বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা করো না যাতে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের একের উপর অপরের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। পুরুষরা যা অর্জন করে সেটা তাদের অংশ, আর নারীরা যা অর্জন করে সেটা তাদের অংশ। আর আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। নিসন্দেহে আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।"–(সূরা আন নিসা ঃ ৩২)

পুরুষ পাবে তার অর্জিত অংশ আর নারী পাবে তার অর্জিত অংশ

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নারী-পুরুষকে এমন সব বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা করতে নিষেধ করেছেন। যেসব বিষয়ে আল্লাহ নিজেই কাউকে দান করেছেন যেমন কারো পুরুষ হয়ে জন্ম হওয়া, কারো ধনী হওয়া, কারো সৈয়দ বংশে জন্ম হওয়া, কারো সুন্দর স্বাস্থবান হওয়া–ইত্যাদি। এসব বিষয়ই মানুষের আয়ত্বের বাইরে আল্লাহর বিশেষ ইচ্ছায় এরূপ হয়ে থাকে।

আলোচ্য আয়াত নাযিল হওয়া প্রসংগে বর্ণিত আছে যে, একবার হযরত উম্মে সালমা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন যে, আমাদের নারীদের জন্য ওয়ারিশী সম্পত্তিতে পুরুষদের অর্ধেক নির্ধারিত হয়েছে। এমনি ধরনের আরো কতিপয় বিষয়ে নারীদের বেলায় বৈষম্য করা হলো কেন ? তাঁর প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য আপত্তি উত্থাপন নয় বরং এ আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করা, "আমরাও যদি পুরুষ হতাম তবে তাদের মত আমাদের প্রাধান্য থাকত।" কোনো কোনো মহিলা আক্ষেপ করেছিলেন আমরাও পুরুষ হলে জিহাদে অংশগ্রহণ করে অধিক মর্যাদা লাভ করতে পারতাম। তাছাড়া জনৈক স্ত্রীলোক একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করেছিলেন, আমরা ওয়ারিশী স্বত্বের অর্ধেক পাই, সাক্ষীর

বেলায়ও আমরা দু'জন নারী একজন পুরুষের সমান গণ্য হই। তাহলে কি আমরা আমাদের ইবাদাতের ফলও অর্ধেক পাব ? এসব প্রশ্নের জবাবে উপরের দুটো আয়াত নাযিল হয়েছে।

হযরত উম্মে সালমা (রা)-এর প্রশ্নের জবাবে বলা হয়েছে وَلَا تَتَمَنَّوْا مَافَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ অর্থাৎ আল্লাহ বিশেষ হিকমতের কারণে কারো উপর কারো মর্যাদা দিয়েছেন, সে জন্য তোমরা অযথা মনক্ষুণ্ন হয়ো না। এটা আল্লাহর সৃষ্টি কৌশল। এর রহস্য তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না। এগুলো তো মানুষের আয়ত্বাধীন বিষয় নয়। সুতরাং এ জাতীয় বিষয়ে সন্তুষ্ট থাকা ও আল্লাহর শোকর করাই বাঞ্ছনীয়।

পুরুষরা তাদেরকে আল্লাহ পুরুষ বানানোর কারণে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবে তেমনি নারীগণও তাদের নারী বানানোর কারণে আল্লাহর উপর রাজী থাকবে। অন্যথা উপরোক্ত অর্থহীন আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে মানসিক যন্ত্রণা ছাড়া আর কোনো লাভ নেই।

অবশ্য মানুষের আয়ত্বাধীন যেসব বিষয় রয়েছে সেসব বিষয়ে চেষ্টা-সাধনা ও প্রতিযোগিতা করলেই সাফল্য লাভের আশা করা যেতে পারে। পরবর্তীতে لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا..... বলে সেদিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে পুরুষ যা অর্জন করে তা তার অংশ, আর নারী যা অর্জন করে তা তার অংশ। অর্থাৎ পুরুষগণ যাকিছু চেষ্টা-সাধনা করে অর্জন করবে তারা তার অংশ পাবে। আর নারীরা যাকিছু অর্জন করবে তার অংশ পাবে তারা।

এখানে ইংগিত করা হয়েছে যে, গুণ-বৈশিষ্ট্য ও কর্মদক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করার চেষ্টা ব্যর্থ হবে না। প্রত্যেকেই তার প্রচেষ্টার ফল অবশ্যই লাভ করবে। নর-নারীর কোনো বিশেষ পার্থক্য এ ক্ষেত্রে মোটেই থাকবে না। আয়াত থেকে আরো শিক্ষণীয় যে, অপরের জ্ঞান-গরিমা ও চারিত্রিক গুণ-বৈশিষ্ট্য দেখে সেরূপ গুণ-বৈশিষ্ট্যের আকাঙ্ক্ষা করা বাঞ্ছনীয় ও প্রশংসনীয়। আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে জানা যায় যে, কোনো চেষ্টাকারীর চেষ্টাই বৃথা যাবে না। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেকেই নিজ নিজ চেষ্টা ও আমলের ফল পাবে।

وَاسْئَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ- "আর আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা কর।" এ বলে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তোমরা যদি অন্যকে কোনো বিষয়ে তোমাদের চেয়ে সমৃদ্ধ দেখতে পাও, তবে তার সেটুকু কেড়ে নেয়ার অনর্থক

চেষ্টা করার পরিবর্তে তুমি নিজের জন্য আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহের প্রার্থনা করতে থাক। কেননা আল্লাহর অনুগ্রহ প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে বর্ষিত হতে থাকে। কারো প্রতি সেই অনুগ্রহ দেখা দেয় ধন-সম্পদের আকারে আর কারো প্রতি দেখা দেয় দারিদ্র আকারে। কেননা তা না হলে প্রথম ব্যক্তি হয়ত ঈমান হারা হয়ে পড়তো, আর দ্বিতীয় ব্যক্তি জড়িয়ে পড়তো নানা প্রকার গুনাহের কাজে। কার জন্য কোন্ বস্তু বা কোন্ অবস্থান উপকারী বা কল্যাণকর, তা একমাত্র সর্বজ্ঞ আল্লাহ তা'আলাই ভালভাবে জানেন এবং তিনি সেভাবেই মানুষের জন্য তাঁর অনুগ্রহের দরযা খুলে দেন। মানুষের মধ্যে কাউকে পুরুষ রূপে সৃষ্টি করা কাউকেও নারী রূপে সৃষ্টি করা তাঁর হিকমতের বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

পঞ্চাশ

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَا اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ط فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ط

"পুরুষরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল। এজন্যে যে আল্লাহ একের উপর অন্যের মর্যাদা দিয়েছেন আর এ জন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে। সতী নারীগণ হয় অনুগত লোক চক্ষুর অন্তরালে ও সেসবের হেফাজত করে। যেসব কিছু আল্লাহ হেফাজতযোগ্য করে দিয়েছেন।"

–(সূরা আন নিসা ঃ ৩৪)

পুরুষগণ নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ "আর পুরুষদের রয়েছে নারীদের উপর মর্যাদা। আয়াতে পুরুষদের প্রধান্যের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে বিশেষ ভংগিতে। পুরুষদের এ মর্যাদা নারীদের সামগ্রিক কল্যাণের বিষয় বিবেচনা করেই ব্যক্ত করা হয়েছে। এ প্রাধান্য নারীদের খাটো করা অথবা তাদের অধিকার খর্ব করার উদ্দেশ্যে নয়, বরং তাদের দৈহিক, মানসিক ও স্বভাবগত অবস্থানের প্রতি লক্ষ্য রেখেই এ ঘোষণা দেয়া হয়েছে। এ ঘোষণা তো দিয়েছেন তিনি, যে সত্বা অত্যন্ত সুনিপুণভাবে সৃষ্টি করেছেন নর ও নারীকে। এখানে বলা হয়েছে, اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ পুরুষরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল বা দায়িত্বশীল। আরবীতে قَوَّامٌ, قِيَام ও قَيِّمٌ বলতে বুঝায় এমন ব্যক্তিকে যে কোনো কাজের পরিচালক, দায়িত্বশীল বা তত্বাবধায়ক। তাই এ আয়াতের তরজমা করা হয় পুরুষরা স্ত্রীলোকদের পরিচালক বা অভিভাবক। সাধারণত কোনো যৌথ কাজ কারবারের জন্য যেমন একজন পরিচালক বা অভিভাবকের প্রয়োজন, তেমনি পরিবার পরিচালনার জন্যও আবশ্যক একজন পরিচালক বা অভিভাবক। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পরিবার পরিচালনার দায়িত্ব শিশু বা স্ত্রীলোকের উপর অর্পণ না করে, তা অর্পণ করেছেন পুরুষের উপর। কারণ, সৃষ্টিগত দিক থেকে সংসার জীবনের দৈনন্দিন কার্যাদি পরিচালনা ও এতদসংক্রান্ত সমস্যাদি

মুকাবিলা করার মানসিক যোগ্যতা ও দৈহিক ক্ষমতা শিশু ও নারীর তুলনায় পুরুষের অনেক বেশী।

ইসলাম পুরুষদের উপর নারীদের অধিকার ততটুকুই দিয়েছে, যতটুকু অধিকার পুরুষদের দিয়েছে নারীদের উপর। অর্থাৎ কুরআন ও হাদীস নারী-পুরুষের অধিকারের বেলায় পরস্পরের মধ্যে কোনো পার্থক্য করেনি। কিন্তু একটি বিষয়ে স্ত্রীর উপর দিয়েছে স্বামীর প্রাধান্য। আর তা হচ্ছে পরিবারে স্বামী হবে স্ত্রীর অভিভাবক, তত্ত্বাবধায়ক ও দায়িত্বশীল। তবে আল কুরআন এ বিষয়ে সুস্পষ্ট করে ঘোষণা করেছে যে, এ অভিভাবকত্ব স্বৈরাচারমূলকভাবে প্রয়োগ করার অধিকার স্বামীর নেই। বরং এ অভিভাবকত্ব হবে শরীয়াতের বিধি-বিধান ও পারস্পরিক পরামর্শের নীতিমালার অধীন। স্বামী নিজের খেয়াল-খুশী মাফিক যা ইচ্ছা তাই করতে পারবে না। বরং তাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে ঃ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ "স্ত্রীদের সাথে সমীচীন পন্থায় উত্তম আচরণের সাথে জীবন যাপন কর।" তেমনি আরেকটি আয়াতে বলা হয়েছে ঃ عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ অর্থাৎ পরিবারিক ও সাংসারিক কাজকর্ম স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সন্তুষ্টি ও পরামর্শের ভিত্তিতে আনজাম দেবে। কাজেই স্বামীর অভিভাবকত্ব জনিত প্রাধান্য স্ত্রীর জন্য কোনো প্রকার ক্ষোভ বা অসন্তুষ্টির কারণ হতে পারে না। বরং স্বামীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেয়ে তার দায়িত্ব পালন করার প্রতি অধিক জোর দেয়া হয়েছে।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমার সর্বোত্তম স্ত্রী হবে সে যাকে তুমি দেখলে তোমার মন তৃপ্ত হবে, তাকে কোনো কাজের আদেশ করলে সে তা মেনে চলবে, আর তোমার অনুপস্থিতিতে সে তোমার সম্পদের ও তার নিজের হেফাজত করবে।

স্বামীর আনুগত্য করা স্ত্রীর কর্তব্য, কিন্তু রাব্বুল আলামীন আল্লাহর দাসত্বের গুরুত্ব অনেক বেশী। সুতরাং কোনো স্বামী যদি তার স্ত্রীকে আল্লাহর নাফরমানীমূলক কোনো কাজের আদেশ করে অথবা নির্ধারিত ফরয পালনে বাধার সৃষ্টি করে, তবে স্বামীর সেই হুকুম পালন করতে অস্বীকার করা স্ত্রীর কর্তব্য। আল্লাহর কোনো নাফরমান অবাধ্য স্বামী যদি স্ত্রীকেও আল্লাহর নাফরমানী ও অবাধ্যতার কাজের প্রতি বাধ্য করে, তবে তাকে অমান্য করা স্ত্রীর ঈমানী দায়িত্ব। তখন যদি সে স্বামীর হুকুম পালন করে তবে সে গুনাহগার হবে। অবশ্য স্বামী কখনো কোনো নফল নামায-রোযা না করতে বললে, তা মেনে চলা স্ত্রীর কর্তব্য।

وَالّٰتِىْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ج فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلاًo (النساء : ٣٤)

"আর যেসব নারীর মধ্যে অবাধ্যতার আশংকা কর ; তাদের উপদেশ দাও, তাদের শয্যা ত্যাগ কর, তাদের (মৃদু) প্রহার কর। তারপর যদি তারা তোমাদের আনুগত্য করে তবে তাদের বিরুদ্ধে কোনো অজুহাত তালাশ করবে না।"–(সূরা আন নিসা ঃ ৩৪)

অবাধ্য স্ত্রীকে সংশোধন করে নেয়ার নির্দেশ

যদি কখনো কোনো স্ত্রী থেকে অবাধ্যতা দেখা যায়, তবে তাকে সংশোধনের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং সে জন্যে এ আয়াতে তিনটি পর্যায় বর্ণিত হয়েছে। প্রথমত, তাকে স্বাভাবিকভাবে নরম সুরে উপদেশ সহকারে বুঝাতে থাকবে। যাতে করে সে তার ভুল, দোষ-ত্রুটি বুঝে উঠতে সক্ষম হয়। যদি এতে সে সংশোধিত না হয়ে তার পূর্বের অবস্থায় থেকে যায় বা দোষ থেকে বিরত না হয়, তবে দ্বিতীয় পর্যায়ে তার থেকে পৃথক হয়ে রাত্রি যাপন করবে। এখানে বিছানা পৃথক করে দেয়ার নিয়ম বলে দেয়া হয়েছে—পৃথক ঘরে রাত যাপনের কথা বলা হয়নি। বিছানা পৃথক করে দিলে সে স্বামীর অসন্তুষ্টি উপলব্ধি করতে পেরে নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হতে পারে। ঘর পৃথক করে দিলে যেমন তার মনে অধিক দুঃখ ও আঘাত লাগতে পারে। তেমনি কোনো অঘটনও ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে অধিক।

একজন সাহাবী বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, আমাদের উপর আমাদের স্ত্রীদের হক কি ? তিনি বললেন, তোমরা খেলে তাকেও খাওয়াবে, তুমি পরিধান করলে তাকেও পরতে দেবে, তার চেহারায় মারবে না। তার বদনাম করবে না, আর তার থেকে পৃথক থাকবে না, তবে একই ঘরে পৃথক থাকতে পার। বস্তুত যদি এত ভদ্রোজনোচিত শাসন এবং শাস্তিতেও সে সংশোধিত না হয়, তবে তাকে মৃদু প্রহার করার অনুমতি আছে। কিন্তু তার মুখের উপর মারা সম্পূর্ণভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

প্রথম দু'টো পর্যায়ের সংশোধনী একান্তই ভদ্রজনোচিত, তাই সে ব্যাপারে নবী-রাসূল বুযুর্গ-মনীষীগণের মৌখিক অনুমতি রয়েছে এবং বাস্তবেও তা করে প্রমাণিত করেছেন। কিন্তু তৃতীয় পর্যায়ের সংশোধন পদ্ধতির অনুমতি থাকলেও সে সম্পর্কে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। হাদীসে বলা হয়েছে ঃ وَمَنْ لَّمْ تَضْرِبْ خِيَارُكُمْ "আর তোমাদের যারা স্ত্রীকে মারবে না তারা উত্তম লোক। নবী রাসূলদের থেকে এ ধরনের কাজ সংঘটিত হওয়ার কোনো প্রমাণ নেই।"

এ অবাধ্যতার ধরন ও মাত্রা সম্পর্কে স্বামীকে অবশ্যই সচেতনতা ও সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। সাধারণ মতপার্থক্যকে কেন্দ্র করে এমনটি হওয়া অনভিপ্রেত ও অসংগত। পক্ষান্তরে, আল্লাহর নাফরমান কোনো স্বামী যদি স্ত্রীর দীনি কাজ-কর্ম ও শরীয়তী আমল সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করে, তবে তার আনুগত্য করা স্ত্রীর জন্য আবশ্যকীয় নয়। বিশেষত কোনো ফরয কাজে বাধা দিলে তা অমান্য করাই হবে স্ত্রীর কর্তব্য। বস্তুত দাম্পত্য জীবনেও তেমনি সহনশীলতা দরকার, যেমন তা প্রয়োজন সামাজিক জীবনে। আয়াতের শেষাংশে সাবধান করে দেয়া হয়েছে যে, যদি এ তিনটি পর্যায়ের যে কোনো অবস্থায় বা পর্যায়ে যদি তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের মানতে আরম্ভ করে দেয়, তবে তোমরা আর বাড়াবাড়ী করতে যাবে না, বরং অতীত পর্যালোচনা ছেড়ে দিয়ে তাদের সাথে স্বাভাবিক আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহার করবে। স্ত্রীরা নমনীয়তা প্রদর্শন করার পরেও কথায় কথায় তাদের দোষ-ত্রুটির পথ খুঁজতে যাবে না, তাদের দোষ ধরে বেড়াবে না। জেনে রেখ, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নারীদের উপর কোনো উচ্চ মর্যাদা দান করেননি, আল্লাহর মহত্ব ও ক্ষমতা তোমাদের উপরও বিরাজিত, তোমরা অযথা বাড়াবাড়ী করলে তার শাস্তি তোমাদেরকেও ভোগ করতে হবে।

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সংশোধনী মনোভাবাপন্ন নারী-পুরুষ তথা স্বামী-স্ত্রীর সুন্দর সুষ্ঠু দাম্পত্য জীবনের এক চমৎকার ব্যবস্থা দিয়েছেন। এতে করে পরিবারের বিষয়টি ঘরের মধ্যে পরস্পরের সমঝোতায় একটা অনুকূল ও সুন্দর পরিবেশ গড়ে উঠতে পারে। স্বামী-স্ত্রী—দু'জনের বিবাদ-বিসংবাদ, ভুল বুঝাবুঝি তাদের দু'জনের মধ্যেই মীমাংসা হয়ে যেতে পারে। তৃতীয় কোনো লোকের মধ্যস্থতার আবশ্যক হয় না। নিজেদের কথা বাইরের কেউ জানতেও পারে না। ফলে উভয়ের পারস্পরিক গোপনীয়তা, মানসম্ভ্রম ও সামাজিক মর্যাদাও অক্ষুণ্ন থাকে।

বায়ান্ন

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا ج اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا ○

"আর যদি তোমরা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কচ্ছেদ হওয়ার মত পরিস্থিতির আশংকা কর তবে স্বামীর আত্মীয়-স্বজন থেকে একজন আর স্ত্রীর আত্মীয় স্বজন থেকে একজন সালিস নিযুক্ত কর। তারা দু'জনই সংশোধন ও মিটমাট চাইলে আল্লাহ তাদের তাওফীক দিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু জানেন, সবকিছুর খবর রাখেন।"–(সূরা আন নিসা ঃ ৩৫)

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কচ্ছেদের আশংকায় সালিসের মাধ্যমে মীমাংসার নির্দেশ

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার মনোমালিন্য পরস্পরের মধ্যেই মীমাংসা হয়ে যাওয়া উভয়ের জন্য মঙ্গলজনক। কিন্তু আল্লাহ না করুন যদি অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, এখন আর দু'জনের মধ্যে ঘরোয়াভাবে মীমাংসিত হওয়ার মত অবস্থায় থাকলো না বরং তা ঘরের বাইরে নিয়ে যাওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে, তখনো বিষয়টি অন্ততঃ আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে সীমিত রেখে তাদের মাধ্যমেই বিবাদ মীমাংসার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতে স্বামী-স্ত্রীর আত্মীয়-স্বজন, মুসলমানদের জামায়াত ও সরকারী প্রশাসনকে সম্বোধন করে এমন এক পূত-পবিত্র পন্থা বলে দেয়া হয়েছে যাতে করে উভয় পক্ষের উত্তেজনা প্রশমিত হয়ে যেতে পারে এবং সেই সাথে পরস্পরের অপবাদ আরোপের পথ বন্ধ হয়ে আপোষ মীমাংসার পথ বেরিয়ে আসতে পারে। তাছাড়া ঘরের বিবাদ ঘরে মীমাংসা হতে না পারলেও তা যেন পরিবারের মধ্যেই সমাধা হয়ে যায়—আদালতে মামলা রুজু করার ফলে বিষয়টি যেন হাট-বাজারে বিস্তার লাভ করতে না পারে। সমাজে যেন ঘটনাটি ছড়িয়ে না পড়ে।

আর তার পদ্ধতি হলো, সরকার উভয় পক্ষের মুরব্বী-অভিভাবক অথবা মুসলমানদের কোনো শক্তিশালী জামায়াত বা সংস্থা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আপোষ করিয়ে দেয়ার বা ফায়সালায় পৌঁছে দেয়ার জন্য দু'জন সালিস ঠিক করে

দেবেন। একজন স্বামীর পরিবার থেকে, একজন স্ত্রীর পরিবার থেকে। এখানে সালিস অর্থে 'হাকাম' শব্দ প্রয়োগ করে কুরআন নির্বাচিত সালিসদ্বয়ের প্রয়োজনীয় গুণবৈশিষ্ট্যও বর্ণনা করেছে। তাহলো সালিসদ্বয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়ার যোগ্যতা ও গুণ থাকতে হবে। আর এ গুণটি তো এমন ব্যক্তির মধ্যেই থাকতে পারে যিনি হবেন বিজ্ঞ এবং তৎ সংগে বিশ্বস্ত ও দিয়ানতদার।

আয়াতে উভয় পক্ষের সালিস নির্ধারণের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু তারা কি কি কাজ করবেন, তারা কোন্ পদ্ধতি প্রয়োগে মীমাংসায় পৌঁছবেন, আয়াতে সে কথা বলে দেয়া হয়নি। অবশ্য এ প্রসংগে বলা হয়েছে ঃ

اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ط

অর্থাৎ "তারা উভয়ে যদি সমস্যার সমাধান চায়, তাদের পরস্পরের মধ্যে সমঝোতার মনোভাব থাকে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাদের কাজে সহায়তা করবেন আর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সদ্ভাব সৃষ্টি করে দেবেন।"

–(মাআরেফুল কুরআন)

আয়াতে তারা উভয় মানে দু'জন সালিস অথবা স্বামী-স্ত্রী—দু'টোর একটা অথবা দু'টোই হতে পারে। প্রত্যেক বিবাদেরই একটা মীমাংসা হওয়া সম্ভব, কিন্তু শর্ত হলো উভয় পক্ষকে অবশ্যই সন্ধি প্রিয় হতে হবে, আর যারা সালিস করে বা মধ্যস্থ হয় তাদেরও আন্তরিকতা সহকারে যে কোনোভাবে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সমঝোতা করিয়ে দেয়ার মানসিকতা ও সর্বাত্মক চেষ্টা থাকতে হবে।

মীমাংসার পন্থা সম্পর্কে তাফহীমুল কুরআনে বলা হয়েছে এভাবে যে, স্বামী ও স্ত্রীর পরিবারের এক একজন লোক একত্রিত হবে এবং অনৈক্যের মূল কারণ অনুসন্ধান করে সম্মিলিতভাবে চিন্তা করে উভয়ের মধ্যে মিল সৃষ্টির পথ খুঁজে বের করবে। কিন্তু এ পঞ্চায়েত বা সালিস নিযুক্তির কাজ কে করবে—এ প্রশ্নের জবাব আল্লাহ তা'আলা এখানে অস্পষ্টই রেখেছেন। তাই স্বামী-স্ত্রীই ইচ্ছা করলে নিজ নিজ আত্মীয়-স্বজনের মধ্য থেকে এক একজন লোক নিজেদের অনৈক্য মীমাংসার জন্য নিযুক্ত করবে। তা না হলে উভয় পরিবারের মুরব্বীগণ হস্তক্ষেপ করে পঞ্চায়েত নিযুক্ত করবে। আর আদালত পর্যন্ত মোকদ্দমা দায়ের হলে আদালত নিজেই কোনো সিদ্ধান্ত করার পূর্বে পারিবারিক পর্যায়ে পঞ্চায়েত নিযুক্ত করে মীমাংসার চেষ্টা করবে।

সালিসের ক্ষমতা-ইখতিয়ার কতটুকু থাকবে—এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। ফিক্হবিদের একদলের মত হলো, সালিসগণ চূড়ান্ত ফায়সালা করতে পারবে না, মীমাংসার যে পন্থা কার্যকরী হতে পারে বলে তারা মনে করবেন,

তারা কেবল তার সুপারিশ করতে পারবে মাত্র ; তা মেনে নেয়া বা না নেয়া দম্পতির মর্জির উপর নির্ভর করবে। কিন্তু দম্পতি যদি তালাক, খোলা অথবা অন্য কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে ফায়সালা করার জন্য তাদেরকে নিজেদের উকিল নিযুক্ত করে, তবে তাদের ফায়সালা মেনে নেয়া দম্পতির উপর ওয়াজিব হবে। এটা হানাফি ও শাফেয়ী মাযহাবের আলেমদের মত। অন্য ফকীহদের মতে উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানোর অধিকার তাদের নেই। হাসান বসরী, কাতাদাহ প্রমুখ একথাই বলেছেন। ফকীহদের আরেক দলের মতে দম্পতির মধ্যে মিলন কিংবা বিচ্ছেদ ঘটানোর পূর্ণ ইখতিয়ার সালিসদের রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) সাঈদ ইবনে যুবাইর, ইবরাহীম নখয়ী, শাবী, মুহাম্মদ ইবনে সীরীন এবং অন্যান্য ফকীহগণ এ মত ব্যক্ত করেছেন।–(তাফহীমুল কুরআন)

হযরত ওসমান (রা) ও হযরত আলী (রা) বিভিন্ন ফয়সালার যেসব নজীর আমাদের সম্মুখে রয়েছে, তা থেকে জানা যায় যে, তাঁরা দু'জনই সালিস নিযুক্ত করে আদালতের পক্ষ থেকে সালিসদের রাজকীয় ক্ষমতা দান করতেন। হযরত আকীল ইবনে আবু তালিব এবং তাঁর স্ত্রী ফাতিমা বিনতে উতবা ইবনে রাবিয়ার মোকদ্দমা যখন হযরত ওসমান (রা)-এর আদালতে পেশ করা হলো, তখন তিনি স্বামীর পরিবার থেকে হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-কে, স্ত্রীর পরিবার থেকে হযরত মুআবিয়া (রা) ইবনে আবি সুফিয়ান (রা)-কে সালিস নিযুক্ত করলেন, আর তাদের বললেন ঃ আপনারা দু'জনই যদি এদের মধ্যে বিচ্ছেদ করে দেয়া যুক্তিযুক্ত মনে করেন, তবে তাই করে দেবেন। তাছাড়া হযরত আলী (রা)ও একটি মোকদ্দমায় সালিস নিযুক্ত করে তাকে বলেছিলেন ঃ হয় মিলন, না হয় বিচ্ছেদ—দু'টির একটি করে দিন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, সালিস নিজে কোনো আদালতী ক্ষমতার মালিক নয়, তবে আদালত যদি সালিস নিযুক্ত করার সময় তাদের এখতিয়ার দেয় তবে তাদের ফায়সালা আদালতের ফায়সালার ন্যায়ই কার্যকর হবে।–(তাফহীমুল কুরআন)

হযরত আলী (রা)-এর সময়কার একটি ঘটনা সুনানে বায়হাকী গ্রন্থে হযরত ওবায়দা সালমানীর রেওয়ায়েত ক্রমে বর্ণিত হয়েছে যে, একজন পুরুষ ও একজন মহিলা হযরত আলী (রা)-এর খেদমতে হাজির হলো। তাদের উভয়ের সাথে ছিল বহু লোকের এক এক দল। হযরত আলী (রা)-এর নির্দেশে পুরুষের পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন হাকাম বা সালিস নির্ধারণ করা হলো। তাদের সম্বোধন করে হযরত আলী (রা) বললেন, তোমরা কি তোমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে জান ? আর তোমাদের কি করতে হবে তা কি তোমরা অবগত ? শোন, তোমরা যদি এ স্বামী-স্ত্রীকে একত্রে রাখার ব্যাপারেও তাদের পারস্পরিক আপোষ করে দেয়ার ব্যাপারে একমত হতে পার,

তবে তাই কর। পক্ষান্তরে তোমরা যদি মনে কর যে তাদের মধ্যে আপোষ মীমাংসা করা সম্ভব নয় ; কিংবা তা করে দিলে শেষ পর্যন্ত টিকে থাকবে না এবং তোমরা উভয়েই একমত হয়ে তাদের পৃথক করে দেয়া ভাল মনে কর—এতেই মঙ্গল বিবেচনা কর, তবে তাই করবে। একথা শুনে মহিলাটি বললো, আমি একথা মেনে নিলাম। উভয় সালিস আল্লাহর আইন অনুসারে যে ফায়সালা করবে—তা আমার মতের পক্ষে হোক অথবা বিরোধী হোক, আমি তাই মেনে নেব। কিন্তু পুরুষটি বললো, পৃথক হয়ে যাওয়া বা তালাক হয়ে যাওয়া আমি কোনোক্রমেই সহ্য করবো না। অবশ্য সালিসদের এ অধিকার দিচ্ছি যে, তারা আমার উপর যে কোনো রকম আর্থিক জরিমানা আরোপ করে তাকে (স্ত্রীকে) সম্মত করিয়ে দিতে পারে।

হযরত আলী (রা) বললেন, তা হয় না। তোমারও সালিসদের তেমনি ক্ষমতা দেয়া উচিত। যেমন স্ত্রী দিয়েছে।

এ ঘটনা থেকে কোনো কোনো মুজতাহিদ ইমাম নিয়ম উদ্ভাবন করেছেন যে, সালিসদের এখতিয়ার সম্পন্ন হওয়া উচিত। যেমন হযরত আলী স্বামী স্ত্রীকে বলে সালিসদের ক্ষমতা সম্পন্ন করেছেন। কিন্তু ইমাম আযম হযরত আবু হানিফা (রা) ও হযরত হাসান বসরী (র) সাব্যস্ত করেছেন যে, উল্লিখিত সালিসদের যদি ক্ষমতা সম্পন্ন হওয়াই অপরিহার্য হতো, তবে হযরত আলী কর্তৃক উভয় পক্ষের (স্বামী-স্ত্রীর) সম্মতিলাভের চেষ্টা করার কোনো প্রয়োজনীয়তাই ছিল না। সুতরাং উভয়ের সম্মতি আদায়ের চেষ্টাই প্রমাণ করে যে, প্রকৃতপক্ষে এ সালিসদ্বয় ক্ষমতাসম্পন্ন নয়। অবশ্য স্বামী-স্ত্রী যদি অধিকার বা ক্ষমতা দেয়, তবে তারা ক্ষমতা সম্পন্ন হয়ে যাবে।

কুরআনুল কারীমের এ শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের পারিবারিক বিবাদ বিসম্বাদ মীমাংসার ক্ষেত্রে অতি চমৎকার এক নতুন পথের উন্মোচন হয়েছে। যে পথে মামলা মোকদ্দমা আদালতে যাবার পূর্বেই পারিবারিক কিংবা সামাজিক পঞ্চায়েতের মাধ্যমে মীমাংসা করা যেতে পারে।–(মা'আরেফুল কুরআন)

তিপ্পান্ন

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا ○ (النساء : ١٢٤)

"যে ব্যক্তি কোনো সৎকাজ করে সে পুরুষ হোক বা নারী হোক, সে ঈমানদার হয়ে থাকলে, এরূপ লোকেরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে ; তাদের প্রতি তিল পরিমাণও যুল্‌ম করা হবে না।"–(সূরা আন নিসা ঃ ১২৪)

ঈমান ও আমলের পুরস্কার প্রাপ্তিতে নারী-পুরুষের কোনো পার্থক্য নেই

যে ব্যক্তি যথাযথভাবে ঈমান রাখে আর কুরআন নির্দেশিত পথে থেকে দুনিয়ার জীবন অতিবাহিত করে, সে জান্নাত লাভ করবে। তার ঈমান ও আমলের প্রতিদান প্রদানে তিল পরিমাণও যুল্‌ম করা হবে না। চাই সে ব্যক্তি পুরুষ হোক অথবা হোক মহিলা। সে কুরআন ছাড়া অন্য কোনো আসমানী কিতাবের আহল হলেও। অর্থাৎ যে যাই থাকুক না কেন যদি সে শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান রাখে আর ঈমান রাখে যাবতীয় বিশ্বাস্য বিষয়ের প্রতি এবং আমল করে তদানুযায়ী। তবে তো সে হলো মসুলিম, আর তার ঈমানের ও আমলের পুরস্কারও সে পাবে পুরোপুরি। পূর্বে অন্য কিতাবধারী বা ধর্মাবলম্বী হওয়ার কারণে অথবা বর্তমানে নর বা নারী হওয়ার কারণে কারো ঈমান ও আমলের পুরস্কারে কোনো প্রকার তারতম্য করা হবে না। দুনিয়ার নিযাম বা শৃংখলা রক্ষার জন্য মানুষ নারী-পুরুষে বিভক্ত হলেও ঈমান ও আমলের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে কোনো প্রকার পার্থক্য করা হবে না।

মানুষ নারী ও পুরুষ হওয়ার কারণে দৈহিক-মানসিক শক্তিতেও তারতম্যের অধিকারী হয়েছে। প্রকৃতিগতভাবেই নর-নারীর এ পার্থক্য রয়েছে, আর সেভাবেই তাদের মধ্যে ইসলামী জীবন বিধানে দায়িত্ব বণ্টন ও কর্তব্য কাজের সীমারেখা সূচিত হয়েছে। মূলত এ তারতম্য তাদের কাউকেও অধিক সম্মানী আর কাউকেও স্বল্প সম্মানী হওয়ার ব্যাপারে পার্থক্য নিরুপণ করে না।

সূরা আল আহযাবের ৩৫ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمٰتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْقٰنِتٰتِ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالصّٰدِقٰتِ وَالصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰبِرٰتِ وَالْخٰشِعِيْنَ وَالْخٰشِعٰتِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقٰتِ وَالصّٰئِمِيْنَ وَالصّٰئِمٰتِ وَالْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحٰفِظٰتِ وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرٰتِ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا ○ (الحزاب : ٣٥)

"নিশ্চয় মুসলমান পুরুষ, মুসলমান নারী, ঈমানদার পুরুষ, ঈমানদার নারী, অনুগত পুরুষ, অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ, সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ, ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ, বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ, দানশীল নারী, রোযা পালনকারী পুরুষ, রোযা পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হেফাজতকারী পুরুষ, যৌনাঙ্গ হেফাজতকারী নারী, আল্লাহর অধিক যিক্‌রকারী পুরুষ যিকরকারী নারী—এদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহা পুরস্কার।"–(সূরা আল আহযাব ঃ ৩৫)

কুরআন শরীফের যাবতীয় আহকাম নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য প্রযোজ্য হলেও বিভিন্ন আয়াতে মানুষকে সম্বোধন করা হয়েছে পুরুষ বাচক শব্দ দিয়ে, আর নারীকে ধরা হয়েছে পুরুষ বাচক শব্দেরই মাধ্যমে। মুফতী মুহাম্মদ শফী (র)-এর মতে এতে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, নারীদের সকল বিষয় থাকবে গোপনীয়, আর এর মধ্যেই তাদের প্রকৃত মর্যাদা নিহিত রয়েছে। কুরআনুল কারীমে দেখা যায় যে, হযরত মারইয়াম ছাড়া অন্য কোনো মাহিলার নাম কুরআনে উল্লেখ করা হয়নি। যেখানে কোনো নারী বিশেষের কথা এসেছে সেখানে সংশ্লিষ্ট পুরুষের সাথে সম্পর্ক সূচক শব্দে তাদের উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন امرأة نوح ও امرأة فرعون ইত্যাদি। হযরত মারইয়াম (আ)-এর নাম উল্লেখের কারণও ছিল এই যে, হযরত ঈসা (আ)-এর পিতা না থাকায় মাতার নামের সাথে তাঁর সম্পর্ক স্থাপন করার কোনো বিকল্প ছিল না। বাকী আল্লাহই ভাল জানেন।

কুরআনুল কারীমের এ প্রকাশভংগী যদিও এক বিশেষ প্রজ্ঞা, যৌক্তিকতা ও মঙ্গলের ভিত্তিতেই অনুসৃত হয়েছিলো, তবুও আল্লাহর গোপন রহস্য মানুষের বোধগম্যের বাইরে বিধায় এ কারণে নারীগণের মধ্যে হীনমন্যতার উদ্রেক

হওয়া ছিল একান্ত স্বাভাবিক। তাই হাদীসের বিভিন্ন রেওয়ায়াত মতে নারীগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে আরয করলো যে, আল্লাহ পাক কুরআনে মানুষকে সম্বোধন করতে গিয়ে কেবল পুরুষ বাচক শব্দ ব্যবহার করেছেন। এতে বুঝা যায় আমাদের (নারীদের) মধ্যে কোনো কল্যাণ বা পুন্য নেই—আর সে জন্য আমাদের ইবাদাতও কবুল হয় না। ইমাম বাগবীর রেওয়ায়াত অনুযায়ী প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়েছিল পুন্যবতী নারীগণের পক্ষ থেকে। তিরমিযি শরীফে হযরত উম্মে আম্মারা থেকে, কোনো কোনো বর্ণনা মতে হযরত আসমা বিনতে উমায়েস থেকেও এ ধরনের প্রশ্ন উত্থাপনের কথা বর্ণিত আছে। জবাবে সূরা আহযাবের ৩৫নং আয়াত নাযিল হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, যেসব ঈমানদার লোক ভাল কাজ করবে তাদের জন্য আল্লাহ পাক ক্ষমা ও মহা প্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন। পুরুষ বা নারী হওয়ার কারণে কোনো মানুষের ঈমান ও আমলের ফলাফলের মধ্যে কোনো প্রকার তারতম্য বা বেশকম করা হবে না। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক জ্ঞাত।–(মা'আফেল কুরআন)

দুনিয়াতে মীরাস বন্টনে কিছুটা পার্থক্য থাকার দায়িত্ব ও দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রের ব্যাপারে তারতম্য থাকা ইত্যাদি সর্বজ্ঞ ও মহাকৌশলী রাব্বুল আলামীনের সেই হেকমতেরই অন্তর্ভুক্ত—যে কারণে তিনি নারী-পুরুষকে গঠন প্রকৃতিতেও পার্থক্য করেছেন। নারীগণ দৈহিক গঠনে যেমন পুরুষের চেয়ে ভিন্ন রকমের, তেমনি তারা মন-মানসিকতার ব্যাপারেও স্বতন্ত্র ধরনের। নারী হওয়ার কারণে পুরুষদের থেকে তাদের যে দৈহিক পার্থক্য রয়েছে, তাছাড়াও প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেও রয়েছে বিরাট পার্থক্য। শরীরতত্ত্ববিদদের দৃষ্টিতে নারী-পুরুষের যেসব অংগ-প্রত্যঙ্গ বাহ্যত একই রকম মনে হয় ; প্রকৃতপক্ষে সেসব অংগ-প্রত্যঙ্গেও নারীরা পুরুষদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। বস্তুত এসব কিছু দুনিয়ার নিযাম ও শৃংখলা বিধানের জন্যই এভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই বলে সে কারণে নর ও নারীর ঈমান-আমল তথা বিশ্বাস ও কর্ম ফলের ব্যাপারে কোনোই পার্থক্য করা হবে না। নর বা নারী হওয়ার কারণে কারো কর্মফলে তিল পরিমাণও পার্থক্য করা হবে না।

وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ ۙ وَمَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتٰبِ فِيْ يَتٰمَى النِّسَاءِ الّٰتِيْ لَا تُؤْتُوْنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْوِلْدَانِ ۙ وَاَنْ تَقُوْمُوْا لِلْيَتٰمٰى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهٖ عَلِيْمًا ۝ (النساء : ١٢٧)

"লোকেরা তোমাকে বিধান জিজ্ঞেস করছে। বল, আল্লাহ তাদের ইয়াতীম মহিলাদের বিষয়ে বিধান দিচ্ছেন। আর কুরআনে তোমাদের যা যা তিলাওয়াত করে শুনানো হয় ঐসব পিতৃহীনা নারীদের বিধান যাদেরকে তোমরা নির্ধারিত অধিকার দাও না অথচ তাদের বিবাহ করতে আগ্রহ রাখ, আর অক্ষম শিশুদের বিধান। আল্লাহ আরও বিধান দিচ্ছেন যে, তোমরা ইয়াতীমদের প্রতি ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার করবে।"

–(সূরা আন নিসা ঃ ১২৭)

ইয়াতীম মেয়ে ও ইয়াতীম শিশুদের হক সংরক্ষণে তাকীদ

এ সূরার শুরুতে ইয়াতীম ও নারীদের অধিকার ও হক সম্পর্কে বিশেষ বিধান দিয়ে তা আদায় করার প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কারণ, জাহেলী যুগে অনেকে তাদের মীরাস দিতো না, কেউ তাদের মীরাস সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ ও সম্পত্তি বেমালুম হজম করে ফেলতো, আর কেউ কেউ তাদের বিয়ে করে পূর্ণ মোহরানা দিতো না। কুরআনে ইতিপূর্বে এহেন গর্হিত কাজ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু কতিপয় লোক মনে করতে লাগলো যে, উপরোক্ত নির্দেশ হয়ত কিছুসংখ্যক লোককে সাময়িকভাবে দেয়া হয়েছিল, শেষ পর্যন্ত ঐ বিধান রহিত হয়ে যাবে। অনেকে ইয়াতীম মেয়েদের সম্পর্কিত উক্ত বিধান রহিত হওয়ার অপেক্ষায় দিন গুণতে থাকে। অবশেষে যখন তা রহিত হলো না, তখন তারা পরামর্শ করে স্থির করলো যে, এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হবে। সে মতে তারা রাসূলের কাছে গিয়ে এ বিষয়ে প্রশ্ন করতে শুরু করলো। তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআনে উল্লেখ করা

হয়েছে যে, ইবনে জারীর ও ইবনুল মুনযিরের বর্ণনা অনুযায়ী এ প্রশ্নই হচ্ছে আয়াতটি নাযিল হওয়ার কারণ।

ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করেছেন, হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ যেসব ইয়াতীম বালিকা সম্পদের মালিক হলেও সুন্দরী ছিলো না, তাদের (গায়র মুহরম) অভিভাবক তাদের রূপহীনতার কারণে তাদের বিবাহ করতে চাইতো না। অথচ তার সম্পদের লোভে অন্যের কাছেও বিবাহ দিতো না। এভাবে তারা অসহায় বালিকার বিবাহ ঠেকিয়ে রাখতো। এ জাতীয় লোকদের সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে আলী ইবনে আবি তালহা এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, জাহেলী যুগে কারো অভিভাবকত্বে ইয়াতীম বালিকা থাকলে সে তার গায়ে নিজের কাপড় রেখে দিতো। এরূপ করার কারণে সেই বালিকাকে আর কেউ কখনো বিবাহ করতে পারতো না। বালিকাটি রূপসী হলে সে নিজেই তাকে বিবাহ করতো, আর এভাবেই তার সম্পদ আত্মসাত করে নিতো। আর বালিকাটি রূপসী না হলে সে নিজে তো তাকে বিবাহ করতো না, অন্যকেও বিবাহ করার সুযোগ দিতো না। এভাবে সে তার মৃত্যুর পর তার সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করতো। এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি এরূপ অত্যাচার করতে তাদের নিষেধ করেছেন।

জাহেলী যুগে এভাবে অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান ও কন্যা সন্তানকে তাদের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হতো। উপরিউক্ত আয়াতে তাদের প্রতি যুল্ম থেকে বিরত থাকার জন্যও বলা হয়েছে।

আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ তা'আলা ইয়াতীমদের প্রতি ইনসাফপূর্ণ ব্যবহারের যে নির্দেশ দিয়েছেন, তার তাৎপর্য হযরত সাঈদ ইবনে যুবাইর (রা) এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, ইয়াতীম বালিকা রূপসী ও ধনবতী হলে তোমরা যেমন তাদের বিবাহ করতে আগ্রহী হও, তারা রূপহীনা আর নির্ধন হলেও ঠিক তেমনি তাদের বিবাহ করবে।–(ইবনে কাসীর)

পৃথিবীতে অনেক সময় মানুষ মারা যায়, আর তাদের ছেলে-মেয়েরা হয়ে পড়ে অভিভাবকহীন অসহায়। দুনিয়ার মানুষ ধন-সম্পদের প্রতি এতই লোভী হয়ে আছে যে, তারা যদি এরূপ পিতা-মাতা হারা কোনো ইয়াতীম সন্তানের অভিভাবক হয়ে থাকে, তবে এসব ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাতে মেতে উঠে।

তারা একটুও চিন্তা করে না যে, তার সন্তানদেরও এমনি অবস্থা হতে পারে। পরের সন্তানের অসহায়তার প্রতি তারা দয়াদ্র না হয়ে বরং সুযোগ সন্ধানী মনোভাবাপন্ন হয়ে উঠে। ঈমানদারগণ কখনো এমন পাষণ্ড হতে পারে না। সকল আশ্রয়হীনের আশ্রয় হলেন আল্লাহ তা'আলা ; সকল অসহায়ের সহায় হলেন আল্লাহ তা'আলা। কাজেই যে ব্যক্তি ইয়াতীম—অসহায়কে আশ্রয় দিল সে যেন আল্লাহর পক্ষে দায়িত্ব পালন করলো, যেন আল্লাহর কাজে সহযোগিতা করলো।

আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে এরূপ ভাল কাজ করতে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করছেন। তোমাদের সমস্ত ভাল কাজ সম্পর্কে আল্লাহ অবহিত আছেন। তিনি তোমাদের সমস্ত সৎকাজের পুরো পুরস্কার দিয়ে দেবেন।–(ইবনে কাসীর)

কাজেই নিজের শ্রম, সময় ও অর্থ ব্যয় করে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় ত্যাগ স্বীকার করা একজন আন্তরিকতা সম্পন্ন ঈমানদারের কাজ। স্বার্থপর লোকেরাই উপস্থিত লাভের সন্ধানে থাকে। আল্লাহতে অগাধ বিশ্বাস স্থাপনকারী ব্যক্তি বৈষয়িক লাভ ক্ষতির দিকে না তাকিয়ে অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করে থাকেন। আল্লাহর পথে ব্যয় করতে, ইয়াতীম ও অসহায়কে অকাতরে দান করতে যদি কোনো মানুষ নাও জানে, তবুও মহান আল্লাহ তো সবকিছু দেখেন ও জানেন। সুতরাং ভাল কাজের সুফল তিনি অবশ্যই দেবেন।

وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ط وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ ط وَاِنْ تُحْسِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۝(النساء : ١٢٨)

"কোনো স্ত্রী যদি তার স্বামী থেকে দুর্ব্যবহার ও উপেক্ষার আশংকা করে, তবে তারা আপোষ-নিষ্পত্তি করতে চাইলে তাদের কোনো দোষ নেই ; আপোষ নিষ্পত্তিই উত্তম। মানুষ লোভের কারণে স্বভাবতই কৃপণ। আর তোমরা যদি ইহসানকারী ও মুত্তাকী হও, তবে তোমরা যা করো আল্লাহ তার খবর রাখেন।"–(সূরা আন নিসা ঃ ১২৮)

বিচ্ছিন্নতার চেয়ে আপোষ-মীমাংসা উত্তম

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা স্বামী তার স্ত্রী থেকে বীতস্পৃহ ও পরাঙ্খুম হওয়ার অবস্থায় তাদের পালনীয় বিধান বলে দিয়েছেন। কোনো স্ত্রীর ব্যাপারে তার স্বামী বিরাগভাজন বা উপেক্ষার ভাব দেখে যদি স্ত্রী তার প্রাপ্য বা দাবীর আংশিক ছেড়ে দিয়েও ঐ স্বামীর সাথে থাকতে চায় আর স্বামী এ সুযোগ গ্রহণ করে স্ত্রীর প্রস্তাবে সম্মত হয় ; তবে এ ধরনের আপোষ মীমাংসার বিষয়ে-আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়েছে। আয়াতে এ জাতীয় আপোষ-মীমাংসায় শরীয়তের কোনো বাধা নেই। বাহ্যিকভাবে এটা ঘুষের মত মনে হলেও এটা আসলে কোনো গুনাহর কাজ নয়। ঘুষের মত মনে হওয়ার কারণ, এতে স্বামীকে মোহরানা বা অন্যান্য পাওনা থেকে অব্যাহতির প্রলোভন দেখিয়ে দাম্পত্য বন্ধন অটুট রাখা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এতে উভয়ই কিছু কিছু স্বার্থ ত্যাগ করে সমঝোতা ও মধ্যপন্থা অবলম্বন করে মাত্র। সুতরাং এটা সম্পূর্ণ জায়েয।–[মা'আরেফুল কুরআন–মুফতী মুহাম্মদ শফী (র)]

ইমাম বুখারী (র) বলেন, হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, এমনো দেখা যায়, কোনো স্ত্রী বৃদ্ধা হয়ে যাওয়ার কারণে স্বামী তার প্রতি বিরাগ হয়ে তাকে তালাক প্রদান করতে চায়, এতে স্ত্রী স্বামীর কাছে নিজের পাওনা হকের দাবী ত্যাগ করেও তাকে স্বামী হিসাবে বহাল রাখতে চায়। এ ব্যাপারেই আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়েছে।–(ইবনে কাসীর)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, সিমাক ইবনে হারব, সুলাইমান ইবনে মুআয ও আবু দাউদ আত তায়ালেসী বর্ণনা করেন, হযরত সাওদা (রা) আশংকা করেছিলেন যে, নবী করীম (স) তাঁকে তালাক দিতে পারেন। তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ! আমাকে তালাক দিবেন না। আমার সাথে আপনার রাত যাপন বিষয়ক হক আমি আয়েশা (রা)-কে দিচ্ছি। নবী করীম (সা) তাই করলেন। তখন আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হয়।–(ইবনে কাসীর)

একদা জনৈক ব্যক্তি হযরত আলী (রা)-এর কাছে এসে তাঁকে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করলে হযরত আলী (রা) বললেন, কেউ তাঁর স্ত্রীর রূপহীনতা, বার্ধক্য, কর্কশ স্বভাব অথবা অপরিপচ্ছন্নতার কারণে তার প্রতি বীতরাগ ও বীতস্পৃহ হয়ে তাকে তালাক দিতে চাইলে এবং স্ত্রীর কাছে তালাক অনভিপ্রেত ও অনাকাঙ্ক্ষিত হলে স্ত্রী যদি মোহরানার অংশবিশেষের দাবী অথবা স্বামীর কাছে তার রাত্রী যাপনের অংশ বিশেষের দাবী ত্যাগ করে, তবে তা জায়েয ও বৈধ। স্বামীর উক্ত সুবিধা গ্রহণ করায় কোনো দোষ নেই।

–(ইবনে কাসীর)

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ –"আপোষ নিষ্পত্তিই উত্তম।" আয়াতাংশের স্বাভাবিক তাৎপর্য এই যে, স্ত্রীকেই স্বীয় অধিকারের অংশবিশেষ ত্যাগ করা এবং স্বামী কর্তৃক এর বিনিময়ে স্ত্রীকে তালাক প্রদান থেকে বিরত থাকা তাদের বিচ্ছেদ অপেক্ষা অধিকতর শ্রেয়। হযরত সাওদা বিনতে যামআ (রা) কর্তৃক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে প্রাপ্য রাত্রিবাসের অধিকার হযরত আয়েশা (রা)-কে দেয়ার বিনিময়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক তাকে তালাক প্রদান থেকে বিরত থাকার ঘটনা উক্ত আয়াতে বর্ণিত সন্ধির একটি দৃষ্টান্ত। আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মাতের জন্য এ দৃষ্টান্ত স্থাপন করে যান। প্রকৃত কথা এই যে, 'তালাক' আল্লাহর কাছে অনভিপ্রেত বিষয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হালাল কাজসমূহের মধ্যে আল্লাহর কাছে অধিকতর অনভিপ্রেত কাজ হচ্ছে তালাক।

وَإِنْ تُحْسِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا -

"আর তোমরা যদি ইহসানকারী ও মুত্তাকী হও, তবে তোমরা যা কর আল্লাহ তার খবর রাখেন।"–অর্থাৎ তোমাদের অপসন্দনীয় ও অনভিপ্রেত স্ত্রীদের ত্রুটি ও অযোগ্যতা তোমরা সহ্য করে তাদের সাথে বৈষম্যহীন আচরণ

করলে আল্লাহ তোমাদের সে আচরণ ও কাজ সম্পর্কে সম্যক অবগত থাকেন, আর তিনি সে জন্য তোমাদের পূর্ণ পুরস্কার প্রদান করবেন।"–(ইবনে কাসীর)

وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ-

আয়াতাংশের আরেক তরজমা হলো, "নফস স্বভাবতঃ সংকীর্ণতার দিকেই ঝুঁকে পড়ে।" এ অর্থে স্বামী-স্ত্রীর সংকীর্ণতার তাৎপর্য হলো স্ত্রীলোক যদি নিজের মধ্যে স্বামীর চোখে অবাঞ্ছিতা হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে বলে মনে করে, আর তা সত্ত্বেও সে যদি বাঞ্ছিতা স্ত্রীর মত ব্যবহার পাওয়ার প্রত্যাশা করে, তবে এটাই হবে তার সংকীর্ণতা। পক্ষান্তরে যে স্ত্রীলোকটির স্থান স্বামীর মন থেকে মুছে যাওয়ার পরও সে ঐ স্বামীর সাথেই অবস্থান করতে চায়, আর স্বামী যদি এ স্ত্রীকে অত্যধিক কোণঠাসা করতে চায় এবং তার অধিকার চরম-ভাবে হরণ করতে চায়, তবে এটা হবে স্বামীর দিক থেকে সংকীর্ণতা।

–(তাফহীমুল কুরআন)

জাহেলী যুগে এক এক ব্যক্তি সীমা সংখ্যাহীন স্ত্রী গ্রহণ করতে পারতো, এ ব্যাপারে তার ছিল পূর্ণ স্বাধীনতা। অথচ সেই অসংখ্য স্ত্রীদের ছিলো না কোনো নির্দিষ্ট অধিকার। সূরা আন-নিসার প্রাথমিক আয়াতসমূহে এ স্বাধীনতার উপর দু' ধরনের বিধিনিষেধ আরোপ করা হলো। এক ঃ স্ত্রীদের সংখ্যা চার পর্যন্ত সীমাবদ্ধ হয়ে গেল—এর অধিক এক সাথে বিবাহ করা হারাম ঘোষিত হলো। দুই ঃ এ একাধিক স্ত্রী গ্রহণের ব্যাপারেও 'আদল' বা সর্বক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠার শর্ত আরোপ করা হলো। এমতাবস্থায় প্রশ্ন উত্থাপিত হলো, কারো স্ত্রী যদি বন্ধা বা চির রুগ্না হয় অথবা স্বামীর সাথে সম্পর্ক রক্ষা করার যোগ্য না হয়, আর স্বামী যদি দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণে বাধ্য হয়, তখন উভয় স্ত্রীর প্রতি সমান আকর্ষণ রাখা, সমান ভালবাসা পোষণ করা, দৈহিক সম্পর্কের ব্যাপারেও পূর্ণ সমতা রাখা কি তার জন্য অবশ্য কর্তব্য হবে ? আর সে যদি তা না করে তবে দ্বিতীয় বিবাহ করার পূর্বে প্রথমা স্ত্রীকে তালাক দেয়াই কি উপরোক্ত শর্তের দাবী ? অধিকন্তু প্রথম স্ত্রী যদি বিচ্ছিন্ন হতে না চায়, তবে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এমন কোনো সমঝোতা হতে পারে কি, যাতে করে অবাঞ্ছিতা স্ত্রী নিজের কোনো অধিকার ও দাবী ত্যাগ করে স্বামীকে তালাক দেয়া থেকে বিরত রাখবে ? বস্তুত আলোচ্য আয়াতসমূহে এসব প্রশ্নেরই উত্তর দেয়া হয়েছে।

এসব আয়াতে বর্ণিত আল্লাহর নির্দেশাবলীর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা পুরুষদের মধ্যে উদারতার ভাবধারা জাগ্রত করতে চান। আল্লাহ তা'আলা পুরুষকে তার স্ত্রীর প্রতি কোনো আকর্ষণ না থাকলেও স্ত্রীলোকটির সাথে ভাল ব্যবহার ও সদাচরণের আহ্বান জানিয়েছেন। কারণ স্ত্রীলোকটি তো তার সাথে

দীর্ঘ সময় জীবন কাটিয়েছে। বহু বছর পর্যন্ত সে পুরুষটির জীবন সংগিনী হয়ে রয়েছে। সাথে সাথে সেই আল্লাহকে ভয় করে চলার নির্দেশ দিয়েছেন, যিনি কোনো মানুষের দোষ-ত্রুটির কারণে নিজের অনুগ্রহের দৃষ্টি অন্য দিকে ফিরিয়ে নিলে এবং তার ভাগ্যের অংশ হ্রাস করে দিলে এ দুনিয়ায় তার আশ্রয় গ্রহণের দ্বিতীয় কোনো স্থানই অবশিষ্ট থাকে না।–(তাফহীমুল কুরআন)

وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ-

আয়াতাংশের অপর একটি তরজমা হলো, "প্রত্যেক অন্তরেই লোভ বিদ্যমান রয়েছে।" এর তাৎপর্য হলো, স্ত্রী হয়তো মনে করবে যে, আমাকে বিদায় করে দিলে সন্তানাদির জীবন বরবাদ হবে, অথবা অন্যত্র আমার জীবন হয়তো আরো দুর্বিসহ হয়ে পড়বে। তার চেয়ে বরং এখানে কিছু ত্যাগ স্বীকার করে পড়ে থাকাই ভাল। পক্ষান্তরে স্বামী হয়তো মনে করবে যে দায়-দায়িত্ব হতে যখন অনেকটা রেহাই পাওয়া গেল, তখন তাকে বিবাহ বন্ধনে রাখতে ক্ষতি কি ? অতএব এভাবে অনায়াসে সমঝোতা হতে পারে।

–(মা'আরেফুল কুরআন)

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ط وَاِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ○ (النساء : ١٢٩)

"আর তোমরা যতই ইচ্ছা করো না কেন, তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি সমান ব্যবহার কখনোই করতে সক্ষম হবে না। সুতরাং তোমরা একজনের দিকে সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকে পড়ো না, আর অন্যকে ঝুলন্ত অবস্থায় রেখো না। তোমরা যদি নিজেদের সংশোধন করো আর সাবধান হও, তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।"–(সূরা আন নিসা ঃ ১২৯)

এক স্ত্রীর প্রতি ঝুঁকে গিয়ে অন্য স্ত্রীকে ঝুলন্ত রেখো না

আলোচ্য আয়াতে একাধিক স্ত্রীর সাথে বৈষম্যহীন আচরণ সম্পর্কিত একটি বাস্তব অবস্থা ও পরিস্থিতির কথাই ব্যক্ত করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, তোমরা কখনো স্ত্রীদের সাথে বৈষম্যহীন আচরণ বজায় রাখতে সক্ষম হবে না। যদিও স্ত্রীদের মধ্যে সমান আচরণ করতে তোমরা আন্তরিকও হও। কারণ, স্ত্রীদের সাথে রাতযাপনে বা দৈহিক সম্পর্ক স্থাপনে বাহ্যিক সাম্য বজায় রাখা সম্ভব হলেও অন্তরের আকর্ষণ, ভালবাসা ও যৌন মিলনে বৈষম্য ও তারতম্য অবশ্যই থেকে যাবে। এটা হযরত ইবনে আব্বাস (রা), উবায়দা আসলামী, মুজাহিদ ও হাসান বসরী প্রমুখেরও ব্যাখ্যা।

হযরত ইবনে আবু সুলায়কা বলেন, আয়াতটি হযরত আয়েশা (রা) সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। কারণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আয়েশা (রা)-কে অন্য যে কোনো স্ত্রীর চেয়ে বেশী ভালবাসতেন। হযরত আয়েশা (রা) থেকে আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ, আবু কুলাবা, আইউব ও হাম্মাদ ইবনে সালমা প্রমুখ রাবীর সূত্রে ইমাম আহমদ এবং সুনান সংকলকগণ বর্ণনা করেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) নিজ স্ত্রীদের বৈষম্যহীন নীতি অনুসরণ করে চলতেন আর বলতেন, "আয় আল্লাহ যে বিষয়ে আমার ক্ষমতা রয়েছে সে বিষয়ে আমি এরূপ বন্টন করলাম। যে বিষয়ে কেবল তোমরাই ক্ষমতা রয়েছে আমার ক্ষমতা নাই, সে বিষয়ে আমাকে ভর্ৎসনা করো না। তিনি ক্ষমতা বর্হিভূত বিষয় বলতে মনের আকর্ষণকে বুঝিয়েছেন।–(ইবনে কাসীর)

এ আয়াতে فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ অর্থ স্ত্রীলোকটির অবস্থা এমন যে, স্বামী থেকেও না থাকার মত অথচ সে তালাক প্রাপ্তাও নয়। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে লোকের দু'টো স্ত্রী রয়েছে সে যদি এক স্ত্রীর প্রতি সম্পূর্ণ রূপে ঝুঁকে পড়ে থাকে, তবে কিয়ামতের দিন তার শরীরের এক অংশ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় উপস্থিত হবে।–(ইবনে কাসীর)

আলোচ্য আয়াতের ভাবার্থ হলো, মানুষ দুই বা ততোধিক স্ত্রীর মধ্যে পূর্ণ সমতা রাখতে পারে না। কারণ একজন সুন্দরী অপরজন কুশ্রী, একজন যুবতী অন্যজন বয়স্কা, একজন রুগ্ন আরেকজন সাস্থ্যবতী, একজন কঠোর স্বভাবের, অন্যজন মধুর মেজাযের—স্ত্রীদের মধ্যে এরূপ আরো অনেক পার্থক্য থাকতে পারে। যে কারণে একজনের প্রতি স্বভাবতই অধিক আকর্ষণ ও অন্যজনের প্রতি কম আকর্ষণ হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। এমতাবস্থায় প্রেম, ভালবাসা, মনের আকর্ষণ ও দৈহিক সম্পর্কের দিক থেকে উভয়ের সাথে সমতা রক্ষা করে চলতে হবে—আইন এমনটি দাবী করেনি। বরং আইনের দাবী হলো আকর্ষণের তারতম্য থাকা সত্ত্বেও যখন তুমি একটা স্ত্রীকে তালাক দাওনি এবং তাকে তোমার নিজের ইচ্ছায় অথবা তার বাসনায় এখনো স্ত্রী হিসেবেই রেখেছ। তখন তার সাথে এতটুকু সম্পর্ক অবশ্যই রাখতে হবে যাতে করে সে স্বামীহীনার মত হয়ে না পড়ে। উপরিউক্ত অবস্থায় একজন অপেক্ষা আরেকজনের প্রতি অধিক আকর্ষণ বা কম আকর্ষণ থাকা একেবারেই স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু তাই বলে তাকে এমনভাবে ফেলে রাখা যাবে না যাতে করে মনে হতে পারে যে তার কোনো স্বামী নেই।–(তাফহীমুল কুরআন)

এ আয়াত থেকে কোনো কোনো লোক সিদ্ধান্ত নেয়ার চেষ্টা করেছে যে, কুরআন একদিকে সমতা রক্ষার শর্ত সাপেক্ষে বহু বিবাহের অনুমতি দিয়েছে, আর অপরদিকে সমতা রক্ষা অসম্ভব বলে সেই অনুমতিকে কার্যত বাতিল করে দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এরূপ সিদ্ধান্ত নেয়ার কোনো অবকাশই এ আয়াতে নেই। কারণ, কুরআন যদি "তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে সমতা রক্ষা করতে পারবে না" বলেই কথা শেষ করে দিতো, তাহলে এরূপ একটা সিদ্ধান্ত নেয়ার যুক্তি দেখানো যেত। কিন্তু কুরআনে একটু পরেই বলা হয়েছে "একজন স্ত্রীকে একদিকে ঝুলিয়ে রেখে অন্যজনের দিকে একেবারেই ঝুঁকে পড়বে না।" একথা বলে উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার কোনো অবকাশ রাখেনি। আসলে খ্রীষ্টান ইউরোপের অনুসরণ করতে গিয়েই লোকেরা এরূপ সিদ্ধান্ত নিতে আগ্রহী হয়ে উঠে।–(তাফহীমুল কুরআন)

আয়াতের শেষাংশের বক্তব্যও অনিচ্ছাকৃত মনের আকর্ষণকে দোষণীয় বলে প্রকাশ করা হয়নি। বলা হয়েছে ঃ

وَاِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ـ

অর্থাৎ "তুমি যদি নিজে যুলম করা থেকে নিজেকে বিরত রাখ, আর ইনসাফ করার যথাসাধ্য চেষ্টা কর, তবে স্বাভাবিক দুর্বলতার কারণে অনিচ্ছাকৃত কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে গেলে আল্লাহ নিশ্চয় তা মাফ করবেন।"

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

সাতান্ন

وَاِنْ يَّتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّٰهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهٖ ط وَكَانَ اللّٰهُ وَاسِعًا حَكِيْمًا ○

- *"স্বামী-স্ত্রী যদি পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তবে আল্লাহ তার প্রাচুর্য দিয়ে তাদের প্রত্যেককে অভাবমুক্ত করে দিবেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময় প্রজ্ঞাময়।"–(সূরা আন নিসা ঃ ১৩০)*

বিচ্ছেদের বিকল্প না থাকলে আল্লাহই প্রত্যেকের সহায়

ইসলামী সমাজের জন্য বিবাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। বিবাহের মাধ্যমে সমাজের একটি ভিত্তি অর্থাৎ পরিবার গড়ে উঠে। মূলত এ বিবাহ প্রথা একটি সমাজের অপরিহার্য আবশ্যকীয় ইউনিট। যে সমাজে এ ভিত্তি যত মযবুত হবে সে সমাজ তত সুন্দর ও সুশৃংখল হবে। তাই ইসলামী শরীয়ত বিবাহ ব্যবস্থাকে সর্বদিক থেকে সুদৃঢ় ও সুশৃংখলভাবে আনজাম দানের ও সংরক্ষণের বিভিন্ন বিধি বিধান দিয়েছে। বিবাহ বিচ্ছেদ ইসলামের দৃষ্টিতে অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ। এজন্যে আল কুরআন স্বামী-স্ত্রীকে যেমন একদিকে ন্যায্য অধিকার লাভের আইনগত সুযোগ দিয়েছে ; অন্যদিকে ধৈর্য, সংযম ও পারস্পরিক সুসম্পর্ক সৃষ্টি ও সংরক্ষণের প্রতি উৎসাহিত করেছে। আর বিবাহ বিচ্ছেদ থেকে যথাসাধ্য বিরত থাকার জন্য শিক্ষা দিয়েছে। এমনকি সম্পর্কের অবনতি ঘটার আশংকা দেখা দিলে উভয় পক্ষকেই কিছু কিছু ত্যাগ স্বীকার করে হলেও সমঝোতায় আসতে উদ্বুদ্ধ করেছে। এতদসত্ত্বেও যদি আল্লাহ না করুন—কোথাও এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যে, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক রক্ষা করা সাধ্যের বাইরে চলে গেছে, তখন উভয়ের বৃহত্তর স্বার্থে উদ্ভূত অস্বস্থিকর অবস্থার অবসানে ও অসহনীয় দুর্ভোগপূর্ণ জীবনের শৃংখলমুক্ত হওয়ার জন্য অগত্যা বিবাহ বিচ্ছেদ বা তালাক দেয়া জায়েয। এহেন চরম পরিস্থিতিতেই ইসলামে তালাকের ব্যবস্থা রয়েছে।

বিবাহ বিচ্ছেদের ফলে স্বামীর চেয়ে স্ত্রী অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। সে জন্যে স্ত্রী নিজ অধিকারের অংশবিশেষ পরিত্যাগ করে হলেও স্বামীর সাথে সন্ধি করতে পারে। কিন্তু সন্ধির যাবতীয় সম্ভাবনা ব্যর্থ হয়ে গেলে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার অনুমতি আছে। এমতাবস্থায় আল্লাহ তার অসাধারণ ক্ষমতার বলে এদের পরস্পরকে উভয়ের অমুখাপেক্ষী করে দিতে পারেন। আল্লাহ তা'আলাই সর্ববিষয়ে কর্ম বিধায়ক। আল্লাহ স্ত্রীর জন্য তালাকাদাতা স্বামীর চেয়ে শ্রেয়

স্বামীর ব্যবস্থা করে দিতে পারেন ; আবার স্বামীর জন্য পরিত্যক্ত স্ত্রীর চেয়ে ভাল স্ত্রী মিলিয়ে দিতে পারেন।

আলোচ্য আয়াতে স্বামীদের তুলনায় স্ত্রীদের প্রতিই অধিকতর সান্ত্বনার বাণী ঘোষিত হয়েছে। কারণ, স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদের ফলে স্বামীর তুলনায় স্ত্রীই অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। সাধারণত স্ত্রীরাই তো অসহায় অবলা বিধায় একটা সম্পর্ক বিনষ্ট হওয়ার পর দ্বিতীয় কোনো সুবিধাজনক সম্পর্ক স্থাপনের সম্ভাবনায় তারা বিচলিত হয়ে পড়ে। বিশেষত আজকের সমাজে তাই পরিলক্ষিত হয়। আলোচ্য আয়াতে উভয়ের মধ্যে কেবল সবল পক্ষের সুবিধাজনক অবস্থানের কথা নাকচ করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা উভয়ের পূর্বাবস্থার একটি সন্তোষজনক নতুন অবস্থার সূচনা করতে পারেন। আল্লাহ বিপুল, ব্যাপক ইহসান, রহমত ও কৃপার মালিক। তিনি সকল কাজে প্রজ্ঞাময়, কৌশলী ও সুক্ষ্মজ্ঞানী। আল্লাহ সর্বাবস্থায় মানুষের কল্যাণের ব্যবস্থা করেন।

আয়াতে আল্লাহ একটা সান্ত্বনার বাণী ব্যক্ত করে বলেছেন يُغْنِ اللّٰهُ كُلاًّ مِنْ سَعَتِهٖ "আল্লাহ স্বামী-স্ত্রীর উভয়কে তার প্রাচুর্য দিয়ে অভাবমুক্ত করে দেবেন।" যখন পরস্পর সন্ধি-সমঝোতার যাবতীয় পথ রুদ্ধ হয়ে যায়—শত আন্তরিকতা সত্ত্বেও কোনোভাবেই যদি বিচ্ছেদের বিকল্প না থাকে। তখন আল্লাহ তা'আলাই তার প্রাচুর্য থেকে উভয়কেই পরস্পর থেকে আরও ভাল অবস্থায় নিয়ে যেতে পারেন। উভয়কে উভয়ের অভাবমুক্ত করে অধিকতর উত্তম ব্যবস্থা করা আল্লাহর জন্য অতি সহজ। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلٰى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيْمًا (النساء : ١٥٦)

"(আর তারা অর্থাৎ ইয়াহুদীরা অভিশপ্ত হয়েছিল) কুফরী করার কারণে এবং মারইয়ামের বিরুদ্ধে জঘন্য অপবাদ দেয়ার কারণে।"

–(সূরা আন নিসা ঃ ১৫৬)

নিরপরাধ মারইয়ামকে দোষী সাব্যস্ত করার পরিণতি

আল কুরআনের আলোচ্য আয়াত এর পূর্ববর্তী ও তৎপরবর্তী কয়েকটি আয়াতে ইয়াহুদী জাতির কতগুলো জঘন্যতম গুনাহর বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। এসব গুনাহ তাদের উপর আল্লাহর গযব ডেকে এনেছিল আর তাদের আল্লাহর হেদায়াত ও সত্য পথ থেকে বিভ্রান্ত করেছিল ও বহুদূরে নিক্ষেপ করেছিল। উপরিউক্ত আয়াতাংশে ইয়াহুদীদের উপর আল্লাহর গযব আসার দু'টো কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। একটি তাদের নবী কর্তৃক আনীত আল্লাহর সত্যদীনকে অস্বীকার করা, দ্বিতীয়টি হচ্ছে মারইয়ামের উপর জঘন্য তোহমত আরোপ করা।

হযরত মারইয়াম ছিলেন বনী ইসরাঈলের অতীব শরীফ, খ্যাতিমান ও প্রসিদ্ধ ধর্মীয় পরিবারের এক অবিবাহিতা কন্যা। আল্লাহর কুদরত প্রকাশে পুরুষের মিলন ছাড়াও যে আল্লাহ সন্তান দিতে পারেন, তারই একমাত্র নযীর হিসেবে হযরত ঈসা (আ) পিতা ছাড়া বিবি মারইয়ামের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের ব্যাপারটি ইয়াহুদী জাতির নিকট প্রকৃতপক্ষে মোটেই সন্দেহের বিষয় ছিলো না। যেদিন তিনি জন্মগ্রহণ করেন সেদিনই আল্লাহ তা'আলা সমস্ত ইয়াহুদী জাতিকে সাক্ষী রেখে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, এতো এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শিশু, এর জন্মই একটি মুযিজা, এর সাথে নৈতিক অপরাধের কোনো সম্পর্ক নেই। অবিবাহিতা কন্যা মারইয়াম যখন কোলে বাচ্চা নিয়ে আসল, তখন জাতির ছোট-বড় শত-সহস্র লোক এসে সে ঘরে ভিড় জমায়। তারা বাচ্চা সম্পর্কে মারইয়ামকে জিজ্ঞেস করলে সে এ সম্বন্ধে কোনো কথাই বলেনি। সে চুপচাপ থেকে হাতের ইশারায় বাচ্চাকে জিজ্ঞেস করতে বললো। উপস্থিত জনতা সবিস্ময়ে বললো দোলনায় শায়িত এ শিশুকে আমরা কি জিজ্ঞেস করতে পারি ? আল্লাহর কুদরতে সে শিশুই কথা বলে তাদের জবাব দিল। সদ্যজাত শিশুটি স্পষ্ট ও বিশুদ্ধ ভাষায় বলে দিল ঃ

اِنِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ اٰتٰنِىَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِىْ نَبِيًّا -

"আমি আল্লাহর বান্দাহ, তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন, আর আমাকে নবী বানিয়েছেন।"–(সূরা মারইয়াম ঃ ৩০)

এভাবে হযরত ঈসা (আ)-এর জন্ম সম্পর্কিত সকল প্রকার সন্দেহ-শোবাহর মূলোৎপাটন করে দিলেন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা। তাই হযরত ঈসা (আ)-এর যৌবন কাল পর্যন্ত কেউ না মারইয়ামের প্রতি ব্যভিচারের দোষ চাপিয়েছে, না ঈসা (আ)-কে অবৈধ সন্তান বলে কোনো খোঁচা দিয়েছে। কিন্তু যখন হযরত ঈসা ত্রিশ বছর বয়সে উপনীত হওয়ার পর নবুয়াতের দায়িত্ব পালন শুরু করলেন, ইয়াহুদীদের যাবতীয় বদ কাজের জন্য তিরস্কার করতে লাগলেন, তাদের নৈতিক পতনের বিষয়ে সাবধান করতে লাগলেন ; আল্লাহর দ্বীন কায়েমের জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে, দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে, আর প্রত্যেক ক্ষেত্রে শয়তানী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে যাওয়ার আহ্বান জানালেন, তখন ইয়াহুদীরা এ নির্ভিক ও সততার আওয়ায স্তব্ধ করে দেয়ার সকল অসদুপায় অবলম্বন করতে লাগলো। বিগত ত্রিশ বছর পর্যন্ত তারা যা বলেনি এখন তাই বলতে শুরু করলো। তারা বলতে লাগলো (নাউযুবিল্লাহ) "মারইয়াম ব্যভিচারিণী ছিলেন, ঈসা অবৈধ সন্তান।"—অথচ তারা নিসন্দেহে জানতো এ মা ও সন্তান উভয়ই ওসব মলিনতা ও কদর্য থেকে পূত-পবিত্র। তাই তাদের এ দোষারোপ আসলে কোনো সন্দেহের কারণে ছিলো না, বরং তা ছিল একেবারেই মিথ্যা। তারা তো জেনে বুঝে সত্যের বিরোধিতার জন্যই এরূপ বলছিলো, এজন্যে আল্লাহ তা'আলা তাদের এ আচরণকে যুল্ম ও মিথ্যা না বলে তাকে 'কুফর' বলে অভিহিত করেছিলেন। কারণ, এতে করে তাদের উদ্দেশ্য ছিল দীনের পথে বাধা সৃষ্টি করা মাত্র।

উনষাট

وَإِنْ كَانُوْا إِخْوَةً رِّجَالاً وَّنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوْا ـ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝ (النساء : ١٧٦)

"আর তারা যদি ভাই-বোন উভয় থাকে তবে একজন পুরুষ পাবে দু'জন নারীর অংশের সমান। আল্লাহ তোমাদের জন্য বিষয়টি পরিষ্কার করে বর্ণনা করছেন, যেন তোমরা ভ্রষ্ট হয়ে না যাও। আর আল্লাহ তো সকল বিষয়ে পরিজ্ঞাত।"–(সূরা আন নিসা ঃ ১৭৬)

মীরাসের মাল নারীদের দ্বিগুণ পাবে পুরুষরা

আলোচ্য আয়াতটি সূরা আন নিসার সর্বশেষ আয়াত। সূরা নিসায় মীরাস সম্পর্কিত আলোচনাই প্রধান্য পেয়েছে। সর্বশেষ আয়াতটিতে তাই মূল বক্তব্যকে অধিকতর স্মরণীয় করার জন্য মীরাসের একটি মৌলিক নির্দেশিকা বর্ণিত হয়েছে বলে তাফসীরকারগণ মন্তব্য করেছেন।

আয়াতটির প্রথম থেকে 'কালালা'-র মীরাস সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়েছে। 'কালালা' বলা হয় এমন মৃত ব্যক্তিকে যার সন্তানাদি ও মাতা-পিতা নেই, কিন্তু বোন অথবা ভাই-বোন উভয়ই রয়েছে। এক বোন থাকলে পাবে মোট সম্পত্তির অর্ধেক। বাকীটা পাবে আসাবারা। 'আসাবা' না থাকলে সবটুকু পাবে বোন। দুই বোন থাকলে পাবে তিন ভাগের দুই ভাগ। বাকীটা পূর্বের ন্যায়। আর যদি মৃত ব্যক্তির বোন ও ভাই থাকে তবে ভাইয়েরা পাবে বোনদের দ্বিগুণ।

কেবল ভাই-বোন উত্তরাধিকারী থাকলে তাদের মীরাসের বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এমনটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি। আর তা হচ্ছে, সাধারণত মীরাস বন্টনের ব্যাপারে, বিশেষত নারীদের মীরাস দেয়ার ব্যাপারে যেন কেউ ভ্রষ্ট হয়ে না পড়ে, বিভ্রান্তিতে পড়ে না যায়। কারণ জাহেলিয়াতের যুগে মীরাসের ব্যাপারে বড়ই যুলম করা হতো। যেমনটি হচ্ছে আধুনিক যুগেও। জাহেলী যুগে নারীদের উপর নানাভাবে যুল্ম করা হতো, ইয়াতীমদের হক নষ্ট করা হতো, বিশেষত ইয়াতীম বালিকাদের হক এবং নারীদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হতো।

রাব্বুল আলামীন আল কুরআনে সকলকে তাদের অধিকার দানের বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা দিয়েছেন। অবশেষে বিশ্ববাসীকে বিশেষত মু'মিনদের সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন ঃ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا "আল্লাহ তোমাদের জন্য পরিষ্কার করে বর্ণনা করেছেন যেন তোমরা বিভ্রান্ত না হয়ে যাও।"

মানুষ আল্লাহর বিধানের রহস্য অনুধাবন না করে অনেক সময় নিজ নিজ বদ্ধমূল ধারণার ভিত্তিতে আল্লাহর বিধান নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করার দুঃসাহস দেখিয়ে থাকে। যেমন উপরিউক্ত আয়াতে "একজন পুরুষ পাবে দু'জন নারীর অংশের সমান"–কথার বাহ্যিক অর্থের পরে ভিত্তি করে তারা বলতে থাকে যে ইসলাম নারীদের ঠকিয়েছে, নারী-পুরুষের অধিকারে বৈষম্য রেখেছে। কিন্তু তারা তো আল্লাহর বিধানের সার্বিক দিকগুলোর প্রতি একটুও দৃষ্টি দিতে না পারার কারণেই হয়ত এমনটি বলে থাকে অথবা চিন্তার বক্রতার কারণে এভাবে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে সমাজে অশান্তির সৃষ্টি করে। প্রথমতঃ তাদের জানা উচিত যে, ইসলামই নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে, অন্য কোনো ধর্ম বা মতবাদ তা করেনি। দ্বিতীয়তঃ নারীদের বিবাহদান পর্যন্ত তাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব থাকে পিতার উপর। বিবাহের পর স্বামীর উপর সমস্ত দায়িত্ব অর্পিত হয়। তৃতীয়তঃ বিবাহের সময় মোহরানার অর্থ পেয়ে গেলে স্ত্রী একটা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থের মালিকানা লাভ করতে পারে। এতে স্বামীর বিন্দুমাত্র অধিকার থাকে না। স্ত্রী এ অর্থ নিজের মর্জি মাফিক কোনো ব্যবসায়ে বা কোনো উৎপাদনমূলক কাজে বিনিয়োগ করতে পারে। চতুর্থতঃ স্ত্রীর যাবতীয় ভরণ-পোষণ এমনকি প্রসাধনী ব্যয়ও স্বামীকেই বহন করতে হয়। স্ত্রীর যদি কোনো ব্যবসা অথবা চাকুরীও থাকে, তবুও তার খোর-পোষের পুরো দায়িত্ব স্বামীর। পঞ্চমতঃ স্ত্রী তার ভাইয়ের সাথে যে এক অংশ পেয়েছিল, সে সম্পদ তো তার পুরোটাই অব্যয় অক্ষয় থেকে যায় ; কিন্তু তার ভাইকে তো নিজের স্ত্রীর দায়-দায়িত্বও বহন করতে হয়। সুতরাং এক ভাই দুই বোনের অংশের সমান মীরাস পাওয়াটা একেবারেই যুক্তিযুক্ত। বাকী আল্লাহর হুকুম-আহকামের রহস্য তিনিই ভাল জানেন। তাঁর সকল হুকুম আন্তরিকতা সহকারে মেনে নেয়া আমাদের কর্তব্য। ব্যষ্টিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমালোচনার পথ পরিহার করে সামষ্টিক দৃষ্টিতে পর্যালোচনায় নিরপেক্ষতা রক্ষা করতে পারলে মানুষের চিন্তার বক্রতা কেটে যেতে পারে। আল্লাহ সবাইকে তাওফীক আতা করুন। আমীন।

وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ
اِذَا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِيْٓ اَخْدَانٍ ط
وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ ز وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ○

"তোমাদের জন্যে হালাল করা হলো, মু'মিন সচ্চরিত্রা নারী আর তোমাদের আগে যাদের কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদের সচ্চরিত্রা নারী; যখন তোমরা তাদের মোহর দাও তাদের স্ত্রী করার জন্যে; কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্যে কিংবা গুপ্ত প্রেমে লিপ্ত হওয়ার জন্যে নয়। আর যে কেউ ঈমানের নীতি অনুযায়ী চলতে অস্বীকার করে তার সকল আমল বরবাদ হয়ে যাবে এবং আখিরাতে সে মহাক্ষতির সম্মুখীন হবে।"

–(সূরা আল-মায়িদাহ্ ঃ ৫)

মু'মিনগণ কি কোন অমুসলিমকে বিয়ে করতে পারে ?

আয়াতে 'মুহ্সানাত' محصنت শব্দের দু'টো অর্থ হতে পারে। এক, স্বাধীন ও মুক্ত, যার বিপরীত শব্দ ক্রীতদাসী। দুই, সচ্চরিত্রা ও সতী-সাধ্বী। অধিক সংখ্যক সাহাবী ও তাবেঈ আলিমের মতে এখানে দ্বিতীয় অর্থই প্রযোজ্য। অবশ্য এর অর্থ এ নয় যে, যারা সচ্চরিত্রা বা সতী-সাধ্বী নয় তাদের বিয়ে করা হারাম। বরং আয়াতের মর্মার্থ হলো মু'মিনদের উত্তম ও চরিত্রবানদের বিবাহ করার প্রতি উৎসাহিত করা। অর্থাৎ ব্যভিচারিণী বা পাপাচারিণী মহিলাদের বিবাহ করা কোন সম্ভ্রান্ত মুসলিমের কাজ নয়।

(মা'আরেফুল কুরআন, তাফসীরে মাযহারী থেকে)

আয়াতে اَلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ "যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছিল" বলে 'আহ্লে কিতাব' বা কিতাবী সম্প্রদায়কে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যাদের উপর আসমানী কিতাব নাযিল হয়েছিল। বর্তমানকালে ইয়াহুদী বা খৃষ্টান ছাড়া আর কোন সম্প্রদায়কে আহলে কিতাব বলা যায় না। কারণ, আহলে কিতাব বলতে বুঝায় ঐসব সম্প্রদায়কে যারা কোনো আসামানী কিতাব পেয়েছে বা আসামানী কিতাবের অনুসারী বলে দাবী করে—আর তা কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। তাওরাত ও ইনজীলই এমন কিতাব আজকের বিশ্বে যার অনুসরণের কিছু কিছু দাবীদার বর্তমানে বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু কুরআন মজীদের আরেকটি আয়াতে

ঘোষণা করা হয়েছে وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ "কোনো মুশরিক নারীকে বিয়ে করবে না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে।" এ আয়াতের মর্মানুসারে বর্তমান বিশ্বের ইয়াহুদী খৃষ্টান মহিলাদের বিয়ে করাও নাজায়েয। কারণ, তারা ঈসা (আ)-কে সহ তিন খোদায় বিশ্বাসী এবং নানা প্রকার শিরকে লিপ্ত। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা)-এরও এ মত।

–(মা'আরেফুল কুরআন, আহকামুল কুরআন)

সূরা মায়িদাহ্র উক্ত আয়াতে আহলে কিতাব মহিলাদের বিয়ে করা হালাল বুঝালেও এ ধরনের বিয়ের ফলে কোনো মু'মিনের নিজের, তার সন্তান-সন্তুতির এবং সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য বাস্তবে যে অবশ্যম্ভাবী ক্ষতি ও অনিষ্ট দেখা দেবে তার প্রেক্ষিতে অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেঈর মতে অমুসলিম আহলে কিতাব মহিলাকে বিয়ে করা মাকরূহ বা অনুচিত।

বর্ণিত আছে, হযরত হোযায়ফা ইবনে ইয়ামান (রা) মাদায়েন পৌঁছে জনৈকা ইয়াহুদী স্ত্রীলোকের পানি গ্রহণ করেন। হযরত ওমর ফারূক (রা) সংবাদ পেয়ে তাঁকে পত্র লিখে বললেন, "স্ত্রীলোকটিকে তালাক দিয়ে দাও।" হযরত হোযায়ফা উত্তরে লিখলেন, "সেকি আমার জন্য হারাম ?" হযরত ওমর (রা) উত্তরে লিখলেন, "আমি হারাম বলছি না, কিন্তু ইয়াহুদী মহিলারা সাধারণত সচ্চরিত্রা বা সতী-সাধ্বী নয়। তাই আমার আশংকা, এ পথে না জানি তোমাদের পরিবারেও অশ্লিলতা ও ব্যভিচারের অনুপ্রবেশ ঘটে।"

–(আহকামুল কুরআন–জাস্সাস)

ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান 'কিতাবুল আছার' গ্রন্থে এ ঘটনাকে ইমাম আবূ হানীফা (রহ)-এর অভিমত বলে বর্ণনা করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, দ্বিতীয়বার হযরত ওমর (রা) হোযায়ফাকে পত্রে বলেন ঃ

اعزم عليك ان لاتضع كتابي حتى تخلى سبيلها فانى اخاف ان يقتر يك المسلمون فيختاروا نساء اهل الذمة لجمالهن وكفى بذالك فتنة لنساء المسلمين-

অর্থাৎ "তোমাকে কসম দিয়ে বলছি, পত্র পাঠান্তে তা রেখে দেয়ার পূর্বেই তাকে তালাক দিয়ে মুক্ত করে দাও। আমার আশংকা, অন্য মুসলিমরাও না জানি তোমার পদাংক অনুসরণ করে বসে। ফলে তারা যিম্মী আহলে কিতাব মহিলাদের রূপ-সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে মুসলিম মহিলাদের পরিবর্তে তাদের বেশি পছন্দ করতে শুরু করে দেবে। মুসলিম মহিলাদের জন্য এ বড় বিপদ! "

–(কিতাবুল আছার ঃ ১৫৬ পৃঃ)

আল্লামা ইব্‌নে হুমাম 'ফতহুল কাদীর' গ্রন্থে বর্ণনা করেন, শুধু হোযায়ফা নয়, তালহা এবং কা'ব ইবনে মালেকও এরূপ ঘটনার সম্মুখীন হন। তাঁরাও সূরা মায়েদাহ্‌র এ আয়াত দৃষ্টে আহলে কিতাব মহিলাদের বিয়ে করেছিলেন। খলীফা হযরত ওমর (রা) এ সংবাদ পেয়ে তাদের প্রতি খুব অসন্তুষ্ট হন এবং তালাক দেয়ার নির্দেশ দেন।–(তাফসীরে মাযহারী থেকে মা'আরেফুল কুরআন)

মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ) 'মা'আরেফুল কুরআনে' বলেন, ফারূকে আযমের যুগ ছিল সর্বোত্তম যুগ। কোনো ইয়াহুদী বা খৃষ্টান মহিলা মুসলমানদের সহধর্মিনী হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করার সম্ভাবনা তখন ছিল না। তাদের মধ্যে ব্যভিচারের অভ্যাস মুসলমানদের পরিবার কলুষিত করতে পারে আর তাদের রূপ-সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে মুসলমানরা তাদের অগ্রাধিকার দিবে এবং মুসলিম মহিলারা বিপদের সম্মুখীন হবে—এটাই ছিল তখনকার যুগের একমাত্র আংশকা। এতটুকু অনিষ্টকে সামনে রেখেই ফারূকে আযমের দূরদৃষ্টি উপরিউক্ত সাহাবীদের তাদের 'আহলে কিতাব' স্ত্রীদের তালাক দিতে বাধ্য করেছিলেন। যদি আজকালের চিত্র তাঁদের সামনে থাকতো, তবে অনুমান করুন, একে প্রতিরোধ করতে গিয়ে তাঁরা কত কঠোর কর্মপন্থাইনা অবলম্বন করতেন? আজকাল যারা আদম শুমারীর খাতায় নিজেদেরকে ইয়াহুদী-খৃষ্টান নামে লিপিবদ্ধ করায় তাদের অনেকেই বিশ্বাসের দিক থেকে খৃষ্টবাদ ও ইয়াহুদীবাদকে অভিশাপ মনে করে। তারা যেমন তাওরাত-ইনজীলে বিশ্বাস করে না, তেমনি হযরত মূসা-ঈসাকে আল্লাহর রাসূল বলে স্বীকার করে না। বরং বিশ্বাসের দিক থেকে তারা পুরোপুরি নাস্তিক। শুধু জাতিগত কিংবা প্রথাগতভাবে নিজেদেরকে ইয়াহুদী বা খৃষ্টান বলে থাকে।

এমতাবস্থায় তাদের মহিলারা মুসলমানদের জন্য কিছুতেই হালাল নয়। যদি ধরে নেয়া যায় যে, তারা স্বীয় ধর্মের অনুসরণ করে, তবুও তাদের মুসলিম পরিবারে স্থান দেয়া গোটা পরিবারের জন্য দুনিয়া-আখিরাতের ধ্বংস ডেকে আনার শামিল। সুতরাং কুরআন-সুন্নাহ ও সাহাবায়ে কেরামের আদর্শের প্রেক্ষিতে আজকালকার তথাকথিত আহলে কিতাব মহিলাদের বিয়ে করা থেকে মুসলমানদের বিরত থাকা কর্তব্য।

একষট্টি

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللّٰهِ ط
وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○ (المائدة : ٣٨)

"আর চোর ও চোরনীর হাত কেটে দাও। এটা তাদের কর্মের শাস্তি, আল্লাহর পক্ষ থেকে দৃষ্টান্তমূলক দণ্ড। আল্লাহ তো পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।"–(সূরা আল-মায়িদাহ্ ঃ ৩৮)

অপরাধী পুরুষ বা মহিলা—তাদের শাস্তি সমান

উপরিউক্ত আয়াতটি চুরি কর্মের দণ্ডবিধি সম্পর্কিত। এখানে বলা হয়েছে চোর পুরুষ হোক আর নারী হোক তাদের উভয়ের হাত কেটে দাও।

এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, কুরআনী বিধি-বিধানে কোনো বিষয়ে হুকুম করা হলে পুরুষদের সম্বোধন করে নির্দেশ দেয়া হয় আর নারীরা পুরুষদের সাথে অন্তর্ভুক্ত থাকে। নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ও অন্যান্য বিধি-বিধানে কুরআন-সুন্নাহর রীতি তাই। কিন্তু চুরি ও যিনার শাস্তির বেলায় পুরুষ ও নারীকে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এর কারণ, এই বিধানটি হচ্ছে হুদূদ বা দণ্ডবিধি সম্পর্কিত। আর কোনো প্রকার সন্দেহ দেখা দিলে হুদূদ রহিত হয়ে যায়। এজন্যে এখানে পুরুষদের অধীনস্থ করে নারীদের সম্বোধন করা হয়নি। বরং নারীর কথা পৃথক করে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে।

প্রসংগত লক্ষণীয় যে, চুরির শাস্তির ব্যাপারে কুরআনে اَلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ বলে প্রথমে পুরুষের এবং পরে নারীর উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু যিনার ব্যাপারে اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِي বলে প্রথমে নারী ও পরে পুরুষের কথা বলা হয়েছে। তাফসীরবিদগণ এই আগ-পর করার অনেক কারণ বর্ণনা করেছেন। মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ) তাঁর তাফসীর মা'আরেফুল কুরআনে বলেন, চুরির অপরাধ মহিলাদের তুলনায় পুরুষদের ক্ষেত্রে অধিক গুরুতর। কারণ, আল্লাহ তা'আলা জীবিকা উপার্জনের যে শক্তি পুরুষকে দিয়েছেন তা নারীর মধ্যে নেই। জীবিকার এতসব পথ খোলা থাকা সত্ত্বেও চুরির মত হীন অপরাধে লিপ্ত হওয়া পুরুষের অপরাধকে আরো গুরুতর করে দিয়েছে। যিনা বা ব্যভিচারের ক্ষেত্রে অবস্থা এই যে, আল্লাহ তা'আলা নারীদের স্বাভাবিক লজ্জা-শরম ছাড়াও তাদের জন্য

যিনা থেকে বেঁচে থাকার মত উপযুক্ত পরিবেশও দিয়েছেন। তারপরও যদি সে নির্লজ্জতায় মত্ত হয়ে যিনার মত বেহায়ায়ী কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তা হবে জঘন্য অপরাধ। তাই চুরির আয়াতে আগে পুরুষের কথা পরে নারীর কথা এবং যিনার আয়াতে আগে মহিলার কথা পরে পুরুষের কথা বলা হয়েছে।

আল্লামা কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী (রহ) তাঁর তাফসীর, তাফসীরে মাযহারীতে বলেন, চুরি করার জন্য সাহসের প্রয়োজন হয়, আর সাহস সাধারণত পুরুষের মধ্যেই বেশি থাকে ; পক্ষান্তরে যিনা হয় শাহ্ওয়াত (কামনা) থেকে, আর শাহ্ওয়াত (কামনা) সাধারণতঃ নারীর মধ্যেই বেশি থাকে। আবার কেউ কেউ বলেন, যিনার কাজ নারীর অনিচ্ছায় সংঘটিত হওয়া কঠিন বিধায় একাজে নারীর ভূমিকাই অধিক থাকে, তাই নারীর কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে।

তাফসীরে মাযহারীতে আরও বলা হয়েছে, চুরির কাজ হাত দ্বারা হয়ে থাকে বিধায় চুরির কারণে হাত কাটার বিধান রয়েছে। কিন্তু যিনার কাজ পুরুষাঙ্গ দিয়ে হলেও যিনার শাস্তিতে পুরুষাঙ্গ কেটে ফেলার নির্দেশ দেয়া হয়নি ; কারণ তাতে বংশবৃদ্ধি লোপ পাবে।

চোরের হাত কাটার বিষয়টি প্রসংগে কোন্ হাত কতটুকু কাটতে হবে–এ বিষয়ে তাফসীরবিদগণ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এখানে প্রসংগক্রমে সংক্ষিপ্তাকারে তার বিবরণ তুলে ধরা হলো ঃ

তাফসীরে মাযহারীর বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ "হাত বলা হয় আংগুলের অগ্রভাগ থেকে কাঁধ পর্যন্ত অংগকে। এজন্যে খারেজীদের মতে চোরের হাত কাঁধ থেকে কেটে ফেলতে হবে। কিন্তু মুসলিম সমাজের সর্বকালের কব্জি থেকে কাটার নিয়ম চলে আসছে। এর উপরই ইজমা সংগঠিত হয়েছে। চোরের ডান হাত কাটতে হবে। আয়াতে হাত বলতে ডান হাতকেই বুঝানো হয়েছে আর একথার উপরই 'ইজমা' হয়েছে। কারণ হযরত ইবনে মাসউদ (রা)-এর কিরাতে ايديهما (উভয়ের হস্তদ্বয় এর স্থলে ايمانهما (উভয়ের ডান হাত) বলা হয়েছে। আর মুসলিম সমাজে এ কিরাতের উপরই আমল চলে আসছে।"

তাফহীমুল কুরআনে বলা হয়েছে, দু'টো হাতই কাটতে হবে না, কাটতে হবে একটি হাত মাত্র। ইসলামী মিল্লাত এ ব্যাপারে একমত যে প্রথম চুরির ক্ষেত্রে ডান হাত কাটতে হবে। নবী করীম (সা) বলেছেন, لا قطع على خائن – "খিয়ানতকারীর হাত কাটা হবে না।" কারণ, খিয়ানত করাটা চুরি নয়। অবশ্য খিয়ানতের শাস্তি অন্যভাবে দেয়া হবে।

কি পরিমাণ চুরির জন্য চোরের হাত কাটতে হবে সে বিষয়ে তাফহীমুল কুরআনের বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ

নবী করীম (স) হিদায়াত দিয়েছেন, একটি ঢালের মূল্য থেকে কম মূল্যের জিনিস চুরি করলে হাত কাটা যাবে না। নবী করীম (স)-এর সময়ে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর বর্ণনা মতে একটা ঢালের মূল্য ছিল দশ দিরহাম। আবদুল্লাহ ইবনে উমরের মতে পাঁচ দিরহাম। হযরত আয়েশা (রা)-এর মতে এক দিনারের (স্বর্ণ মুদ্রা) এক-চতুর্থাংশ।

এ কারণে কত মূল্যের জিনিস চুরি করলে হাত কাটা হবে তা নির্ধারণের ব্যাপারে ইসলামী ফিক্‌হবিদদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে। ইমাম আবূ হানিফা (রহ)-এর মতে এর পরিমাণ দশ দিরহাম। ইমাম মালেক (রহ), শাফেঈ (রহ) ও আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ)-এর মতে এক চতুর্থাংশ দীনার। সেকালের দিরহামে ৩ মাসা ১ ১/৫ রতি রূপা থাকতো আর এক-চতুর্থাংশ দীনার তিন দিরহামের সমান ছিল।

অনেক জিনিস এমন আছে যা চুরি করার দরুন চোরের হাত কাটার দণ্ড দেয়া যাবে না। যেমন–নবী করীম (সা) বলেছেন لاقطع فى ثمرة ولا كثر – "ফল ও তরকারী চুরি করলে হাত কাটা যাবে না।" لا قطع فى طعام "খাদ্যবস্তু চুরি করলে হাত কাটা যাবে না।" হযরত আয়েশ (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ আছে ঃ

لم يكن قطع السارق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الشئ التافة

"সামান্য জিনিস চুরি করলে নবী করীম (সা)-এর যুগে হাত কাটা হতো না।"

হযরত আলী (রা) ও উসমান (রা)-এর ফায়সালা রয়েছে لاقطع فى الطير "পাখী চুরি করলে হাত কাটা যাবে না" কোনো সাহাবী এ ফায়সালার প্রতিবাদ করেননি। অর্থাৎ সাহাবীগণ এতে একমত ছিলেন। হযরত উমর (রা) ও হযরত আলী (রা) বায়তুলমাল (সরকারী কোষাগার) থেকে চুরি করলে চোরের হাত কাটেননি। এ ব্যাপারেও কোনো সাহাবী মতভেদ করেননি। ইমাম আবূ হানিফা (রহ)-এর মতে তরকারী, গোশত, রান্না করা খাবার, যে ফসল এখনো খোলানো হয়নি, খেলার সরঞ্জাম ইত্যাদি চুরি করলে চোরের

হাত কাটা যাবে না। বনে-জংগলে বিচরণশীল জন্তু ও বায়তুলমালের জিনিস চুরি করলেও হাত কাটার শাস্তি দেয়া যাবে না। কিন্তু এর মানে এ নয় যে, এসব অপরাধের কোনো শাস্তি নেই। শাস্তি তো দিতেই হবে, কিন্তু হাত কাটার দণ্ড এসব ব্যাপারে প্রয়োগ করা যাবে না।

আলোচ্য আয়াতে চুরির শাস্তি বর্ণনা করার পর দু'টো বাক্য উল্লেখ করা হয়েছে। এক, جَزَاءً بِمَا كَسَبَا "এই শাস্তি হচ্ছে তাদের (চোর বা চোরনীর) কৃতকর্মের ফল।" দুই, نَكَالاً مِّنَ اللّٰهِ "আল্লাহর পক্ষ থেকে সাজা" হিসেবে (এ হাত কাটার বিধান) আরবী অভিধানে نكال শব্দে বুঝায় দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিকে। অর্থাৎ যা দেখে অন্যরাও শিক্ষা লাভ করতে পারে এবং অপরাধ থেকে বিরত থাকতে পারে। এতে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, হাত কেটে ফেলার মত কঠোর শাস্তিটি এজন্যে, যেন এক চোরের হাত কাটলে অন্য সব চোরের অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে। ফলে সমাজ থেকে এ ধরনের হীন অপরাধ বন্ধ হয়ে যায়। দ্বিতীয় বাক্যের দ্বিতীয় অংশ مِنَ اللّٰهِ 'আল্লাহর পক্ষ থেকে' বলে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে ইশারা করা হয়েছে। আর তা এই যে, চুরির অপরাধের দু'টো দিক রয়েছে। এক, চোর অন্যের উপার্জিত মালামাল অন্যায়ভাবে নিয়ে যায়। এতে মালিক মানসিক ও বৈষয়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এটা মালিকের উপর বিরাট জুলুম। দুই, চোর চুরি করে আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধাচারণ করে থাকে। কাজেই প্রথম দিক থেকে চোর মালিকের হক নষ্ট করলো। আর এটা হক্কুল ইবাদ বা বান্দার হক বিধায় মালিক ক্ষমা করে দিলে মাফ হয়ে যাবে। কিসাসের সব বিষয়ের এটাই বিধান। দ্বিতীয় দিক থেকে চোর চুরি করে আল্লাহর হক (হক্কুল্লাহ) নষ্ট করলো। তাই মালিক চোরকে ক্ষমা করে দিলেও আল্লাহর এই হক মাফ হবে না। কারণ এটা আল্লাহ মাফ করলেই তবে মাফ হতে পারে। শরীয়তের পরিভাষায় এ হচ্ছে 'হদ'।

–(বহুবচন 'হদূদ')

আয়াতে مِنَ اللّٰهِ (আল্লাহর পক্ষ থেকে) উল্লেখ করে এই দ্বিতীয় দিকটিকে নির্দেশ করে দেয়া হয়েছে এই শাস্তি হদ—এটা কিসাস নয়। কাজেই মালিক ক্ষমা করে দিলেও এ শাস্তি রহিত হবে না।

–(মা'আরেফুল কুরআন ঃ মুফতী মুহাম্মদ শফী)

এখানে سَرِقَةٌ বা চুরি শব্দটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। শরীয়তে চুরির পারিভাষিক অর্থ বিশেষভাবে প্রণিধান যোগ্য। 'কামুস' গ্রন্থে বলা হয়েছে,

"অন্যের মাল তার অনুমতি ছাড়া হেফাজতের স্থান থেকে গোপনে নিয়ে যাওয়াকে 'চুরি বলে"। শরীয়তের পরিভাষায়ও এটাই চুরি। اَخْذُ مَالِ الْغَيْرِ مِنْ حِرْزٍ مُّخْفِيًا চুরি প্রমাণের জন্য এই সংজ্ঞাটি ভালভাবে জানা থাকা দরকার। এ সংজ্ঞার কয়েকটি লক্ষ্যণীয় দিক হল ঃ

১. মালটি কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের মালিকানাধীন হতে হবে। তাতে চোরের মালিকানা বা মালিকানার সন্দেহ বা অবকাশ থাকবে না। যে মালে চোরের মালিকানার অবকাশ থাকে অথবা যদি মালটি হয় জনগণের বা জনকল্যাণমূলক কোনো প্রতিষ্ঠানের, তবে এ মাল চুরি করলে 'হদ' প্রযোজ্য হবে না। অর্থাৎ চোরের হাত কাটা যাবে না। তবে বিচারক তাঁর বিবেচনা অনুযায়ী অন্য কোনো শাস্তি দেবেন।

২. মালটি হেফাজতে থাকতে হবে—অর্থাৎ তালাবদ্ধ স্থানে বা চৌকিদারের পাহারায় থাকতে হবে। অরক্ষিত স্থান থেকে চুরি হলে সেজন্য হাত কাটা যাবে না। এমনকি মাল সুরক্ষিত হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ থাকলেও হাত কাটা যাবে না। অবশ্য সেজন্য গুণাহ হবে এবং অন্য কোনো শাস্তির যোগ্য হবে।

৩. বিনা অনুমতিতে মাল নিতে হবে। যে মাল নেয়ার বা নিয়ে ব্যবহার করার অনুমতি কাউকে দেওয়া হয়, আর সে যদি ঐ মাল একেবারেই নিয়ে যায়; তবে চুরির হদ জারি হবে না।

৪. মালটি গোপনে নিলে তা চুরি হবে। প্রকাশ্যে নিয়ে গেলে তা হবে ডাকাতি। আর ডাকাতির শাস্তিও ভিন্ন। ডাকাতির শাস্তির কথা সূরা মায়িদাহ্‌র ৩৩নং আয়াতে বলা হয়েছে। শাসক ও বিচারকগণ ডাকাতির অপরাধের তীব্রতার ভিত্তিতে (১) হত্যা করা (২) শুলীতে চড়ানো (৩) হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলা (৪) দেশ থেকে বহিষ্কার করা। এ চারটি শাস্তির যে কোনো শাস্তি দিতে পারেন।–[মা'আরেফুল কুরআন–মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ)]

বাষট্টি

وَقَالُوْا مَا فِيْ بُطُوْنِ هٰذِهِ الْاَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُوْرِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلٰى اَزْوَاجِنَا ج وَاِنْ يَّكُنْ مَّيْتَةً فَهُمْ فِيْهِ شُرَكَاءُ ط سَيَجْزِيْهِمْ وَصْفَهُمْ اِنَّهٗ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ○ (الانعام : ١٣٩)

"তারা বলে এসব চতুষ্পদ জন্তুর পেটে যা আছে, তা কেবল আমাদের পুরুষদের জন্য; আর তা আমাদের মহিলাদের জন্য হারাম আর যদি তা মৃত হয় তা হলে তারা সবাই তাতে অংশীদার। তাদের এসব উক্তির কারণে তিনি (আল্লাহ্) তাদের অবশ্যই শাস্তি দেবেন। তিনি প্রজ্ঞাময় সর্বজ্ঞ।"–(সূরা আল-আন্'আম ঃ ১৩৯)

নারী অধিকার খর্ব করার জাহেলী যুগের একটি নমুনা

আলোচ্য আয়াতে মুশরিকদের কর্মগত ভ্রান্তি ও মূর্খতাসুলভ আচরণ প্রথার একটি বিশেষ দিকের উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস এবং প্রচলিত কু-প্রথার একটি ছিল এই যে, তাদের দেব-দেবী বা প্রতিমার নামে যেসব জন্তু ছেড়ে দেয়া হতো, সেগুলো জবেহ্ করার সময় পেট থেকে জীবিত বাচ্চা বের হলে তাকেও জবেহ্ করতো। কিন্তু তা শুধু পুরুষদের জন্য হালাল মনে করতো, আর মহিলাদের জন্য তাকে হারাম মনে করা হতো। অথচ জবেহকৃত জন্তুর পেটের বাচ্চাটা যদি মৃত হতো তবে তাতে নারী-পুরুষ সবাই অংশ নিতো। অন্যান্য অনেকগুলো মনগড়া বিশ্বাসের ভিত্তিতে প্রচলিত কু-প্রথাসমূহের মধ্যে এ প্রথাটাও চালু ছিল। আসলে আল্লাহর আলোর পথে না চললে যে মানুষ অন্ধকারে হাবুডুবু খেতে থাকে এবং তাতে সামাজিক ইনসাফ বিনষ্ট হয়—এ হচ্ছে তারই এক উদাহরণ বিশেষ এবং নারীদের বঞ্চিত করার একটি নজীর। তাই আয়াতের শেষাংশে রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করছেন, "ওদের এহেন উক্তির কারণে তিনি ওদের অবশ্যই শাস্তি দেবেন। তিনি প্রজ্ঞাময় সর্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী।" পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তৎকালীন মুশরিকদের কতিপয় ভ্রান্ত বিশ্বাস ও কু-প্রথার উল্লেখ করার পর আলোচ্য বিষয়টির উল্লেখ করা হয়েছে। ওদের বে-ইনসাফী ও কু-প্রথাগুলোর মধ্যে রয়েছে ঃ

১. তারা খাদ্যশষ্য ও ফলের কিছু অংশ আল্লাহর এবং কিছু অংশ দেব-দেবীর নামে পৃথক করতো। তারপর ঘটনাক্রমে যদি আল্লাহর অংশ থেকে কিছু অংশ দেব-দেবীর অংশে মিশে যেতো, তবে তা এমনি থাকতে দিতো।

পক্ষান্তরে দেব-দেবীর অংশ থেকে যদি আল্লাহর অংশের সাথে মিশে যেতো, তবে তা তুলে নিয়ে দেব-দেবীর অংশ পুরোণ করে দিতো। তাদের বাহানা ছিলো আল্লাহ তো অভাবমুক্ত, তার অংশ কম হলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু প্রতিমাদের অংশ কমে যাওয়া উচিত নয়।

২. যেসব জন্তু দেব-দেবীর নামে ছেড়ে দিতো তাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য বলে ধারণা করতো। এতে প্রতিমার অংশ ছিল তাদের আরাধনা করতো। আর আল্লাহর অংশ ছিল তাঁর সন্তুষ্টির আশা করতো।

৩. মুশরিকরা নিজেদের কন্যা সন্তানকে জীবিত কবর দিতো বা হত্যা করতো।

৪. কিছু শষ্যক্ষেত্র প্রতিমার নামে ওয়াক্‌ফ করে দিতো। এর ফসল শুধু পুরুষরা ভোগ করতো। মহিলাদের দেয়া না দেয়া পুরুষদের এখতিয়ার। মহিলাদের কোনো দাবী করার অধিকার ছিলো না।

৫. চতুষ্পদ জন্তুর বেলায়ও এ একই নিয়ম জারি ছিলো। কোনো কোনো জন্তু কেবল পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট থাকতো।

৬. জন্তুর দুধ দোহন করতে, আরোহণ করতে ও জবেহ্ করতে তারা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতো না।

কোনো জিনিসকে হালাল বা হারাম সাব্যস্ত করতে পারে একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। আল্লাহর নির্দেশ নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে মানবজাতির কাছে পৌছানো হয়েছে। হালাল-হারাম, কল্যাণ-অকল্যাণ, ভাল-মন্দ প্রকৃতপক্ষে একমাত্র আল্লাহই নির্ধারণ করতে পারেন। সৃষ্টির সার্বিক কল্যাণ-অকল্যাণ নির্ধারণ করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই (স্রষ্টাই) সংরক্ষণ করতে পারে, তাই হালাল-হারামের সীমানা নির্ধারণ ক্ষমতা একমাত্র তাঁরই জন্য নির্দিষ্ট। নিজের ইচ্ছেমত কোনো জিনিসকে হালাল-হারাম ঘোষণা করার অধিকার কোনো সৃষ্টির নেই। তা স্থির হতে পারে কেবল রাব্বুল আলামীনের নির্দেশেই। মুশরিকদের এভাবে হালাল-হারাম ঘোষণার অনধিকার চর্চার ফলে তৎকালীন নারী সমাজকে এভাবে নানান দিক থেকে বঞ্চিত করা হতো। একবিংশ শতাব্দির এই কথিত সভ্য যুগেও যে বা যারাই মানব কল্যাণ, মানবাধিকার, নারীর অধিকার ও মর্যাদা এবং শিশুর অধিকার সংরক্ষণের জন্য নিজস্ব বিধি-বিধান প্রয়োগের ব্যর্থ চেষ্টায় শক্তি-সামর্থ ব্যয় করবে তারাও যে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে উপনীত হতে পারবে না, তা এই অতীত ইতিহাস থেকেই অনুমান করা যায়।

সার্বিক মানব কল্যাণ ও মানবাধিকার নিশ্চিত হতে পারে একমাত্র রাব্বুল আলামীনের দেয়া বিধি-বিধানের মাধ্যমেই। মানবেতিহাস এ অমোঘ সত্যের জাজ্জ্বল্যমান সাক্ষী। সুতরাং নতুন করে তা পুনঃ পরীক্ষা করে দেখার কোনো প্রয়োজন নেই। পরীক্ষিত জিনিসকে আরও পরীক্ষা করে দেখতে গেলে কেবল সময়েরই অপচয় হতে পারে, তাতে কোনোই ফলোদয় হবে না। বিশ্বের সচেতন বিবেক যত তাড়াতাড়ি এ মহাসত্যকে স্বীকার করে নেবে, তত দ্রুত তারা প্রকৃত কল্যাণের দিকে এগুতে সক্ষম হবে। আল্লাহ তাঁর প্রিয় সৃষ্টি মানব জাতির পরিচালনা-ক্ষমতাসম্পন্ন বিবেককে এ দিকে হিদায়াত করুন। আর মুসলিম মিল্লাতকে দিন তাঁর পক্ষ থেকে প্রকৃত সত্যানুভূতি, আত্মসচেতনতা ও দায়িত্ববোধ, আর বিশ্ব মানুষকে সত্য ও কল্যাণের পথে নিয়ে যাওয়ার যোগ্যতা। আমীন!

তেষট্টি

وَيَادَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلاَ مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظَّالِمِيْنَ (الاعراف : ١٩)

"ও আদম! তুমি আর তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর। তোমরা দু'জনেই যেখান থেকে ইচ্ছা খাও, কিন্তু এ গাছটির কাছেও যেয়ো না। তাহলে তো তোমরা যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।"–(সূরা আল আ'রাফ ঃ ১৯)

আল্লাহর হুকুমের অবাধ্যতায় নারী-পুরুষ উভয়কেই চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়

আলোচ্য আয়াতে পৃথিবীর প্রথম নর-নারীর বাসস্থান ও অন্ন সংস্থান সম্পর্কিত নির্দেশের উল্লেখ রয়েছে। পূর্ববর্তী কয়েকটি আয়াতে মানব সৃষ্টির ইতিহাস আলোচনা করা হয়েছে। এ প্রসংগে সূরা আ'রাফের এগার নম্বর আয়াত থেকে আঠার নম্বর আয়াত পর্যন্ত দেখা যেতে পারে। এ আয়াতগুলোতে মানব সৃষ্টির ইতিহাস ও শয়তানের শত্রুতার সূচনার বিষয় বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতটির মর্মার্থ বুঝার জন্য পূর্ববর্তী আয়াত সম্পর্কে জানা আবশ্যক। আল্লাহ তা'আলা তাতে বলেন, "আমি তোমাদের সৃষ্টির সূচনা করলাম, তারপর তোমাদের আকৃতি দান করলাম ; অতপর ফেরেশতাদের বললাম, আদমকে সিজদা করো। এ নির্দেশ অনুযায়ী সবাই সিজদা করলো কিন্তু ইবলীস করলো না—সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলো না। আল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন, আমি যখন তোকে সিজদা করতে হুকুম দিলাম তখন তোকে সিজদা করতে বাধা দিলো কিসে ?" সে বললো, "আমি তো ওর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আমাকে সৃষ্টি করেছো আগুন থেকে আর ওকে সৃষ্টি করেছো মাটি থেকে।" তিনি বললেন, "ঠিক আছে তুই এখান থেকে নেমে যা। এখানে অহংকার করার অধিকার তোর নেই। বের হয়ে যা। তুই তো ওদেরই অন্তর্ভুক্ত যারা নিজেরাই নিজেদের লাঞ্ছিত করতে চায়।" সে বললো, "আমাকে সেই দিন পর্যন্ত অবকাশ দাও যেদিন ওদের উঠানো হবে।" তিনি বললেন, "তোকে অবকাশ দেয়া হলো।" সে বললো, "তুমি যেমন আমাকে গোমরাহীতে নিক্ষেপ করেছো, আমিও তেমনি তোমার সরল-সত্য পথে ওদের জন্য ওঁত পেতে বসে থাকবো, ওদের সামনে-পেছনে, ডানে-বাঁয়ে সবদিক থেকে ঘিরে ধরবো—ওদের অধিকাংশকে তুমি শোকর-গুজার পাবে না।" আল্লাহ বললেন, "বের

হয়ে যা তুই এখান থেকে লাঞ্ছিত ও ধিকৃত হয়ে। নিশ্চিত জেনে রাখ, এদের মধ্য থেকে যারাই তোর অনুসরণ করবে তাদেরকে এবং তোকে দিয়ে জাহান্নাম ভরে দেবো।"

আলোচ্য আয়াতের পূর্বের আয়াতগুলোতে আদম সৃষ্টি ও শয়তানের অবাধ্যতা এবং বনী আদমের সাথে শয়তানের শত্রুতার সূচনা সম্পর্কে উপরিউক্ত কথাগুলো বলা হয়েছে। অতপর এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ)-কে লক্ষ্য করে তার চির শত্রু শয়তানের চক্রান্ত থেকে বেঁচে থাকার জন্য সাবধানতা অবলম্বনের পথ বাতলে দিয়েছেন। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আদমের সাথী হিসেবে হাওয়া (আ)-কে সৃষ্টি করে তাদের স্বামী-স্ত্রী হিসেবে জান্নাতে বসবাস করার নির্দেশ দিয়ে বললেন, "ও আদম! তুমি তোমার স্ত্রীকে নিয়ে জান্নাতে বসবাস কর। আর জান্নাতের যেখান থেকে ইচ্ছা পানাহার কর। কিন্তু এ গাছটির ধারেও যেয়ো না—তাহলে তোমরা উভয়ে যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে।"

সূরা আল বাকারার ৪র্থ রুকূ'তেও বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। সেখানে আলোচ্য আয়াতটির সাথে এ আয়াতের হুবহু মিল রয়েছে। সূরা আল বাকারার ৩৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَقُلْنَا يٰادَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلاَ مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ○ (البقرة : ٣٥)

"আর আমি বললাম, "ও আদম ! তুমি তোমার স্ত্রীকে নিয়ে জান্নাতে বসবাস করো, আর দু'জনে এ থেকে স্বাচ্ছন্দে পানাহার করো। তবে এ গাছটির ধারেও যেয়ো না—তাহলে তোমরা উভয়েই যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ৩৫)

একই বিষয়ের বর্ণনায় উপরোক্ত সূরা আল বাকারা, সূরা আল আরাফের দু'টো আয়াতেই জান্নাতে বসবাসের নির্দেশনায় আল্লাহ তা'আলা সরাসরি নির্দেশ দিয়েছেন হযরত আদম (আ)-কে ; আর এ নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত করেছেন তার স্ত্রীকে। বলেছেন ঃ

اُسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ

"তুমি বসবাস করো তোমার স্ত্রীকে নিয়ে জান্নাতে" লক্ষণীয় যে, এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বসবাসের ব্যাপারে কেবল আদম (আ)-কেই সম্বোধন করেছেন। এ ব্যাপারে উভয়কে সম্বোধন করা হয়নি। আয়াতে বসবাসের ও

জীবন ধারণের ক্ষেত্রে আদমকেই উদ্দেশ্য করে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, কারণ, হাওয়া (আ) ছিলেন আদম (আ)-এর অধীন। আয়াতের পরবর্তী অংশে খানা-পিনার বিষয়ে উভকেই সম্বোধন করা হয়েছে। আয়াতের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, স্ত্রীগণের থাকার ব্যবস্থা ও নিয়ন্ত্রণ থাকবে স্বামীর উপর, কিন্তু আল্লাহর বিধি-নিষেধ মেনে চলার ব্যাপারে উভয়ই স্বতন্ত্রভাবে দায়ী। স্ত্রীর অবস্থান সংক্রান্ত যাবতীয় দায়-দায়িত্ব স্বামীর উপর ন্যস্ত হলেও আল্লাহর হুকুম-আহকাম পালনের ব্যাপারে উভয়কেই সম্বোধন করা হয়েছে বিধায় এ বিষয়ে স্বামী-স্ত্রী স্বতন্ত্রভাবে নিজ নিজ কৃতকর্মের জন্য আল্লাহর কাছে দায়ী।–(তাফসীরে মাযহারী অবলম্বনে)

আল্লাহ তা'আলা আদম-হাওয়ার বাসস্থান ব্যবস্থার সমাধান স্বরূপ এ নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাও এতে বলে দেয়া হয়েছে। আর বলে দেয়া হয়েছে এসবের সীমারেখাও। আল্লাহর দেয়া সীমারেখা লংঘন করা হলে তার পরিণতি সম্পর্কেও সাবধান করে দেয়া হয়েছে।

সূরা আল আরাফের ২০নং আয়াত থেকে ২২নং আয়াত পর্যন্ত তরজমা থেকে পরবর্তী অবস্থা বর্ণিত হয়েছে।

তারপর শয়তান তাদের উভয়কে (আদম-হাওয়া) ওয়াস্‌ওয়াসা দিল, যাতে তাদের সামনে প্রকাশ করে দেয় (তাদের লজ্জাস্থান), যা তাদের কাছে গোপন ছিল। অর্থাৎ এমন ওয়াসওয়াসা দিল যাতে করে আদম-হাওয়ার বেহেশতী লেবাস থেকে তারা বঞ্চিত হয়ে পড়ে। তারা বিবস্ত্র হয়ে পড়ে। সে বললো, "তোমাদের রব এ গাছ থেকে নিষেধ করার কারণ একমাত্র এই যে, এতে তোমরা ফেরেশতা হয়ে যাবে অথবা, চিরন্তন জীবন লাভ করে বসবে। সে তাদের উভয়কে কসম করে বললো, "আমি তোমাদের জন্য অবশ্যই কল্যাণকামী" এভাবে সে তাদের প্রতারণার জালে আবদ্ধ করে ফেললো। শেষ পর্যন্ত যখন তারা উভয়ে ঐ গাছের স্বাদ আস্বাদন করলো, তাদের গোপন অঙ্গসমূহ তাদের সামনে খুলে গেল।

তারা নিজেদের অঙ্গ জান্নাতের পাতা দিয়ে ঢাকতে লাগলো। তখন তাদের রব তাদের ডেকে বললেন, আমি কি তোমাদের ঐ গাছটি থেকে নিষেধ করিনি? আর তোমাদের বলিনি যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু ?"

মানুষের চির শত্রু শয়তান আদম-হাওয়াকে প্রতারিত করে বিপদে ফেলার জন্য তাদের হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে কসম করে তাদেরকে আল্লাহর কথা অমান্য করাতে সক্ষম হলো। তারা উভয়ে শয়তানের ধোঁকায় পড়ে নিষিদ্ধ গাছের ফল

খেলেন। অমনি তাঁদের বেহেশতী লেবাস খুলে গেলে তাঁরা লজ্জাস্থান ঢাকার জন্য জান্নাতী গাছের পাতা শরীরে ধারণ করলেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, সাধারণত একথা প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত যে, শয়তান প্রথমে বিবি হাওয়াকে প্রতারিত করতে সক্ষম হয়েছিল। পরে তাকে দিয়ে আদম (আ) -কে প্রতারিত করা হয়েছিল। কিন্তু কুরআন থেকে জানা যায় যে, আদম-হাওয়া উভয়কেই একই সময়ে শয়তান প্রতারিত করেছিল। কুরআন বলে ঃ

فَدَلَّهُمَا بِغُرُوْرٍ ج فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا

"সে দু'জনকেই প্রতারণার জালে আবদ্ধ করে ফেললো, আর যখন দু'জনেই গাছটির স্বাদ আস্বাদন করলো তখন তাদের উভয়ের সামনে উভয়ের লজ্জাস্থান খুলে গেল।"–(সূরা আল আ'রাফ ঃ ২২)

শয়তান কর্তৃক আদম-হাওয়ার প্রতারিত হওয়ার ইতিহাসের একথাটি কুরআনে সুস্পষ্টভাবেই বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু শয়তান প্রথমে বিবি হাওয়াকে প্রতারিত করেছে, অতপর তারই মাধ্যমে আদম (আ)-কে প্রতারিত করা হয়েছে। একথাটি গুরুত্ব সহকারে লক্ষ্য করার বিষয়। কারণ এতে করে নারী জাতির নৈতিক, আইনগত ও সামাজিক মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করার ব্যাপারে সাংঘাতিক কাজ করেছে। আর এতে করে ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত করার চেষ্টা করা হয়েছে যে, মানুষের যাবতীয় বিপর্যয়ের দ্বার উন্মুক্ত হওয়ার পেছনে নারীরা দায়ী। আল-কুরআনের উপরোক্ত আয়াতে মূলতঃ এ ধরনের কাল্পনিক কথার প্রতিবাদ করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে আল্লাহর নাফরমানী করলে নারী-পুরুষ উভয়কেই চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়।

–(তাফহীমুল কুরআন অবলম্বনে)

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ○ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءِ ط بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ○(الاعراف : ٨٠ ـ ٨١)

"আর লূতকে আমি নবী করে পাঠালাম। সে তার জাতিকে বললো, তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ করছো যা তোমাদের আগে সারা বিশ্বে কখনো কেউ করেনি ? তোমরা যৌনবাসনা চরিতার্থ করার জন্য স্ত্রীদের ছেড়ে পুরুষদের কাছে গমন করছো। আসলে তোমরা একেবারেই সীমা লঙ্ঘনকারী জাতি।"–(সূরা আল আ'রাফ ৮০-৮১)

পৃথিবীর প্রথম জঘন্য অশ্লীলতা ও সেজন্য আল্লাহ্‌র গযব

হযরত লূত (আ) ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র। ইব্‌রাহীম (আ)-এর পরিবারের মধ্যে শুধু সহধর্মিণী বিবি সারা ও ভ্রাতুষ্পুত্র লূত মুসলমান হয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত ইবরাহীম (আ) তাদেরকে নিয়ে মাতৃভূমি ইরাক থেকে হিজরত করে সিরিয়ায় চলে যান। হযরত লূত (আ) সিরিয়া, ফিলিস্তিন ও মিশর ভ্রমণ করে ইসলামী দাওয়াত ও আন্দোলনের অভিজ্ঞতা লাভ করেন। অতপর তাঁকেও নবুয়ত দান করে আল্লাহ্ তা'আলা জর্ডান ও বায়তুল মোকাদ্দাসের মধ্যবর্তী সাদুমের অধিবাসীদের হেদায়েতের জন্য প্রেরণ করেন। হযরত লূত (আ) এখানেই অবস্থান করতেন। এ এলাকার ভূমি ছিল খুবই উর্বর ও শস্য-শ্যামল। সর্বপ্রকার শস্য ও ফলের প্রাচুর্য ছিল এ জায়গায়। কুরআনের ভাষায় মানুষের সাধারণ অভ্যাস হচ্ছে ঃ

كَلَّآ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰٓى ○ اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى ○(العلق : ٦ـ٧)

"মানুষ যখন দেখে যে, সে কারো মুখাপেক্ষী নয়, তখন সে অবাধ্যতা শুরু করে দেয়।"–(সূরা আল আলাক ঃ ৬-৭)

হযরত লূত (আ)-এর জাতির সামনেও আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় নিয়ামতের দ্বার খুলে দিয়েছিলেন। তারাও মানুষের সাধারণ অভ্যাস অনুযায়ী ধনৈশ্বর্যের নেশায় মত্ত হয়ে পড়ে। তারা বিলাস-ব্যসন, কাম-প্রবৃত্তি ও লোভ-লালসার জালে এমনভাবে আবদ্ধ হয়ে পড়ে যে, লজ্জা-শরম ও ভাল-মন্দের স্বভাবজাত

পার্থক্যও বিস্মৃত হয়ে যায়। তারা এমন প্রকৃতি বিরুদ্ধ নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়ে পড়ে যা হারাম ও গুনাহর কাজ তো বটেই, অধিকন্তু তা সুস্থ স্বভাবের কাছে ঘৃণ্য এবং রুচি বিরুদ্ধও বটে। রুচিবান মানুষ তো দূরের কথা সাধারণ জন্তু-জানোয়ারও এ ধরনের আচারণের কাছেও যায় না। তারা নারীর পরিবর্তে পুরুষকে দিয়ে যৌন ক্ষুধা মিটায়।

হযরত লূত (আ) তার জাতিকে এ ধরনের জঘন্য, ঘৃণ্য, স্বভাব বিরুদ্ধ ও রুচীহীনতার কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য হুশিয়ার করে দিয়ে বলেছিলেন ঃ

اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ-

"তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজে প্রবৃত্ত হচ্ছো যা তোমাদের পূর্বে পৃথিবীর কেউ করেনি।"–(তাফ্সীরে মা'আরেফুল কুরআন)

কুরআনের অন্যান্য স্থানে হযরত লূত (আ)-এর জাতির আরো কোনো কোনো নৈতিক অপরাধের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এখানে উল্লেখ করা হয়েছে তাদের এমন এক অপরাধের কথা যা পৃথিবীর ইতিহাসে কখনো কোনো মানুষ থেকে প্রকাশ পায়নি এবং যে কারণে সে জাতির উপর আল্লাহর ভীষণ আযাব নাযিল হয়েছিল। এ প্রকৃতি বিরুদ্ধ, ঘৃণ্য ও কদর্য কাজের দরুনই তারা দুনিয়ায় অশ্লীলতার স্থায়ী খ্যাতি লাভ করেছে।

আজকের পৃথিবীতে চরিত্রহীন লোকেরা এখনো এমন অপরাধ করেই চলছে। গ্রীক দার্শনিকরা এ জঘন্য অপরাধকে একটি নৈতিক গুণ ও সৌন্দর্যরূপে প্রতীত করার চেষ্টা করেছে। আর তাদের অপরাধে যতটুকু অপূর্ণতা ছিল তা পূরণ করে দিয়েছে ইউরোপ। ইউরোপীয়রা প্রকাশ্যে এ অশ্লীলতার স্বপক্ষে প্রচার কার্য চালায়। এমনকি জার্মানির মত একটি দেশের আইন-পরিষদ এ অশ্লীতাকে বৈধ বলে ঘোষণা দিয়েছে। অথচ এতো এক সুস্পষ্ট ও অনস্বীকার্য সত্য যে, সমমৈথুন একান্তই প্রকৃতি বিরোধী। আল্লাহ তা'আলা সকল জীব- জন্তুর মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ সৃষ্টি করেছেন কেবল বংশ রক্ষার উদ্দেশ্যে। কিন্তু মানবজাতির ব্যাপারে বংশ রক্ষা ছাড়াও আরেকটি মহৎ উদ্দেশ্য রয়েছে। আর তা হচ্ছে স্ত্রী-পুরুষ মিলে গঠন করবে পরিবার এবং পরিবারের ভিত্তিতে গড়ে উঠবে সমাজ ও সভ্যতা। প্রধানতঃ এ দু'টো উদ্দেশ্যেই মানবজাতিকে স্ত্রী-পুরুষ করে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ ও ভালবাসা স্থাপন করা হয়েছে।

নারী-পুরুষের দৈহিক গঠন ও মনস্তত্ব নিজেদের পারস্পরিক উদ্দেশ্য সম্পন্ন করার উপযোগী করে তৈরি করা হয়েছে। তাদের পারস্পরিক মিলন ও সংগমে

রক্ষিত হয়েছে স্বাদ-আস্বাদনের অপূর্ব ব্যবস্থা—যা যুগপৎভাবে যেমন করে আকর্ষণ তেমনি হয় আকর্ষিত ও উদ্বুদ্ধ। একাজের বিনিময়ও তারা লাভ করে তা থেকে। কিন্তু যে ব্যক্তি বা যে জাতি প্রকৃতির এ পরিকল্পনার বিরুদ্ধে কাজ করে সমমৈথুনের সাহায্যে যৌন স্বাদ আস্বাদন করে, সে বা তারা একই সাথে কয়েক প্রকারের অপরাধ সংঘটিত করে থাকে। এক, নিজেই নিজের গঠন-প্রকৃতি ও মনস্তাত্বিক প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ করে আর তাতে এক বিরাট ও চরম বিকৃতি ও বিপর্যের সৃষ্টি করে ; যার ফলে উভয়ের দেহ-মন ও নৈতিকতার উপর অত্যন্ত খারাপ প্রভাব বিস্তার লাভ করে। দুই, সে প্রকৃতির সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ ও বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধ করে। কারণ যে স্বাদ আস্বাদন লাভ করার সঙ্গে কতগুলো দায়িত্ব ও অধিকার পূরণকে অনিবার্য করে দেয়া হয়েছে সে ঐ স্বাদ আস্বাদন করতে চায়, কিন্তু কোনো দায়িত্ব ও অধিকার পূরণকে বাদ দিয়ে। তিন, সে মানব সমাজের সাথে প্রকাশ্যে বিশ্বাসঘাতকতা করে। সে সমাজ প্রতিষ্ঠিত তমদ্দুনিক প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে উপকার লাভ করে কিন্তু সে অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্যের বোঝা বহনের পরিবর্তে পূর্ণ স্বার্থপরতা সহকারে নিজের শক্তির এমন ব্যবহার করে যা সভ্যতা ও নৈতিকতার জন্য কোনো কল্যাণ বয়ে আনে না। সে নিজের সাথে একজন পুরুষের অস্বাভাবিক যৌন ক্রিয়া করে অন্ততঃ দু'জন নারীর যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার নৈতিক পতন ও বিপর্যয়ের দুয়ার খুলে দেয়।

জাতির এ পশুত্বের চেয়েও নিকৃষ্ট ধরনের নির্লজ্জতা ও অশ্লিলতা এতই নিম্নস্তরে পৌছে গিয়েছিলো হযরত লূত (আ) তাদের এ কাজ থেকে বিরত থাকতে বললে তারা প্রতি উত্তরে লূত (আ)-কে বললো, "এরা তো বড্ড পবিত্রতা জাহির করছে, তোমরা এদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বের করে দাও।"

এভাবে তারা নিজেদের মধ্যে লূত (আ)-সহ তার সঙ্গী-সাথীদের মত নেক চরিত্রের লোকদের (যারা তাদের কল্যাণের দিকে ডাকছিলো এবং পাপ ও অন্যায় কাজের জন্য আপত্তি তুলছিলো) বরদাশ্ত করতে পারছিলো না। কারণ তাদের চোখে তো তাদের বদকাজগুলো ভাল কাজরূপেই দেখাচ্ছিলো। তারা পাপে এতবেশী মগ্ন হয়ে পড়েছিল যে, সংশোধনের কোনো প্রচেষ্টাই সহ্য করতে পারছিলো না। পাক-পবিত্রতার এ কতিপয় উপাদান (লূত ও তার সঙ্গী-সাথীগণ)-কে বহিষ্কার করে দিতে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেছিলো। এ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছে যাওয়ার পর আল্লাহর তরফ থেকে তাদের ধ্বংস করে দেয়ার সিদ্ধান্ত কার্যকর হলো। কেননা যে সমাজে সামগ্রিকভাবে পবিত্রতার এ

সামান্যতম উপাদান অবশিষ্ট থাকে না, সে সমাজকে দুনিয়ার বুকে বাঁচিয়ে রাখার যুক্তিসঙ্গত কোনো কারণই থাকতে পারে না। পঁচা ফলের ঝুড়ির মধ্যে যতক্ষণ পর্যন্ত কয়েকটি ভাল ফল অবশিষ্ট থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত ঝুড়িটিকে ধরে রাখা যায় ; কিন্তু সেই ভাল ফল কয়টি যখন তা থেকে বের করে নেয়া হয়, তখন ডাষ্টবিনে নিক্ষেপ করা ছাড়া এ ঝুড়ির আর কোনো উপযুক্ত স্থান থাকতে পারে না।–(তাফহীমুল কুরআন)

আল্-কুরআন ওদের শাস্তি সম্পর্কে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে উল্লেখ করেছে। যেমন এখানে সূরা আ'রাফের ৮৪নং আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ ○

"আমি তাদের উপর পাথর বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম। দেখ, এসব অপরাধীর পরিণতি কেমন ছিল।"

এখানে তো সংক্ষেপে এতটুকুই বলা হয়েছে। সূরা হূদে এ আযাবের বিস্তারিত অবস্থা উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

فَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ ○ –(هود : ٨٢)

"অতপর যখন আমার নির্দেশ এসে গেল আমি বস্তিটিকে উল্টে দিলাম, আর তাদের উপর বর্ষণ করলাম প্রস্তর স্তরে স্তরে।"–(সূরা হূদ ঃ ৮২)

সূরা হিজরের আয়াতে এ আযাব বর্ণনার পূর্বে বলা হয়েছে ঃ

فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِيْنَ ○(الحجر : ٧٣)

"সূর্যোদয়ের সময় বিকট নাদ তাদের পাকড়াও করেছিলো।"

মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ) বলেন, এতে জানা যায় যে, প্রথমে আকাশ থেকে একটি বিকট চিৎকার ধ্বনী এবং তারপর অন্যান্য আযাব এসেছে। বাহ্যতঃ বুঝা যায় চিৎকার ধ্বনীর পর প্রথমে ভূ-খণ্ড উল্টিয়ে দেয়া হয়। অতপর তাদেরকে অধিকতর লাঞ্ছিত করার জন্য উপর থেকে পাথর বর্ষণ করা হয়। তাছাড়া এমনও হতে পারে প্রথমে পাথর বৃষ্টি বর্ষণ করা হয় এবং পরে ভূ-খণ্ড উল্টিয়ে দেয়া হয়। কারণ কুরআনের বর্ণনা পদ্ধতিতে আগে উল্লিখিত বিষয় আগে সংঘটিত হওয়া অপরিহার্য নয়। লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ের উপর পতিত

ভয়াবহ আযাবসমূহের মধ্যে ভূ-খণ্ড উল্টিয়ে দেয়ার আযাবটি তাদের অশ্লীল ও নির্লজ্জ কাজের সাথে বিশেষ সংগতিও রাখে। কারণ তারা স্বাভাবিক ও সিদ্ধ পন্থার বিপরীত কাজ করেছিলো।

সূরা হূদে বর্ণিত আয়াতসমূহের শেষে কুরআনে পাকে আরবদের হুশিয়ার করে একথাও বলা হয়েছে ঃ

وَمَا هِيَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ ○ (هود : ٨٣)

"উল্টে দেয়া বস্তিগুলো এসব যালিমদের থেকে বেশি দূরে নয়।"

সিরিয়া গমণের পথে সবসময়ই সেগুলো তাদের চোখের সামনে পড়ে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তারা তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না।

সেই ভয়াবহ দৃশ্য পৃথিবীতে আজও বিদ্যমান রয়েছে। বায়তুল মোকাদ্দাস ও জর্ডান নদীর মাঝখানে আজও এ ভূ-খণ্ডটি 'লূত সাগর' বা 'মৃত সাগর' নামে পরিচিত। এর ভূ-ভাগ সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে অনেক নীচে অবস্থিত। এর একটি বিশেষ অংশ নদীর আকারে এমন আছে যার পানি আশ্চর্য ধরনের, যাতে মাছ, ব্যাঙ ইত্যাদি জীবিত থাকতে পারে না। এ কারণেই একে 'মৃত সাগর' বলা হয়।–(মা'আরেফুল কুরআন)

এভাবে আল্লাহ তা'আলার দেয়া স্বাভাবিক নিয়ম হলো মানব বংশ রক্ষা সমাজের প্রাথমিক ইউনিট পরিবার গঠন ও মানব সভ্যতার বিকাশ সাধনে নর-নারীর যৌথ ভূমিকা রাখা। সেজন্যে আল্লাহ তা'আলা নারী-পুরুষ সৃষ্টি করে তাদের মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণ, প্রেম ও ভালবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। আর উভয়ের সম্পর্ক স্থাপন নীতি ও তা রক্ষার সীমারেখা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। কিন্তু মানুষ আল্লাহর দেয়া সেই সীমারেখা প্রথম লঙ্ঘন করেছিলো লূত (আ)-এর সময়ে। আর পরিণামে তাদের উপর এমন ভয়ংকর আযাব নেমে এসেছিলো যার নিদর্শনাদি আজও পৃথিবীর মানুষের সামনে রয়েছে। আল-কুরআন আজকের বিশ্ব সমাজকে সেদিকটির প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে উক্ত আয়াতসমূহে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো আজকের বিশ্বের কথিত বুদ্ধিজীবি ও প্রাচুর্যের সমাজ, এমনকি সঠিক জ্ঞানের অভাবে মুসলিম সমাজ আল্লাহর বিধানের অনুসরণ এবং ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণে চরম উদাসীনতার পরিচয় দিয়ে চলছে।

পঁয়ষট্টি

فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَهْلَهٗٓ اِلَّا امْرَاَتَهٗ ز كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ۝ وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ط

فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ ۝ (الاعراف : ٨٣-٨٤)

"অতপর আমি তাকে [লূত (আ)-কে] ও তার আহালকে নাজাত দিলাম। কিন্তু তার স্ত্রীকে নয়; সেতো পেছনের লোকদের সাথেই রয়ে গেল। আমি তাদের উপর পাথর বৃষ্টি বর্ষণ করলাম। তারপর দেখ, ওসব অপরাধীর পরিণতি কেমন হয়েছে।"–(সূরা আল আ'রাফ ঃ ৮৩-৮৪)

অসাধু নারী সাধু পুরুষের স্ত্রী হলেও তার নাজাত নেই

আল্লাহ তা'আলা উপরিউক্ত আযাব (পূর্বোক্ত আয়াত প্রসঙ্গে বর্ণিত) দিয়ে লূত (আ)-এর পুরো অবাধ্য উচ্ছৃঙ্খল জাতিকে ধ্বংস করে দিলেন। লূত (আ)-এর জাতির লোকেরা যখন তাঁর অবাধ্য হয়ে কেবল সেই অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতায় ডুবেই রইলো না, অধিকন্তু তারা এহেন মারাত্মক নৈতিকতা বিধ্বংসী কাজের বাধা সৃষ্টিকারী লূত (আ) ও তাঁর কতিপয় সঙ্গী-সাথীকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করলো ; তখন তাদের উপর আল্লাহর আযাব অবধারিত হয়ে গেল। তাদের আযাব থেকে লূত (আ) ও তাঁর অল্প কতক অনুসারীকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহ তা'আলা লূত (আ)-কে নির্দেশ দিলেন তিনি যেন শেষ রাতে তাঁর এক স্ত্রী ছাড়া সকল আহ্‌ল ও সংঙ্গী-সাথীদের নিয়ে ঐ স্থান ত্যাগ করেন। আর তারা যেন পেছনের দিকে ফিরে না তাকান। কারণ, লূত (আ) সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সাথে সাথেই মুহূর্ত বিলম্ব না করে আযাব এসে যাবে।

হযরত লূত (আ) আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক তাঁর এক স্ত্রী ছাড়া বাকী আহলদের নিয়ে শেষ রাতে সাদুম ত্যাগ করেন। তাঁর স্ত্রী সম্পর্কে দু' রকমের কথা আছে। এক, সে তাঁদের সাথে রওয়ানাই করেনি। দুই, সে তাঁদের সাথে রওয়ানা করে কিছু দূর গিয়ে আল্লাহর হুকুমের বিপরীতে পেছনের দিকে অপরাধীদের দেখতে চেয়েছিলো। অমনি ওদের সাথে তাকেও আযাব এসে পাকড়াও করলো।

কুরআনে আল্লাহর বাণী,

فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَهْلَهٗٓ اِلَّا امْرَاَتَهٗ ط (الاعراف : ٨٣)

"তার স্ত্রী ছাড়া তাকে ও তার আহলকে আমি নাজাত দিলাম।" এখানে 'আহ্‌ল' বলতে কাদের বুঝানো হয়েছে সে সম্পর্কে মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ) তাঁর তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআনে বলেন, 'আহ্‌ল' পরিবারকে বলা হয়। কোনো কোনো তাফসীরকারকের মতে তাঁর পরিবারে তখন মাত্র দু'টো কন্যা মুসলমান হয়েছিলো। কিন্তু তাঁর স্ত্রী মুসলমান হয়নি। আল-কুরআনের অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে فَمَا وَجَدْنَا فِيْهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ অর্থাৎ 'সমস্ত জনবসতির মধ্যে একটি ঘর ছাড়া কোনো মুসলমান ছিল না।' এতে বুঝা যায় যে লূত (আ)-এর ঘরের লোকই শুধু মুসলমান ছিল। সুতরাং তারাই আযাব থেকে মুক্তি পেল। অবশ্য তাদের মধ্যে তাঁর স্ত্রী অন্তর্ভুক্ত ছিল না। কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন ঃ 'আহ্‌ল' অর্থ ব্যাপক। এতে পরিবারের লোকজন এবং অন্যান্য মুসলমানকেও বুঝানো হয়েছে। মোটকথা, মাত্র অল্প ক'জনই মুসলমান ছিল। তাদেরকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহ তা'আলা লূত (আ)-কে শেষ রাতে বেরিয়ে পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন।-(মা'আরেফুল কুরআন)

হযরত লূত (আ)-এর স্ত্রী নবী স্বামীর অবাধ্য ও আল্লাহর নাফরমানদের আদর্শে বিশ্বাসী—তথা আল্লাহদ্রোহীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল বিধায় নবীর স্ত্রী হয়েও আল্লাহর অযাব থেকে রক্ষা পায়নি। আল্লাহর সামগ্রিক আযাব তাকেও গ্রাস করে নিয়েছিলো। ইসলামের ইতিহাসে এমনি বহু নযীর রয়েছে। যেমন হযরত নূহ (আ)-এর ছেলে 'কেন্‌-আন্‌' নবী পিতার অবাধ্য ছিল বিধায় সর্বগ্রাসী প্লাবন তাকেও ধ্বংস করে দিয়েছিলো। অবাধ্য হলেও তো আপন ছেলে। তাই নবী নূহ্‌ (আ) তার নাজাতের জন্য আল্লাহর কাছে আরয করে বলেছিলেন ঃ اِنَّ ابْنِيْ مِنْ اَهْلِيْ 'আমার ছেলে তো আমার আহ্‌ল'। উত্তরে রাব্বুল আলামীন বললেনঃ اِنَّهٗ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ 'সে তো তোমার আহল নয়।' এতে বুঝা যায় আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্য হয়ে নবী-রাসূলের একান্ত আপনজন হলেও নিস্তার পাওয়া সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে হযরত ইবরাহীম (আ) অগ্নি পূজক আযরের ছেলে হয়েও মুসলিম মিল্লাতের পিতা হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিলেন। সুতরাং কোনো মানুষের সম্পর্ক নয় বরং আল্লাহ ও রাসূলের সম্পর্ক তাদের হুকুম ও আদর্শ মেনে চলার মধ্যে নাজাত এবং অমান্য করার মধ্যে আযাব ও শাস্তি অবধারিত পরিণতি।

ছেষট্টি

اَلْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ يَاْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفِ وَيَقْبِضُوْنَ اَيْدِيَهُمْ ط نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ ط اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ○ (التوبة : ٦٧)

"মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক মহিলা সকলেই পরস্পরের অনুরূপ ভাবাপন্ন। তারা অসৎকাজের প্ররোচনা দেয়, সৎকাজে বাধা দেয় এবং (আল্লাহর পথে ব্যয় করার ও কল্যাণজনক কাজে) তাদের হাত বন্ধ করে রাখে। তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে, ফলে আল্লাহও তাদের ভুলে গেছেন। নিশ্চয় মুনাফিকরাই ফাসিক।"–(সূরা আত তাওবা ঃ ৬৭)

মুনাফিক পুরুষ-মহিলা উভয়ই সমাজে অপকর্ম ছড়ায় আর ভাল ও ন্যায় কাজে বাধার সৃষ্টি করে

আলোচ্য আয়াতে মুনাফিক নারী-পুরুষের মনোভাব ও তাদের কার্যক্রমের সামাজিক প্রভাব সম্পর্কে বলা হয়েছে মুনাফিক ব্যক্তি চাই সে পরুষ হোক, অথবা হোক স্ত্রী; তাদের উভয়ের স্বভাব স্বরূপ অভিন্ন। তাদের কার্যক্রমের বৈশিষ্ট্যই এমন যে, তারা সমাজে অন্যায় ও গর্হিত কার্যক্রম ছড়িয়ে দেয়— সমাজকে অন্যায় ও মন্দ কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। অথচ সমাজ সদস্যদের ভাল ও ন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে।

মুনাফিক তো তাকেই বলা হয় যার মধ্যে (نِفَاق) 'নিফাক' বা 'দ্বিমুখিতা' থাকে।

اَلَّذِىْ لَايُطَابِقُ ظَاهِرَه بَاطِنَه

অর্থাৎ যার ভিতরের অবস্থা তার বাহ্যিক অবস্থার অনুরূপ নয়। অর্থাৎ ভিতরের অবস্থাটা খারাপ।

এর মানে যার মনের ভাবধারা ও বাহ্যিক অবস্থা একরূপ নয়। সে-ই মুনাফিক। বস্তুতঃ মুনাফিক সে ব্যক্তি যে প্রকৃতপক্ষে ইসলামে বিশ্বাসী নয়, অথচ নিজেকে সে মু'মিন ও মুসলিমরূপে প্রকাশ করে।

হাদীস শরীফে মুনাফিকের তিনটি লক্ষণ বলে দেয়া হয়েছে। ১. কথা বলবে তো মিথ্যা বলবে, ২. ওয়াদা করলে তার বিপরীত কাজ করবে, ৩. তাকে কোনো কিছুর আমানতদার বানানো হলে সে তাতে খিয়ানত করবে। এ লক্ষণগুলো মুনাফিক পুরুষের মধ্যে যেমন লক্ষ্য করা যাবে, তেমনি মুনাফিক নারীর মধ্যেও এগুলো পাওয়া যাবে।

সূরা আত তাওবার উক্ত আয়াতে বর্ণিত চরিত্র সকল মুনাফিকের মধ্যে সমানভাবে বর্তমান। অন্যায় ও অসত্যের প্রতি আকর্ষণ এবং সত্য ও ন্যায়ের সাথে শত্রুতা তাদের সকলের। কোনো খারাপ কাজ করতে চাইলে তাদের সহানুভূতি, পরামর্শ, সাহস ও সহযোগিতা, সুপারিশ ও প্রশংসা সবকিছুই তারা নিয়োজিত ও উৎসর্গকৃত করবে। তারা আন্তরিকভাবে সেই খারাপ কাজে শরীক হবে, অন্যদেরকেও তাতে শরীক হওয়ার জন্য উৎসাহিত করবে। তাদের কথা ও চাল-চলন থেকে বুঝা যাবে এ অন্যায় অসত্য উৎকর্ষ লাভ করলে তাদের অন্তর যেন আরাম পায় আর চক্ষু শীতল হয়। পক্ষান্তরে সমাজে কেউ কোনো ভাল কাজ করতে শুরু করলে যেন এ খবরটাই তাদের জন্য দুঃসহ হয়ে পড়ে। এর ধারণা করলেও যেন তাদের কলিজা ফেটে যায়। এর প্রস্তাবনা তাদের মোটেই সহ্য হয় না। এরূপ কোনো সৎকাজের প্রতি কাউকেও এগুতে দেখলে তাদের অন্তর-আত্মা কেপে উঠে। তারা তখন সম্ভাব্য সকল পথেই তার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এই ভাল কাজ থেকে তাকে বিরত রাখার জন্য যে কোনো পথ ধরতে বা যে কোনো ব্যবস্থা নিতে তারা মোটেই কুণ্ঠিত হয় না। আর কাজটি সমাজে যাতে সফল হতে না পারে, বিস্তার লাভ না করে, সেজন্য তাদের চেষ্টার সামান্যতম ত্রুটিও করে না।

মোটকথা, অন্যায় কাজের জন্য তারা কারুণের মত ধনী, কিন্তু সত্য ও ন্যায় কাজে তারা একেবারেই গরীব।–(তাফহীমুল কুরআন)

اَلْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ-

এখানে মুনাফিক পুরুষদের সাথে মুনাফিক স্ত্রীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আর উভয়কেই সমান অপরাধী সাব্যস্ত করা হয়েছে। এতে করে যেন তাদের এ বিষয়ে সাবধানতা আসে যে, তাদের পুরুষদের যে করুণ পরিণতি হবে তাদের মহিলাদেরও একই পরিণতি হবে। যদি তারা (নারীরা) স্বতন্ত্রভাবে নিজেদেরকে আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচানোর চেষ্টা না করে। দ্বীনের ব্যাপারে অধীনস্থ

হওয়ার ওযর মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। বরং নর-নারী নির্বিশেষে সকলকেই নিজ নিজ মুক্তির জন্য নিজেকেই চেষ্টা-সাধনা চালিয়ে যেতে হবে। এতে বুঝা যায়, মুনাফিকির খেলায় মহিলাদেরও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল।

–(তাদাব্বুরে কুরআন– মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী)

সাতষট্টি

وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا هِيَ حَسْبُهُمْ ۚ وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ○ (التوبه : ٦٨)

"আল্লাহ ওয়াদা করেছেন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীদের এবং কাফিরদের জন্যে জাহান্নামের আগুনের। তাতে তারা চিরদিন থাকবে। তাই তাদের জন্য যথেষ্ট। তাদের উপর আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন, আর তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী আযাব।"–(সূরা আত তাওবা ঃ ৬৮)

মুনাফিক নর-নারী ও কাফিরদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী জাহান্নাম

আলোচ্য আয়াতে মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীর জন্য আখিরাতের জীবনে কি পরিণতি হবে, সেই হুশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে। মুনাফিক নর-নারী এবং কাফিরদের পরকালীন জীবনের শাস্তি হলো চিরস্থায়ী জাহান্নাম। তারা মূলতঃ এমনি ধরনের শাস্তির যোগ্য। বাস্তবে ইসলামের দাবীদার হওয়া সত্ত্বেও মুনাফিকরা কোনোভাবে বাহ্যিক দাবীর কারণে রেহাই পাবে না। বরং প্রকাশ্য কুফরীর কারণে কাফিররা যেমন চিরদিনের জন্য জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে, ঠিক তেমনিভাবে ইসলামের দাবীদার এসব গাদ্দারদেরও চিরদিনের তরে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত করা হবে।

এ জাহান্নামের শাস্তিই তাদের জন্য যথেষ্ট অথবা তারা জাহান্নামের এমনি শাস্তি পাওয়ারই যোগ্য। এটা হচ্ছে তাদের উপর আল্লাহর লা'নত—অভিসম্পাত।

তাদের এ শাস্তি থেকে রেহাই পাওয়ার যাবতীয় দ্বার রুদ্ধ হয়ে যাবে। এ মুনাফিকরা এমন এক স্থায়ী আযাবে গ্রেফতার হবে যা থেকে তারা কখনো মুক্তি পাবে না।–(তাদাব্বুরে কুরআন)

মুনাফিকরা প্রধানতঃ দু' ধরনের। এক, যারা প্রকৃতপক্ষে ইসলামের বিরোধী হলেও কোনো দুনিয়াবী স্বার্থে বাহ্যিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছিলো।

এরা ইসলাম নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করতো আর নতুন নতুন অপবাদ রটাতো। দুই, দ্বিধা-সংকোচকারী, এরা ইসলামকে তো সত্য দ্বীন মনে করতো বটে কিন্তু প্রথম প্রকারের মুনাফিকদের সাথে মেলামেশা করতো আর তাদের কথা-বার্তায়ও অংশগ্রহণ করতো। অতপর তাদের বিষয়টি প্রকাশ হয়ে পড়লে তারা নানারূপ হীলা-বাহানা করে ওযর পেশ করতো ; বলতো এটা এ কারণে, ওটা এভাবে হয়ে গেছে। তাদের জবাবে বলা হতো, আচ্ছা যদি তোমাদের এসব ওযর গ্রহণ করাও হয়, তাহলেও তো কেবল তারাই রেহাই পেতে পারে যারা অন্যদের কথায় এমনটি করতো। কিন্তু যারা এসব বিশৃঙ্খলা ও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে বেড়ায় এবং অন্তরে ইসলামের শত্রুতা পোষণ করে তারা তো অবশ্যই শাস্তির যোগ্য।–(তাফসীরে হাক্কানী) সর্বাবস্থায় মুনাফিকীর মাধ্যমে মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক মহিলাদের সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির ব্যাপারে পরস্পরের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। ওরা যেন একই নীতি-আদর্শের রঙ্গে রঞ্জিত। ওদের চিন্তা-চেতনা ও কার্যক্রমের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। কাফির ও মুনাফিকদের মধ্যে কার্যতঃ কোনো পার্থক্য নেই বিধায় ওরা উভয় শ্রেণীই চিরস্থায়ী জাহান্নামী।

আটষট্টি

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ط اُولٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ط اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○ (التوبة : ٧١)

"মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন মহিলাগণ পরস্পরের বন্ধু-সাথী। তারা সৎ ও কল্যাণের নির্দেশ দেয় আর অসৎ ও অকল্যাণ থেকে বিরত রাখে, সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এরা তো এমন লোক যাদের প্রতি আল্লাহ অবশ্যই রহমত নাযিল করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, বেশ হিক্‌মত ওয়ালা।"

–(সূরা আত তাওবা ঃ ৭১)

মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন মহিলা সমাজে সৎ ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করে আর অসৎ ও অকল্যাণ প্রতিরোধ করে

নিষ্ঠাবান মু'মিন ও মুনাফিকরা বাহ্যিকভাবে একই ইসলামের অনুসারীরূপে সমাজে বসবাস করে। মুনাফিকরা এমনি তো ইসলামের বাহ্যিক অনুষ্ঠানাদি পালন করে থাকে কিন্তু বাস্তবে এবং প্রকৃতপক্ষে মু'মিন ও মুনাফিকদের আমল-আখলাকে বিরাট পার্থক্য বরং বৈপরিত্য বিরাজ করে। মু'মিনরা ভাল ও কল্যাণমূলক কাজে পরস্পরকে সহায়তা ও সহযোগিতা করে থাকে আর মন্দ ও অকল্যাণকর কাজ থেকে নিজেরা কেবল দূরেই থাকে না বরং সমাজে ওসব কাজে তারা বাধার সৃষ্টি করে। সমাজকে সুশৃঙ্খল রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে থাকে। পক্ষান্তরে, মুনাফিকরা প্রকৃতপক্ষে এর বিপরীত কাজ করে থাকে। তারা করে ন্যায় ও সত্যের প্রতিরোধ আর অসৎ ও অকল্যাণ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। তাদের বাহ্যিক রূপ সমাজকল্যাণধর্মী প্রদর্শিত হলেও প্রকৃতপক্ষে তা বয়ে আনে সমাজের জন্য চরম অকল্যাণ ও অমঙ্গল। এজন্যে সূরা তাওবার ৬৭নং আয়াত এবং এ ৭১নং আয়াতে মুনাফিক ও মু'মিনকে স্বতন্ত্র গোষ্ঠী বা পৃথক উম্মতরূপে বিভক্ত করে প্রকাশ করে দেয়া হয়েছে।

এ দু'টো আয়াতে লক্ষ্য করা যায় যে, মুনাফিকদের পারস্পরিক সম্পর্ক দেখাতে গিয়ে বলা হয়েছে, بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ (পরস্পর একজন থেকে আরেকজন) আর মু'মিনদের সম্পর্ক আলোচনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে, بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ (পরস্পর একে অপরের বন্ধু-সাথী) এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মুনাফিকদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও যোগাযোগ শুধুমাত্র বংশগত সমন্বয় ও উদ্দেশ্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে। কাজেই তার স্থায়িত্ব দীর্ঘ নয় আর না তাতে সেই ফল লাভ করা সম্ভব হতে পারে, যা সম্ভব হয় আন্তরিক ভালবাসা ও আত্মিক সহানুভূতির মাধ্যমে। পক্ষান্তরে মু'মিনগণ একে অপরের আন্তরিক বন্ধু এবং সত্যিকার সহানুভূতিশীল।

–(মা'আরেফুল কুরআন–কুরতুবী থেকে)

মুনাফিকদের পরিচিতি ও আচরণ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তাদের পুরুষ ও মহিলারা সবাই একই চিন্তা-চেতনা লালন করে থাকে। মুনাফিকীর লালনে উভয়ের চেষ্টা-সাধনা অভিন্ন। পক্ষান্তরে ঈমানদার তথা প্রকৃত মু'মিনদের ব্যাপারে বলা হয়েছে তারা ঈমানের দাবী পূরণে পরস্পর একে অপরের সাথী। বন্ধু, সহযোগী হিতাকাঙ্ক্ষী। মু'মিন বান্দারা যখন জান-মাল দিয়ে জিহাদে বের হয়, তখন মু'মিন স্ত্রীরা তাদের অন্তরায় হওয়ার চেষ্টা করে না, বরং তারা আন্তরিকতা সহকারে স্বামীদের উৎসাহিত করে এবং নিজে ত্যাগ-তিতিক্ষা, আন্তরিক দোয়া, নিজের অনাবিল আনুগত্য ও আমানতদারী দিয়ে জিহাদে সহযোগিতা করে থাকে। আর এভাবে নিজেও স্বামীর সাথে জিহাদের প্রতিদানের ভাগী হয়ে থাকে।–(তাদাব্বুরে কুরআন)

মুনাফিকদের অবস্থা হলো তারা অন্যায় ও অসত্যের প্রশিক্ষণ ও প্রতিষ্ঠা করে আর সত্য ও ন্যায়ের বিরোধিতা করে। তারা আল্লাহর পথে ব্যয় থেকে মুষ্টিবদ্ধ থাকে। পক্ষান্তরে মু'মিনরা ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা-অন্যায়ের প্রতিরোধ করে আর যাকাত আদায় করে আল্লাহর পথে ব্যয়ের হাত খোলা রাখে।

আল্-কুরআন বিভিন্ন স্থানে কাফির ও মুনাফিকদের একত্র করেই তাদের ব্যাপারে একই সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। সূরা তওবার ৭৩নং আয়াত উদাহরণস্বরূপ পেশ করা হলো। আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে সম্বোধন করে বলেন ঃ

يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ط وَمَا وٰهُمْ جَهَنَّمُ ط وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ○ (التوبة : ٧٣)

"হে নবী আপনি কাফির এবং মুনাফিকদের সাথে যুদ্ধ করুন। তাদের সাথে কঠোরতা অবলম্বন করুন। তাদের ঠিকানা হলো জাহান্নাম, আর অত্যন্ত খারাপ প্রত্যাবর্তন স্থল।"–(সূরা আত তাওবা ঃ ৭৩)

কুফুরী ও মুনাফিকীতে নারী ও পুরুষ যারাই জড়িত তাদের স্বভাব-চরিত্র ও কার্যক্রম একই রকম। পার্থক্য শুধু নামের ও বাহ্যিকতার। কাফিররা ইসলামের প্রকাশ্য শত্রু ; আর মুনাফিকরা হলো ছদ্ম শত্রু। এতদোভয়ের পুরুষ বা নারীর আদর্শিক ও চারিত্রিক সার্বিক সামঞ্জস্য আছে বিধায় উভয়ের চেষ্টা ও কার্যক্রম যেমন অভিন্ন, উভয়ের পরিণামও সে কারণেই অভিন্ন। সমাজে জনকল্যাণমূলক কাজে যেমন ঈমানদার পুরুষদের যথেষ্ট ভূমিকা থাকে, তেমনি ঈমানদার মহিলাদেরও অনুরূপ ভূমিকা ও উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়। পক্ষান্তরে কাফির ও মুনাফিক পুরুষরা যেমন—সমাজে অসৎ কার্যক্রম ছড়ায় তেমনি কাফির ও মুনাফিক নারীরাও অসৎ কার্যক্রম ছড়িয়ে সমাজকে কলুষিত করে ছাড়ে। সুতরাং সমাজকল্যাণ, সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক শান্তি নির্ভর করে মানুষের আকীদা-বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা ও কার্যক্রমের উপর—মানুষের নারী বা পুরুষ হওয়ার উপর নয়।

والله اعلم وهو المستعان

সমাপ্ত

আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১

বিক্রয় কেন্দ্র

৪৩৫/২-এ, বড় মগবাজার,
(ওয়ারলেস রেলগেট)
ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৯৩৩৯৪৪২

১০, আদর্শ পুস্তক বিপণী
বায়তুল মোকাররম, ঢাকা।

আলোকিত কুরআনে নারী

দ্বিতীয় খন্ড

অধ্যাপক মোহাম্মদ মোশাররফ হোসাইন

আল কুরআনে নারী

দ্বিতীয় খণ্ড

অধ্যাপক মোহাম্মদ মোশাররফ হোসাইন

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. আবদুল খালেক মজুমদার
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ৩৭৮

১ম প্রকাশ

রজব	১৪২৭
শ্রাবণ	১৪১৩
আগস্ট	২০০৬

বিনিময় মূল্য ঃ ১৩০.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

Al QURANE NARE-2nd Volume by Mohammad Mosharraf Hossain. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Price : Taka 130.00 Only.

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রাসংগিক কথা

আল কুরআন আজকের দুনিয়ায় আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের একমাত্র নির্ভুল বাণী-সম্ভার। কিয়ামত পর্যন্ত মানব জাতির পথনির্দেশিকা হিসেবে একক গ্রহণযোগ্য গ্রন্থ আল কুরআন মানবজাতির জন্য আল্লাহর মহান এক নি'আমত। পৃথিবীতে মানুষ আল্লাহর খলীফা বা প্রতিনিধি। মহাকাশ ও মহাবিশ্বের যাবতীয় সৃষ্টিরাজি মানবজাতির কল্যাণের জন্যেই নিয়োজিত। দুনিয়ার জীবন সুচারুরূপে ও সুবিন্যস্তভাবে অতিবাহিত করে আখেরাতের জীবনে সার্বিক কল্যাণ ও পূর্ণ সাফল্য অর্জনের তথা রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি লাভের পথে চলার একমাত্র আলোকবর্তিকা এ আল কুরআন। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মানুষকে আল কুরআনই সঠিক পথের দিশা দিয়ে থাকে।

নারী-পুরুষ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনেরই প্রিয় সৃষ্টি। আল্লাহর রহমত ও দানের ব্যাপারে তিনি যেমন তাঁর সৃষ্টির মধ্যে কোনো পার্থক্য করেননি, তেমনি তাঁর বিধানে নারী-পুরুষের অধিকার ও মর্যাদার মধ্যেও কোনো তারতম্য রাখেননি। মহান আল্লাহ পুরুষদের জন্যে যেমন অপার করুণার আধার, তেমনি মহিলাদের জন্যেও তাঁর দয়া সীমাহীন। সংকীর্ণ দৃষ্টির কোনো মানুষের চোখেই বিভিন্ন কারণে মানুষে মানুষে পার্থক্য থাকতে পারে। কারণ, মানুষের জন্যে তো কেউ আপন, কেউ পর, কেউ কাছের আর কেউ দূরের হতে পারে। কিন্তু আল্লাহর চোখে তো সকল মানুষই সমান—আল্লাহর তো কেউ আপন, কেউ পর, কেউ কাছের, কেউ দূরের নেই। সুতরাং আল্লাহর বাণী আল কুরআনে নারী পুরুষ সকলের জন্যেই সমান কল্যাণকর বিধান দেয়া হয়েছে।

আল কুরআন মানব জাতির জন্য আল্লাহর দেয়া একমাত্র সত্যপথ নির্দেশিকা। কোনো সম্প্রদায় বিশেষের জন্য কুরআন নাযিল হয়নি। এ সম্পর্কে স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার ঘোষণা 'হাযা বায়ানুল লিন্নাস' এবং 'হুদাল্ লিন্নাস'-এর মাধ্যমে কুরআনকে সকল মানুষের জীবন পথের নির্দেশিকা বানিয়ে দেয়া হয়েছে।

আজকের বিশ্বে ইসলাম বিদ্বেষীরা নারী অধিকার ও নারী মর্যাদা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ব্যাপদেশে ইসলামকেই দায়ী করে থাকে। মানব ইতিহাসে

একমাত্র যে ইসলাম নারীদের প্রকৃত মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে সে ইসলামকেই ওরা দায়ী করছে নারী মর্যাদা ক্ষুণ্ন করার দায়ে ! আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, এক শ্রেণীর তথাকথিত বুদ্ধিজীবি নামধারী মুসলিমগণও এ নির্জলা মিথ্যার বেসাতি করে বেড়াচ্ছে আজকের সমাজে। তারা বিভ্রান্ত করে ছাড়ছে আধুনিক বিশ্বের নতুন প্রজন্মকে। অথচ তাদের মনগড়া প্রগতির পথ নারী সমাজকে নিয়ে যাচ্ছে পশুত্বের এক মারাত্মক ও ঘৃণ্য পর্যায়ে।

আল্লাহর বাণী আল কুরআন ও রসূলুল্লাহ স.-এর সুন্নাহ সমন্বয়ে সুবিন্যস্ত পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান আল ইসলাম নারী-পুরুষের সার্বিক কল্যাণ নির্দেশ করেছে। 'নারী' বিষয়ে অনেক লেখক ও চিন্তাবিদের লেখা গ্রন্থরাজি বাজারে চালু রয়েছে। "আল কুরআনে নারী" শীর্ষক বইটি সে ধরনের একটি বই নয়। বরং কুরআন শরীফে 'নারী' উল্লেখে যেসব আয়াত রয়েছে, সেসব আয়াত চয়ন করে তা থেকে উল্লেখযোগ্য আয়াতসমূহ বাছাই করে বিভিন্ন তাফসীরের আলোচনা থেকে এ বইটি লেখা হয়েছে। এজন্যে বইটিতে গতানুগতিক রীতিতে কোনো বিষয়ের অধীনে সংশ্লিষ্ট আয়াত নিয়ে আলোচনা করা হয়নি ; বরং আয়াতের অধীনে সেই আয়াতে সন্নিহিত বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহর বাণীর ভাবার্থ এতই ব্যাপক যে একই আয়াত থেকে বহুবিধ বিষয় বের করা যায় বিধায় একটি আয়াত কেবল মাত্র একটি বিষয়ের জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়া বৈধ বা সমীচীন মনে করিনি। এ কারণেই শিরোনামের নীচে আয়াত না লিখে, প্রচলিত রীতির খেলাফ আয়াতের নীচে শিরোনামের উল্লেখ করা হয়েছে। এতেকরে একই আয়াতের অধীনে উল্লিখিত শিরোনাম ছাড়াও যেন প্রয়োজনে অন্যান্য শিরোনাম ব্যবহারের অবকাশ থাকে বা অন্য কোনো বিষয়ের সাথে আয়াতটিকে সংযুক্ত করা যেতে পারে। কারণ, কিয়ামত পর্যন্ত যে কোনো পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে উদ্ভূত সমস্যাদির যেসব সমাধান আল কুরআনের আয়াত-গুলোতেই বিদ্যমান রয়েছে, তা যেন প্রয়োজন মত বের করে সমাধান হিসেবে পেশ করা যায়।

তাছাড়া বইটির আলোচনায় বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়নি, বরং কুরআনের সূরাগুলোর ধারাবাহিকতা ঠিক রেখে বিভিন্ন আয়াতের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়েছে। আলোচনার উৎসের উল্লেখ কোনো কোনো স্থানে অসতর্কতাবশত বাদ পড়ে গেছে। আবার কোথাও আলোচনা শেষ করে উৎসের উল্লেখ করা হয়েছে, কোথাওবা আলোচনার সাথেই উৎসের উল্লেখ করা হয়েছে। তবে সার্বিকভাবেই এ বইতে যেসব তাফসীরের সাহায্য গ্রহণ করেছি, তাহলো ঃ

১. আল কুরআনুল করীম—ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

২. কুরআনুল হাকীম—শাহ রফি উদ্দীন র. ও শাহ আশরাফ আলী থানভী র.

৩. মা'আরেফুল কুরআন—মুফতী মুহাম্মদ শফী র.

৪. তাফসীরে ইবনে কাসীর—আল্লামা ইবনে কাসীর র.

৫. তাফহীমুল কুরআন—সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.

৬. বায়ানুল কুরআন—শাহ আশরাফ আলী থানভী র.

৭. তাফসীরে মাজেদী—আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী র.

৮. তাফসীরে মাযহারী—কাযী ছানাউল্লাহ পানীপথী র.

৯. মিশকাত শরীফ—শেখ অলি উদ্দীন মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ র.

১০. তাদাব্বুরে কুরআন—মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী র.

১১. তাফসীরে হাক্কানী—মাওলানা আবদুল হক র.

১২. আল কুরআনুল কারীম—মাওলানা মাহমুদুল হাসান র. ও মাওলানা শিব্বির আহমদ উসমানী র.

১৩. চল্লিশ হাদীসে কুদসী—ড. ইয্যুদ্দীন ইবরাহীম র.

১৪. তাফসীরে উসমানী

বিষয়বস্তু নির্ধারণে যেসব শিরোনামের উল্লেখ করা হয়েছে তা সংশ্লিষ্ট আয়াতের মর্মার্থ বিভিন্ন তাফসীর থেকে যেভাবে বুঝতে পেরেছি সেভাবেই উল্লেখ করেছি। এ ব্যাপারে সহৃদয় পাঠকবর্গের মন্তব্য ও পরামর্শ পেলে বইটির মানোন্নয়নে সহায়ক হবে বলে আশা রাখি।

সময়ের স্বল্পতার কারণে বইয়ের শিরোনামের অধীনে সন্নিবেশিত কিছু কিছু আলোচনা অতি সংক্ষেপে পেশ করা হয়েছে। ভবিষ্যতে তা সম্প্রসারণের ও পূর্ণাঙ্গ রূপদানের আশা রইল। বইটি বহুমুখী বিভ্রান্তি ও ষড়যন্ত্রের শিকার আজকের নারী সমাজের প্রকৃত অবস্থান, সত্যিকার মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টিতে সামান্য অবদান রাখতে পারলেও শ্রম স্বার্থক মনে করবো।

আধুনিক প্রকাশনী ইতিপূর্বে আল কুরআনে নারী ১ম খণ্ড বের করেছে, বর্তমানে বইটির ২য় খণ্ড প্রকাশ করার দায়িত্ব গ্রহণ করায় সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। বইটি প্রকাশের কাজে বিভিন্নভাবে যারা সহযোগিতা করেছেন, প্রেরণা যুগিয়েছেন, ব্যবস্থা নিয়েছেন আল্লাহ সবাইকে নেক জাযা দিন।

—মোহাম্মদ মোশাররফ হোসাইন

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১. নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মুমিনগণকে আল্লাহ্ তাআলার মহাসাফল্যদানের ওয়াদা	১৫
২. প্রাচীন মিশর সম্রাট-এর স্ত্রীর কাণ্ড	২০
৩. ইউসুফ আ.-এর চারিত্রিক স্বচ্ছতা সম্পর্কে মিশর সম্রাটের স্ত্রীর স্বীকারোক্তি	২৯
৪. পুরুষ বিহীন সমাজ নারীদের জন্য বিপজ্জনক ও শাস্তিতুল্য	৩৩
৫. মুশরিক সমাজে কন্যা সন্তানের জন্ম অসহনীয় ও মনস্তাপে ক্লিষ্ট হওয়ার কারণ	৩৬
৬. মুমিনগণ নারী-পুরুষ নির্বিশেষে নেক আমলের ফলে (হায়াতে তাইয়্যেবা) 'পবিত্র জীবন' লাভ করতে পারে	৪০
৭. আল্লাহ্ ছাড়া কারো দাসত্ব করবে না, আর মাতা-পিতার সেবা-যত্নের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখবে	৪৪
৮. সন্তান হত্যা করো না আর ব্যভিচারের ধারেও যেয়ো না	৫১
৯. বন্ধা স্ত্রী ও বুড়ো স্বামীর সন্তান লাভের দুআ কবুলের ইতিহাস	৫৮
১০. স্বাধ্বী নারী সম্মুখীন হলেন কঠিন পরীক্ষার, শিকার হলেন অসহনীয় তোহ্মতের	৬২
১১. ব্যভিচার মানব বংশ বিধ্বংসী ও দণ্ডনীয় অপরাধ	৭০
১২. সতী নারীর প্রতি অপবাদ শাস্তিযোগ্য অপরাধ— সেই অপরাধীর সাক্ষ কখনও গ্রহণযোগ্য নয়	৮০
১৩. নিজের স্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেও সাক্ষ-প্রমাণ দিতে হবে	৮৫
১৪. নিষ্কলুষ সম্ভ্রান্ত নারীর বিরুদ্ধেও অপবাদ রটানো হয়	৯০
১৫. নিষ্কলুষ সম্ভ্রান্ত নারীর অপবাদ শুনে মুমিনদের কি করা উচিত ?	৯৯
১৬. পবিত্র চরিত্রের নারীর প্রতি অপবাদকারীরা দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত	১০৬
১৭. সমাজে নর-নারী পরস্পর থেকে কিভাবে পর্দা করবে ?	১০৯
১৮. যাদের সাথে মহিলাদের পর্দা না করা ও দেখা দেয়া জায়েয	১২০

১৯. বিবাহযোগ্য নর-নারীর বিয়ের ব্যবস্থা করে দেয়া অভিভাবক ও সমাজপতিদের কর্তব্য অসর্থরা যেন চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষা করে ১৩০
২০. কারো ঘরে প্রবেশের অনুমতি গ্রহণ ঃ দেখা-সাক্ষাতের শিষ্টাচার ১৩৬
২১. যে তিন সময়ে মা-বাবার কক্ষে প্রবেশের আগে অনুমতি নিতে হবে ১৪৪
২২. যেসব বৃদ্ধার জন্য পর্দার বিধান শিথিলযোগ্য ১৪৯
২৩. দীনদার স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের জন্য ও সন্তানাদির জন্য মুত্তাকী হওয়ার দুআ করে ১৫২
২৪. আল্লাহর অবাধ্য হওয়ায় নবীর স্ত্রী হয়েও রক্ষা পেল না যে নারী ১৫৫
২৫. অনৈসলামী সমাজে নারী নিরাপত্তাহীনতার করুণ ইতিহাসের একটি দিক ১৫৯
২৬. যে তিন নারীর মাধ্যমে আল্লাহ শিশু মূসাকে ফিরাউনের হাত থেকে বাঁচালেন ১৬৫
২৭. কওমে লূতের অভূতপূর্ব নাফরমানী সমর্থন করায় নবী পত্নী আল্লাহর গযবে পতিত হলো যেভাবে ১৭১
২৮. মাতা-পিতার সাথে অবশ্যই সদ্ব্যবহার করে যেতে হবে এমন কি শিরক করতে বাধ্য করলেও ১৭৬
২৯. মুহাম্মদ স.-এর স্ত্রীগণ মুমিনদের মাতা হওয়ার তাৎপর্য ১৭৯
৩০. নবী পত্নীদের দুনিয়ার স্বাচ্ছন্দ পরিত্যাগের অভিন্ন সিদ্ধান্ত ১৮২
৩১. পর্দা ও নারী মর্যাদা সংরক্ষণে নবী পত্নীদের থেকে সূচনায় আল্লাহর কতিপয় নির্দেশ ১৯০
৩২. নির্দিষ্ট গুণবৈশিষ্ট্যের সকল পুরুষ-নারীর জন্য রয়েছে আল্লাহর অভিন্ন ক্ষমা ও পুরস্কার ১৯৭
৩৩. মুসলিম নারীগণ প্রয়োজনে বাড়ীর বাইরে যাবে কিভাবে ? ২০৭
৩৪. মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীকে কষ্ট দেয়ার পরিণতি ২১৩
৩৫. আল্লাহর শাস্তি অথবা সন্তুষ্টি লাভ মানুষের পুরুষ বা নারী হওয়ার কারণে নয় ২১৬
৩৬. আল্লাহ কাউকে দেন মেয়ে, কাউকে দেন ছেলে, কাউকে দেন দুটোই আর কাউকে রাখেন নিঃসন্তান ২২০

৩৭. মানব সৃষ্টি একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে। মানব মর্যাদার মূলভিত্তি 'তাকওয়া'। জাতি ও গোত্র বিভক্তি পরিচিতি মাত্র ২২৫
৩৮. কিয়ামতের দিন মুনাফিক নারী-পুরুষরা ঈমানদার নারী-পুরুষের কাছে নূর ভিক্ষা চাইবে ২২৯
৩৯. যে নারীর অভিযোগ সপ্ত আকাশ পর্যন্ত পৌঁছেছে ও গৃহীত হয়েছে ২৩৩
৪০. স্ত্রীকে 'মায়ের মত' বললে সে তার মা হয়ে যায় না ২৩৬
৪১. রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে নারীদের আনুগত্যের শপথ ২৩৯
৪২. কোন্ কোন্ স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের শত্রু ২৪৪
৪৩. দুজন নেক বান্দার স্ত্রী ছিলেন দুজন বিশ্বাসঘাতক নারী ২৪৯
৪৪. আল্লাহদ্রোহী স্বামীর আল্লাহভক্ত স্ত্রী আর আল্লাহর অনুগত এক মহিয়ষী নারী ২৫২
৪৫. যেদিন মানুষ তার একান্ত আপনজন এমনকি স্ত্রী থেকেও পলায়ন করবে ২৫৬
৪৬. খড়ী বাহক যে নারী গলায় লোহার শিকল নিয়ে প্রবেশ করবে লেলিহান অগ্নিতে ২৫৯
৪৭. সাধারণত নারীরা যাদুটোনা করে থাকে বা তাদের মাধ্যমে যাদু করা হয় ২৬৪

এক

وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِىْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ط وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ط ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○ - التوبة : ٧٢

"আল্লাহ ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার মহিলাদের এমন জান্নাতের ওয়াদা দিয়েছেন যার নিম্নদেশে ঝর্ণাসমূহ প্রবাহিত থাকবে, তারা সেখানে চিরদিন থাকবে। এই স্থায়ী জান্নাতে থাকবে উত্তম বাসস্থান। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো সেখানে তারা লাভ করবে আল্লাহর সন্তুষ্টি—আর এটিই হচ্ছে মহাসাফল্য।"–সূরা আত তাওবা ঃ ৭২

নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মুমিনগণকে আল্লাহ তাআলার মহাসাফল্যদানের ওয়াদা

পূর্বের আয়াতে অর্থাৎ এ সূরার ৭১ আয়াতে মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীর কতিপয় বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হয়েছে। যেসব বৈশিষ্ট্যের ফলে তারা আল্লাহর রহমতের যোগ্য হবেন। আয়াতে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যগুলো হলো, তারা ঈমান রূপ মহা নিয়ামতের তাওফীক পাওয়ার কারণে একে অপরের হিতাকাংখী বন্ধু, তারা পরস্পরকে ন্যায় ও সৎ কাজের নির্দেশ দেয় আর অন্যায় ও অসৎকাজ থেকে বিরত রাখে। তারা নামায কায়েম করে আর যাকাত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে। তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে। এসব লোকেরাই এমন, যাদের ওপর আল্লাহ রহমত নাযিল করেন।

এসব গুণবৈশিষ্ট্যের কারণে আল্লাহ তাদের জন্য ওয়াদা করেছেন জান্নাতের, যার তলদেশে ঝর্ণাসমূহ প্রবাহিত থাকবে, এটা কিন্তু স্বল্প সময়ের জন্য নয়, বরং তাদেরকে এসব নিয়ামত দেয়া হবে স্থায়ীভাবে—চিরদিনের জন্য। ওসব চিরস্থায়ী জান্নাতে তাদের জন্য থাকবে উত্তম বাসস্থান। তারা সেখানে আরও পাবে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও রেজামন্দির মত দুর্লভ নিয়ামত—আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ দান। প্রকৃতপক্ষে এটাই জীবনের একমাত্র মহাসাফল্য. যথার্থ কামিয়াবী।

উপরোক্ত নিয়ামতসমূহ, আল্লাহর বিশেষ দান কারা পাবে ? আলোচ্য আয়াতে সে কথাই বলা হয়েছে। উল্লেখিত গুণবৈশিষ্ট্যের অধিকারীরাই ওসব পুরস্কারের ভাগী হবে। বস্তুত ওসব পুরস্কার পাবে ঈমানদার নারী পুরুষগণ। অন্য কথায় নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ঈমান, আমল ও আখলাকের বদৌলতে তারা ওসব মহা নিয়ামত লাভে সমর্থ হবে। আল্লাহ, তাঁর রসূল ও আখিরাতের প্রতি ঈমান ; ঈমান অনুযায়ী আমল তথা দুনিয়ার জীবন অতিবাহিত করলো এবং সেই ঈমান ও আমলের অনুশীলনের মাধ্যমে পূত-পবিত্র আখলাক বা চরিত্র গঠন করতে পারলে, মানুষ আল্লাহর রহমতের যোগ্য হতে পারে। আর আল্লাহর রহমতের ভাগী হতে পারলেই তারা আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত—তাঁর সন্তুষ্টি লাভ করতে সমর্থ হতে পারবে।

আসলে ঈমানের প্রভাবে মানুষ ব্যক্তিগতভাবে যেমন স্বচ্ছতা ও সততার অধিকারী হয়ে থাকে, তেমনি তাদের আমল ও আখলাকের ফলে সমাজেও শান্তি শৃংখলা বিরাজ করে। সাহচর্য প্রভাবের কারণে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক আচরণ পরস্পরকে যেমন প্রভাবিত করে তেমনি এর সফলও সমাজে প্রতিবিম্বিত হয়ে থাকে। পুরুষদের আল্লাহর পথে চলতে স্ত্রীরা বাধা না দিয়ে বরং সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে থাকে। আবার স্ত্রীদের সতীত্ব রক্ষায় সৎ জীবন যাপনে স্বামীরা তাদের সহায়ক ও পরিপুরক শক্তি হিসেবে কাজ করে থাকে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিশ্বস্ততা, আমানতদারী, আন্তরিকতা, ত্যাগ ও সহানুভূতির সুমধুর ভাব ও সম্পর্ক বিরাজ করে। এভাবে সমাজে নর-নারীর ঈমানী শক্তি তাদের দুনিয়ার জীবনে শান্তিময় পরিবেশ সৃষ্টির নিয়ামক হিসেবে কার্যকর হয়ে থাকে। নামায-রোযার মাধ্যমে যেমন তাদের আত্মিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার গুণ সৃষ্টি হয়, তেমনি যাকাত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাদের দিয়ে সামাজিক সৌহার্দ-সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজে ন্যায় ও সৎকাজের প্রতিষ্ঠা আর অন্যায় ও অসৎকাজের প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে উঠে।

ঈমানদার নারী-পুরুষ ঈমানের বদৌলতে এমনি এক পর্যায়ে উন্নীত হয়ে আল্লাহর রহমতের ভাগী হতে পারে, তারা আল্লাহ সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে। সর্বোপরি এভাবে তাদের জীবনের প্রকৃত সফলতা নিশ্চিত হতে পারে বলে আলোচ্য আয়াতে স্বয়ং রাব্বুল আলামীনই ঈমানাদার নারী ও ঈমানদার পুরুষকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।-[তাফহীমুল কুরআন ও তাদাব্বুরে কুরআনের আলোকে]

আল্লাহ তাআলার এ প্রতিশ্রুতি পুরুষের জন্য যতটুকু ঠিক ততটুকু নারীর জন্যেও। এখানে বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে ঈমান ও কুফ্‌র—পুরুষ বা নারী হওয়া নয়।

আলোচ্য আয়াতে নারী-পুরুষদের যারাই সত্যিকারভাবে দীনকে বুঝে শুনে ঈমান আনবে তাদের পুরো জীবনে প্রকৃত সাফল্যপ্রাপ্তির নিশ্চয়তাদান করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীর জীবনে মহাসাফল্যের ওয়াদা করে বলেছেন, মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীর জন্য আল্লাহ তাআলা চিরস্থায়ীভাবে জান্নাত দানের ওয়াদা করেছেন। দ্বিতীয়ত, তাদের প্রদত্ত জান্নাতে বাসোপযুগী উত্তম বাসস্থান দেয়ারও তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সর্বোপরি, তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর সন্তুষ্টির মহান ঘোষণা। আল্লাহর দেয়া উল্লিখিত নিয়ামতসমূহের মধ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টিই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও মহান। বস্তুত আল্লাহ প্রদত্ত এসব নিয়ামত ঈমানদার নারী-পুরুষের জন্যও 'মহা সফলতা'-এর তিনটি উল্লেখযোগ্য দিক। একজন ঈমানদারের জন্য আয়াতে বর্ণিত সর্বশেষ নিয়ামত আল্লাহর সন্তুষ্টি হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম প্রাপ্তি। দুনিয়ার জীবনে যেমন مَنْ لَهُ الْمَوْلٰى فَلَهُ الْكُلُّ (جسكا رب اسكاسب)। যে মাওলাকে সন্তুষ্ট করতে পেরেছে তার পাওয়ার আর কি বাকী থাকলো ? যা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মুমিনেরই প্রাপ্য।

❐

দুই

وَرَاوَدَتْهُ الَّتِىْ هُوَ فِىْ بَيْتِهَا عَنْ نَّفْسِهٖ وَغَلَّقَتِ الْاَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ط
قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اِنَّهٗ رَبِّىْٓ اَحْسَنَ مَثْوَاىَ ط اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ○ وَلَقَدْ
هَمَّتْ بِهٖ ج وَهَمَّ بِهَا لَوْلَآ اَنْ رَّاٰ بُرْهَانَ رَبِّهٖ ط كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْٓءَ
وَالْفَحْشَاءَ ط اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ ○ وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيْصَهٗ
مِنْ دُبُرٍ وَّاَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ ط قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ اَرَادَ بِاَهْلِكَ سُوْٓءًا اِلَّآ
اَنْ يُّسْجَنَ اَوْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○ قَالَ هِىَ رَاوَدَتْنِىْ عَنْ نَّفْسِىْ وَشَهِدَ شَاهِدٌ
مِّنْ اَهْلِهَا ج اِنْ كَانَ قَمِيْصُهٗ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ○ وَاِنْ
كَانَ قَمِيْصُهٗ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ○ فَلَمَّا رَاٰ قَمِيْصَهٗ قُدَّ
مِنْ دُبُرٍ قَالَ اِنَّهٗ مِنْ كَيْدِكُنَّ ط اِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيْمٌ ○ يُوْسُفُ اَعْرِضْ عَنْ
هٰذَا سكته وَاسْتَغْفِرِىْ لِذَنْۢبِكِ ج اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخٰطِئِيْنَ ○ وَقَالَ نِسْوَةٌ
فِى الْمَدِيْنَةِ امْرَاَتُ الْعَزِيْزِ تُرَاوِدُ فَتٰهَا عَنْ نَّفْسِهٖ ج قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ط اِنَّا
لَنَرٰىهَا فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ اَرْسَلَتْ اِلَيْهِنَّ وَاَعْتَدَتْ
لَهُنَّ مُتَّكَاً وَّاٰتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّيْنًا وَّقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ ج فَلَمَّا
رَاَيْنَهٗٓ اَكْبَرْنَهٗ وَقَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا هٰذَا بَشَرًا ط اِنْ هٰذَآ اِلَّا
مَلَكٌ كَرِيْمٌ ○ قَالَتْ فَذٰلِكُنَّ الَّذِىْ لُمْتُنَّنِىْ فِيْهِ ط وَلَقَدْ رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ
فَاسْتَعْصَمَ ط وَلَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَآ اٰمُرُهٗ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُوْنًا مِّنَ الصّٰغِرِيْنَ ○

"আর তাঁকে (ইউসুফ আ.-কে) ফুসলাতে লাগলো মহিলাটি (জুলায়খা), যার ঘরে তিনি ছিলেন। সে মহিলা ঘরের দরজাগুলো বন্ধ করে বললো, 'এসো!' তিনি বললেন, আল্লাহর পানাহ চাই। আমার রব তো আমার থাকার সুব্যবস্থা করে দিয়েছেন। (আমি কি এ কাজ করতে পারি ?)

নিশ্চয়ই যালিমরা সফলকাম হতে পারে না।" মহিলা তো তাঁর প্রতি আশক্ত হয়েই পড়েছে, আর তিনিও মহিলার প্রতি আশক্ত হয়ে পড়তেন যদি তিনি তাঁর রবের বুরহান বা নিদর্শন দেখতে না পেতেন। এমনিভাবে হলো, যাতে করে আমি তার থেকে মন্দ ও নির্লজ্জতা দূর করে দিয়েছি। নিশ্চয়ই সে আমার বাছাইকৃত বান্দাদের একজন। তারা উভয়ে ঘরের দরজার দিকে দৌড়ে গেল, আর মহিলাটি ইউসুফের জামা পেছন থেকে টেনে ছিঁড়ে ফেললো। উভয়েই মহিলার স্বামীকে দরজার কাছে পেল। অমনি মহিলাটি বলে উঠলো, "যে তোমার পরিজনের সাথে কুকর্মের ইচ্ছা করে, তাকে জেলে পাঠানো অথবা অন্য কোনো কঠোর শাস্তি দেয়া ছাড়া তার আর কি সাজা হতে পারে ?" ইউসুফ বললেন, সে-ই তো আমাকে দিয়ে কুকর্ম করাতে ফুসলিয়েছে।" মহিলাটির পরিবার বর্গের এক (ব্যক্তি) শিশু ইংগিতসূচক সাক্ষ দিয়ে বললো, "ইউসুফের জামা যদি সামনের দিকে ছেঁড়া থাকে, তাহলে মহিলাটি সত্যবাদিনী আর সে মিথ্যাবাদী। কিন্তু যদি তার জামা পেছনের দিক থেকে ছেঁড়া থাকে, তাহলে মহিলাটি মিথ্যুক আর সে সত্যবাদী।" অতপর গৃহস্বামী যখন দেখল ইউসুফের জামা পেছন দিক থেকে ছেঁড়া, তখন সে বললো, "নিশ্চয়ই এটা তো মহিলাদেরই শঠতা, নিসন্দেহে মহিলাদের শঠতা ও কৌশল মারাত্মকই হয়ে থাকে। ইউসুফ! তুমি প্রসংগটি বাদ দাও, আর হে নারী! তুমি নিজের অপরাধের জন্য ক্ষমা চাও, নিসন্দেহে তুমিই অপরাধিনী।" শহরের নারীরা বলাবলি করতে লাগলো, "আযীযের স্ত্রী নিজের ক্রীতদাসকে কুমতলব চরিতার্থ করার জন্য ফুসলায়। সে ওর প্রেমে উন্মত্ত হয়ে গেছে। আমরা তো দেখছি সে সুস্পষ্ট ভ্রান্তিতে লিপ্ত।" যখন তাদের চক্রান্ত তার কানে গেল, সে তাদের দাওয়াত করলো বৈঠকখানায় তাদের প্রত্যেককে (ফল কাটার জন্য) একখানা করে ছুরি দিল। এদিকে ইউসুফকে তাদের সামনে আসার নির্দেশ দিল। মহিলারা ইউসুফকে দেখে হতভম্ব হয়ে গেল, তারা (ফলের পরিবর্তে) নিজেদের হাত কেটে ফেললো। তারা বললো, "আল্লাহর কসম, এতো কোনো মানুষ নয়, এতো কোনো সম্মানিত ফেরেশতা ছাড়া কিছু নয়।"

আযীযের স্ত্রী বললো, "দেখ, এ-ই তো সে ব্যক্তি, যার সম্পর্কে তোমরা আমাকে ভৎর্সনা করেছিলে। আসলে তো আমিই তাকে ফুসলিয়েছি, কিন্তু সে নিজেকে পবিত্র রেখেছে। আর আমি যা আদেশ করি সে যদি তা না করে তবে সে অবশ্যই কারাগারে প্রেরিত হবে ও অপদস্ত হবে।

ইউসুফ বললেন, ও রব! তারা আমাকে যে কাজের দিকে ডাকছে, তার চেয়ে কারাগারই আমার পসন্দনীয়। যদি তুমি তাদের চক্রান্ত আমার উপর থেকে প্রতিহত না করো তাহলে আমি তাদের চক্রান্তের জালে আটকে যাব আর জাহেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বো। অতপর তাঁর রব তাঁর দুআ কবুল করেছেন এবং মহিলাদের চক্রান্ত তাঁর থেকে প্রতিহত করে দিলেন। নিশ্চয়ই তিনি সবকিছু শুনেন ও সবকিছু জানেন।"

–সূরা ইউসুফ ২৩-৩৪

প্রাচীন মিশর সম্রাট-এর স্ত্রীর কাণ্ড

উপরিউক্ত বারটি আয়াত সূরা ইউসুফ থেকে নেয়া হয়েছে। সূরা ইউসুফকে আল্লাহ তাআলা اَحْسَنَ الْقَصَصِ বা সর্বোত্তম কাহিনী বলে ঘোষণা দিয়েছেন। আর কুরআনের এ একটি সূরাতেই হযরত ইউসুফ আ.-এর ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে। এতে মানবজাতির জন্য শিক্ষণীয় অনেক বাস্তব ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার্য অনেক বিষয় বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াত গুলোতে ২৩ আয়াত থেকে ৩৪ আয়াত পর্যন্ত তৎকালীন মিশরের বাদশাহর স্ত্রী যুলায়খার কাহিনী বিবৃত হয়েছে।

ইউসুফ আ.-এর ভাইয়েরা তাঁকে কুপে নিক্ষেপ করে চলে গিয়েছিলো। আল্লাহর অসীম রহমতে হযরত ইউসুফ আ. কুপে সুস্থ ও জীবিত থেকে গেলেন। পথিক কাফেলার লোকেরা তাঁকে কুফ থেকে তুলে নিয়ে মিশর শহরে বিক্রি করে দিল। মিশর শহরে ইউসুফের এ ক্রেতা ছিলেন মিশরের বাদশাহ (আযীযে মেছের)। বাদশাহ ইউসুফকে কিনে নিয়ে স্ত্রীকে যা বললেন, কুরআনের ভাষায় তা হলো ঃ

اَكْرِمِىْ مَثْوٰاهُ عَسٰٓى اَنْ يَّنْفَعَنَآ اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا ـ

"একে ভালভাবে থাকার ব্যবস্থা করো, এ আমাদের কোনো উপকারে আসতে পারে অথবা একে আমরা পুত্র হিসেবে গ্রহণ করতে পারি।"

–সূরা ইউসুফ ঃ ২১

ইউসুফ আ. যখন যৌবনের স্তরে উপনীত হন, তিনি যখন আঠার-বিশ বছর বয়সের এক সুদর্শন যুবক এবং সুষমামণ্ডিত দেহ আর ভরা যৌবনের অধিকারী তখন তাঁর মালিকের স্ত্রী যুলায়খা ইউসুফের রূপ-সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে গোটা পরিবেশটাকেই ইউসুফের জন্য অস্বস্থিকর করে তুলেছিলো। প্রতিটি মুহূর্তেই যুলায়খা তার কুমতলব চরিতার্থ করার জন্য ওঁৎ পেতে

থাকতো ইউসুফকে কাবু করার জন্য। আর ইউসুফ–আল্লাহতে বিশ্বাসী নওযোয়ান, তাকওয়ার বলে বলীয়ান দৃঢ়চেতা ও বলিষ্ঠ মনোবল সম্পন্ন যুবক হয়েও এ পরিস্থিতির শিকার হয়ে স্বীয় মানবিক দুর্বলতার কথা ভেবে কেঁপে উঠতেন। তিনি আল্লাহর দরবারে কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা করে বলতেন, "হে আল্লাহ! আমি বড়ই দুর্বল মানুষ, এসব আকর্ষণ ও প্রলোভনের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার শক্তি আমার নেই। আল্লাহ! তুমিই আমাকে আশ্রয় দাও। তুমিই আমাকে বাঁচাও।"–তাফহীমুল কুরআন

এমনি পরিস্থিতিতে একদা 'আযীযে মেছের' এর অনুপস্থিতিতে যুলায়খা ইউসুফের সাথে যে আচরণ ও কাণ্ড করেছিল উপরিউক্ত ১২টি আয়াতে তারই বর্ণনা করা হয়েছে। যুলায়খা ইউসুফকে বালাখানায় ঢুকিয়ে ক্রমাগত দরজাসমূহ বন্ধ করতে করতে ভিতরে নিয়ে গেল। কোনো কোনো বর্ণনায় সাতটি দরজায় সাতটি তালা দিয়ে দরজাগুলো বন্ধ করে ভিতরের দিকে চলে যাওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

সর্বশেষ কক্ষে ঢুকে তালাবন্ধ করে দিয়ে যুলায়খা ইউসুফকে বললো, هَيْتَ لَكَ "শুন, তোমাকে বলছি, এসো।"

সুদ্দী ইবনে ইসহাক প্রমুখ তাফসীরবিদের বরাত দিয়ে মুফতী শফী রহ. তাঁর 'তাফসীরে মাআরেফুল কুরআনে' বলেন, এ সময় যুলায়খা ইউসুফকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য ইউসুফের রূপ-সৌন্দর্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে লাগলো। সে তার কুমতলব চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে ইউসুফকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করছিলো এই বলে, "ইউসুফ! তোমার মাথার চুল কত সুন্দর!" ইউসুফ বললেন, "মৃত্যুর পর এ চুল আমার মাথা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।" যুলায়খা বললো, "তোমার চক্ষু দুটো কতই না আকর্ষনীয়!" ইউসুফ বললেন, "মৃত্যুর পর এগুলো পানি হয়ে আমার মুখাবয়বের উপরে প্রবাহিত হবে।" যুলায়খা বললো, "তোমার চেহারাটা কতই না কমনীয়।" ইউসুফ বললেন, "এসবই তো মাটির খোরাক।"

এভাবে মহিলাটি ইউসুফকে ডাকছিলো শয়তানের পথের দিকে। পক্ষান্তরে ইউসুফ তাকে ডাকছিলো প্রকৃত সত্য তথা আল্লাহর পথের দিকে। ভাল লোকেরা সবসময়ই আল্লাহর পথে—সত্যের পথে সংগ্রাম করে যায়। আর মন্দ লোকেরা প্রতি নিয়ত মন্দের দিকে তথা শয়তানের পথে সংগ্রামে লিপ্ত থাকে। যেমন আল্লাহ তাআলা সূরা আন নিসার ৭৬ আয়াতে ইরশাদ করেছেন ঃ

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ-

"যারা ঈমান এনেছে, তারা সংগ্রাম করে আল্লাহর পথে ; আর যারা কুফরী করেছে, তারা সংগ্রাম করে তাগূতের (সীমালংঘনকারী শয়তানী শক্তির) পথে।"

হযরত ইউসুফ আ. আর যুলায়খার উপরিউক্ত কথাগুলো যেন সূরা আন নিসার এ আয়াতেরই বাস্তব উদাহরণ। এভাবে যুলায়খা ইউসুফকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার সকল ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে যুবক ইউসুফকে এক বিরাট অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন করে যাচ্ছিল। ইজ্জতের মালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যুবক ইউসুফকে এহেন চরম পরিস্থিতিতেও পবিত্র থাকার তাওফীক দিলেন। অবস্থার নাযুকতা উপলব্ধি করা যায় আল্লাহর বাণী এ আয়াত থেকে ঃ

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَآ اَنْ رَّاٰ بُرْهَانَ رَبِّهٖ-

"মহিলা তো আশক্ত হয়েই পড়েছে, আর তিনিও মহিলার প্রতি আশক্ত হয়ে পড়তেন, যদি তিনি তাঁর রবের বুরহান না দেখতে পেতেন।"

-সূরা ইউসুফ ঃ ২৪

অর্থাৎ যুলায়খা তো পাপ কাজের কল্পনায় বিভোরই ছিল, আর তার বিভিন্ন ফন্দি-ফিকির ও ষড়যন্ত্রের জালের কারণে ইউসুফের মনেও মানবিক দুর্বলতার কিছুটা উন্মেষ হতে যাচ্ছিল। কিন্তু আল্লাহ তাআলা ঠিক সেই মুহূর্তে স্বীয় বুরহান (রবের প্রমাণ) হযরত ইউসুফের সামনে তুলে ধরলেন। ইউসুফ আ. যদি তাঁর পালনকর্তার প্রমাণ অবলোকন না করতেন তবে এ কল্পনাতেই লিপ্ত থাকতেন। রাব্বুল আলামীনের প্রমাণ দেখে নেয়ার কারণে অনিচ্ছাকৃত কল্পনা ও ধারণা তাঁর অন্তর থেকে দূর হয়ে গেল।

'রব' এর 'বুরহান' মানে স্বীয় পালনকর্তার যে প্রমাণ ইউসুফ আ.-এর দৃষ্টির সামনে এসেছিল, তা কি ছিল কুরআন শরীফে তা ব্যক্ত করা হয়নি। এ কারণে 'বুরহান' বা প্রমাণ সম্পর্কে তাফসীরবিদগণ বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, সাঈদ ইবনে যুবাইর, মুহাম্মদ ইবনে সিরীন, হাসান বসরী প্রমুখ বলেছেন, আল্লাহ তাআলা তখন মুজিযা হিসেবে ইউসুফের পিতা হযরত ইয়াকুব আ.-এর ছবি এমনভাবে উপস্থাপিত করেছিলেন যে, তিনি হাতের আংগুল দাঁতে কামড়

দিয়ে তাকে সাবধান করে দিচ্ছেন। কোনো তাফসীরবিদ বলেছেন, তখন আযীযে মেছেরের মুখচ্ছবি তার সম্মুখে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কেউ বলেছেন, ইউসুফের দৃষ্টি ছাদের উপর পড়তেই সেখানে কুরআন শরীফের এ আয়াত লিখিত দেখলেন, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا "আর যিনার ধারেও যেও না, নিশ্চয়ই তা ফাহিশা কাজ ও অত্যন্ত খারাপ পথ।" কেউ কেউ বলেছেন, যুলায়খার ঘরে একটি মূর্তি ছিল। ঐ মুহূর্তে যুলায়খা মূর্তিটি কাপড় দিয়ে ঢেকে দিলে ইউসুফ তার কারণ জিজ্ঞেস করলেন, সে বললো, এটা আমার উপাস্য। এর সামনে গুনাহ করার মত সাহস আমার নেই। ইউসুফ বললেন, আমার উপাস্য তো আরও বেশী লজ্জা করার যোগ্য। তাঁর দৃষ্টিকে কোনো পর্দা ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। কারও কারও মতে হযরত ইউসুফ আ.-এর নবুওয়াত ও বিভু জ্ঞানই ছিল স্বয়ং পালনকর্তা সম্পর্কে তাঁর এ দিব্য দৃষ্টির কারণ।—মাআরেফুল কুরআন

তাফসীরে ইবনে কাসীর এসব উক্তি উদ্ধৃত করার পর যে মন্তব্য করেছেন, তা সব সুধীজনের কাছেই সর্বাপেক্ষা সাবলীল ও গ্রহণযোগ্য। তিনি বলেছেন, কুরআন পাক যতটুকু বর্ণনা করেছে ততটুকু নিয়েই ক্ষান্ত থাকা দরকার। অর্থাৎ ইউসুফ আ. এমন কিছু দেখেছেন, যার কারণে তাঁর মন থেকে সীমালংঘন করার সামান্য ধারণাও বিদূরীত হয়ে গেছে। এ বস্তুটি কি ছিল —তাফসীরবিদগণ যেসব বিষয়ের উল্লেখ করেছেন সেগুলোর যে কোনো একটি হতে পারে। তাই নিশ্চিতভাবে কোনো একটিকে নির্দিষ্ট করা যায় না।—ইবনে কাসীর থেকে মাআরেফুল কুরআন।

আলোচ্য আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে, যুলায়খার সেই নির্জন কক্ষে আল্লাহর প্রমাণ প্রত্যক্ষ করার সাথে সাথেই ইউসুফ আ. সেখান থেকে পলায়োনদ্যত হলেন এবং বাইরে চলে যাওয়ার জন্য দরজার দিকে দৌড় দিলেন। আযীয পত্নী যুলায়খা তাঁকে ধরার জন্য পেছনে দৌড় দিল এবং তাঁর জামা ধরে তাঁকে বাইরে যেতে বাধা দিতে চেষ্টা করলো। কিন্তু তিনি পবিত্রতা রক্ষার ব্যাপারে ছিলেন দৃঢ়সংকল্প—তাই তিনি থামলেন না। ফলে তাঁর জামা পেছন দিক থেকে ছিঁড়ে গেল। মাআরেফুল কুরআনে মুফতী শফী রহ. ঐতিহাসিক সূত্রের উল্লেখ করে বর্ণনা করেছেন, ইউসুফ আ. দৌড়িয়ে দরজার ধারে পৌঁছামাত্র যুলায়খার বন্ধ করা তালাগুলো আপনা আপনি খুলে নীচে পড়ে যেতে থাকে। এভাবে প্রত্যেকটি দরজার তালা খুলে পড়ে যেতো আর ইউসুফ আ. প্রতিটি কামরার দরজা পেরিয়ে যেতে থাকলেন। শেষ পর্যন্ত হযরত ইউসুফ আ. দরজার বাইরে বেরিয়ে পড়লেন। যুলায়খা ও তাঁর পেছনে পেছনে যেতে যেতে শেষ দরজার

বাইরে চলে গেল। উভয়ে দরজার বাইরে এসেই দেখলো আযীযে মেছের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এভাবে হযরত ইউসুফ আ. তাকওয়া বলে তথা আল্লাহর অসীম রহমতে এ মারাত্মক ষড়যন্ত্রের বেড়াজাল থেকে রক্ষা পেলেন। তাঁর ঈমানী শক্তি এবং সর্বত্র আল্লাহর উপস্থিতির দ্বিধাহীন অকৃত্রিম বিশ্বাস থাকায় আল্লাহ তাঁকে হেফাযত করলেন।

কিয়ামত পর্যন্ত সকল ঈমানদার ব্যক্তির জন্য বিশেষত যুব শ্রেণীর জন্য হযরত ইউসুফ আ.-এর এ ঘটনা থেকে শিক্ষণীয় ও অনুকরণীয় অনেক বিষয়ই রয়েছে। প্রথমত, আমরা দেখতে পেলাম বাদশাহর স্ত্রী নিজেই যুবক ইউসুফকে প্ররোচিত করেছে। দ্বিতীয়ত, মহিলাটি বাদশাহর স্ত্রী, তার বিষয়টি ফাঁস হয়ে গেলেও বাদশাহর স্ত্রী হওয়ায় এ নিয়ে হৈ চৈ করার সাহস কেউ করতো না। তৃতীয়ত, ঘটনা ঘটে গেলে ইউসুফের জন্যও তেমন মাথা ব্যথার বিষয় ছিল না, কারণ এটাতো ইউসুফের দেশ না—ইউসুফের দেশ কেনানে হলে হয়তো দেশী-বিদেশী লোকেরা তাকে ভৎর্সনা বা তার দুর্নাম করতো। চতুর্থত, যুলায়খা তো এমন মযবুত ব্যবস্থা করেছে যে ঘটনাটি ঘটে গেলেও তা জানার কারো সাধ্য ছিল না। পঞ্চমত, যুলায়খার বাসনা পূরণ করলে বরং ইউসুফ তার পূর্ণাঙ্গ আন্তরিক ভালবাসা ও সহযোগিতা পেতো। সর্বোপরি মহিলাটি যেমন ইউসুফের প্রেমে বিভোর ছিল তেমনি ইউসুফও ছিল ভরা যৌবনের অধিকারী যুবক। এতসব অনুকূল পরিস্থিতি ও সুবিধাজনক অবস্থা থাকা সত্ত্বেও কোন্ সে শক্তি, যা যুবক ইউসুফকে যুলায়খার বাসনা পূরণে বিরত রেখেছে ? কুরআনের ভাষায় তা ছিল ইউসুফের রবের 'বুরহান'। আসলে এটাই 'তাকওয়া', এটাই তাওহীদ বিশ্বাস তথা আল্লাহর সর্বত্র উপস্থিতির উপলব্ধির প্রমাণ, এটাই মূলত আখিরাত বিশ্বাসের সত্যিকার তাৎপর্যানুভূতির ফল—যা হযরত ইউসুফ সুদৃঢ় ঈমানী শক্তির ফলে আল্লাহর খাস রহমতে প্রাপ্ত হয়েছিলেন। আল্লাহ তাঁকে বিশেষ রহমতে ধন্য করেছিলেন।

আবার ইউসুফ তো দেখেছেন যুলায়খা কামরাগুলোর দরজা তালাবদ্ধ করে দিয়েছিল। তবুও কেন তিনি যুলায়খার কুকর্ম থেকে বাঁচার জন্য সেই তালাবদ্ধ দরজার দিকে দৌড়ালেন ? তিনি দৌড়াচ্ছিলেন আর তালাগুলো কেন একে একে সবকটিই খুলে নীচে পড়ে যাচ্ছিল ?

আল্লাহর পথের সৈনিকদের জন্য—মুত্তাকীগণের জন্য এখান থেকে সবক নেয়ার—ফিকির করার বিষয় নিহিত রয়েছে। আসলে ঐ বিশেষ মুহূর্তে হযরত ইউসুফ আ. নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আল্লাহর নাফরমানীতে লিপ্ত হয়ে পড়ার ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে কোনো মতে বাঁচার পথ খুঁজছিলেন।

তখন নিজ অবস্থান থেকে দৌড় দিয়ে দরজা পর্যন্ত পৌঁছা ছাড়া তাঁর আর কোনো পথ ছিল না। তাঁর আত্মরক্ষার জন্য দরজা পর্যন্ত দৌড় দিতে পারার সর্বশেষ শক্তিটুকু ব্যয় করে তিনি বাঁচার চেষ্টা করলেন। তাঁর চেষ্টার যেখানে শেষ, সেখানে আল্লাহ্‌র সাহায্যের শুরু। এভাবেই আল্লাহর কোনো বান্দা অথবা বান্দাদের কোনো জামায়াত যখন নিজের বা নিজেদের সর্বশেষ শক্তিটুকু আল্লাহর পথে ব্যয় করে শেষ করে দেয় তখনই আল্লাহ্ তার বা তাদের প্রতি সাহায্যের হাত প্রসারিত করেন। এটা আল্লাহর আদত, যার কোনো পরিবর্তন নেই। কুরআনের ভাষায় ঃ

لَامُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ -

"আল্লাহর কথার কোনো পরিবর্তনকারী নেই।"

এদিকে দরজার বাইরে দুজনই আযীযে মেছেরকে দাঁড়ানো দেখতে পেল। যুলায়খা চমকে উঠলো, আর সম্পূর্ণ বিপরীত দোষ ও অপবাদ চাপিয়ে দিল ইউসুফের উপর। সে স্বামীকে বললো, যে লোক তোমার পরিজনের সাথে কুকর্মের ইচ্ছা করে তার শাস্তি এছাড়া কি হতে পরে যে তাকে জেলে পাঠানো হবে অথবা কোনো কঠোর দৈহিক যন্ত্রণা দেয়া হবে ?

এতক্ষণ তো ইউসুফ সৌজন্য বোধের কারণে কোনো কথা বলেননি। এবার কিন্তু তিনি মুখ খুলতে বাধ্য হলেন। তাছাড়া প্রতিবাদ না করলে তো যুলায়খার মিথ্যা ও অপবাদ সমর্থন করা হয়। তিনি বলে উঠলেন ঃ

هِيَ رَاوَدَتْنِيْ عَنْ نَّفْسِيْ -

"সে-ই তো নিজের কুমতলব চরিতার্থ করার জন্য আমাকে ফুসলাচ্ছিল।"

আযীযে মেছের পড়ে গেলেন বিপাকে। কে সত্যবাদী তা নির্ণয় করা তার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়লো। ঠিক এ সময় আল্লাহ্ তাআলা এক অলৌকিক ব্যবস্থা করে দিলেন। ঐ পরিবারেই অবস্থানরত একটি কচি শিশুকে আল্লাহ্ তাআলা বিজ্ঞ ও দার্শনিকসুলভ বাকশক্তি দান করলেন। দোলনার শিশুটি থেকে এ ধারণা করাই যায় না যে সে এসব কর্মকাণ্ড দেখবে ও বুঝবে, আর তারপর অত্যন্ত বিজ্ঞতার সাথে তা বর্ণনাও করে দেবে। যে শিশুটি বাহ্যত জগতের সবকিছু থেকে উদাসীন ও নির্বিকার অবস্থায় দোলনায় পড়েছিল, সে ইউসুফ আ.-এর মুজিযা হিসেবে ঠিক ঐ মুহূর্তে মুখ খুললো, যখন আযীযে মেছের ছিল এ ঘটনা সম্পর্কে নানা দ্বিধা-দ্বন্দ্বে জড়িত।

আল্লাহ তাআলা এ শিশুর মুখে একটি দার্শনিকসুলভ উক্তি করিয়েছেন। সে বললো, ইউসুফের জামাটি দেখ—যদি তা সামনের দিকে ছিন্ন থাকে তবে যুলায়খার কথা সত্য, ইউসুফ মিথ্যাবাদী রূপে সাব্যস্ত হবেন। পক্ষান্তরে যদি জামাটি পেছন দিকে ছিন্ন থাকে তাহলে যুলায়খা মিথ্যুক আর ইউসুফ সত্যবাদী। কারণ, তাতে বুঝা যাবে যে ইউসুফ আ. পলায়নরত ছিলেন, কিন্তু যুলায়খা তাকে পলায়নে বাধা দিতে চেয়েছিল। অতপর যখন শিশুর বর্ণিত আলামত অনুযায়ী জামাটি পেছনের দিকে ছিন্ন দেখা গেল, তখন ইউসুফ আ.-এর পবিত্রতা প্রমাণিত হয়ে গেল।

শিশুর মুখে যুক্তিভিত্তিক কথা শোনার সময়ই আযীযে মেছের বুঝতে পেরেছিলেন যে ইউসুফের পবিত্রতা প্রকাশ করার জন্যই এ অস্বাভাবিক ঘটনার অবতারণা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত ইউসুফের জামাটি পেছনের দিকে ছেড়া দেখে বাদশাহ নিশ্চিত হয়ে গেলেন যে দোষ যুলায়খারই এবং ইউসুফ আ. পবিত্র, তখন তিনি যুলায়খাকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

اِنَّهٗ مِنْ كَيْدِكُنَّ اِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيْمٌ ○

"এতো তোমাদেরই ষড়যন্ত্র ; তোমাদের ষড়যন্ত্র খুবই জটিল।"

—সূরা ইউসুফ ঃ ২৮

বাদশাহ যুলায়খাকে ভর্ৎসনা করার পর ইউসুফ আ.-কে বললো, يُوْسُفُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا -"ইউসুফ! এটাকে উপেক্ষা করো"—অর্থাৎ যুলায়খার এ ষড়যন্ত্র ভুলে যাও—এটা বলাবলি করতে যেয়ো না, নয়তো বে-ইজ্জতী হতে থাকবে। তারপর যুলায়খাকে সম্বোধন করে বললো ঃ

وَاسْتَغْفِرِىْ لِذَنْبِكِ اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخٰطِئِيْنَ ○

"তুমি তোমার অপরাধের জন্য ক্ষমা চাও, তুমিই তো অপরাধী।"

—সূরা ইউসুফ ঃ ২৯

অর্থাৎ স্বামীর কাছে ক্ষমা চাও, কারণ স্বামীর অবর্তমানে তুমি তারই অধিকারে খেয়ানত করেছো। অথবা ইউসুফের কাছে ক্ষমা চাও, কারণ নিজে দোষ করে তার উপর চাপিয়েছ।"—মাআরেফুল কুরআন

উপরে মিশর সম্রাটের স্ত্রীর কাণ্ডের একটা দিকের আলোচনা করা হলো। অবশ্য এ দিকটার বেশ গুরুত্বও রয়েছে। আর ইউসুফ সম্পর্কিত কাহিনীর আরেকটি দিক নিম্নে বর্ণিত হলো ঃ

ইউসুফের প্রতি যুলায়খার আশক্তির বিষয়টি জনসমক্ষে রটে গেল। বিশেষত মহিলাদের মাঝে তা নিয়ে চলছিল বেশ কানাঘুষা। সে সমাজের

মহিলাদের এ কানাঘুষার কথা যুলায়খার কানেও গেল। গোপনে যুলায়খার বিরুদ্ধে মহিলাদের কুৎসা রটনার খবর শুনে যুলায়খা এক ফন্দি আঁটলো। সে একদিন ওসব মহিলাকে ভোজসভার আহ্বান করলো। মহিলাদের সামনে বিভিন্ন রকমের খাদ্যসামগ্রী ও ফলমূল রাখা হলো। যেহেতু কিছু খাবার ছিল চাকু দিয়ে কেটে খাওয়ার। তাই প্রত্যেক মহিলাকে একটি করে চাকুও দেয়া হলো। মহিলারা খাবার কাটতে উদ্যত হচ্ছিল, এমন সময় যুলায়খা পাশের কক্ষ থেকে ইউসুফকে মহিলাদের সামনে হাজির করলো। মহিলারা ইউসুফকে দেখে তাঁর রূপ সৌন্দর্যে স্থির থাকতে পারলো না। তারা ইউসুফের প্রতি বিমোহিত হয়ে অপলকনেত্রে তাকিয়ে চাকু দিয়ে খাবারের পরিবর্তে নিজে নিজ হাত কেটে ফেললো। তারা হতভম্ব হয়ে বলতে লাগলো ঃ

حَاشَ لِلّٰهِ مَا هٰذَا بَشَرًا اِنْ هٰذَآ اِلاَّ مَلَكٌ كَرِيْمٌ ○

"হায় আল্লাহ! এতো মানুষ নয়, অবশ্যই তিনি একজন সম্মানিত ফেরেশতা।" অর্থাৎ এত সুন্দর নুরানী চেহারা মানুষের হতে পারে না।"

–সূরা ইউসুফ ঃ ৩১

যুলায়খা তখন মহিলাদের বললো, "দেখলে তো, এ-ই তো সেই ব্যক্তি যার বিষয়ে তোমরা আমাকে ভর্ৎসনা করতে (আমার দুর্ণাম রটাতে) আসলে আমিই তাকে ফুসলিয়েছিলাম, কিন্তু সে পবিত্র রয়েছে। ভবিষ্যতে সে যদি আমার আদেশ অমান্য করে তাহলে সে অবশ্যই কারাগারে নিক্ষিপ্ত হবে এবং লাঞ্ছিতও হবে।"

যুলায়খা যখন দেখলো সমাগত মহিলাদের সামনে তার গোপন ভেদ ফাঁস হয়ে গেছে, তখন সে মহিলাদের সামনেই ইউসুফকে ভয় দেখাতে লাগলো। কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেছেন, আমন্ত্রিত মহিলারাও ইউসুফকে বলতে লাগলো, "তুমি তো যুলায়খার কাছে ঋণী, কাজেই তার ইচ্ছার অবমাননা করা উচিত নয়।" ইউসুফ আ. বললেন, "হে রব! তারা আমাকে যে কাজের দিকে আহ্বান করে, তার চেয়ে আমি কারাগারকেই পসন্দ করি। তুমি যদি ওদের চক্রান্ত আমার উপর থেকে প্রতিহত না করো, তাহলে তো আমি ওদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়তে পারি আর তখন আমি জাহিলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।" অতপর আল্লাহ তাঁর দুআ কবুল করে তাঁকে ওদের চক্রান্ত থেকে বাঁচিয়ে রাখলেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এভাবে হযরত ইউসুফ আ.-কে বহুমুখী ষড়যন্ত্রের জাল থেকে উদ্ধার করে পবিত্র ও নিষ্কলুষ রাখলেন। মিশর সম্রাটের স্ত্রী যুলায়খার সকল ষড়যন্ত্র নস্যাৎ হয়ে গেল। বস্তুত তাওহীদ ও আখিরাতে

বিশ্বাসের প্রকৃত তাৎপর্যের এটাই চমৎকার উদাহরণ। সকল যুগে আল্লাহর পথের অনুসারী ব্যক্তিবর্গ এমনি আখলাকের অধিকারী হয়ে থাকে। আসলে সর্বাবস্থায় আল্লাহর স্মরণ ও সর্বত্র আল্লাহ বিরাজমান। তার প্রকৃত অনুভূতি হযরত ইউসুফ আ.-কে যেভাবে যুলায়খার ষড়যন্ত্রের জাল থেকে মুক্ত রেখেছিল, সকল যুগের মর্দে মুমিনগণও এভাবেই সত্যিকার তাকওয়া অর্জনে সক্ষম হয়ে থাকে। অবশ্য এ ক্ষেত্রে আল্লাহর সাহায্য একান্ত প্রয়োজন। আর নিজেকে এ সাহায্য প্রাপ্তির যোগ্য করে গড়ে তোলা এবং সে উদ্দেশ্যে নিজেকে প্রস্তুত রাখাই ঈমানদার লোকদের কাজ।

وَاللّٰهُ الْمُوْفَقُ وَهُوَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْهِ التُّكْلَانُ -

❐

তিন

قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ اِذْ رَاوَدْتُّنَّ يُوْسُفَ عَنْ نَّفْسِهٖ ط قُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوْءٍ ط قَالَتِ امْرَاَتُ الْعَزِيْزِ الْئٰنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ ز اَنَا رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ وَاِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ○

"বাদশাহ মহিলাদের বললো, তোমাদের অবস্থা কেমন যখন তোমরা ইউসুফকে দিয়ে নিজেদের মনস্কামনা পূরণে তাকে ফুসলিয়েছিলে ?" তারা বললো, "আল্লাহরই মহত্ব, আমরা তো তার মধ্যে সামান্যতম খারাপীও দেখিনি।" বাদশাহর স্ত্রী বলে উঠলো, "এখন তো সত্য প্রকাশিত হয়ে গেছে। আমিই তাকে ফুসলিয়েছিলাম, সে তো সত্যবাদী।"

–সূরা ইউসুফ ঃ ৫১

ইউসুফ আ.-এর চারিত্রিক স্বচ্ছতা সম্পর্কে মিশর সম্রাটের স্ত্রীর স্বীকারোক্তি

এ হচ্ছে মিশর সম্রাটের স্ত্রীর কাণ্ডের আরেক দিক। এখানে 'আযীযে মেছের'-এর স্ত্রীই নয় বরং সমাজের অন্যান্য মহিলারাও যে হযরত ইউসুফের চরিত্রের স্বচ্ছতা সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছিল সেকথা ফুটে উঠেছে। সংক্ষিপ্ত ঘটনা হলো, মিশর সম্রাটের অনুপস্থিতিতে তার স্ত্রী ইউসুফকে যে নিজের কুমতলব চরিতার্থ করার জন্য ফুসলিয়েও কঠিন ষড়যন্ত্র করেও তাকে কাবু করতে পারলো না, অধিকন্তু সম্রাটের সামনে উল্টো ইউসুফের ঘাড়েই সমস্ত দোষ চাপিয়ে দিল। শেষ পর্যন্ত মিশর সম্রাটও প্রকৃত ঘটনা বুঝতে পেরে নিজের স্ত্রীকে ভর্ৎসনা করলো আর ইউসুফকে বললো বিষয়টি নিয়ে যেন নাড়াচাড়া না করে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও লোক সমক্ষে স্ত্রীর মুখ বাচানোর জন্য ইউসুফকে জেলখানায় পাঠানো হলো। জেলখানায় তাঁকে বন্দী জীবনযাপন করতে হয়েছিল দীর্ঘ আট-নয় বছর।–তাফহীমুল কুরআন

ইউসুফ আ.-এর সাথে আরও দুই যুবকও জেলখানায় আটক ছিল। দুই যুবকের দুটো স্বপ্নের ব্যাখ্যার জন্য তারা হযরত ইউসুফকে অনুরোধ জানালো। তারা দীর্ঘদিনের বাস্তব ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় হযরত ইউসুফকে অত্যন্ত সৎ, চরিত্রবান ও সুবিজ্ঞ জানতে পেরেছে বলে উভয়ে তাঁর কাছে

নিজ নিজ স্বপ্নের তা'বীর জানতে চাইলো। হযরত ইউসুফ আ. তাদেরকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিলেন। ইতিমধ্যে তাদের একজন স্বপ্নের ব্যাখ্যানুযায়ী জেলখানা থেকে মুক্তিও পেয়ে গেলো।

একদিন মিশর সম্রাট দরবারের লোকদের ডেকে তার এক আশ্চর্য স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চাইলো। লোকেরা বললো, "এটা তো একটা অস্পষ্ট স্বপ্নের কথা আর আমরা তো স্বপ্নের তা'বীর সম্পর্কে জ্ঞাত নই।" সে সময় ওখানে জেলখানা থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত যুবকটিও উপস্থিত ছিল। তৎক্ষণাৎ তার মনে পড়লো দীর্ঘদিনের জেলখানার সাথী ইউসুফের কথা এবং স্বপ্নের তা'বীর সম্পর্কে তার বিজ্ঞতার কথা। সে বললো, আমি আপনাদেরকে এ স্বপ্নের তা'বীর বলে দেব, আমাকে একটু জেলখানায় ইউসুফের কাছে পাঠিয়ে দিন। যুবকটি সভাসদকে ইউসুফের নির্ভুল স্বপ্ন তা'বীর জানার বিষয়েও অবহিত করেছিল।-তাফহীমুল কুরআন

যুবকটিকে জেলখানায় পাঠানো হলো। সে ইউসুফকে বাদশাহর স্বপ্নের বিষয় জানালে ইউসুফ আ. বাদশাহর স্বপ্নের তা'বীর বলে দিলেন। যুবক বাদশাহর দরবারে গিয়ে ইউসুফের বর্ণিত তা'বীর—স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিল। বাদশাহ বললো, "তাকে আমার কাছে নিয়ে আস।" বাদশাহর পাঠানো লোক যখন ইউসুফের কাছে গিয়ে এ সুসংবাদ দিল, তখন ইউসুফ তাকে বললেন, আগে তুমি তোমার মালিকের কাছে ফিরে গিয়ে তার কাছ থেকে জেনে আস তো, ঐসব মহিলাদের কি অবস্থা, যারা নিজেদের হাত কেটেছিল ? নিশ্চয়ই আমার রব তাদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে ওয়াকিফহাল আছেন।"

এ খবর বাদশাহর কাছে গেলে তিনি সেসব মহিলাদের একত্র করে তাদের কাছ থেকে ইউসুফ সম্পর্কে তার চরিত্র সম্পর্কে জানতে চাইলেন। আলোচ্য আয়াতে বাদশাহর সেই জিজ্ঞাসা ও মহিলাগণ থেকে সেই জিজ্ঞাসার জবাব এবং মিশর বাদশাহর স্ত্রীর স্বীকৃতি কুরআনের ভাষায় ব্যক্ত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, বাদশাহ মহিলাদের একত্র করে জিজ্ঞেস করলেন, ঐ ঘটনাটি কি ছিল, যখন তোমরা নিজেদের কুমতলব পূরণের জন্য ইউসুফকে ফুসলিয়ে ছিলে ? অর্থাৎ ইউসুফ সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কি ? জবাবে মহিলারা একবাক্যে বললো, "আল্লাহরই মহত্ব, আমরা তার মধ্যে খারাপির লেশমাত্রও দেখতে পাইনি। বাদশাহর স্ত্রী যখন দেখলো প্রকৃত সত্য বেরিয়ে এসেছে, তখন সেও মূল ঘটনার প্রকৃত রহস্য উন্মোচিত করলো। সে স্বীকার করলো যে আসলে দোষী তো সে নিজে। সে বলে উঠলো, আমিই তাকে দিয়ে আমার মনস্কামনা পূরণের চেষ্টা করেছিলাম। সে নিশ্চয়ই পবিত্র

চরিত্রের অধিকারী। আমি যখন দোষটা তার ওপর চাপিয়ে দিয়েছিলাম, তখন সে যে বলেছিল আমিই তাকে ফুসলিয়েছিলাম। তার একথায় সে সম্পূর্ণ সত্যবাদী।"

বাদশাহর স্ত্রী ইউসুফকে দিয়ে নিজের কুমতলব চরিতার্থ করার সকল ষড়যন্ত্র যখন ইউসুফের সুদৃঢ় ঈমানী শক্তি ও অনঢ় মনোবলের কাছে হেরে গেল, আর ইউসুফের পেছনে পেছনে তাকে ধরার জন্যে যখন বাদশাহর স্ত্রী দৌড়াচ্ছিল এবং ঘরের বাইরে এসে উভয়ই বাদশাহর সামনে পড়ে গেলো ; তখন মহিলাটি স্বামীর কাছে উল্টো ইউসুফের দোষ করার কথা বানিয়ে বলেছিল। সে নিজের দোষটা ইউসুফের উপর চাপিয়ে দিয়েছিল। তারপর বাদশাহ ইউসুফের নির্দোষী হওয়ার বিষয়ে নিশ্চিতও হয়েছিল। এতদসত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত ইউসুফকে জেলখানায় ঢুকানো হলো। তাঁকে দীর্ঘদিন জেলখানায় পঁচতে হলো। নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী হয়েও মিথ্যা অপবাদের গ্লানী কাঁধে নিয়ে তাঁকে জেলখানায় শাস্তি পেতে হলো। এতসব প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও ইউসুফ আ. ধৈর্যের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছিলেন।

অতপর বাদশাহ যখন তার স্বপ্নের তা'বীর ইউসুফ থেকে লোক মারফত জানতে পেলেন, তখন তাঁকে জেলখানা থেকে নিয়ে আসতে বলা হলে ইউসুফ তা প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি যে মিথ্যা অজুহাতে জেলে গেলেন তার যথাযথ ফায়সালা ছাড়া তিনি মুক্তির আদেশ মেনে নিতে অস্বীকার করলেন। তিনি চাইলেন তাঁর নির্দোষ হওয়ার বিষয়টি আগে জনসমক্ষে আসতে হবে, তারপর তিনি জেল থেকে বেরুবেন। আর সে জন্যেই তিনি বলে পাঠালেন, আগে বাদশাহকে গিয়ে বলো মহিলাদের হাত কাটার ঘটনাটি কি ছিল ? বাদশাহ কি সে জন্যে তাঁকে সন্দেহ করেন ? সেজন্যে কি তাঁকে দোষী মনে করা হয় ?

এখানে প্রসংগত এ বিষয়টিও প্রনিধানযোগ্য যে, ইউসুফকে মুক্তির কথা শুনালে তিনি হাত কর্তনকারীনী মহিলাদের কথা বললেন, অথচ ঘটনার মূল কেন্দ্রবিন্দু বাদশার স্ত্রীর কথা বলেননি। তিনি যে অত্যন্ত শালীনতাসম্পন্ন অতিশয় ভদ্র ব্যক্তি ছিলেন, এটা তার আরেকটি প্রমাণ। দ্বিতীয়ত, তিনি তাদের ঘরে লালিত-পালিত হয়েছিলেন বিধায় সেই নিমকের কদর স্বরূপ বাদশাহর স্ত্রীর কথা বলেননি। তৃতীয়ত, বাদশাহর স্ত্রী যতবড় অন্যায়ই করুক না কেন, সে বাদশাহর কাছে ছিল খুবই প্রিয়পাত্রী। কাজেই ইউসুফ তার সম্পর্কে উক্তি করা পসন্দ করেননি। চতুর্থত, নিজের পবিত্রতা প্রমাণ করাই ছিল ইউসুফ আ.-এর উদ্দেশ্য। তাই তিনি মহিলাদের কথা বললেন।

বাদশাহর স্ত্রীর কথা বললে তো সরাসরি তার বিরুদ্ধেই অভিযোগ বুঝা যেতো। তিনি এভাবে বাদশাহর স্বীয় অপমানিত হওয়ার পক্ষপাতি ছিলেন না।

মোটকথা, বাদশাহর জিজ্ঞাসার উত্তরে এলাকার সকল মহিলাই ইউসুফের পবিত্রতা ও নির্দোষিতার বিষয় স্বীকার করলো। সেই পরিস্থিতিতে বাদশাহর স্ত্রী যুলায়খাও নিজের দোষী হওয়ার কথা স্বীকার করে ইউসুফের নিষ্কলুষ ও চরিত্রবান হওয়ার কথা প্রকাশ করলো। আসলে সেই মুহূর্তে যুলায়খার জন্য নিজের দোষ স্বীকার করা ছাড়া কোনো উপায়ও ছিলো না। অবস্থা বেগতিক দেখে যুলায়খা প্রকাশ্যে স্বীকার করলো যে, এখন তো সত্য প্রকাশিত হয়ে পড়েছে আর যুলায়খা নিজেই ইউসুফকে ফুসলিয়েছে আর ইউসুফ পবিত্র চরিত্রের মানুষ। এমন ফেরেশতা স্বভাবের লোকটার এহেন দুষ্কর্মের সাথে কোনোই সম্পর্ক নেই।

❐

চার

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ اَنْجٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ط وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ○

"আর স্মরণ করো, মূসা যখন তার জাতির লোকদের বলেছিল, তোমরা আল্লাহর সেই নিয়ামতের কথা স্মরণ করো যে তিনি তোমাদেরকে ফেরাউনের সম্প্রদায় থেকে মুক্তি দিয়েছেন। যারা তোমাদের অত্যন্ত নিকৃষ্ট ধরনের শাস্তি দিচ্ছিল। আর তারা তোমাদের ছেলেদের হত্যা করতো এবং মেয়েদের জীবিত রাখতো। এতে তোমাদের জন্য তোমাদের রবের পক্ষ থেকে ছিল কঠিন পরীক্ষা।"–সূরা ইবরাহীম ঃ ৬

পুরুষবিহীন সমাজ নারীদের জন্য বিপজ্জনক ও শাস্তিতুল্য

আলোচ্য আয়াতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হযরত মূসা আ.-এর যামানার এক জঘন্য ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। এ আয়াতটি হযরত মূসা আ. তাঁর জাতিকে যে ভাষণ দিয়েছিলেন সেই ভাষণের মমার্থস্বরূপ। আর ভাষণটি ছিল সেই সময়ের, যখন মূসা আ.-এর কওম ফেরাউনী সম্প্রদায়ের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছিল। এ ভাষণে মূসা আ. তাঁর কওমকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে, ফেরাউন ও তার সম্প্রদায় থেকে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে ও দয়ায় তোমাদের নাজাত দিয়েছিলেন। এখন তোমাদের উচিত আল্লাহ তাআলার সেই দয়া ও অনুগ্রহের কথা স্মরণ রাখা, সবসময় আল্লাহর শোকরগুযার থাকা, সেই অনুগ্রহের কথা ভুলে গিয়ে কখনো যেন এমন স্বেচ্ছাচারিতায় ডুবে না যাও, যার শাস্তি আল্লাহ তোমাদের উপর ফেরাউনী সম্প্রদায়ের অত্যাচারের আকারে নিপতিত করেছিলেন।

হযরত মূসা আ.-এর সময়কার ইতিহাস মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানার ইসরাঈলীদের শুনিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্য হলো, সমসাময়িক ইসরাঈলীরা যে মূসা আ.-এর সেই শিক্ষা ভুলে গিয়ে শয়তানের পথে পা দিচ্ছে এবং ইসলামের বিরোধীতায় মত্ত হয়ে নতুন করে নিজেদের দুর্ভাগ্যই ডেকে আনছে—সে কথা তাদের স্মরণ করিয়ে

দেয়া এবং পুরানো ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে ইসলাম বিদ্বেষ থেকে বিরত রাখা।–তাদাব্বুরে কুরআন—মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী।

সূরা ইবরাহীমের এ হচ্ছে ষষ্ঠ আয়াত। শব্দের সামান্য পার্থক্য সহ এ আয়াতটি সূরা আল বাকারার ৪৯ আয়াতে এবং সূরা আল আরাফের ১৪১ আয়াতেও উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা আল বাকারায় বলা হয়েছে ঃ

وَاِذْ نَجَّيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآئَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآئَكُمْ وَفِىْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ○

"স্মরণ করো যখন আমি ফেরাউনী সম্প্রদায় থেকে তোমাদের মুক্তি দিয়েছিলাম, যারা তোমাদের পুত্রদের হত্যা করতো আর মেয়েদের জীবিত রেখে তোমাদের মর্মান্তিক যন্ত্রণা দিতো। এতে ছিল তোমাদের রবের পক্ষ থেকে এক মহাপরীক্ষা।"–সূরা আল বাকারা ঃ ৪৯

এখানে পূর্ববর্তী দুটো আয়াতে বনী ইসরাঈলীদের আল্লাহ তাআলা সরাসরি সম্বোধন করে আয়াত নাযিল করেছেন। আলোচ্য আয়াতে অবশ্য মূসা আ.-এর ভাষণের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে।

সূরা আল আরাফে বলা হয়েছে এভাবে—

وَاِذْ اَنْجَيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُوْنَ اَبْنَآئَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآئَكُمْ وَفِىْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ○

"স্মরণ করো, আমি তোমাদেরকে ফেরাউনীদের থেকে উদ্ধার করেছি, যারা তোমাদের ছেলেদের হত্যা করতো মেয়েদের জীবিত রাখতো, এতে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য ছিল এক মহাপরীক্ষা।"–সূরা আল আরাফ ঃ ১৪১

সূরা আল আরাফের এ আয়াতেও হযরত মূসা আ.-এর ভাষণের উদাহরণ দেয়া হয়নি। বরং সরাসরি ইসরাঈলীদেরকেই সম্বোধন করা হয়েছে। তিনটি আয়াতেই বনী ইসরাঈলদের প্রতি অত্যাচারকারী ফেরাউনের লোকদের ব্যাপারে বলতে গিয়ে اٰل فِرْعَوْنَ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থ ফেরাউনের লোকজন। اٰلٌ অর্থ বংশধর, অনুগত ও অনুসারী।

ফেরাউনীদের অত্যাচার করার ঘটনা ছিল এই যে, একদা ফেরাউনের স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে জ্যোতিষীরা তাকে বললো যে, বনী ইসরাঈল

বংশে এমন এক লোক জন্মগ্রহণ করবে যে আপনার কর্ম ও রাজত্ব ধ্বংস করে দেবে। তখন ফেরাউন এক ফরমান জারি করে বলে দিল যে, বনী ইসরাঈলের ঘরে কোনো ছেলের জন্ম হলে তাকে হত্যা করে দিবে আর মেয়ে জন্ম নিলে তাকে খিদমতের জন্য জীবিত রাখবে। কিন্তু আল্লাহ হযরত মূসা আ.-কে সৃষ্টি করে জীবিত রাখলেন।–আল কুরআনুল কারীম, মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী।

আল্লাহ তাআলা প্রথম মানুষ হযরত আদম আ.-কে সৃষ্টি করে তাঁর থেকে তাঁর জোড়া হিসেবে সৃষ্টি করলেন বিবি হাওয়া আ.-কে। অতপর মানব সমাজের বৃদ্ধি ও সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে নারী-পুরুষ সৃষ্টির ধারা জারি করেন। নারী-পুরুষের মধ্যে যৌন স্পৃহা সৃষ্টি মূলত একটি সৃষ্টি কৌশল স্বরূপ। নারী বিহীন পুরুষের জীবন অসম্পূর্ণ তেমনি পুরুষ বিহীন নারীর জীবন বৃথা। বরং নারী-পুরুষ পরস্পরের সম্পূরক বিধায় উভয়েই একে অন্যের অভাবে অসার জীবনযাপন করে। শক্তি-সামর্থ ও দায়িত্ব-কর্তব্যের প্রাকৃতিক বিভাজন অনুযায়ী পুরুষ বিহীন সমাজ নারী-জীবনের জন্য বিপজ্জনক। ফেরাউন সেই প্রাকৃতিক বিভাজন বিনষ্টকারী ও সমাজ শৃংখলা ধ্বংসকারী পদক্ষেপ নিয়েছিল।

❐

পাঁচ

وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثٰى ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَظِيْمٌ ○ يَتَوَارٰى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْٓءِ مَا بُشِّرَ بِهٖ ط اَيُمْسِكُهٗ عَلٰى هُوْنٍ اَمْ يَدُسُّهٗ فِى التُّرَابِ اَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ○

"যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তান হওয়ার সুসংবাদ দেয়া হয় তখন তার চেহারা কাল হয়ে যায়। আর সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়। তাকে শোনানো সুসংবাদের দুঃখে সে তার কওম থেকে আত্মগোপন করে। সে ভাবে, এ অপমান সহ্য করে ওকে থাকতে দেবে, না ওকে মাটিতে পুতে ফেলবে। দেখ, তাদের সিদ্ধান্ত কতইনা নিকৃষ্ট।"

—সূরা আন নহল ঃ ৫৮-৫৯

মুশরিক সমাজে কন্যা সন্তানের জন্ম অসহনীয় ও মনস্তাপে ক্লিষ্ট হওয়ার কারণ

আলোচ্য আয়াতে রসূলের সময়ে আরবের মুশরিকদের কতিপয় ভ্রান্ত চিন্তা ও আচরণের মধ্যে একটির উল্লেখ করা হয়েছে। আর তাহলো যখন ওদের কোনো ব্যক্তির কন্যা সন্তানের জন্ম হওয়ার খবর পিতার কানে পৌঁছতো, তখন পিতার চেহারা কালো হয়ে যেতো, রাগে ও ক্ষোভে তার মন অস্থির হয়ে উঠতো আর সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হতো। এর গ্লানি হেতু সে তার কওম থেকে আত্মগোপন করতো—সমাজের লোকদের মুখ দেখাবে কিভাবে—এ ছিল তার মানসিক প্রতিক্রিয়া। মেয়ে বড় হলে তাকে অন্য কোনো ছেলের কাছে বিয়ে দিতে হবে ভেবে সে লজ্জায় অস্থির হয়ে পড়তো। এ হীনতা সত্ত্বেও সে কন্যাটাকে রাখবে, না মাটিতে পুঁতে ফেলবে —এ ছিল তার দুঃচিন্তা।

পূর্ববর্তী দুটো আয়াতে মুশরিকদের ভ্রান্ত চিন্তা-চেতনার বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। তারা আল্লাহর দেয়া রিয্‌কের একাংশ তাদের উপাস্যদের জন্য নির্ধারণ করে থাকে। আল্লাহর দেয়া রিয্‌ক প্রাপ্তিতে তাদের বাতিল মাবুদদের ভূমিকা রয়েছে বলে তাদের বিশ্বাস। এমনকি রিয্‌ক থেকে মান্নত বা কুরবানীর একাংশ নির্ধারণ করতো তাদের ওসব

উপাস্যদের নামে। তারা ফেরেশতাদের আল্লাহর কন্যা বলে বিশ্বাস করতো। তারা নিজেদের কন্যা হওয়াকে এত খারাপ মনে করতো যে, কন্যা জন্মালে তারা কওম থেকে দূরে গিয়ে আত্মগোপন করতো।

মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী রহ. তার তাফসীর তাদাব্বুরে কুরআনে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, "অর্থাৎ তারা তো আল্লাহর ফেরেশতাদের আল্লাহর কন্যা বলে বিশ্বাস করে কন্যাদের আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে রেখেছে। অথচ কন্যা সম্পর্কে তাদের নিজেদের অবস্থা এই যে, কাউকে কন্যা হওয়ার খবর দিলে তার চেহারা কালো হয়ে যায়, আর তখন থেকে সে মনের ক্ষোভে মনের জ্বালায় অস্থির হয়ে পড়ে। কন্যা হওয়াটাকে নিজের জন্য লজ্জার বিষয় মনে করে সমাজ থেকে সে আত্মগোপন করতে থাকে আর সর্বক্ষণ এ দ্বিধা-দ্বন্দ্বে থাকে যে, এ অপমান সহ্য করে কন্যাটাকে জীবিত রাখবে, নাকি ওকে মাটিতে দাফন করে সেই অপমান থেকে নিস্তার লাভ করবে।"

শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী রহ. বলেন, "জাহেলী যুগে অনেক নিষ্ঠুর পিতা কন্যাদের হত্যা করতো অথবা যমীনে জীবন্ত দাফন করতো। ইসলাম এসব মন্দ প্রথার উচ্ছেদ করে এবং এমনভাবে তার মূলোৎপাটন করে ফেলে যে ইসলামের স্বর্ণযুগে এ নিষ্ঠুরতার একটি দৃষ্টান্তও খুঁজে পাওয়া যাবে না। কোনো কোনো তাফসীরকার اَيُمْسِكُهٗ عَلٰى هُوْنٍ এর অর্থ কন্যাকে অপমান সহ্য করে জীবিত রাখবে—এর পরিবর্তে তরজমা করেছেন সে কন্যাকে লাঞ্ছনা-গঞ্জনার মধ্যে জীবিত রাখবে। অর্থাৎ কন্যাকে জীবিত রাখলেও তার সাথে এমন নিকৃষ্ট আচরণ করবে যেন সে তার সন্তানই নয়, বরং যেন সে মানুষই নয়।"

اَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ "দেখ, তাদের সিদ্ধান্ত কতই না নিকৃষ্ট!" আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, কন্যাদের সম্পর্কে তাদের যে নির্যাতনমূলক সিদ্ধান্ত ছিল, তার চেয়ে অধিক নিকৃষ্ট সিদ্ধান্ত হলো এই যে, তারা আল্লাহর সন্তান সাব্যস্ত করে থাকে। তাও আবার কন্যা সন্তান, যার ব্যাপারে নিজেদের অবস্থা হলো অসহনীয় অপমানবোধ। যেন তাদের জন্য চাই উত্তম বস্তু, আর আল্লাহর জন্যে নিকৃষ্ট বস্তু !

আল কুরআন জাহেলী যুগ তথা মুশরেকী সমাজের কুপ্রথা—কন্যা সন্তানের জন্ম সংবাদে স্বয়ং জন্মদাতা পিতার প্রতিক্রিয়া ও ভূমিকা সম্পর্কে এখানে আলোকপাত করেছে। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ফলে কন্যা সন্তানের সেই ভয়াবহ অবস্থার অবসান ঘটে। আল্লাহর নবী কন্যা সন্তানের

লালন-পালন করাকে বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করেছেন। পৃথিবীতে মানব বংশ সংরক্ষণ ব্যবস্থা হিসেবে আল্লাহ তাআলা মানব জাতিকে নর-নারীরূপে সৃষ্টি করে উভয়ের প্রতি উভয়ের প্রেম-প্রীতি ও আকর্ষণ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। আর এ প্রেম-প্রীতি ও আকর্ষণের সদ্ব্যবহার এবং রীতিনীতিও শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষের স্বভাবধর্ম ইসলাম মানব জাতিকে মান-সম্ভ্রম নিয়ে নর-নারীর সেই সম্পর্ক স্থাপন ও রক্ষার ব্যবস্থাও শিখিয়েছে। ইসলাম হচ্ছে স্রষ্টার পক্ষ থেকে সৃষ্টির কল্যাণের স্বাভাবিক বিধান। কিন্তু যুগে যুগে মানুষ তাদের রব আল্লাহ তাআলার সেই কল্যাণকর বিধান থেকে বিচ্যুত হয়ে বহুমুখী সমস্যা ও যন্ত্রণার শিকার হয়ে আসছে। আর অন্য পথে তার সমাধান করতে গিয়ে সম্মুখীন হচ্ছে আরও বহুবিধ. নতুন নতুন সমস্যার।

জাহেলী যুগের জাহেলী ধ্যান-ধারণা আধুনিক যুগেও বিরাজমান রয়েছে। হয়তো ধরণ কিছুটা পাল্টিয়েছে। তখনকার যুগে কেবল কন্যার জন্ম হওয়াকে গ্লানী ও অপমানকর মনে করা হতো কিন্তু আজকের বিশ্বের উন্নয়নমুখী দেশে তো সন্তানের আগমনকেই অসহনীয় ভাবা হচ্ছে। অবস্থা এমন পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যে, অধিক সন্তানের পরিবারকে সর্বদিক থেকে নাজেহাল হতে দেখা যায়। পাশাপাশি একটি সন্তান পাওয়ার জন্যও তো অনেক দম্পতিকে পাগলপারা হয়ে ঘুরতে দেখা যায়। আসল কথা, মানুষতো ব্যাষ্টিক (Micro) দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করে থাকে, আর আল্লাহর তো রয়েছে মহা সামষ্টিক (Super Macro) দৃষ্টিকোণ। বিশ্বসমাজে দেখা যায় প্রাচুর্যের দেশ (Aflucnt Country) বলে কথিতরা উন্নয়নমুখী জাতি (Developing Nations) সমূহকে জন্মনিরোধের সবক দিয়ে যাচ্ছে। অথচ তাদের দেশে ব্যাপক হারে নাগরিকত্ব প্রদান করা হচ্ছে অন্য দেশের জনসমষ্টিকে! আবার সমাজে নারী মুক্তি আন্দোলন চলছে নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। অধিকার ও মর্যাদা তো সেই সত্ত্বাই নির্ধারণ করতে পারেন যিনি সৃষ্টি করে লালনপালন করছেন। অন্য কারো পক্ষে তা আদৌ সম্ভব হতে পারে না। আশ্চর্যের বিষয় হলো, যে ইসলামী জীবন বিধান বিশ্বের বুকে নারী মুক্তির ব্যবস্থা করেছে, সেই জীবন বিধানকেই তো কেউ কেউ নারী মুক্তির অন্তরায় ভাবছে। এই হচ্ছে এদের ইসলাম সম্পর্কে চরম অজ্ঞতা অথবা জেনেবুঝে ইসলামদ্রোহীতার আত্মঘাতী ভূমিকা।

বস্তুত প্রাচীন জাহেলিয়াত ও আধুনিক জাহেলিয়াতের ইসলাম দ্রোহীতার ব্যাপারে রয়েছে এক আত্যাশ্চর্য সামঞ্জস্য। অবশ্য এ দুয়ের ধরণ ও এতদোভয়ের অনুসারীদের মধ্যে বেশ অগ্রগতির দিক যে সুস্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে তা নির্দ্বিধায় বলা যায়। আর তাহলো ঃ এক. প্রাচীন জাহেলিয়াতে

কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেয়া হতো আর নব্য জাহেলিয়াতে কন্যা বা ছেলে নির্বিশেষে যে কোনো সন্তানের জন্মনিরোধের ব্যবস্থা নেয়া হয়। দুই. প্রাচীন জাহেলিয়াতে শুধু কন্যার জন্মকে লজ্জাকর মনে করা হতো আর নব্য জাহেলিয়াতে যে কোনো প্রকারের সন্তানই অকাম্য ও অনভিপ্রেত। তিন. প্রাচীন জাহেলিয়াতে সন্তান দুনিয়াতে আসার পর ব্যবস্থা নেয়া হতো আর আধুনিক জাহেলিয়াতে সন্তান যাতে জন্মই নিতে না পারে সে ব্যবস্থাই করা হয়। চার. প্রাচীন জাহেলিয়াতের যুক্তি ছিল অভাব-অনটন, মান-মর্যাদা ও সামাজিক রীতিপ্রথা ; আধুনিক জাহেলিয়াতের যুক্তি জীবনযাত্রার মান সংরক্ষণের নামে প্রাচীন জাহেলিয়াতেরই অনুরূপ।

❐

ছয়

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ج وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

"যে ব্যক্তি নেক আমল করবে—চাই সে পুরুষ হোক বা নারী—সে মুমিন হলে অবশ্যই তাকে দুনিয়াতে 'হায়াতে তাইয়্যেবা' (পবিত্র জীবন) দান করবো। আর আখিরাতে তাদের কাজের প্রতিফল দেব উত্তমভাবে, যা তারা আমল করতো।"–সূরা আন নাহল ঃ ৯৭

মুমিনগণ নারী-পুরুষ নির্বিশেষে নেক আমলের ফলে হায়াতে তাইয়্যেবা 'পবিত্র জীবন' লাভ করতে পারে

আলোচ্য আয়াতে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, কুরআনের দৃষ্টিতে নারী ও পুরুষের কর্মফল ও সফলতার নিয়ম এক ও অভিন্ন। অর্থাৎ নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে নিজ নিজ অবস্থার প্রেক্ষিতে নেক কাজ করে দুনিয়াতে যেমন পবিত্র জীবন লাভে সক্ষম হয়, আখিরাতেও তেমনি নেক আমলসমূহের উত্তম সুফল পেতে থাকবে। এখানে সমস্ত নেক আমল সম্পর্কে একটা সাধারণ নিয়ম বর্ণনা করা হয়েছে। সংক্ষেপে বলা যায়, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে যে কেউ নেক আমলের অভ্যাস করে, আর নেক আমলগুলোও বাহ্যিক দৃষ্টিতেই নয় ; বরং প্রকৃতপক্ষেই যদি নেক হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ তাআলা এমনসব লোকদের দুনিয়ার জীবনে উত্তম ও পবিত্র জীবনযাপন করাবেন।–শায়খুল ইসলাম মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী।

আয়াতটির তরজমা এভাবেও বুঝতে পারি, যে ব্যক্তি নেক আমল করে অর্থাৎ আল্লাহর বিধান ও রসূলের আদর্শের ভিত্তিতে দুনিয়ার জীবন অতিবাহিত করে, তাকে আল্লাহ তাআলা 'হায়াতে তাইয়্যেবা' দান করবেন ; সে ব্যক্তি নারী হোক কিংবা পুরুষ।

সূরা আন-নাহলের এ আয়াতটিতে সুস্পষ্ট করে নারী ও পুরুষের জন্য আল্লাহ তাআলার এ ওয়াদা ব্যক্ত করা হয়েছে। এখানে নারী ও পুরুষকে পৃথকভাবে উল্লেখ করার কারণ, সেই যুগে মুসলিম পুরুষ যেভাবে নিজের ঈমান নিয়ে বেঁচে থাকার জন্য কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন হতো, তেমনিভাবে অনেক মহিলাও নিজের ঈমান বাঁচাতে গিয়ে প্রাণপণ লড়াই করতে হতো।

কিন্তু মহিলারা অবলা হওয়ার কারণে তাদের পরীক্ষা ছিল পুরুষের পরীক্ষা থেকে কঠোরতর। তাই এখানে পবিত্র কুরআন পুরুষদের সাথে মহিলাদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করে তাদের সান্ত্বনা ও প্রেরণা যুগিয়েছে। তারা যদি ঈমান ও নেক আমলের সংকল্প করে নেয়, তাহলে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তাদের পবিত্র জীবনযাপন করাবেন। শয়তান তাদেরকে এ নিয়ামত থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না। আল্লাহ শয়তানদের সেই সুযোগই দিবেন না।–মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী ঃ তাদাব্বুরে কুরআন।

মুসলিম ও কাফির সমাজের যেসব সংকীর্ণমনা ও সংকীর্ণ দৃষ্টির ধৈর্যহীন লোক অজ্ঞতা ও ভুলবশত মনে করে যে, সততা, বিশ্বস্ততা, আমানতদারী ও পরহেজগারীর নীতি অবলম্বন করলে আখিরাতের জীবনে যত কল্যাণই লাভ হোক না কেন, দুনিয়ায় অবশ্যই বড় ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়—আলোচ্য আয়াতে তাদের সেই ভুল ধারণার নিরসন করা হয়েছে। তাদের জবাব স্বরূপ আল্লাহ তাআলা বলছেন, তোমাদের এহেন খেয়াল মোটেই ঠিক নয়। সঠিক ও নির্ভুল নীতিপন্থা অবলম্বনে কেবল আখিরাতে কল্যাণ লাভ হয় না, দুনিয়াতেও কল্যাণ লাভ হয়ে থাকে। যারা সত্যিকার ঈমানদার, সত্যপন্থী ও সঠিকভাবে কাজ সম্পন্নকারী, তাদের বৈষয়িক জীবনও বেঈমান ও অসত্যপন্থীদের চেয়ে অবশ্যই উত্তম হয়ে থাকে। নির্মল নৈতিক চরিত্রের কারণে তারা যে প্রভাব-প্রতিপত্তি ও সম্মান-মর্যাদা লাভ করে থাকে, অন্য কেউ তা কিছুতেই লাভ করতে পারে না। যে সুস্থতা, শুভ্রতা ও পবিত্রতা লাভ তাদের সৌভাগ্যে হয়ে থাকে, তা থেকে অন্যরা বঞ্চিতই থেকে যায়। কেননা তারা চরম নিকৃষ্ট ও খারাপ আচরণ করে বলে ব্যর্থতা তাদের ভাগ্যলিপি হয়ে থাকে। নেক লোকেরা দরিদ্র হয়েও মনের যে প্রশান্তি লাভ করে থাকে, তাদের অন্তর্জগতে যে ধীরতা স্থিরতা বিরাজ করে, তার শতাংশের একাংশও ফাসেক-ফাজের লোকেরা পেতে পারে না।–সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী-তাফহীমুল কুরআন।

আলোচ্য আয়াতে সৎকর্মশীল মুমিন নর-নারীকে আল্লাহ তাআলা 'হায়াতে তাইয়্যেবা' (পবিত্র জীবন বা উন্নত জীবন) দান করার ওয়াদা করেছেন। কিন্তু 'হায়াতে তাইয়্যেবা' বলতে কি বুঝায় ? এ বিষয়ে মুফাস্‌সিরীনের বিভিন্ন কথা বর্ণিত আছে। হযরত ইবনে আব্বাস রা., সাঈদ ইবনে যুবাইর রা., যাহ্‌হাক ও আতা বলেন, দুনিয়াতে হালাল রিয্‌ক ভাগ্য হওয়া আর আখিরাতে নেক আমলের উত্তম ফল লাভ করার নাম 'হায়াতে তাইয়্যেবা'। হযরত হাসান বসরী ও ওহাব ইবনে মুম্‌বা বলেন, অল্পে তুষ্ট থেকে জীবনযাপন করা হায়াতে তাইয়্যেবা। কারণ, কোটিপতি হলেও যদি অন্তরে তৃপ্তি না

থাকে বরং আরো বেশী পেতে মন অস্থির থাকে, তাহলে কোনো নিয়ামতের তৃপ্তিই পাওয়া যায় না। ইমাম জাফর সাদেক রহ. বলেন, আল্লাহর হুকুম মেনে জীবনযাপন করাটাই হায়াতে তাইয়্যেবা। আবু বকর ওররাক রহ. বলেন, আল্লাহর আনুগত্যে সাহায্য পাওয়া হায়াতে তাইয়্যেবা। সহল তসতরী বলেন, নিজের সমস্ত চেষ্টা-তদবীর আল্লাহর উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত জীবনযাপন হায়াতে তাইয়্যেবা। হযরত মাওলানা আবদুল হক দেহলভী রহ.-এর মতে দুনিয়ার জীবন সুস্থ ও সুনামের সাথে অতিবাহিত করা, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখিরাতের পাথেয় উপার্জন করে সাথে নেয়া এবং মৃত্যুর সময় সুনাম ও সুকর্ম রেখে যাওয়ার নাম 'হায়াতে তাইয়্যেবা। কেউ কেউ বলেন, কাফির ও শত্রুদের থেকে নিরাপদ থাকা, মান-সম্ভ্রম নিয়ে জীবন যাপন করা, কাফির ও শত্রুদের দ্বারা শাসিত হয়ে জীবনযাপন না করা 'হায়াতে তাইয়্যেবা'। তাছাড়া সাহাবায়ে কিরাম যেহেতু ইসলামের প্রথম পর্যায়ে খুব দৈন্যাবস্থায় ছিলেন, তাই তাঁদেরকে উন্নত জীবনের ওয়াদা করা হয়েছে যা অতিসত্বর পূরণ হয়েছিল। আগেকার সেসব বিত্তহীন দরিদ্র ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার যুগ পর্যন্ত থাকায় অতিসত্বর সুবজ-শ্যামল রাজ্যের রাজা ও ন্যায়বিচারক হয়ে গেলেন। শেষ পর্যন্ত পৃথিবীতে আরবদের জাতীয় মর্যাদা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল।

—হযরত মাওলানা আবদুল হক দেহলভী ঃ তাফসীরে হাক্কানী।

মুফতী শফি রহ. তাঁর তাফসীর মাআরেফুল কুরআনে বলেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ তাফসীরবিদগণের মতে এখানে হায়াতে তাইয়্যেবা বলে দুনিয়ার পবিত্র ও আনন্দময় জীবন বুঝানো হয়েছে। অবশ্য এর অর্থ এ নয় যে, যাকে 'হায়াতে তাইয়্যেবা' দেয়া হবে সে কখনো অনাহার-উপবাস ও অসুখ-বিসুখের সম্মুখীন হবে না। বরং এর অর্থ এই যে, মুমিন ব্যক্তি কোনো সময় আর্থিক অভাব-অনটন কিংবা কষ্টে পতিত হলেও দুটি বিষয় তাকে উদ্বিগ্ন হতে দেয় না। এক. অল্পে তুষ্টি ও অনাড়ম্বর জীবনযাপনের অভ্যাস —যা দারিদ্রের মাঝেও কেটে যায়। দুই. তার এ বিশ্বাস যে দুনিয়ার অভাব-অনটন ও অসুস্থতার বিনিময়ে আখিরাতে সুমহান চিরস্থায়ী নিয়ামত পাওয়া যাবে। কাফির ও পাপিষ্ট ব্যক্তির অবস্থা এর বিপরীত। সে অভাব-অনটন ও দুরবস্থায় পতিত হলে তার সান্ত্বনার কোনো ব্যবস্থা নেই। ফলে সে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলে। কখনো কখনো আত্মহত্যা করে বসে। আর সে যদি স্বচ্ছল ব্যক্তি হয় তবে আরো পাওয়ার লোভ তাকে শান্তিতে থাকতে দেয় না। কারণ সে কোটিপতি হয়ে থাকলেও আরো অধিক পাওয়ার জন্য জীবনটাকে বিড়ম্বনাময় করে তোলে।—মাআরেফুল কুরআন ঃ মুফতী শফী র.

'পবিত্র জীবন' মানে দুনিয়ার জীবনে হালাল রুযী অল্পে তুষ্টি, অন্তরের প্রশান্তি, ধীরতা-স্থীরতা, আল্লাহর যিক্‌রের স্বাদ ও তৃপ্তি, আল্লাহ প্রেমের স্বাদ, ফরয কাজ ও ইবাদাতে মনের সন্তুষ্টি, পরবর্তী জীবনে সাফল্য লাভের আশা, আল্লাহর সাথে সম্পর্কের মাধুর্য ইত্যাদি। যা হোক, অল্পে তুষ্ট মুমিনের পবিত্র ও তৃপ্তিময় জীবনের শুরু হয়, আর কবরে গিয়ে এর রং আরো ফুটে উঠে। শেষ পর্যন্ত এ 'হায়াতে তাইয়্যেবা' এমন পর্যায়ে উপনীত হয় যে সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

حَيَاةٌ بِلاَ مَوْتٍ وَغِنًى بِلاَ فَقْرٍ وَصِحَّةٌ بِلاَ سُقْمٍ وَمُلْكٌ بِلاَ هُلْكٍ وَسَعَادَةٌ بِلاَ شَقَاوَةٍ -

"মৃত্যুহীন জীবন, অভাবশূন্য ধন, নিঃরোগ স্বাস্থ্য, চিরস্থায়ী রাজ্য, অশেষ সৌভাগ্য।"

পরম করুণাময় আল্লাহ তাআলা আমাদের হায়াতে তাইয়্যেবা নসীব করুন। আমরা মাওলায়ে কারীম রাহমানুর রাহীমের দরবারে এ মুনাজাত করি ঃ

ہر قسم کی مرض سے تودے شفا اور حیات طیبہ تو کرعطا

اپنی رحمت ہم پراب مبذول کر یہ مناجات اور دعا مقبول کر

"তুমি আমাদের সকল প্রকার রোগ (বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ, দৈহিক ও মানসিক) থেকে আরোগ্য দান করো। আর 'হায়াতে তাইয়্যেবা' নসীব করো। তোমার রহমত আমাদের উপর বর্ষিত করো। এ দুআ-মুনাজাত কবুল করো।"

❐

সাত

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلاَّ تَعْبُدُوْٓا اِلاَّ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ط اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيْمًا ۝ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِىْ صَغِيْرًا ۝

"তোমার রব আদেশ করেছেন, একমাত্র তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত না করতে ; আর মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করতে। তাদের একজন অথবা দুজনই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে পৌঁছে যায়, তবে তাদেরকে 'উহ্' শব্দটিও বলবে না, তাদেরকে ধমক দিবে না, তাদের উভয়ের সাথে সম্মানসূচক কথা বলবে। সহৃদয়তার সাথে নম্রভাবে তাঁদের সামনে নত থাকবে, আর এই বলে দুআ করবে, হে রব! তাঁদের উভয়ের প্রতি তুমি রহম করো, যেভাবে তাঁরা উভয়ে আমার শিশুকালে আমাকে লালন-পালন করেছেন।"-সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৩-২৪

আল্লাহ্ ছাড়া কারো দাসত্ব করবে না,আর মাতা-পিতার সেবা-যত্নের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখবে

মানব জাতির শান্তি, কল্যাণ ও সাফল্য কিসে ও কিভাবে—তা একমাত্র সে সত্তাই ভাল জানেন, যিনি মানুষকে সৃষ্টি করে লালন-পালন করেন। সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে দুনিয়ার জীবনে ইচ্ছাশক্তি ও কর্মের স্বাধীনতা দিয়ে তার জীবনের চলার পথও বাতলে দিয়েছেন। আল কুরআনই হচ্ছে আল্লাহর সেই পথনির্দেশিকা। আর এরই বাস্তবায়ন পদ্ধতি হচ্ছে রাসূলের সুন্নাহ। আলোচ্য আয়াতে মানবজাতির জন্যে দুটি মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে। এক. মানবজাতি তাদের রব আল্লাহ্ ছাড়া কারো দাসত্ব করবে না, দুই. মানুষ নিজ নিজ মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। বস্তুত রাব্বুল আলামীনের রহমত ও ইচ্ছায় মানুষ জীবনী শক্তি পেয়ে পৃথিবীতে বেঁচে আছে, আর মাতা-পিতার অকৃত্রিম স্নেহ-মমতা ও সীমাহীন সহিষ্ণুতার বদৌলতে মানুষ দুনিয়াতে টিকে থাকতে পারছে। যেন মানুষকে আল্লাহর লালন-পালন কাজটির বাস্তবায়ন মাতা-পিতার মাধ্যমে সমাধান

করছেন। এজন্যেই আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে মানুষকে তার দাসত্ব করার নির্দেশের সাথে মাতা-পিতার খিদমত আনজাম দানের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো, আল্লাহ তাআলা মানব সন্তানকে মাতা-পিতার প্রতি সদাচারের নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু দাসত্ব করার জন্য বলেননি। কারণ, মানুষ স্বীকার করুক বা না-ই করুক, সে জন্মগতভাবেই আল্লাহর দাস, আর দাসত্ব কেবল আল্লাহরই জন্য নির্ধারিত। বস্তুত আল্লাহর দাসত্বেই নিহিত রয়েছে মানবজাতির মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব।

আলোচ্য আয়াতের বাচনভঙ্গিতে একথা বেরিয়ে এসেছে, যদি আল্লাহর ইবাদাত বা দাসত্বে অন্য কাউকেও সামান্যতম অংশীদার করার ন্যূনতম অবকাশও থাকতো, তবে তার অধিকারী হতো মাতা-পিতা। কিন্তু যেহেতু আল্লাহ নিজেই যখন মাতা-পিতাকে তার শরীক সাব্যস্ত করেননি, তখন অন্য কাউকে আল্লাহর সাথে শরীক করার প্রশ্নই উঠতে পারে না।

—তাদাব্বুরে কুরআন

لَا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ-

"তিনি ছাড়া কারো ইবাদাত করবে না।"

কথাটির অর্থ কেবল এতটুকুই নয় যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পূজা করো না ; বরং তার সাথে একথাও আসবে যে, দাসত্ব ও আনুগত্য এবং নিশর্তে ও নিসংকোচে মান্য করবে একমাত্র আল্লাহকে। তাঁর আদেশকেই একমাত্র আদেশ, তাঁর আইনকেই একমাত্র আইন বলে স্বীকার করবে ও মেনে চলবে। তাঁকে ছাড়া আর কারো প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে নিবে না। বস্তুত এটা একটা ধর্মীয় আকীদা বা ব্যক্তিগত কর্মনীতিই নয় বরং মদীনায় নবী করীম স. কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মূল ভিত্তিও। সেই ব্যবস্থার মূল আদর্শ ছিল আল্লাহ তাআলাই বিশ্বজাহানের মালিক ও নিরংকুশ বাদশাহ, আর তাঁর দেয়া শরীয়তই সমগ্র দেশের আইন।-তাফহীমুল কুরআন

ইমাম কুরতুবী র. বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা পিতা-মাতার প্রতি আদব-সম্মান এবং তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করাকে নিজের ইবাদাতের সাথে একত্রিত করে ফরয করে দিয়েছেন। যেমন সূরা লুকমানে নিজের শোকরের সাথে মাতা-পিতার শোকরকে একত্রিত করে অপরিহার্য করে দিয়েছেন। বলা হয়েছে اَنِ اشْكُرْلِىْ وَلِوَالِدَيْكَ অর্থাৎ আমার শোকর করো আর পিতা-মাতারও। এতে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তাআলার ইবাদাতের পর পিতা-মাতার আনুগত্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং আল্লাহ

তাআলার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার ন্যায় পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া ওয়াজিব। সহীহ্ বুখারীর একটি হাদীসও এর পক্ষে সাক্ষ দেয়। হাদীসে রয়েছে কোনো এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহকে প্রশ্ন করলো ঃ আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় কাজ কোন্‌টি ? তিনি বললেন, সময় হলে নামায পড়া। সে আবার প্রশ্ন করলো ঃ এরপর কোন্ কাজটি সর্বাধিক প্রিয় ? তিনি বললেন, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার।-[মাআরেফুল কুরআন-কুরতুবী থেকে]

পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার ও তাদের সেবাযত্নের বিষয়ে মুফতী শফী র. তাঁর তাফসীরে মাআরেফুল কুরআনে বেশ কটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। তিনি সেগুলো নিয়েছেন তাফসীরে মাযহারী থেকে। এখানে তিনটি হাদীস উদ্ধৃত করা হলো ঃ

১. বায়হাকী শোআবুল ঈমান গ্রন্থে এবং ইবনে আসাকির হযরত ইবনে আব্বাসের বাচনিক উদ্ধৃত করেছেন। রসূলুল্লাহ্ স. বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে পিতা-মাতার আনুগত্য করে তার জন্য জান্নাতের দুটো দরজা খোলা থাকবে এবং যে ব্যক্তি পিতা-মাতার অবাধ্য হবে, তার জন্য জাহান্নামের দুটো দরজা খোলা থাকবে। যদি পিতা-মাতার মধ্যে একজনকে পায় তবে জান্নাত বা জাহান্নামের একটি দরজা খোলা থাকবে। একথা শুনে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলো, জাহান্নামের এ শাস্তি বাণী কি তখনো প্রযোজ্য যখন পিতা-মাতা তার প্রতি যুল্‌ম করেন ? তিনি তিনবার বললেন, যদি পিতা-মাতা সন্তানের প্রতি যুল্‌মও করেন, তবুও পিতা-মাতার অবাধ্যতার কারণে সন্তান জাহান্নামে যাবে।

একথার সারমর্ম এই যে, পিতা-মাতা থেকে প্রতিশোধ নেয়ার অধিকার সন্তানের নেই। তাঁরা যুল্‌ম করলেও সন্তান তাদের সেবা-যত্ন ও আনুগত্যের হাত গুটিয়ে নিতে পারে না।

২. বায়হাকী হযরত ইবনে আব্বাসের বাচনিক উদ্ধৃত করেছেন যে, রসূলুল্লাহ স. বলেন, "যে সেবা-যত্নকারী পুত্র পিতা-মাতার দিকে দয়া ও ভালবাসা সহকারে দৃষ্টিপাত করে তার প্রত্যেক দৃষ্টিপাতের বিনিময়ে সে একটি মকবুল হজ্জের সওয়াব পায়।" লোকেরা আরয করলো, "সে যদি দিনে একশবার এভাবে দৃষ্টিপাত করে ?" তিনি বললেন, হাঁ, একশবার দৃষ্টিপাত করলেও প্রত্যেক দৃষ্টির বিনিময়ে এই সওয়াব পেতে থাকবে।"

৩. বায়হাকী শোআবুল ঈমানে আবু বকরা রা.-এর বাচনিক বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ স. বলেন, সকল গোনাহর শাস্তির ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা যেগুলো ইচ্ছা করেন কিয়ামত পর্যন্ত পিছিয়ে নিয়ে যান। কিন্তু পিতা-

মাতার হক নষ্ট করা এবং তাঁদের প্রতি অবাধ্য আচরণ করা এর ব্যতিক্রম। এর শাস্তি আখিরাতের পূর্বে দুনিয়াতেও দেয়া হয়।

মাতা-পিতার খিদমত সম্পর্কে কতিপয় জরুরী জ্ঞাতব্য

১. সাধারণত পিতা-মাতার আনুগত্য সন্তানের উপর ওয়াজিব। এমনকি তারা কোনো সন্তানের প্রতি যুল্ম করলেও তাদের আনুগত্য, সেবা-খিদমত করা সেই সন্তানের কর্তব্য। তবে তারা যদি সন্তানকে শিরক বা আল্লাহর নাফরমানীর কাজে বাধ্য করে তাহলে কেবল সেই নির্দিষ্ট কাজে তাদের আনুগত্য করা যাবে না। বরং সেই অবস্থায় ঐ কাজে তাদের বিরোধীতা করা কর্তব্য। হাদীসের ভাষায় لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ। "স্রষ্টার নাফরমানীর কাজে সৃষ্টির আনুগত্য নেই।"

২. পিতা-মাতা অমুসলিম হলেও তাদের সেবা-যত্ন করতে হবে। ইমাম কুরতুবী এ বিষয়ের সমর্থনে বুখারী থেকে হযরত আসমা রা.-এর একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। হযরত আসমা রা. রসূলুল্লাহ স.-কে জিজ্ঞেস করেন, "আমার জননী মুশরিক। তিনি আমাকে দেখতে আসেন। তাঁকে আদর আপ্যায়ন করা জায়েয হবে কি ?" তিনি বললেন, صلى امك তোমার জননীকে আদর-আপ্যায়ন করো। কাফের পিতা-মাতা সম্পর্কে স্বয়ং কুরআন পাক বলে, وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا অর্থাৎ তাদের উভয়ের সাথে দুনিয়ার জীবনে সদ্ব্যবহার করে চল। আয়াতে 'মারূফ' আচরণ বলতে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার ও আদর-আপ্যায়নমূলক আচরণ বুঝানো হয়েছে।

৩. যে পর্যন্ত 'জিহাদ' ফরযে আইন পর্যায়ে না পৌঁছে—ফরযে কেফায়ার পর্যায়ে থেকে যায়, সে পর্যন্ত পিতা-মাতার অনুমতি ছাড়া সন্তানের জিহাদে যাওয়া জায়েয নয়। সহীহ বুখারীতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট জিহাদের অনুমতি নেয়ার জন্য উপস্থিত হয়। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার পিতা-মাতা জীবিত আছেন কি ?" সে বললো, জী-হাঁ, জীবিত আছেন। রসূলুল্লাহ স. বললেন, فَفِيْهِمَا فَجَاهِدْ 'তাহলে তাদের সেবাযত্নে আত্মনিয়োগ করেই জিহাদ করো।' অর্থাৎ তাঁদের সেবা-যত্ন করলেই তুমি জিহাদের সওয়াব পাবে। অন্য রেওয়ায়াতে আছে লোকটি আরও বললো, "আমি পিতা-মাতাকে ক্রন্দনরত অবস্থায় ছেড়ে এসেছি।" একথা শুনে রসূলুল্লাহ স. বললেন, "যাও তাদের হাসাও, যেমন কাঁদিয়েছো। অর্থাৎ তাদের কাছে

গিয়ে বল, এখন আমি আপনাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জিহাদে যাব না।"
-কুরতুবী থেকে মাআরেফুল কুরআন।

৪. পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার যে নির্দেশ কুরআন ও হাদীসে উক্ত হয়েছে পিতা-মাতার আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবের সাথে সদ্ব্যবহার করাও এর অন্তর্ভুক্ত। বিশেষ করে পিতা-মাতার ইন্তিকালের পর। হযরত আবু উসায়েদ বদরী রা. বর্ণনা করেন, "আমি রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে বসেছিলাম, ইতিমধ্যে একজন আনসার এসে প্রশ্ন করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! পিতা-মাতার ইন্তিকালের পরেও তাদের কোনো হক আমার যিম্মায় আছে কি ? তিনি বললেন হ্যাঁ—তাঁদের জন্য দুআ ও ইস্তিগফার করা, তাঁরা কারো সাথে কোনো অঙ্গীকার করে থাকলে তা পূরণ করা, তাঁদের বন্ধুবর্গের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এবং তাঁদের এমন আত্মীয়দের সাথে আত্মীয়তা বজায় রাখা যাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক শুধু তাদেরই মাধ্যমে। পিতা-মাতার এসব হক তাঁদের ইন্তিকালের পরও তোমার যিম্মায় অবশিষ্ট রয়েছে। উল্লেখ্য, রসূলুল্লাহ স. হযরত খাদীজা রা.-এর ইন্তিকালের পর তাঁর বান্ধবীদের কাছে উপঢৌকন পাঠাতেন, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল হযরত খাদীজা রা.-এর হক আদায় করা।

৫. পিতা-মাতার বার্ধক্য অবস্থায় তাঁদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে ও তাদের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। বার্ধক্যে উপনীত হলে পিতা-মাতা সন্তানের সেবা-যত্নের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে এবং তাঁদের জীবন সন্তানের দয়া ও কৃপার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। তখন যদি সন্তানের পক্ষ থেকে সামান্য বিমুখতা প্রকাশ পায়, তবে তাঁদের অন্তরে তা ক্ষত হয়ে দেখা দেয়। অধিকন্তু বার্ধ্যক্যের উপসর্গসমূহ মানুষকে স্বভাবগত খিটখিটে করে দেয়। তৃতীয়ত, বার্ধ্যক্যের শেষপ্রান্তে যখন বুদ্ধি-বিবেচনা অকেজো হয়ে পড়ে, তখন পিতা-মাতার বাসনা ও চাহিদা এমন ধরনের হয়ে যায়—যা পূরণ করা সন্তানের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। কুরআন পাক এসব অবস্থায় পিতা-মাতার মনোতুষ্টি ও সুখ-শান্তি বিধানের আদেশ দেয়ার সাথে সাথে সন্তানকে তার শৈশবকালের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলছে—আজ পিতা-মাতা তোমার যতটুকু মুখাপেক্ষী এক সময় তুমিও তাদের প্রতি তদপেক্ষা বেশী মুখাপেক্ষী ছিলে। তখন তাঁরা যেমন নিজেদের আরাম-আয়েশ ও কামনা-বাসনা সবকিছু তোমার জন্য কুরবান করেছিলেন এবং তোমার অবুঝ কথাবার্তা ও আচার-আচরণকে স্নেহ-মমতার আবরণে ঢেকে নিয়েছিলেন ; তেমনি মুখাপেক্ষিতার এ দুঃসময়ে বিবেক ও সৌজন্যবোধের

তাগিদে তোমারও একান্ত কর্তব্য পিতা-মাতার সেই ত্যাগ ও কুরবানীর কথা স্মরণ করে তাঁদের সেই ঋণ শোধ করার প্রতি পূর্ণ মনোযোগী হওয়া।

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِىْ صَغِيْرًا ○

আল কুরআন মানবজাতিকে এ দোয়া শিখিয়ে উক্ত বিষয়টির প্রতিই ইংগিত করেছে।

পিতা-মাতার বার্ধক্যাবস্থায় সন্তানের আচরণ বিধি

আলোচ্য আয়াতে পিতা-মাতা বার্ধক্যে উপনীত হলে তাঁদের সাথে কিরূপ আচরণ করতে হবে সে বিষয়ে পাঁচটি আদেশ দেয়া হয়েছে ঃ

এক. "তাদেরকে 'উহ্' শব্দটিও বলবে না।" তাঁদের দুজন অথবা একজন বার্ধক্যে পৌছলে তাঁদের কোনো কথায় বা আচরণে বিরক্তি প্রকাশক শব্দ 'উহ্' বলতে পারবে না। বিরক্তিবোধক দীর্ঘশ্বাস ছাড়াও এর অন্তর্ভুক্ত। হযরত আলী রা. থেকে বর্ণিত এক হাদীসে রসূলুল্লাহ স. বলেন, পীড়াদানের ক্ষেত্রে 'উহ্' বলার চেয়েও কম বিরক্তিকর কোনো স্তর থাকলে তাও অবশ্য উল্লেখ করা হতো। অর্থাৎ যে কথায় পিতা-মাতার সামান্যতম কষ্ট হয়, তাও বলা নিষিদ্ধ।

দুই. "তাঁদেরকে ধমক দিবে না।" তাঁদের অসহায় অবস্থায় সন্তানদের ধমক শুনলে বড়ই মনোকষ্ট হওয়া স্বাভাবিক।

তিন. "তাঁদের উভয়ের সাথে সম্মানসূচক নম্রভাষায় কথা বলবে।" অতি নম্রস্বরে ভালবাসা ও ভক্তিশ্রদ্ধা প্রকাশক শব্দে কথা বলবে।

চার. "সহৃদয়তার সাথে নম্রভাবে তাঁদের সামনে নত থাকবে। আয়াতের এ অংশের তরজমা হলো 'তাদের উভয়ের জন্য তোমার দয়াজনিত বিনয়-পাখা নত করে দাও।

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ ـ

"অর্থাৎ তাঁদের সাথে অকৃত্রিম বিনয়সুলভ সদয় ব্যবহার প্রদর্শন করবে।"

পাঁচ. তাঁদের জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করবে এই বলে যে, "হে রব! তাঁদের উভয়ের প্রতি তেমনি রহম করো যেমনি তাঁরা শিশুকালে আমাকে লালন-পালন করেছেন।"

পিতা-মাতার ষোলআনা হক আদায় করা কিছুতেই সম্ভব নয়। আর তাঁদের বার্ধক্যাবস্থায় প্রয়োজনীয় শান্তির বিধান করাও সন্তানের শত চেষ্টা

সত্ত্বেও সম্ভব নয়। তাই রাব্বুল আলামীনের দরবারে তাঁদের জন্য এ দুআ করবে। তাছাড়া তাঁদের ইন্তিকালের পরেও এ দুআ করে তাঁদের ঋণ শোধের চেষ্টা করা যায়। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

আট

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ ط نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ ط اِنَّ قَتْلَهُمْ
كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا ○ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ط وَسَآءَ سَبِيْلًا ○

"তোমরা দারিদ্রের ভয়ে তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না। আমিই তো তাদের রিয্‌ক দিয়ে থাকি, আর তোমাদেরও। নিশ্চয়ই তাদেরকে হত্যা করা মারাত্মক অপরাধ। আর যেনার ধারেও যেয়ো না। নিশ্চয়ই এটা খুবই অশ্লীল কাজ এবং অত্যন্ত খারাপ পথ।"

–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩১-৩২

সন্তান হত্যা করো না আর ব্যভিচারের ধারেও যেয়ো না

সূরা বনী ইসরাঈলের তেইশ আয়াত থেকে সাইত্রিশ আয়াত পর্যন্ত ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে। বস্তুত এতে ইসলামী আদর্শ ভিত্তিক রাষ্ট্রের নৈতিক, তামাদ্দুনিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক আইনের একটা সুস্পষ্ট ইশতিহার ঘোষিত হয়েছে। মিরাজ থেকে ফিরে এসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশ্ববাসীর সম্মুখে উক্ত ভাষণ পেশ করেছিলেন।

আলোচ্য দুটো আয়াতের প্রথমটিতে জাহেলী যুগের একটি নিপীড়নমূলক সামাজিক অভ্যাস সংশোধনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। জাহেলী যুগে আরবদের মধ্যে এমন প্রথা ছিল যে, তারা ভরণ-পোষণের ভয়ে সন্তানদেরকে বিশেষ করে কন্যা সন্তানদের হত্যা করতো। এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাদের এ কর্মপন্থাটি যে অত্যন্ত জঘন্য ও ভ্রান্ত সেকথা সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। আল্লাহ এরূপ মনোভাবসম্পন্ন লোকদের ভ্রান্ত ভাবধারা নিরসন করে দিয়ে বলছেন সন্তান যদিও তোমাদের কিন্তু এদের রিয্‌কদানের তোমরা কে ? এ কাজটা তো একান্তভাবে আল্লাহর। তোমাদেরকেও তো সেই আল্লাহই রিয্‌ক দিয়ে থাকেন। সুতরাং যে আল্লাহ তোমাদেরকে রিয্‌ক দিয়ে থাকেন সে আল্লাহ তাদেরও রিয্‌কদাতা। বরং আল্লাহর কথা হলো তাদের রিয্‌ক আমিই দেব। তোমরা তো তাদের রিয্‌কদাতা নও। সুতরাং তাদের রিযক

বা জীবনোপকরণ নিয়ে তোমাদের অত মাথা ব্যথা কেন ? এ চিন্তায় সন্তান হত্যা করে নিজেকে কেন হত্যার অপরাধী বানাচ্ছো ?

আল্লাহর বাণীর তাৎপর্য হলো, আল্লাহ তাআলা যে বান্দাকে নিজের পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণ ও অন্যান্য দরিদ্র জনগণের সাহায্য করতে দেখেন, তিনি তাকে সেই হিসেবেই রিয্ক দিয়ে থাকেন। এতে করে সে যেমন নিজের প্রয়োজন মিটাতে পারে তেমনি সে অন্যদেরও সাহায্য করতে পারে। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ

بِضُعَفَائِكُمْ اِنَّمَا تُنْصَرُوْنَ وَتُرْزَقُوْنَ-

অর্থাৎ "তোমাদের দুর্বল শ্রেণীর জন্যই আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের সাহায্য করা হয় এবং তোমাদের রিয্ক দেয়া হয়।" এতে জানা গেল যে, পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণকারী পিতা-মাতা যাকিছু পায় তা দুর্বলচিত্ত নারী ও শিশু সন্তানের উসিলাতেই পায়।–মাআরেফুল কুরআন

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ হীন প্রথা নিবারণের জন্য কত দরদপূর্ণ কথাই না বলেছেন। দেখুন আয়াতে اَوْلَادَكُمْ (তোমাদের সন্তান-সন্ততি) বলে কত উষ্ণ মহব্বত প্রকাশ করেছেন। প্রথমত اَوْلَادَكُمْ (তোমাদের সন্তান-সন্ততি) বলে সন্তানদের প্রতি আন্তরিক ও অকৃত্রিম ভালবাসার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। দ্বিতীয়ত, نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ (তাদের রিয্ক আমিই দিব) বলে বুঝিয়েছেন, তোমরা কেন 'রিয্ক' এর জন্য অস্থির হচ্ছো ? রিয্ক তো আমিই দিব—তাদেরকেও এবং তোমাদেরকেও। তৃতীয়ত, اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا "নিশ্চয়ই তাদের হত্যা করা মারাত্মক অপরাধ"–বলে সাবধান করে দিয়েছেন যে ওদের হত্যা করা মহাপাপ—অমার্জনীয় অপরাধ।–তাফসীরে হাক্কানী

জাহেলী আরবে কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেয়ার যে প্রথা জারী ছিল—তার মূল কারণ ছিল এই যে, তারা ভাবতো মেয়েরা যেহেতু কামাই-রুযীতে কোনো ভূমিকা রাখে না, সুতরাং তাদের লালন-পালনের বৃথা বোঝা বহন করে কি লাভ ? কুরআনে হাকীম সেই পাথর দিলের অপরাধ মূলে কুঠারাঘাত হেনে কন্যা হত্যার বর্বরতম প্রথার উচ্ছেদ সাধন করে দেয়। আধুনিক বিশ্বে জন্মনিয়ন্ত্রণের নামে যে আন্দোলন চলছে এবং যা বাস্তবায়নের পথে দিন দিন নিত্যনতুন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হচ্ছে—তা বাহ্যত পশুত্ব না হলেও এর ভেতরেও জাহেলী আরবের সেই বর্বরতার ভাবধারা বিরাজিত। জাহেলী যুগের মত আজকের সভ্য সমাজের মানুষও নিজেকে অন্যের রিয্কদাতার

আসনে বসিয়ে রেখেছে। আল কুরআন نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ (আমিই তাদের রিয্ক দিচ্ছি এবং তোমাদেরও) বলে সেই ভ্রান্তির অপনোদন করেছে। তৎকালীন আরব বদ্দুগণ তো এই রহস্য অনুধাবন করতে সমর্থ হয়েছিল ; আর তারা তো এরি আলোকে নিজেদের সংশোধনও করে নিয়েছিল। কিন্তু আজকের সভ্য সমাজের এসব লেখাপড়া শেখাদের তা বুঝাবে কে ?

–তাদাব্বুরে কুরআন

প্রাচীনকাল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে জন্মনিয়ন্ত্রণের যেসব আন্দোলন চলে আসছে, আলোচ্য আয়াত তার অর্থনৈতিক ভিত্তিমূল-সমূহকে চূড়ান্তভাবে নির্মূল করে দিয়েছে। প্রাচীনকালে দারিদ্রের ভয় মানুষকে নিজেদের শিশু-সন্তান হত্যা করা ও গর্ভপাত করার কাজে উদ্বুদ্ধ করতো। আর বর্তমানে তা তৃতীয় একটি পথের দিকে অর্থাৎ গর্ভনিরোধের দিকে বিশ্ববাসীকে ঠেলে দিচ্ছে। কিন্তু ইসলাম মানব সাধারণকে হেদায়াত দিচ্ছে যে, তারা যেন খাদ্যাভাবের ভয়ে জনসংখ্যা হ্রাস করার ধ্বংসাত্মক প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করে এমনসব গঠনমূলক প্রচেষ্টায় নিজেদের শক্তি ও কর্মক্ষমতা নিয়োগ করে যাতে করে আল্লাহর বানানো স্বভাবনীতি অনুযায়ী রিযকের প্রাচুর্য লাভ করা যায়। মানুষ আর্থিক উপায়-উপাদানের সংকীর্ণতা ও অভাবের আশংকায় বার বার বংশ বৃদ্ধির ধারাকে রুদ্ধ করার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করে—এ আয়াতের আলোকে তা মানুষের একটি অতি বড় মারাত্মক ভুল ছাড়া আর কিছু নয়। এ আয়াত মানবজাতিকে সাবধান করে দিচ্ছে রিয্ক দেয়ার ক্ষমতা মানুষের হাতে নয় ; বরং তা সেই আল্লাহরই হাতে নিবদ্ধ যিনি তোমাকে যমীনের বুকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। পূর্বের লোকদের তিনি যেমন রিয্ক দিয়েছেন পরবর্তীকালের লোকদেরও তিনিই ঠিক তেমনি রিয্ক দিবেন। এটা ইতিহাসেরও শিক্ষা। দুনিয়ার বিভিন্ন এলাকায় খাওয়ার লোকের সংখ্যা যেমন বেড়েছে। তদপেক্ষা অনেক বেশী আর্থিক উপায়-উপাদানও সেখানে লোকদের হস্তগত হয়েছে। সুতরাং আল্লাহর সৃষ্টি কৌশল বংশ বৃদ্ধির ব্যবস্থাপনায় মানবজাতির অযথা হস্তক্ষেপ মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কি হতে পারে ?–তাফহীমুল কুরআন

এখানে প্রথম আয়াতে সন্তান হত্যা না করতে বলার কারণ ও ফলাফল আলোচনা করার পর দ্বিতীয় আয়াতে যিনা বা ব্যভিচারের ধারেও না যেতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। রিয্ক বা জীবিকার অভাবের আশংকায় যে কোনো উপায়ে সন্তান হত্যা মানবতার জন্য চরম ক্ষতিকর কাজ ছাড়া আর কিছু নয় বলে আল কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে। এরি সাথে যিনার ধারেও না যেতে হুকুম করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে সন্তান হত্যার সাথে

যিনার কি সম্পর্ক থাকতে পারে ? জবাবে আজকের গবেষকগণের দুটো কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এক. মানুষ স্ত্রী পুরুষ হিসেবে জন্মগ্রহণ করে থাকে আর এতদোভয়ের প্রতি পারস্পরিক আকর্ষণ থাকে অতি স্বাভাবিকভাবে। জীবিকার আশংকায় মানুষ যখন এ স্বাভাবিক আকর্ষণের বৈধ সমাধান বিয়ে থেকে বিরত থাকতে বদ্ধপরিকর হয়, তখন তাকে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে যিনার প্রতি ধাবিত হতে হয়। দ্বিতীয় কথাটি অধিকতর যুক্তিযুক্ত। তাহলো আধুনিক বিশ্বে জন্মনিরোধের যত প্রকার প্রক্রিয়ার আবিষ্কার হয়েছে, তাতে সমাজে যিনার পথও প্রশস্ত হয়েছে। জন্মনিরোধক ব্যবস্থা গ্রহণ করে ব্যভিচার চলতে থাকলে বিপথগামী যুবক-যুবতীদের জন্য নিশ্চিন্তে ব্যাপকভাবে যিনার পথ ধরা সহজ ও নিরাপদ হয়ে যায়। আজকের বিশ্ব সমাজে যা বলার অপেক্ষা রাখে না।

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰٓ 'আর যিনার ধারেও যেয়ো না'—নির্দেশটি যেমন ব্যক্তি মানুষের প্রতি, তেমনি সামগ্রিকভাবে গোটা সমাজের প্রতিও। ব্যক্তির জন্য এ নির্দেশের তাৎপর্য এই যে ব্যক্তিগতভাবে কেবল যিনা থেকেই বিরত থাকবে না, বরং যিনার উদ্বোধক ও প্রেরণাদায়ক যাবতীয় কার্যক্রম থেকেও দূরে থাকবে। কারণ যিনার কাজটি তো হঠাৎ করেই সংঘটিত হয় না। যিনা সংঘটিত হওয়ার পূর্বে অনেকগুলো ঘাট পার হওয়ার পরেই যিনা পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভব হতে পারে। তাই ব্যক্তির কর্তব্য হলো যিনার প্রাথমিক ঘাটেও পা না দেয়া। পাশাপাশি সমাজের কর্তব্য হলো যিনা, যিনার উদ্রেককারী এবং যিনা সংঘটিত হওয়ার কারণসমূহের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলা। এ উদ্দেশ্যে আইন-কানুন, শিক্ষা-প্রশিক্ষণ, সমাজ ও পরিবেশের সংশোধন, সামাজিক জীবনের যথোপযুক্ত পুনর্গঠন এবং এ ধরনের সম্ভাব্য সকল প্রকার উপায় ও ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমাজেরই কর্তব্য।

এ ধারাটি শেষ পর্যন্ত ইসলামী জীবনব্যবস্থার এক ব্যাপক অধ্যায়ের ভিত্তি হিসেবে গণ্য হয়েছে। এরি দৃষ্টিতে যিনা ও যিনার মিথ্যা অভিযোগকে ফৌজদারী অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। পর্দার আইন বিধান জারী করা হয়েছে। নির্লজ্জতা, অশ্লীলতা ও বেহায়াপনাকে পূর্ণ শক্তিতে দমন করার নির্দেশ রয়েছে। মদ, গান-বাজনা, নাচ, ছায়াছবি প্রভৃতি যিনা-ব্যভিচারের নিকটতর কার্যাবলীরূপে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইসলামে এমন একটি পারিবারিক দাম্পত্য জীবনের বিধি-বিধান তৈরি করা হয়েছে, যাতে বিবাহ অতি সহজসাধ্য হলো আর যিনা-ব্যভিচারের সামাজিক কার্যকারণ-সমূহ চিরতরে মূলোৎপাটিত হয়ে গেল।—তাফহীমুল কুরআন

আলোচ্য আয়াতে যিনা হারাম হওয়ার দুটো কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমত, এটি একটি অশ্লীল কাজ। মানুষের মধ্যে লজ্জা-শরম না থাকলে সে মনুষত্ব বিবর্জিত কাজ করতে পারে আর মনুষত্ব থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে। তার দৃষ্টিতে তখন ভালমন্দের পার্থক্য লোপ পায়। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে اِذَا فَاتَكَ الْحَيَاءُ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ অর্থ যখন তোমার লজ্জা লোপ পায়, তখন কোনো মন্দ কাজ করতে বাধা কিসের ?—তুমি যা চাইবে তা-ই করতে পারবে। রসূলুল্লাহ স. তাই লজ্জাকে ঈমানের শাখা বা অঙ্গ বলে ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْاِيْمَانِ। "লজ্জা ঈমানের অংশ বা অর্ধেক।"

যিনার ক্ষতি ও খারাবীর কারণে প্রাচীনকাল থেকে সকল জ্ঞানবান সমাজেই তা ধিকৃত ও অপরাধ হিসেবে গণ্য হয়ে এসেছে। যিনার ক্ষতির কতিপয় দিক হলো ঃ

১. বংশের কোনো পাত্তা না থাকা। সন্তানটি কার ? এ প্রশ্নের কোনো উত্তর খুঁজে পাওয়া যাবে না। পরিণামে মীরাছ বণ্টনেও সমস্যার সৃষ্টি হবে। ২. একজন মহিলার স্বামী নির্দিষ্ট না থাকার কারণে যেসব পুরুষ এ মহিলার সংস্পর্শে আসবে তাদের মধ্যে মারামারি ও কাটাকাটির ঘটনা সংঘটিত হবে। আজকের সমাজে তো একথার উদাহরণের প্রয়োজন নেই। পরিণামে এ বিষয়টি গড়াবে বিশ্ব সমাজ ধ্বংস হওয়ার দিকে। ৩. স্ত্রীর সাথে মিলনের উদ্দেশ্য কেবল যৌন চাহিদা পূরণই নয়। বরং পারিবারিক কাজে পরস্পরের সহায়ক হওয়াই উদ্দেশ্য। স্বামী উপার্জন করবে আর স্ত্রী সহানুভূতি ও সঞ্চয়ী মনোভাব নিয়ে তার হেফাযত করবে, উভয়ে মিলে সন্তানাদির শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করবে। তাছাড়া স্বামী-স্ত্রী রোগ-শোকে ও বার্ধক্যে পরস্পরের সহযোগী হবে। উভয়েই পরস্পরের সাথে একান্ত ও পূর্ণ আন্তরিকতা সহকারে জীবন যাপন করবে। আর এটা স্বাভাবিক যে একজন স্ত্রীর জন্যে এটা কখনো সম্ভব নয়, যতক্ষণ না তার দৃষ্টি কেবল একজন পুরুষের উপর নিবদ্ধ থাকে। এমন অবস্থা তো যিনা হারাম ও নিষিদ্ধ হওয়া ছাড়া সম্ভব নয়। ৪. যিনার দরজা উন্মুক্ত থাকলে তো মানুষ আর পশুর মধ্যে কোনো পার্থক্যই বাকী থাকলো না। তখন তো যে কোনো স্ত্রীর সাথে মিলতে পারবে অথচ পরস্পরের মধ্যে কখনো প্রেমপ্রীতি সৃষ্টিই হবে না। এসব কারণে শরীয়ত যিনা বা ব্যভিচার হারাম করে দিয়েছে। আর এ বিষয়ে এত তাগিদ দিয়েছে যে, কেউ যেন এর ধারেও না যায়। অর্থাৎ যিনার সকল উদ্দীপক থেকে নিজেকে সবাই যেন দূরে রাখে। আর যিনার

ক্ষতির প্রতি লক্ষ্য করে বলে দিয়েছে যে, اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّسَاءَ سَبِيْلاً –এটা অশ্লীল এবং অতি খারাপ পথ।–তাফসীরে হাক্কানী

এ আয়াতাংশে যিনা হারাম হওয়ার দলিল বলে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, এটা তো সুস্পষ্ট নির্লজ্জতা ও একেবারেই খারাপ পথ। 'সুস্পষ্ট নির্লজ্জতা' মানে যিনার খারাপী ও নির্লজ্জতার ব্যাপারে কোনো যুক্তিশাস্ত্রীয় সূত্র বা প্রমাণের প্রয়োজন নেই। বরং এতো মানবজাতির স্বভাব-প্রকৃতির আবহমানকাল থেকে পরিচিত একটি বিষয়। মানবজাতি যেদিন থেকে পৃথিবীতে এসেছে সেদিন থেকে কখনো সে পুরুষ ও মহিলার অবাধ সম্পর্ক মেনে নেয়নি। বরং সর্বদাই এ ব্যাপারে এক কঠিন বিধি-বিধানের অনুসরণ করে আসছে। আর যারাই এসব বিধি-বিধানের অনুসরণ ছিন্ন করেছে সমাজ কখনো তাদের বরদাশ্‌ত করেনি।

سَاءَ سَبِيْلاً 'অতি খারাপ পথ'। অর্থাৎ কুরআন যেই জাতি সৃষ্টির দাওয়াত দিচ্ছে যিনা সেই জাতির বৈশিষ্ট্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। যে বা যারা এ পথের পথিক, সে বা তারা একটা সৎ পরিবার, সৎ সমাজ সর্বোপরি সৎ সরকারের শিকড় কেটে দিয়ে থাকে।-তাদাব্বুরে কুরআন

মুসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ স.-কে বললো, "আমাকে যিনার অনুমতি দিন।" উপস্থিত সাহাবায়ে কিরাম তাকে ধমক দিল (আল্লাহর নবীর সাথে এ বে-আদবী করছো ?) সাবধান, চুপ থাক। রাসূলুল্লাহ স. তাকে বললেন, "আমার কাছে আস।" লোকটি হুজুরের নিকটে এসে বসলো। তখন তিনি লোকটিকে বললেন, তুমি কি এমন কাজ তোমার মা, মেয়ে, বোন, ফুফী, খালা—কারো ব্যাপারে সহ্য করবে ? লোকটি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য কুরবান করুন —কখনো নয়। তিনি বললেন, অন্যরাও এমন কাজ তাদের মা, মেয়ে, বোন, ফুফী ও খালার ব্যাপারে সহ্য করবে না। তারপর তিনি দুআ করে বললেন, "হে আল্লাহ এর গুনাহ মাফ করে দাও। আর এর দিলকে পবিত্র ও লজ্জাস্থানের হেফাযত করো।" আবু উমামা বলেন, এ দুআর পর ঐ লোকটির অবস্থা এমন হয়ে গেল যে, সে কখনো কোনো মহিলার দিকে তাকাতো না। اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ-আল কুরআনুল কারীম — মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী।

আজকের বিশ্বে মুসলিম সমাজ নিজেদের মুসলিম বলে পরিচয় দিতে এবং এজন্যে অহংকার করতে কসুর করে না ঠিক, কিন্তু ইসলামী জীবন বিধান তথা কুরআন সুন্নাহর আইন দৈনন্দিন জীবনে এবং সামাজিকভাবে

ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে চরম গাফলতিতে নিমজ্জিত। বরং তাদের অনেকে এ বিষয়টিকে দুনিয়াদারী মনে করে থাকে। অনেক মুখলেছ ব্যক্তিও দীনকে ব্যক্তিগত আমলের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে দিয়েই সন্তুষ্ট। অধিকন্তু কোনো ব্যক্তি বা দল যদি দীনকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা-সাধনা করতে দাওয়াত দেয় তখন এরাই তাদের বিরোধিতায় মেতে উঠে। বস্তুত দীনকে যথার্থ না বুঝার কারণে অধিকাংশ মানুষ এমনটি করে থাকে। অবশ্য কিছু লোক অহমিকায় ও হঠকারিতায় মত্ত হয়েও এরূপ করে থাকে। প্রথমে বর্ণিতরা নিজেদেরকে সুন্নাতের পা-বন্দ বলে মনে মনে খুব তৃপ্তি পায়, অথচ রসূলুল্লাহ স. ও খোলাফায়ে রাশেদার আমল ও কার্যক্রম জেনে তা অনুসরণ করতে রাজি না। সূরা বনী ইসরাঈলের আলোচ্য আয়াত দুটো যেন আজকের উপমহাদেশীয়দের শিক্ষা নিতে ডাকছে।

❐

নয়

قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلٰمٌ وَّكَانَتِ امْرَاَتِىْ عَاقِرًا وَّقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ○ قَالَ كَذٰلِكَ ج قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌ وَّقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ○

"সে বললো, রব! আমার ছেলে হবে কিভাবে ? যে অবস্থায় আমার স্ত্রী বন্ধা আর আমিও তো বার্ধক্যের শেষপ্রান্তে পৌঁছে গেছি!" তিনি বললেন এ অবস্থাই হবে। তোমার রব বলেছেন, "এটা তো আমার পক্ষে খুবই সহজ। আমি ইতিপূর্বে তোমাকেও তো সৃষ্টি করেছি, যখন তুমি কিছুই ছিলে না।"–সূরা মারইয়াম ঃ ৮-৯

বন্ধা স্ত্রী ও বুড়ো স্বামীর সন্তান লাভের দুআ কবুলের ইতিহাস

সূরা মারইয়ামের শুরু থেকেই হযরত যাকারিয়া আ.-এর কিছু ইতিহাস বিবৃত হয়েছে। হযরত যাকারিয়া আ. বনী ইসরাঈলের বিশিষ্ট নবী ছিলেন। বুখারী শরীফের বর্ণনা অনুযায়ী তিনি পেশায় ছিলেন একজন কাঠমিস্ত্রি। তিনি স্বহস্তে উপার্জন করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। সূরা আলে ইমরানেও তাঁর ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে।–আল কুরআনুল কারীম ঃ মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী রহ.

আল কুরআনে নারী প্রথম খণ্ড, উনিশ নং বিষয়ে অত্র ইতিহাসের প্রথমাংশ বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য সূরার শুরুতে আল্লাহ তাআলা রসূলে করীম স.-কে লক্ষ করে বলছেন, এখানে সেই ইতিহাস বর্ণিত হচ্ছে, যাতে আপনার রব তার বান্দা যাকারিয়ার প্রতি নাযিলকৃত রহমতের বিষয়ে আলোচনা করেছেন। যাকারিয়া আ. তাঁর রবের কাছে গোপনে দুআ করেছিলেন। দুআয় তিনি বলেছিলেন, হে পরওয়ারদিগার! বার্ধক্যের কারণে তো আমার অস্থি দুর্বল হয়ে পড়েছে। আমার মাথার চুলও সাদা হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় বাহ্যিক দৃষ্টিতে তো সন্তান কামনা করাটাই অযৌক্তিক। কিন্তু রব! তুমি তো অসীম কুদরত ও রহমতের মালিক। আর ইতিপূর্বে কখনো আমি তোমার কাছে দুআ করে ব্যর্থ মনোরথ হইনি। আর আমার মৃত্যুর পর অলি-ওয়ারিশগণের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন যে, তারা শরীয়তের বিষয়ে আমার যথার্থ প্রতিনিধিত্ব করবে না। এদিকে আমার স্ত্রী বন্ধা।

কাজেই তুমি তোমার বিশেষ অনুগ্রহে আমাকে এক উত্তরাধিকারী দান করো। যে আমার উত্তরাধিকারী হবে, আর আমার পিতামহ ইয়াকুব বংশেরও উত্তরাধিকারী হবে। আর তাকে তোমার প্রিয় করে বানাও। অর্থাৎ তাকে শরীয়তের আলেম করে তৈরি করবে। আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের মাধ্যমে বললেন, হে যাকারিয়া! আমি তোমাকে এক পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছি, যার নাম হবে ইয়াহ্ইয়া। ইতিপূর্বে তার মত গুণে গুণান্বিত করে কাউকে বানাইনি।-তাফহীমুল কুরআন, মাআরেফুল কুরআন।

এখানে বলা হয়েছে اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ نِدَآءً خَفِيًّا যখন তিনি (যাকারিয়া) তাঁর রবকে নিভৃতে দুআ করেছিলেন সন্তানের জন্য। হযরত যাকারিয়া গোপনে নিভৃতে আল্লাহর কাছে সন্তান পাওয়ার দুআ করেছিলেন কয়েকটি কারণে। এক. যেহেতু চুপে চুপে গোপনে আল্লাহর কাছে চাওয়া তিনি পসন্দ করেন, কারণ এতে নম্রতা, একাগ্রতা, খুশুখুজু বেশী হয়ে থাকে। দুই. মানুষ তাকে এই বলে যেন বেওকুফ না বলে যে, তিনি চরম বার্ধক্যে পৌঁছেও নির্লজ্জভাবে সন্তান কামনা করছেন। অথচ এখন তাঁর সন্তান প্রাপ্তির স্বাভাবিক বয়স অতিক্রম করে গেছে। তাছাড়া সন্তান না পেলে তো লজ্জারও কারণ। তিন. বার্ধক্যের কারণে তার গলার আওয়াযও ক্ষীণ হয়ে গেয়েছিল।-কুরআনুল কারীম ঃ মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী।

হযরত যাকারিয়া আ. তার মৃত্যুর পরে ভাই-বন্ধু বা উত্তরাধিকারীগণের বিষয়ে উদ্বিগ্ন থাকার কারণ তিনি তাঁর পরবর্তী ভাই বন্ধুদের মধ্যে এমন কাউকে দেখছিলেন না, যারা দীন ও নৈতিকতায় তাঁর পদমর্যাদাসম্পন্ন হতে পারে। এমন কাউকেও তিনি তার কাজের যোগ্য পাচ্ছিলেন না। ফলে তিনি দীনি কাজের প্রচার-প্রসার বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশংকা করছিলেন। অধিকন্তু তিনি তাঁর পরবর্তী বংশধরগণের যারা নেতৃত্বের দিকে এগুচ্ছিল দেখতে পেয়েছিলেন, তাদের লক্ষণও খুব ভাল বলে দেখছিলেন না। তাঁর আশংকা ও উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ কোনো বৈষয়িক ধন-সম্পদের উত্তরাধিকারীত্বের বিষয় ছিল না। তাছাড়া কেবল তাঁর নিজের উত্তরাধিকারী কামনা করেননি। বরং তাঁর পিতামহ হযরত ইয়াকুব আ.-এর আদর্শের যাবতীয় কল্যাণের উত্তরাধিকারী কামনা করেছিলেন। তৃতীয়ত, তিনি এমন এক উত্তরাধিকারী সন্তান চেয়েছিলেন যে হবে আল্লাহর প্রিয় বান্দা—চরিত্রে ও কর্মে নবীর প্রকৃত ওয়ারিশ।-তাফহীমুল কুরআন

প্রকৃতপক্ষে হযরত যাকারিয়া আ. চরম বার্ধক্যে পৌঁছেও স্ত্রীর বন্ধাত্বে সন্তান প্রাপ্তির দুআ করা কোনো বৈষয়িক কারণে ছিল না। তিনি চেয়েছিলেন

তাঁদের উভয়ের সন্তান জন্মদানের স্বাভাবিক অবস্থা না থাকলেও আল্লাহ তাআলা তার অসীম কুদরত ও রহমতে তাঁকে এমন সন্তান দান করবেন যে দীনি কার্যক্রম আনজাম দিতে সক্ষম হবে আর আল্লাহর পবিত্র দায়িত্বের আমানতের বোঝা বহন করতে পারবে। তাঁর বার্ধক্যে করার মত কি ছিল ? তাঁর অন্তরের আকাংখা ছিল তাঁর কোনো ছেলে এমন উপযুক্ত হোক যে তার বাপ-দাদাদের পবিত্র দায়িত্ব পালন করতে পারে, তাদের ইলম ও হিকমতের ভাণ্ডার সামলাতে পারে এবং নবুওয়াতের ওয়ারিস হতে পারে।

সহীহ হাদীস থেকে প্রমাণিত নবীগণের মাল-সম্পদে মীরাস জারি হয় না। তাঁদের মীরাস জারি হয়ে থাকে ইলমের সম্পদে। সুতরাং يَرِثُنِىْ وَيَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ আয়াতাংশে মালের মীরাস উদ্দেশ্য নয়। এখানে 'ইয়াকুবের বংশধর' শব্দ থেকেই তা প্রতীয়মান হচ্ছে। কারণ একথা সুস্পষ্ট যে, ইয়াকুব আ.-এর সকল বংশধরের ধন-সম্পদের ওয়ারিশ কেবল হযরত যাকারিয়ার ছেলে এককভাবে হতে পারে কিভাবে ? বরং কেবল মীরাসের উল্লেখই এ স্থানে বুঝায় যে ধন-সম্পদের বিষয়ে উত্তরাধিকার উদ্দেশ্য নয়। কারণ, একথা তো সারা বিশ্বে স্বীকৃত যে, ছেলে পিতার সম্পদের ওয়ারিশ হয়ে থাকে, তাহলে আবার সে জন্যে দুআ করার প্রয়োজন কি ? নবীগণের চরিত্র অবশ্যই এমন হয় না যে, তাঁরা দুনিয়া থেকে বিদায়ের মুহূর্তে দুনিয়ার তুচ্ছ মালের চিন্তায় পড়ে যাবেন যে, তাদের মাল-সম্পদ কোথায় যাবে কার হাতে পড়বে ? তাদের চিন্তা কিছুতেই এমনটি হয় না। এখানে মজার বিষয় হলো, হযরত যাকারিয়া আ. বুড়ো বয়সে ধন-সম্পদ পাবেনই বা কোত্থেকে ? যিনি সারা জীবন কাঠমিস্ত্রির কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেছেন তাঁর দু' চার পয়সা কোথায় যাবে সে চিন্তা ?.

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, হযরত যাকারিয়ার ভাই-বন্ধু আত্মীয়গণ ছিলেন অনুপযুক্ত। তাই আশংকা ছিল যে, তারা বদ আমল ও দুষ্কৃতির কারণে না জানি নবুওয়াতের সৎ ও ন্যায়পথের বিকৃতি ঘটিয়ে বসে। এবং যেই দীনি ও রূহানী সম্পদ হযরত ইয়াকুব আ. থেকে হযরত যাকারিয়া পর্যন্ত পৌঁছেছে তা যেন তারা নিজেদের অসৎ আচরণে ধ্বংস করে না দেয়।—কুরআনুল কারীম ঃ মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী।

আল্লাহ তার পরিকল্পনা অনুযায়ীই পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টি করে থাকেন। পিতা-মাতার পরিকল্পনায় সন্তানের জন্ম হয় না। অবশ্য পিতা-মাতা সন্তানের জন্ম বন্ধ করার বা বন্ধ রাখার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারেন মাত্র। কোনো দম্পতিকে সন্তান দানের ব্যাপারে আল্লাহর ঘোষণা হলো, "যাকে

চান তিনি ছেলে দেন, যাকে ইচ্ছা মেয়ে দেন, কখনো কাউকে ছেলেমেয়ে দুটোই দান করেন, আবার কাউকে ছেলেমেয়ের কোনোটিই দেন না।"

এমতাবস্থায় যাদেরকে আল্লাহ তাআলা স্বাভাবিক বয়স পর্যন্তও কোনো সন্তান যদি না দেন, তাদের মনের আকাংখা, সন্তান প্রাপ্তির বাসনা পূরণের কি কোনো পথ আছে ? হাঁ, চেষ্টা-তদবীর করেও তো অনেক দম্পতি নিঃসন্তান অবস্থায় বার্ধক্যে উপনীত হয়ে নিরাশ জীবন কাটিয়ে থাকে। এমনি এক অবস্থায় পৌঁছে হযরত যাকারিয়া আ. আল্লাহর দরবারে সন্তানের জন্য দুআ করেছিলেন। তার দুআ কবুল হলো এবং বার্ধক্যের চরমে পৌঁছলেও তাঁকে ছেলে দেয়ার সুসংবাদ দেয়া হয়েছিল রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে। সুসংবাদ পেয়ে তিনি আশ্চর্য হয়ে জানতে চাইলেন, এমন অস্বাভাবিক অবস্থায় (অর্থাৎ স্ত্রীর বন্ধাত্ব আর নিজের চরম বার্ধক্য) কিভাবে তিনি সন্তান পেতে পারেন ? তাঁকে জানিয়ে দেয়া হলো যে, অবস্থা এমনই থাকবে। আর এ অবস্থাতেই আল্লাহ সন্তান দিবেন। এটা আল্লাহর জন্য মোটেই কোনো কঠিন কাজ নয়। স্বয়ং নবীর নিজের জন্মের দিকে ইংগিত দিয়ে আল্লাহ তাঁকে বললেন ঃ وَقَدْ خَلَقْتُكَ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا "আমি তো তোমাকেও সৃষ্টি করেছিলাম যখন তুমি কিছুই ছিলে না।" সুতরাং বার্ধক্যাবস্থায় সন্তান দান করাটাও আমার (আল্লাহর) জন্য কোনো কঠিন কাজ নয়। আল্লাহর এ কুদরতের উপর বিশ্বাস থাকলে মানুষ সন্তানলাভের জন্য শিরক-বিদআতের পথ ধরতে পারে না। ইসলামে চেষ্টা-তদবীরের পথ তো খোলা—তবে তা হতে হবে বৈধ উপায়ে।

❐

দশ

فَاَتَتْ بِهٖ قَوْمَهَا تَحْمِلُهٗ ؕ قَالُوْا يٰمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ۝ يٰاُخْتَ هٰرُوْنَ مَا كَانَ اَبُوْكِ امْرَاَ سَوْءٍ وَّمَا كَانَتْ اُمُّكِ بَغِيًّا ۝

"সে (মারইয়াম) সন্তানকে নিয়ে নিজ জাতির লোকদের নিকট উপস্থিত হলো। তারা বললো, ও মারইয়াম ! তুমি তো বড় পাপের কাজ করে বসেছ। ও হারুনের বোন ! তোমার বাপ তো অসৎ ব্যক্তি ছিল না আর তোমার মাও তো কোনো চরিত্রহীনা নারী ছিল না।"

–সূরা মারইয়াম ঃ ২৭-২৮

স্বাধ্বী নারী সম্মুখীন হলেন কঠিন পরীক্ষার, শিকার হলেন অসহনীয় তোহ্‌মতের

আলোচ্য আয়াত দুটোতে হযরত মারইয়াম আ.-এর গর্ভে হযরত ঈসা আ. জন্মগ্রহণের ফলে হযরত মারইয়াম সমাজের লোকদের দ্বারা যে তিরস্কৃত হয়েছিলেন সে কথাগুলো বিবৃত হয়েছে। বিষয়টি সূরা মারইয়ামের দ্বিতীয় রুকূ'র ১৬ আয়াত থেকে ৩৫ আয়াত পর্যন্ত বর্ণনা করা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা নবী করীম স.-কে বলেছেন, এ কিতাবে মারইয়ামের কাহিনী বর্ণনা করো। সূরা আলে ইমরানে বলা হয়েছে, হযরত মারইয়ামের মা নিজের মান্নত অনুযায়ী মারইয়ামকে বায়তুল মাকদাসে ইবাদাতে বসিয়ে দিলেন। মারইয়ামের খালু হযরত যাকারিয়া আ. তাকে দেখাশুনার দায়িত্ব নিলেন। এক সময় মারইয়াম নিজের লোকজন থেকে পূর্বদিকে গোসলের জন্য গেলেন এবং পর্দা করে নিলেন। আল্লাহ তাআলা হযরত জিবরাঈল আমীনকে মারইয়ামের কাছে পাঠালেন। জিবরাঈল পূর্ণ মানবাকৃতিতে মারইয়ামের সামনে উপস্থিত হলেন। মারইয়াম ভয় পেয়ে গেলেন আর বললেন আমি দয়াময় আল্লাহর আশ্রয় চাই তোমার থেকে, যদি তুমি তাকওয়াবান লোক হও। জিবরাঈল বললেন, আমি তোমার রবের প্রেরিত দূত। আমি এসেছি তোমাকে একটি পবিত্র ছেলে দান করতে। (ভয় করো না, আমি তো মানুষ নই) এতে মারইয়াম কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে বললেন, "আমার ছেলে হবে কিভাবে ? যখন আমাকে কোনো পুরুষ স্পর্শ করেনি, আর

আমি চরিত্রহীনাও নই।" ফেরেশতা বললেন, "এভাবেই হবে।" (একথাটি হযরত যাকারিয়াকেও বলা হয়েছিল)। তোমার রব বলেছেন এটা তো আমার পক্ষে খুবই সহজ। আর আমি এটা এজন্য করবো যে, একে মানবজাতির জন্য একটা নিদর্শন হিসেবে বানাব এবং আমার পক্ষ থেকে রহমত বানিয়ে রাখব। এটা (পিতা ছাড়া ছেলে তৈরি করা ঈসাকে সৃষ্টি করা) তো একটা স্থিরকৃত কাজ। এ কথোপকথন চলছিল, হঠাৎ মারইয়ামের গ্রীবাদেশ থেকে কাপড় একটু সরে গেলে জিবরাঈল তাঁর বুকের উপরিভাগের উন্মুক্ত স্থানে ফুঁ দিলেন আর পুত্র সন্তানের ভ্রূণ তাঁর গর্ভে সঞ্চারিত হলো। অতপর মারইয়াম যখন গর্ভ ধারণের লক্ষণ অনুভব করলেন তখন তিনি গর্ভসহ দূরবর্তী স্থানে চলে গেলেন।-তাফহীমুল কুরআন ও মাআরেফুল কুরআন।

'দূরবর্তী স্থান' বলতে 'বায়তে লাহাম' বুঝানো হয়েছে। গর্ভ সঞ্চারের অনুভব হলে হযরত মারইয়ামের বায়তুল মাকদাসে এতেকাফ থেকে বের হয়ে সেখানে চলে যাওয়া ছিল এক স্বাভাবিক ব্যাপার। বনী ইসরাঈলের পবিত্রতম পরিবার বনী হারুনের কন্যা যিনি বায়তুল মাকদাসে ইবাদাতের কাজে একান্তভাবে নিয়োজিত ছিলেন—সহসা গর্ভবতী হয়ে পড়লেন। এমতাবস্থায় তিনি নিজের এতেকাফে বসে থাকলে এবং লোকেরা তাঁর গর্ভের কথা জানতে পারলে তারা তাঁর জীবন অতীষ্ঠ করে তুলতো। এ কারণে তিনি নিরুপায় হয়ে চুপচাপ স্বীয় এতেকাফ ছেড়ে দিয়ে হুজরা থেকে বের হয়ে পড়লেন। ভাবলেন এতে করে তিনি আল্লাহর মর্জি পূরণ হওয়া পর্যন্ত জনগণের ভর্ৎসনা ও সাধারণ বদনামী থেকে রক্ষা পেয়ে যাবেন।

—তাফহীমুল কুরআন

তারপর প্রসবের সময় হলে যখন মারইয়াম-এর প্রসব বেদনা শুরু হলো, তখন তিনি একটি খেজুর গাছের নীচে আশ্রয় নিলেন। যাতে করে তিনি গাছের উপর ভর দিয়ে উঠা-নামা করতে পারেন। এ সময় তাঁর কোনো সংগী-সাথী ছিল না। অথচ তিনি ছিলেন প্রসব ব্যথায় অস্থির। সে সময় আরাম ও দরকারী যেসব উপকরণ কাছে থাকা উচিত ছিল, তার কিছুই তাঁর কাছে ছিল না। তাছাড়া সন্তান প্রসবের পর দুর্নামের আশংকাও তাঁর মনকে অস্থির করে রেখেছিল। সেই কঠিনতম মুহূর্তে মারইয়াম দৈহিক ও মানসিক যন্ত্রণায় কত অসহায় ছিলেন তা ভুক্তভোগী নারীরাই বুঝতে পারেন। তখন তিনি বলতে লাগলেন ঃ

يٰلَيْتَنِيْ مِتُّ قَبْلَ هٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا ○

"হায়, আমি যদি এ অবস্থার আগেই মরে যেতাম আর আমার নামনিশানাও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যেতো!"–সূরা মারইয়াম ঃ ২৩

এমতাবস্থায় আল্লাহর নির্দেশে হযরত জিবরাঈল আ. সেখানে পৌঁছে নিম্নভূমিতে অবস্থান নিলেন। তিনি নিম্নস্থান থেকে আওয়ায দিয়ে বললেন, তুমি দুঃখ ও চিন্তা করো না। তোমার রব তোমার পাদদেশে একটি নহর বা ঝর্ণা প্রবাহিত করে দিয়েছেন, আর তুমি খেজুর গাছের কাণ্ড ধরে নিজের দিকে নাড়া দাও, তা থেকে তোমার উপর সুপক্ক খেজুর ঝরে পড়বে। সন্তান প্রসবের পর মারইয়াম ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়লে রাব্বুল আলামীন তাঁর খাদ্য হিসেবে ব্যবস্থা করে দিলেন। শুকনো খেজুর গাছ তাজা হয়ে গেল এবং পাকা খেজুর দেখা দিল। আর পায়ের নীচে ঝর্ণা প্রবাহিত হলো। আল্লাহর পক্ষ থেকে ফেরেশতা মারইয়ামকে বললেন, তুমি খাও, পান করো, আর চোখ শীতল করো। অর্থাৎ খেজুর খেয়ে ক্ষুধা মিটাও, ঝর্ণার পানি পান করে তৃষ্ণা নিবারণ করো আর পুত্রকে দেখে ও আল্লাহর প্রিয়পাত্র হওয়ার কারণে চক্ষু শীতল করো এবং আনন্দিত থাক। বাকী দুর্নামের সমাধান হলো, যখনি কোনো মানুষ তোমার কোলে ছেলে দেখে তোমাকে প্রশ্নের সম্মুখীন করে তখন তুমি নিজে কোনো জবাব দিবে না, ইংগিতে বলবে আমি রহমান আল্লাহর জন্য রোযা রেখেছি, তাই কারো সাথে কথা বলবো না, আর বাচ্চার দিকে ইশারা করে তার কাছে জবাব শুনতে বলবে। দেখবে নবজাত শিশু আল্লাহর হুকুমে অস্বাভাবিকভাবে কথা বলে জবাব দিবে। এভাবে তোমার পবিত্রতা ও সতীত্বের অলৌকিক প্রমাণ প্রকাশিত হবে।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো, সন্তান প্রসবের সময় উপস্থিত হওয়ার মুহূর্তে মারইয়াম যে বলেছিলেন, "হায়! আমি যদি এ অবস্থার আগেই মরে যেতাম আর আমার নামনিশানাও সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে যেতো!" এ শব্দগুলো থেকেই বুঝা যায় হযরত মারইয়াম কত জটিল অবস্থায় পতিত হয়েছিলেন, কত কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন। অবস্থার নাজুকতা অনুধাবন করতে পারলে সবাই বুঝতে পারবেন, তাঁর মুখে এসব শব্দ কেবল প্রসব বেদনার কারণেই উচ্চারিত হয়নি। বরং এ চিন্তাই তাঁকে অস্থির করে তুলেছিল যে, আল্লাহ তাঁকে যে মারাত্মক ও কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করে দিলেন, তা থেকে তিনি মান-সম্মান নিয়ে কিভাবে নিষ্কৃতি পেতে পারেন। সমাজে তিনি কিভাবে সসম্মানে ঠাই পাবেন। এতদিন তো গর্ভকে লোক চক্ষুর আড়ালে কোনোভাবে লুকিয়ে রাখতে পেরেছিলেন, কিন্তু এখন এ বাচ্চাকে কোথায় কিভাবে লুকিয়ে রাখবেন।-তাফহীমুল কুরআন

শেষ পর্যন্ত সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ আল্লাহ তাআলার কুদরতে মারইয়ামের ছেলে ঈসা আ. পিতা ছাড়া কেবল মাতা থেকেই জন্মগ্রহণ করেন। জনমানবশূন্য ময়দানে একমাত্র আল্লাহর সাহায্যে মারইয়াম সন্তান প্রসব করলেন, ক্ষুধা-তৃষ্ণা থেকে বাঁচলেন আর মানুষের তোহমত থেকে বাঁচার পথও আল্লাহ পাক বলে দিলেন। বলে দিলেন, বাচ্চা সম্পর্কে মানুষের প্রশ্নের জবাবে তোমাকে কিছু বলতে হবে না। তার জন্ম সম্পর্কে যে কেউই প্রশ্ন তুলবে তার জবাব দানের ব্যবস্থা করা আমারই দায়িত্ব। উল্লেখ্য, বনী ইসরাঈলের সমাজে চুপ থাকার রোযা রাখার রেওয়াজ ছিল।–তাফহীমুল কুরআন

মারইয়াম নবজাত সন্তান ঈসাকে নিয়ে লোকালয়ে এলে লোকেরা তাজ্জব হয়ে তাকে উপরোক্ত প্রশ্নগুলোর সম্মুখীন করলো। তাদের প্রশ্নগুলোর সারকথা ছিল এই যে, যার গোটা পরিবারই অত্যন্ত পবিত্র ও উন্নত চরিত্রের, তার দ্বারা এরূপ কাণ্ড হওয়া কত বড় সর্বনাসের কথা ! মারইয়াম এসব প্রশ্নের কোনো জবাব না দিয়ে সদ্যজাত সন্তানের দিকে ইশারা করলেন। ইশারায় তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে যাকিছু বলার ও জিজ্ঞেস করার আছে তা এ শিশুকেই জিজ্ঞেস করো। তার কাছেই তোমাদের জিজ্ঞাস্য বিষয়গুলোর জবাব পাবে। লোকেরা মনে করলো মারইয়াম তাদের সাথে উপহাস করছে। তাই তারা বললো ওতো কেবল কোলের শিশু মাত্র। তার সাথে আমরা কিভাবে কথা বলবো ? সহসা সেই নবজাত সন্তান কোলের শিশু ঈসা বলে উঠলেন, "আমি আল্লাহর বান্দাহ। আল্লাহ আমাকে কিতাব দিয়েছেন ও নবী বানিয়েছেন। আর তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন। আমি যেখানেই থাকি না কেন। আর তিনি আমাকে সালাত ও যাকাতের আদেশ দিয়েছেন যতদিন আমি জীবিত থাকবো। তিনি আমাকে মায়ের অনুগত বানিয়েছেন, আমাকে স্বৈরাচারী ও হতভাগা দুশ্চরিত্র বানাননি। আর আমার প্রতি শান্তি যেদিন আমি জন্মেছি, যেদিন মরে যাব এবং যেদিন আমি জীবিত হয়ে উত্থিত হবো।"

আল কুরআন হযরত ঈসা আ.-এর জন্মবৃত্তান্ত এভাবে বর্ণনা করার পর ঘোষণা করেছে ঃ

ذٰلِكَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ ج قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِىْ فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ ○ مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ
يَّتَّخِذَ مِنْ وَّلَدٍ لا سُبْحٰنَهٗ ط اِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ○

"এ হলো মারইয়াম পুত্র ঈসার ঘটনা। এটা একটা চূড়ান্ত সত্য কথা, যে সম্পর্কে লোকেরা সন্দেহ করে থাকে। আল্লাহ তো এমন নন যে কাউকে তিনি নিজের পুত্র বানিয়ে নেবেন! তিনি পবিত্র মহিমাময়, তিনি কোনো কাজ করা স্থির করলে বলেন, 'হও' অমনি তা হয়ে যায়।"–সূরা মারইয়াম ঃ ৩৪-৩৫

অর্থাৎ হযরত ঈসা আ.-এর শানও তাঁর বিশেষত্ব উক্ত আয়াতসমূহে বিবৃত হয়েছে। এমন একটি সত্য ও সুস্পষ্ট বিষয়ে লোকেরা অযথা বিতর্কের সৃষ্টি করে থাকে। তারা এতে নানাবিধ মতপার্থক্য দাঁড় করিয়েছে। কেউ তাঁকে খোদা বানিয়ে দিয়েছে, আর কেউ বানিয়েছে খোদার বেটা, কেউ বলেছে মিথ্যাবাদী, প্রতারক আবার অনেকে তাঁর বংশ ও নসবনামায় তিরস্কার করেছে। আল কুরআন তাই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা দিয়েছে যে, হযরত ঈসা ইহুদী-খৃস্টানদের এসব সন্দেহ ও তর্ক-বিতর্কের উর্ধে। তিনি আল্লাহর একজন মোকাররম বান্দা, মিথ্যাবাদী-প্রতারক নন—সত্যবাদী ; আল্লাহর নবী, তাঁর বংশ ও নসব পাক-পবিত্র। আল্লাহ তাঁকে 'কালেমাতুল্লাহ' আখ্যা দিয়েছেন। আয়াতে 'কাওলাল্ হক' বলে সম্ভবত এ 'কালেমাতুল্লাহ'-ই বুঝানো হয়েছে।–আল কুরআনুল কারীম ঃ শাব্বীর আহমদ উসমানী।

হযরত ঈসা আ. সম্পর্কে ইহুদী ও খৃস্টানদের অলীক চিন্তাধারায় বাহুল্য ও স্বল্পতা বিদ্যমান ছিল। খৃস্টানরা তো তাঁকে বাড়িয়ে খোদার পুত্র বানিয়ে দিয়েছে ; আর ইহুদীরা তাঁর অবমাননায় এমন ধৃষ্টতা দেখিয়েছে যে, তারা তাঁকে ইউসুফ মিস্ত্রির জারজ সন্তানরূপে আখ্যায়িত করেছে—নাউযুবিল্লাহ। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা উভয় প্রকার ভ্রান্ত লোকদের ভ্রান্তির অপনোদন করে তাঁর সঠিক মর্যাদা ও প্রকৃত সম্মান প্রতিষ্ঠিত করেছেন।–কুরতুবী থেকে মাআরেফুল কুরআন ঃ মুফতী শফী র.

সূরা মারইয়ামের উক্ত ৩৪-৩৫ আয়াতে বর্ণিত কথাগুলো দ্বারা মূলত খৃস্টানদের মিথ্যা সন্দেহ ও ভুল আকীদার অপনোদন করা হয়েছে। এখানে যে কথাটি খৃস্টানদের সামনে সুস্পষ্ট করে তোলা হয়েছে তাহলো হযরত ঈসাকে যে তারা খোদার পুত্র মনে করে, তাদের সে আকীদা-বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভুল ও বাতিল। হযরত ঈসার মত হযরত ইয়াহইয়ার জন্মও ছিল একটি মুজিযা। এ মুজিযার দরুন হযরত ইয়াহইয়া আ. যেমন খোদার পুত্র হয়ে যাননি, তেমনিভাবে হযরত ঈসা আ.-এর জন্মও এমন মুজিযা, যদ্দরুন তাঁকে খোদার পুত্র মনে করা যেতে পারে না। খৃস্টানদের নিজস্ব বর্ণনায়ও একথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত ইয়াহইয়া ও হযরত ঈসা আ.

উভয়ের জন্মই ছিল মুজিযা স্বরূপ। লূক-এর ইনজীলে এ দুটি মুজিযার উল্লেখ করা হয়েছে কুরআনের মতই। কিন্তু খৃস্টানরা একটি মুজিযা হিসেবে জন্মগ্রহণকারীকে আল্লাহর বান্দা মনে করে অথচ অনুরূপ আরেকটি মুজিযায় জন্মগ্রহণকারীকে (ঈসাকে) খোদার পুত্র বলে মনে করে। এটা যে তাদের অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।–তাফহীমুল কুরআন ঃ মাওলানা মওদূদী রহ.

হযরত ঈসা আ. বলেছিলেন ঃ

وَاِنَّ اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ○

"আল্লাহ আমারও রব আর তোমাদেরও রব। সুতরাং তোমরা তাঁরই বন্দেগী করো—এটাই তো সরল-সঠিক পথ।"–সূরা মারইয়াম ঃ ৩৬

সূরা মারইয়ামের এ ৩৬ আয়াতে খৃস্টানদের বলা হয়েছে যে, হযরত ঈসা আ.-এর দাওয়াতও তো অন্যসব নবী-রসূলদের দাওয়াতের মতই এক ও অভিন্ন। তারা সবাই এক আল্লাহকে রব হিসেবে গ্রহণ করে কেবলমাত্র তাঁরই দাসত্ব ও বন্দেগী করার জন্য বলেছেন। তারপরেও তোমরা তাঁদেরকে আল্লাহর বান্দা মনে করার পরিবর্তে আল্লাহর আসনে বসিয়েছ—তাদেরকে খোদা বানিয়ে নিয়েছ, এটা তো তোমাদের নিজস্ব আবিষ্কার মনগড়া কাজ ছাড়া আর কিছুই নয়। তোমাদের নেতৃবৃন্দ কখনই তোমাদেরকে এ শিক্ষা দেননি।–তাফহীমুল কুরআন ঃ মাওলানা মওদূদী রহ.

এভাবে হযরত ঈসা আ.-এর জন্ম নিয়ে যেমন তৎকালীন খৃস্টানরা নানা বিভ্রান্তি ও বিতর্কের অবতারণা করেছিল—তারা আল্লাহ তাআলার বিশেষ কুদরত পুরুষ ছাড়া কেবল নারী থেকে সন্তান পয়দা করার একটি স্বচ্ছ ঘটনাকে ঘোলাটে করার যাবতীয় ষড়যন্ত্র করেছিল, তারা মানুষের বৈশিষ্ট্যকে সর্বশক্তিমান আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করে নানা সন্দেহ ছড়িয়েছিল, ঈসা আ.-কে 'আল্লাহর বেটা' বলার মত জঘন্য ধৃষ্টতা দেখিয়েছিল। আল কুরআন তাদের সে ভ্রষ্টতার কথা উল্লেখ করে আখেরী নবীর সময়কার ইহুদী-খৃস্টান-মুশরিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাদের 'হক'-এর দিকে আহ্বান করেছিল। মুজিযা হিসেবে জন্মগ্রহণকারী ঈসা আ.-এর জন্ম নিয়ে ঈসা আ. ও তাঁর মাতা মারইয়ামকে অমর্যাদার বিতর্কের জালে জড়ানোর চক্রান্ত করেছিল। তেমনি আখেরী নবীর সময়কার ইহুদী-খৃস্টানরাও আল্লাহর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'নবুওয়াত' সম্পর্কে অবিশ্বাস ও বিভ্রান্তির ঘূর্ণয়নে আবর্তিত হচ্ছে। আর মানব সমাজ কেও বিভ্রান্ত করছে। এতে করে ইহুদী-খৃস্টান-মুশরিকগণ পৃথিবীর শান্তি

বিপন্ন করছিল আখেরী নবীর আনীত বিশ্ব শান্তির পয়গামের বিরোধিতা করে। আল্লাহ তাআলা আলোচ্য ইতিহাসের সূচনা করেছেন এভাবে وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ مَرْيَمَ "এ কিতাবে মারইয়ামের ইতিহাস আলোচনা করো।"

আল কুরআন এমনিভাবে পূর্বোক্ত নবী-রসূলগণের ইতিহাস এবং আল্লাহর কতিপয় বিশেষ বান্দা ও বান্দীর ঘটনাবলী কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষণীয় বিষয়াদির আলোচনা করেছে। এখানে মারইয়াম পুত্র ঈসা আ.-এর আলোচনায় তাঁর জন্ম বৃত্তান্ত প্রসংগে বলতে গিয়ে খৃস্টানদের তাওহীদী শিক্ষা থেকে সরে যাওয়ার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। তারা যে হযরত ঈসা আ.-এর মূল শিক্ষা থেকে বহু দূরে অবস্থান করছে আল কুরআন তা প্রকাশ করে দিয়েছে। তারা ঈসা আ.-কে আল্লাহর পুত্র বলে এবং মারইয়ামের উপর তোহমত আরোপ করে সর্বোপরি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে মানব স্বভাবের বানিয়ে সকল নবীর দীনের মূল ভিত্তি তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের উপর কুঠারাঘাত করেছে আর নিজেদেরকে শিরক ও কুফরের মধ্যে নিক্ষেপ করেছে। অথচ নিজেদেরকে হযরত ঈসা ও ইনজিল কিতাবের অনুসারী বলে দাবী করছে।

সদ্যজাত শিশু হযরত ঈসা আ. স্বয়ং মাতার কোলে থেকে সুস্পষ্ট বলে দিলেন, اِنِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ 'আমি আল্লাহর বান্দা'। অর্থাৎ আমার এ অস্বাভাবিক জন্মের কারণে কেউ যেন এমন বিভ্রান্তিতে না পড়ে যে, আমি কোনো অতিমানবীয় অস্তিত্বের অধিকারী। আমি তো আল্লাহরই বান্দাহ। শিশু ঈসার দ্বিতীয় কথা ছিল, "আল্লাহ আমাকে কিতাব ও নবুওয়াত দানে ধন্য করেছেন আর আমি যেখানেই থাকি না কেন সেখানেই আমার অবস্থান হবে কেবল বরকত আর বরকত।" তাঁর তৃতীয় কথা ছিল, "আমাকে জীবনভর সালাত ও যাকাত প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মূলত এ দুটো বিষয়ই সকল শরীয়তের মূল ভিত্তি ছিল। এজন্যে সকল আসমানী জীবন ব্যবস্থায় সর্বপ্রথম এ দুটো বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে।" শিশু ঈসার চতুর্থ কথা ছিল, "আল্লাহ আমাকে আমার মায়ের অনুগত বানিয়ে পাঠিয়েছেন। আমাকে তিনি স্বৈরাচারী ও বদ চরিত্রের বানাননি।" সর্বশেষ তিনি বলেছেন, "আমার প্রতি শান্তি যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি, যেদিন আমি মৃত্যুমুখে পতিত হবো আর যেদিন আমি জীবিত হয়ে উঠবো।"

হযরত ঈসা আ.-এর জন্মের পর পরই মায়ের কোলে থেকে উপরোক্ত পাঁচটি এমন বিষয়ের কথা বলেছেন যাতে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি অন্যসব মানুষের মতই একজন মানুষ। তিনি মানুষের উর্ধে খোদা

বা খোদার বেটা কোনোটিই নন। প্রথম কথায় তিনি নিজেকে আল্লাহর বান্দাহ বলে সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন। দ্বিতীয় কথায় তাঁকে আল্লাহর কিতাব ও নবুওয়াত প্রাপ্ত আল্লাহর বিশেষ অনুগৃহীত বান্দা হিসেবে প্রকাশ করেছেন। তৃতীয় কথায় তিনি নিজের দায়িত্ব অন্যান্য নবী-রসূলগণের দায়িত্বের অনুরূপ এবং মানুষ নবী হিসেবে যতদিন বেঁচে থাকেন ততদিন অর্পিত দায়িত্ব আনজাম দানের জন্য আদিষ্ট বলে প্রচার করেছেন। চতুর্থ কথায় তিনি অন্যান্য মানুষের মতই মারইয়ামের উদরে জন্ম নেয়ার কারণে মায়ের অনুগত থাকার কথা সংকল্প ও নির্দেশনার বিষয়ে স্বীকার করেছেন। ব্যতিক্রম কেবল এতটুকু যে তিনি আল্লাহর বিশেষ কুদরতে পিতা ছাড়াই কেবল মায়ের গর্ভে জন্ম নিয়েছেন। আর সর্বশেষ কথায় তিনি নিজেকে জন্ম, মৃত্যু ও হাশরে উঠার স্বাভাবিক মানবীয় জীবন ধারার গণ্ডীর মধ্যে থাকা একজন মানুষ হিসেবে ঘোষণা করেছেন। সুতরাং তাঁর অনুসারী বলে দাবীদার খৃস্টানদের আকীদা-বিশ্বাস ও দাবী যে সম্পূর্ণ মিথ্যা ও কল্পিত সে বিষয়ে সর্বশেষ আসমানী কিতাব আল কুরআন পরিষ্কার ঘোষণা করে দিয়েছে।

❐

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ص وَّلَا تَاْخُذْكُمْ بِهِمَا رَاْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ج وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

"যিনাকারিণী নারী ও যিনাকারী পুরুষ—উভয়ের প্রত্যেককে একশ করে কোড়া মার। আল্লাহর দীনের ব্যাপারে তাদের প্রতি যেন তোমাদের মনে দয়ার উদ্রেক না হয় ; যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখ। আর তাদের শাস্তির সময় যেন মুমিনদের একটি দল উপস্থিত থাকে।"–সূরা আন নূর ঃ ২

ব্যভিচার মানববংশ বিধ্বংসী ও দণ্ডনীয় অপরাধ

ইসলামে মানবিক অপরাধসমূহের যেসব শাস্তি কুরআনে নির্ধারিত রয়েছে তন্মধ্যে ব্যভিচারের শাস্তি সবচেয়ে কঠোর। ব্যভিচার স্বয়ং একটি জঘন্য অপরাধ, তদুপরি তা সাথে নিয়ে আসে আরও শত শত অপরাধ যার ফলাফল প্রকাশ পায় মানবতার ধ্বংসের আকারে। অনেকের মতে পৃথিবীতে সংঘটিত হত্যা ও লুণ্ঠনের অধিকাংশের পেছনে রয়েছে কোনো নারী ও তার সাথে অবৈধ সম্পর্কের কারণ। যেসব অপরাধের শাস্তি ও তার পন্থা কুরআনুল কারীম ও মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে —কোনো বিচারক ও শাসনকর্তার মতামতের উপর ন্যস্ত করা হয়নি, সেসব শাস্তিকে শরীয়তের ভাষায় 'হদূদ' বলা হয়। শরীয়তে হদূদ চারটি ঃ চুরি,[১] কোনো সতী-সাধ্বী নারীর[২] প্রতি অপবাদ আরোপ, মদ্যপান[৩] ও ব্যভিচার[৪]। এগুলো ছাড়া অন্যান্য অপরাধের শাস্তি নির্ধারিত নয়, বরং শাসনকর্তা অথবা বিচারক অপরাধীর অবস্থা, অপরাধের গুণাগুণ, পরিবেশ ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রেখে যে পরিমাণ শাস্তিকে অপরাধ দমনের জন্য যথেষ্ট মনে করে সেই পরিমাণ শাস্তি দিতে পারে। এ ধরনের শাস্তিকে শরীয়তের পরিভাষায় 'তা'যীরাত' বলা হয়। উপরোল্লিখিত হদূদগুলোর প্রত্যেক অপরাধই স্বস্থলে গুরুতর, জগতে শান্তি-শৃংখলার জন্য মারাত্মক এবং অনেক অপরাধের মূল উৎস। তবে সবকটির মধ্যে মানবিক সমাজ ব্যবস্থার জন্য ব্যভিচার সর্বাধিক মারাত্মক।-মাআরেফুল কুরআন

যিনা বা ব্যভিচারের শাস্তি নির্ধারণের পূর্বে ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যভিচারিণী নারীকে ঘরে আবদ্ধ রাখার নির্দেশ ছিল। যেমন সূরা আন নিসার পনের নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

فَامْسِكُوْهُنَّ فِى الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلاً

অর্থাৎ তাদেরকে ঘরের মধ্যে আবদ্ধ করে রেখ, মৃত্যু এসে তাদের হায়াত শেষ করা পর্যন্ত অথবা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের ব্যাপারে কোনো পথনির্দেশনা আসা পর্যন্ত। এ বাক্যাংশের পূর্বের অংশে বলা হয়েছিল, তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচারিণী তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের পুরুষদের চারজন সাক্ষী তলব করো ; তারা যদি সাক্ষ প্রদান করে, তবে তাদের জন্য উক্ত শাস্তির বিধান আপাতত কার্যকর হবে। অতপর সূরা আন নূর-এর এ আয়াত নাযিল হলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা (সূরা নিসায়) যে ওয়াদা করেছিলেন সেই অনুযায়ী ব্যভিচারি নারী-পুরুষ সম্পর্কে শাস্তির স্বতন্ত্র বিধান সম্বলিত আয়াত নাযিল হয়েছে। তোমরা তা আমার কাছ থেকে জেনে নাও—তা হচ্ছে অবিবাহিত নারী-পুরুষের জন্য একশ করে কোড়া মারা। আর বিবাহিত নারী-পুরুষের শাস্তি হলো একশ একশ কোড়া ও রজম (পাথর নিক্ষেপ) করে মেরে ফেলা।–মুসলিম, কিতাবুল হদূদ, হদ্দুয্ যিনা অধ্যায়।

অতপর 'হদ' প্রয়োগ করতে গিয়ে তিনি কেবল রজম (পাথর নিক্ষেপ) করে শাস্তি দেন। বাকী একশ করে কোড়া মারাকে রজমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে দেয়া হয়। অর্থাৎ পরবর্তীতে বিবাহিত নারী-পুরুষের ব্যভিচারির শাস্তি 'রজম'ই নির্ধারিত হয়। রসূলের যামানা অতিবাহিত হওয়ার পর খোলাফায়ে রাশেদার যুগেও এভাবেই ব্যভিচারের শাস্তি দেয়া হতো। অতপর সকল যুগের ফকীহগণ ও আলিমগণ এ একই বিধানের কথা বলে আসছেন যা অদ্যাবধি চালু আছে। কেবল খারেজী সম্প্রদায় এ বিধানের বিরোধীতা করেছে। এ বিরোধীতার ভিত্তি হলো হাদীস অমান্য করা।–কুরআনুল কারীম ঃ মাওলানা সালাহুদ্দীন ইউসুফ।

যেনা বা ব্যভিচার যে নৈতিকতার দিক থেকে অত্যন্ত খারাপ ধর্মীয় দৃষ্টিতে অতি বড় গুনাহ, আর সামাজিকতার দিক থেকে জঘন্য, কদর্য ও আপত্তিকর সে সম্পর্কে প্রাচীনতমকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত সমস্ত মানব সমাজ সম্পূর্ণ এক মত। যে বিচ্ছিন্ন ও মুষ্টিমেয় লোক নিজেদের জ্ঞান বিবেককে নিজেদের প্রবৃত্তির লালসার অধীন করে দিয়েছে কিংবা যারা পাগলের প্রলাপকে দার্শনিকতা মনে করে নিয়েছে ; তারা ছাড়া আর

কেউ এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেনি। কারণ, মানুষের প্রকৃতিই এ কাজের বিরোধী নারী-পুরুষ ইতর প্রাণীর মত যৌন মিলনের পর যার যার পথে বিচ্ছিন্ন হয়ে চলে যেতে পারে না। এমনটি হলে সমাজে মানব বংশ টিকে থাকতে পারে না। কেননা মানুষের শিশু সন্তানের জীবন পালন ও পরিবর্ধনের জন্য ক্রমাগত কয়েক বছরের জন্য নিরবচ্ছিন্ন দেখাশুনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও লালন-পালন লাভ করা একান্তই অপরিহার্য। কিন্তু নারী একাকী এ দায়িত্ব পালন কখনো করতে পারে না, যতক্ষণ না পুরুষটি এ কাজে তার সহযোগী না হয়। এজন্যে স্থায়ী চুক্তিবদ্ধতা ছাড়া মানব সমাজ কখনই টিকে থাকতে পারে না। নারী-পুরুষ যদি পরিবার গঠন না করে কেবল নিছক যৌন লালসা চরিতার্থ করার জন্য স্বাধীন ও অবাধে মিলিত হয়, তাহলে সমাজ জীবনের মূল ভিত্তিই চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে। তাহযীব তমদ্দুনের যে ভিত্তি গড়ে উঠেছে তা বিনষ্ট হয়ে পড়বে। এ কারণেই প্রত্যেককালে মানব সমাজ বিবাহের ব্যবস্থা চালু করার পাশাপাশি ব্যভিচারের পথ বন্ধ করার কোনো না কোনো পথ অবলম্বন করার চেষ্টা করেছে। অবশ্য ব্যভিচারের ক্ষতি সম্পর্কে অনুভূতি ও চেতনার স্পষ্টতা ও তীব্রতার পার্থক্যের কারণে সেই চেষ্টার ধরণ, রূপ ও পদ্ধতিতে আইন, নৈতিকতা, তমদ্দুন ও ধর্মীয় ব্যবস্থাপনার মধ্যেও রয়েছে বড় পার্থক্য। ব্যভিচার মানব সমাজের ভিত নষ্টকারী ও মানুষের স্বভাব-ধর্মের পরিপন্থী হওয়ার ব্যাপারে সকল যুগের সকল মানুষের কাছেই তা গর্হিত কাজ হওয়ার বিষয়ে মতৈক্য রয়েছে। তবে এর দণ্ডযোগ্য অপরাধ হওয়ার ব্যাপারে রয়েছে মতপার্থক্য। এখানেই ইসলাম ও অন্যান্য ধর্ম এবং আইন-বিধানের মধ্যে পার্থক্য ও বিরোধ দেখা দেয়। মানবীয় প্রকৃতির কাছের যেসব সমাজ অতীত হয়েছে, তাদের সকলেই যিনা-ব্যভিচার তথা নারী-পুরুষের অবৈধ সম্পর্ককে চিরদিন এককভাবেই অপরাধ হিসেবে গণ্য করে সে জন্য কঠিনতর শাস্তির বিধান করেছে। কিন্তু সভ্যতার পংকিলতায় সমাজ ক্রমশ খারাপ হতে থাকলে ব্যভিচার সম্পর্কে সমাজের আচরণ ও মনোভাব দুর্বলতর হতে থাকে। এ ব্যাপারে যে মারাত্মক ভুলটি করা হয়েছে, তাহলো শুধু যিনা (Fornication) এবং পরস্ত্রীর সাথে যিনা (Adultery)-এর মধ্যে পার্থক্য করে প্রথমটি একটি নগণ্য ভুল এবং শেষোক্তটিকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য করা হয়েছে।

–তাফহীমুল কুরআন

এসবের বিপরীত ইসলামী জীবনব্যবস্থায় যিনা স্বতন্ত্রভাবেই একটি দণ্ডযোগ্য অপরাধ হিসেবে ঘোষিত। আর বিবাহিতের জন্য যিনার শাস্তি অধিক ও তীব্রতর। ইসলামে যিনার শাস্তি হলো অবিবাহিতের জন্য একশ

করে কোড়া মারা আর বিবাহিতের জন্য রজম বা পাথর নিক্ষেপ করে মেরে ফেলা। ইসলামী আইন যিনার বিচার করে এ দৃষ্টিতে যে এটা এমন একটি কাজ যার অবাধ স্বাধীনতা থাকলে মানবজাতি ও মানব সমাজের ভিত্তিই সমূলে বিনষ্ট হয়ে যাবে। মানব বংশের স্থিতি ও মানব সমাজের শৃংখলার জন্য অপরিহার্য বিষয় হলো নারী-পুরুষের সম্পর্ক শুধু বৈধ আইনসম্মত ও নির্ভরযোগ্য সম্বন্ধ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে। কিন্তু অবাধ মিলনের সুযোগ দেয়া হলে এ সম্পর্ক উক্ত সীমার মধ্যে রাখা সম্ভব হবে না। কেননা দাম্পত্য ও পরিবারের দায়িত্ব গ্রহণ না করে যদি যৌন লালসা পূরণের সুযোগ-সুবিধা থাকে, তাহলে যৌন লালসা পূরণের জন্য বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে পরিবার গঠনের গুরুদায়িত্ব স্বেচ্ছায় কেউ নিজ কাঁধে তুলে নিবে বলে ধারণা করা যায় না। যেমন রেলগাড়ীতে বিনা টিকেটে সফর করার স্বাধীনতা থাকলে টিকেট কিনে গাড়ীতে উঠার শর্ত একেবারেই অর্থহীন হয়ে পড়ে। যাত্রীকে টিকেট নিয়ে গাড়ীতে উঠার শর্ত কার্যকর দেখতে চাইলে অবশ্যই বিনা টিকেটে গাড়ী উঠাকে অপরাধ বলে গণ্য করতেই হবে।

ইসলাম মানব সমাজকে যিনার অভিশাপ থেকে মুক্তিদানের জন্য কেবল দণ্ড বিধানমূলক ব্যবস্থার উপরই নির্ভর করে না বরং সেজন্যে সার্বিকভাবেও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা (Preventive Measure)-ও গ্রহণ করে থাকে। আর উক্ত আইনগত ও দণ্ডবিধিমূলক ব্যবস্থা (Direct Action) কেবল শেষ ও চরম ব্যবস্থা হিসেবেই প্রয়োগ করে থাকে। এতে এমন অবস্থার সৃষ্টি করাই ইসলামের উদ্দেশ্য, যেন কেউ এ ধরনের অপরাধে লিপ্ত না হয় এবং যেন কাউকে উক্ত শাস্তি প্রদানের প্রয়োজন দেখা না দেয়। এজন্যে ইসলাম সর্বাগ্রে ব্যক্তির মন-মানসিকতার সংশোধন করে। মানুষের মনে সর্বদ্রষ্টা ও সর্বশ্রোতা রাব্বুল আলামীনের ভয় সৃষ্টির ব্যবস্থা করে এবং আখিরাতে সেই মহান রবের কাছে জবাবদিহির অনুভূতি জাগ্রত করে। আল্লাহর বিধান মেনে চলার আগ্রহ উৎসাহ সৃষ্টি করে। এটা মূলত একজন মুসলিমের ঈমানেরই অনিবার্য দাবী। তাছাড়া ব্যক্তিকে বারবার সতর্ক করে দেয়া হয়, যিনা ও চরিত্রহীনতা কবীরা গুনাহ—যে জন্যে আল্লাহ কঠোর শাস্তি দিবেন। কুরআনের সর্বত্রই অনুরূপ সাবধানতা পাঠক সমক্ষে ভেসে উঠে।-তাফহীমুল কুরআন

অতপর ইসলাম প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য বিবাহ করার সম্ভাব্য সকল প্রকার সহজতর ব্যবস্থা করে দেয়। একজন যথেষ্ট বিবেচিত না হলে প্রয়োজনে চারজন স্ত্রী গ্রহণেরও অবকাশ দেয়। এমনকি কোনো অনাকাংখিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে এবং দাম্পত্য সম্পর্ক বহাল রাখা জীবন যাপনে হুমকি হয়ে

দেখা দিলে পুরুষের জন্য এবং নারীর জন্য তালাক দেয়ার সহজ ব্যবস্থা রয়েছে। দুর্ভাগ্য বশত এমন কোনো অনভিপ্রেত অবস্থার উদ্ভব হলে ইসলামে পারিবারিক পর্যায়ে শালিসী ব্যবস্থা থেকে সরকারী আদালত পর্যন্ত যাওয়ার পথ উন্মুক্ত রয়েছে। যাতে করে উভয়ের মধ্যে সমঝোতা ও মিলমিশ করে নেয়া সম্ভব হয়ে উঠে। আল্লাহ না করুন শেষ পর্যন্তও যদি সম্পর্ক টিকিয়ে রাখা একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়ে তাহলে স্বামী-স্ত্রী পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে অন্যত্র পসন্দ মত পুনরায় বিবাহ করতে পারে।-তাফহীমুল কুরআন

যিনাকারকে অপরাধী সাব্যস্ত করা যাবে যখন সে নিজের স্বাধীন মতে একাজ করে থাকে। জোরজবরদস্তির কারণে কারো থেকে একাজ হয়ে গেলে সে না অপরাধী হবে, না তাকে শাস্তি দেয়া যাবে। কোনো মহিলাকে যিনা করতে বাধ্য করা হলে কুরআন মজীদ সে মহিলাকে মাফ করে দেয়ার কথা ঘোষণা করেছে। যেমন সূরা আন নূরের তেত্রিশ আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ

وَمَنْ يُّكْرِهْهُّنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

"আর যে তাদেরকে সেজন্য জোরজবরদস্তি করবে, তবে আল্লাহ এ জবরদস্তির পরে তাদের প্রতি ক্ষমাশীল, অতি দয়াবান।"

কয়েকটি হাদীস থেকেও জানা যায় যে, জবরদস্তি যিনার ঘটনায় কেবল বলৎকারীকেই শাস্তি দেয়া হয়েছে, আর স্ত্রীলোকটিকে নিষ্কৃতি দেয়া হয়েছে। যেমন তিরমিযি ও আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত হয়েছে একজন মহিলা অন্ধকারে নামাযের জন্য ঘর থেকে বের হয়েছিল। পথে এক ব্যক্তি তাকে ধরে নিয়ে তার সতীত্ব নষ্ট করে। মহিলাটির চিৎকারে চারিদিক থেকে লোকজন জড় হয়ে গেলে বলৎকারকারী ধরা পড়ে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে 'রজম' করলেন। আর মহিলাকে রেহাই দিলেন। বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত ওমর রা.-এর আমলে এক লোক একটি মেয়ের সাথে জবরদস্তি যিনা করে। হযরত ওমর তাকে কোড়া মেরে শাস্তি দিলেন, আর মেয়েটিকে ছেড়ে দিলেন।

কুরআন ও হাদীসের এসব দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে এরূপ যিনাকৃত মহিলাকে শাস্তি না দেয়ার ব্যাপারে ইজমা বা ঐক্যমত হয়েছে। কিন্তু কোনো পুরুষ যদি এভাবে কোনো মহিলা কর্তৃক যিনা করতে বাধ্য হয়, তবে সে ক্ষেত্রে তা জবরদস্তি হবে কিনা এবং ঐ পুরুষ লোকটি শাস্তি হতে রেহাই পাবে কিনা—এ ব্যাপারে আয়িম্যায়ে কিরামের মতভেদ রয়েছে।

এ ব্যাপারে প্রধানত তিনটি মত রয়েছে। ১. ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মাদ, ইমাম শাফেঈ ও ইমাম হাসান ইবনে সালেহ বলেন, পুরুষও যদি যিনা করতে বাধ্য হয়—পুরুষ দ্বারা যদি জবরদস্তি যিনা করানো হয়, তবে তাকে মাফ করা হবে। ২. ইমাম যুফার বলেন, তাকে মাফ করা যাবে না। কেননা পুরুষের দেহে উত্তেজনা সৃষ্টি না হলে তাকে দিয়ে এ কাজ করানো সম্ভব নয়। আর এ উত্তেজনা হওয়াই প্রমাণ করে যে সে কাজটা স্বেচ্ছায় করেছে। ৩. ইমাম আবু হানীফা বলেন, কোনো সরকারী কর্মকর্তা বা কোনো সরকার যদি কোনো পুরুষকে দিয়ে এ কাজ করায়—তাকে একাজ করতে বাধ্য করে, তবে তাকে শাস্তি দেয়া যাবে না। কেননা শাস্তি দাতা তো সরকারই। আর সেই সরকারই যদি জবরদস্তি অপরাধ করায়, তখন তো আর সে শাস্তিদানের অধিকার পেতে পারে না। কিন্তু সরকার ছাড়া অন্য কেউ যদি কোনো পুরুষকে দিয়ে যিনা করায় তাহলে সে পুরুষটিকে অবশ্যই শাস্তি দেয়া হবে। কেননা সে নিজের ইচ্ছা না থাকলে একাজটি করতে পারতো না—জবরদস্তি উত্তেজনা সৃষ্টি করা যেতো না।- তাফহীমুল কুরআন

তাফহীমুল কুরআনের মতে উক্ত তিনটি মতের মধ্যে প্রথম মতটি অধিক সহীহ ও যুক্তিযুক্ত। এর প্রমাণ এই যে, দৈহিক উত্তেজনা ব্যক্তির যৌন লালসার প্রমাণ হলেও তা যে তার নিজের ইচ্ছায় ও আগ্রহে হয়েছে তা প্রমাণিত হয় না। আসলে একটি কাজকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করার জন্য শুধু ইচ্ছা হওয়াই যথেষ্ট নয় বরং সেজন্যে স্বাধীন ইচ্ছা বর্তমান থাকা প্রয়োজন। যে লোককে জোরপূর্বক এমন অবস্থায় ফেলে দেয়া হয়েছে যে, সে ইচ্ছা করে অপরাধ করতে বাধ্য হয়েছে। বাধ্যবাধকতায় পড়ে যাওয়া এমন ব্যক্তি কোনো কোনো অবস্থায় তো নিসন্দেহে অপরাধী হয় না। আর কোনো কোনো অবস্থায় তার অপরাধ হালকা ধরনের হয়ে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ মনে করা যেতে পারে, কোনো জালিম লোক একজন চরিত্রবান লোককে জোরপূর্বক ধরে কয়েদ করে দিল। তার সাথে এক যুবতী সুন্দরী মহিলাকেও বিবস্ত্র করে একই কামরায় আটক করে দিল। আর তাকে যদি যিনা না করা পর্যন্ত মুক্তি না দেয় এ অবস্থায় তারা উভয়ই যদি যিনা করে বসে। এদিকে সেই জালিম লোক চারজন সাক্ষী বানিয়ে বিচারালয়ে মোকদ্দমা দায়ের করে দেয়। ঠিক এমনি অবস্থায় উক্ত লোকটি কি পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিল তৎপ্রতি লক্ষ্য না করে যদি ওদের 'রজম' করা হয় কিংবা কোড়া মারা হয়, তবে তা কতটুকু ইনসাফ বা যুক্তিসংগত হতে পারে ? এরূপ অবস্থায় ব্যক্তির মনে ইচ্ছা ও আগ্রহ না থাকলেও তো

উত্তেজনার সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। তেমনি কোনো লোককে আটক করে যদি মদ ছাড়া অন্য কিছুই পান করতে না দেয়া হয় আর সে অবস্থায় লোকটি যদি মদ পান করে, তবে কি কেবল এ যুক্তিতেই তাকে শাস্তি দেয়া যেতে পারে যে, অবস্থা বাধ্যবাধকতার হলেও তো সে নিজের ইচ্ছা ছাড়া মদ গিলতে পারতো না। সুতরাং স্বাধীন ইচ্ছার সুযোগ না থাকায় তাকে বাধ্যবাধকতার কারণে সৃজিত ইচ্ছার উপর ভিত্তি করে শাস্তি আরোপ করা যায় ?

ইসলামের 'হদূদ' মূলত যথাযথ কর্তৃপক্ষই কায়েম করতে পারে। ইসলামী রাষ্ট্র ছাড়া অন্য কাউকেও যিনাকারী নারী-পুরুষের বিরুদ্ধে কোনোরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করার এবং শাস্তি দেয়ার অধিকার দেয়া হয়নি। আলোচ্য আয়াতে فَاجْلِدُوْا (কোড়া মার) বলে যে হুকুম দেয়া হয়েছে, তা জনসাধারণকে দেয়া হয়নি—দেয়া হয়েছে ইসলামী রাষ্ট্রের শাসক ও বিচারকমণ্ডলীকে। এ ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহর সকল ফকীহই সম্পূর্ণ একমত। ইসলামী আইন যিনার শাস্তিকে রাষ্ট্রীয় আইনের একটি অংশ বলে ঘোষণা করেছে। এ কারণে রাষ্ট্রের প্রজাসাধারণের উপরই এ আইন জারি হবে—সে মুসলিম হোক অথবা অমুসলিম।-তাফহীমুল কুরআন

ইসলামী রাষ্ট্র কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে শাস্তির বিধান তখনই কার্যকর করতে উদ্যোগী হবে যখন অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধের প্রমাণ পাওয়া যাবে। অপরাধের খবর শাসকবৃন্দের গোচরিভূত হলেও প্রমাণ পাওয়া না গেলে শাসকদের শাস্তি বিধানের অধিকার থাকবে না। মদীনায় এক মহিলা সম্পর্কে লোকদের জানা ছিল যে, সে চরিত্রহীনা ব্যভিচারিণী। ইবনে মাজায় উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

فَقَدْ ظَهَرَ مِنْهَا الرِيبَةُ فِي مَنْطِقِهَا وَهَيْئَتِهَا وَمَنْ يَّدْخُلُ عَلَيْهَا -

"মেয়েলোকটির কথায় ও ছুরত-শেকেল থেকে এবং তার কাছে যাতায়াতকারী লোকদের থেকে সন্দেহ জেগে উঠেছিল।"

কিন্তু এতদসত্ত্বেও তার বিরুদ্ধে যিনার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি বলে তাকে কোনো শাস্তি দেয়া হয়নি। অথচ ঐ মহিলা সম্পর্কে নবী করীম স.-এর মুখে এমন কথাও উচ্চারিত হয়েছিল যে,

لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا اَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُهَا -

"অকাট্য প্রমাণ ছাড়াই যদি আমি কাউকেও রজমের শাস্তি দেয়ার নীতি গ্রহণ করতাম, তাহলে এ মহিলাটিকে অবশ্যই রজমের শাস্তি দিতাম।"

যিনার অপরাধের প্রথম সম্ভাব্য প্রমাণ হলো সাক্ষী পাওয়া। এ সম্পর্কে কুরআনের সুস্পষ্ট ঘোষণা হলো যিনা প্রমাণের জন্য অন্তত চারজন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী পাওয়া জরুরী। আবার সাক্ষীও হতে হবে এমন লোক যারা ইসলামের সাক্ষ আইনের দৃষ্টিতে বিশ্বাসযোগ্য। যেমন পূর্বে কোনো মোকদ্দমায় সে যেন মিথ্যা সাক্ষদাতা প্রতিপন্ন না হয়ে থাকে। বিশ্বাসঘাতক, খিয়ানতকারী বা কোনো প্রকার দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি না হয়। তাছাড়া সাক্ষীগণ অভিযুক্ত নারী-পুরুষকে যৌনসংগম কাজে লিপ্ত অবস্থায় দেখাও শর্ত হিসেবে গণ্য। সাক্ষীগণ কবে, কোথায়, কার সাথে, কে যিনা করেছে— ইত্যাদি বিষয়ে সম্পূর্ণ একই ধরনের সাক্ষ দিতে হবে। মৌলিক বিষয়ে মতপার্থক্য থাকলে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।–তাফহীমুল কুরআন

যিনার অপরাধের দ্বিতীয় প্রমাণ হলো যিনাকারীর নিজের স্বীকারোক্তি। এ পর্যায়ে যিনার স্বীকারোক্তি হতে হবে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ও সুস্পষ্ট কথা দিয়ে। তাকে স্বীকার করতে হবে যে, সে একটা মহিলার সাথে যৌনসংগম করেছে। [এতদসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় বিস্তারিত জানতে হলে তাফহীমুল কুরআন সূরা আন নিসা ও সূরা আন নূর এর সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহের তাফসীর দেখা যেতে পারে।]

আলোচ্য আয়াতের মধ্যাংশে বলা হয়েছে وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ –"আল্লাহর দীনের ব্যাপারে যেন তাদের উভয়ের প্রতি তোমাদের মনে দয়ার উদ্রেক না হয়।" এখানে সর্বপ্রথম যে কথাটির প্রতি লক্ষ করা উচিত, তাহলো ইসলামের দণ্ডবিধি বা ফৌজদারী আইনকে 'আল্লাহর দীন' বলা হয়েছে। এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, কেবল নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাতই দীন নয় বরং রাষ্ট্রীয় আইনও দীনের অন্তর্ভুক্ত জিনিস। দীন কায়েম করা বলতে কেবল নামায কায়েম করাই বুঝায় না, বরং আল্লাহর আইন এবং শরীয়তী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করাও বুঝায়। যেখানে এটা কায়েম নেই সেখানে যদি নামায কায়েম করাও হয়, তবে দীনের কিছু অংশ কায়েম রয়েছে বলে বুঝতে হবে। যেখানে ইসলামের আইন বাদ দিয়ে অন্য কোনো আইন গ্রহণ করা হবে সেখানে তো স্বয়ং আল্লাহরই আইন বাদ দেয়া হলো।

এখানে দ্বিতীয় লক্ষণীয় কথা হলো, আল্লাহ তাআলা সাবধান করে দিচ্ছেন যে, যিনাকার নারী-পুরুষের উপর আল্লাহর আইন কার্যকর করার ব্যাপারে অপরাধীর প্রতি দয়া-দরদ যেন তোমাদের হাতকে নিরস্ত করতে না পারে। শাস্তির পরিমাণকে যদি দয়া বা বিশেষ বিবেচনায় কম বা বেশী

করা হয় তবে তা হবে বান্দার প্রতি আল্লাহর চেয়ে অধিক দয়া-দরদ দেখানো বা আল্লাহর চেয়েও সূক্ষ্ম বিচার প্রদর্শনের শামিল। কিন্তু অপরাধীদের বৈষয়িক মান-মর্যাদার ভিত্তিতে যদি আল্লাহর আইনে রদ-বদল বা কমবেশী করা হয়, তবে তা হবে অধিকতর কঠিন অপরাধ। বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম স. এক ভাষণে বলেছিলেন, "হে লোকেরা ! তোমাদের পূর্বের লোকেরা এজন্যে ধ্বংস হয়েছে যে, যদি তাদের মধ্যে কোনো সম্মানী ব্যক্তি চুরি করতো তবে তাকে তারা ছেড়ে দিতো। আর যদি কোনো দুর্বল ব্যক্তি চুরি করতো, তবে তার উপর শরীয়তের শাস্তি জারি করা হতো।"

এখানে একথাও ব্যক্ত করা হয়েছে যে, শাস্তি তাই দিতে হবে, যা আল্লাহ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তা বাদ দিয়ে অন্য কোনো শাস্তি দেয়া যাবে না। অর্থাৎ কোড়ার পরিবর্তে অন্য কোনো শাস্তি দিলে তা হবে আল্লাহর সুস্পষ্ট নাফরমানী—আল্লাহর বিধানের প্রকাশ্য বিরোধীতা। আর যদি কোড়া মারার শাস্তিকে বর্বরতা মনে করে তা বাদ দেয়া হয়, তবে এটা হবে পরিষ্কার কুফরী। কেউ এমনটি মনে করলে তার দিলে একবিন্দু ঈমান বর্তমান থাকতে পারে না। ঈমান ও কুফর এক দিলে কখনো একত্রিত হতে পারে না। আল্লাহকে ইলাহ বলে মানা হবে আর তাঁর হুকুমকে 'বর্বরতা' বলা হবে—এটা কেবল নিকৃষ্টতম মুনাফিকের পক্ষেই সম্ভব ; একজন ঈমানদার তা কখনো করতে পারে না।

আলোচ্য আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ –"আর এদের উভয়ের শাস্তির সময় যেন মুমিনদের একটি দল উপস্থিত থাকে।"

অর্থাৎ এদের শাস্তি দিতে হবে প্রকাশ্যে জনসাধারণের সামনে ; যেন এতে করে একদিকে অপরাধী লজ্জিত হয়, অন্যদিকে জনগণ এ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে। ফলে সামাজিক অপরাধ প্রবণতা হ্রাস পেয়ে সমাজে শান্তি-শৃংখলা ও নৈতিক স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হতে পারে। প্রসংগত উল্লেখ্য, চুরির শাস্তি সম্পর্কে সূরা আল মায়েদার ষষ্ঠ রুকূতে বলা হয়েছে ঃ جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّٰهِ "–তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল আল্লাহর তরফ থেকে অপরাধ দমনের শাস্তি।" আর এখানে বলা হয়েছে যিনার শাস্তি দিতে হবে জনগণের সামনে। এসব আয়াত থেকে স্পষ্ট জানা গেল যে, ইসলামী আইনে অপরাধীকে শাস্তিদানের পেছনে একই সংগে তিনটি উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে। এক. অপরাধীকে তার অপরাধের কারণে শাস্তি

দিতে হবে। কোনো ব্যক্তি বা সমাজের সাথের তার কৃত অন্যায় ও অপরাধের শাস্তির স্বাদ আস্বাদনে তাকে বাধ্য করতে হবে। দুই. সে যেন পুনরায় এ অপরাধ করতে না পারে তার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তাকে অপরাধ করা থেকে বিরত রাখতে হবে। তিন. তাকে দেয়া শাস্তিকে অন্যান্য লোকদের জন্য একটি বিশেষ উপদেশ ও শিক্ষাপ্রদ বানাতে হবে। এতে করে সমাজের অন্যান্য সদস্যগণের মন-মগজ থেকে অপরাধ প্রবণতাকে ধুয়ে মুছে ফেলতে হবে। যেন তাদের মগজ এমনভাবে ধোলাই হয়ে যায় যে, সমাজের কেউ যেন এমনটি করতে আর কখনো সাহস না করে। তাছাড়া প্রকাশ্য শাস্তিদানের আরেকটি ভাল দিক হলো, এতে করে শাসক-বিচারকগণ কাউকে শাস্তি প্রদানে অকারণ সুবিধাদান কিংবা অপ্রয়োজনীয় কঠোরতা করার সাহসী হতে না পারে।-তাফহীমুল কুরআন

আজকের বিশ্ব সমাজের জন্য ঐতিহাসিক শিক্ষা হলো আল্লাহর সৃষ্টি —শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ইনসানের ব্যক্তিগত ও সামাজিক শান্তি ও কল্যাণের জন্য একমাত্র তাঁরই দেয়া বিধানের প্রয়োগ অত্যাবশ্যক। আল্লাহর আইন বাস্তবায়নের বিকল্প কোনো ব্যবস্থাই মানবজাতির জন্য অনুকূল ফলদায়ক হতে পারে না। বরং সমাজের যে কোনো সমস্যার সমাধানে কেবল মানব মস্তিষ্কপ্রসূত ব্যবস্থার উপর নির্ভর করার ফলে সমাধানের পরিবর্তে দেখা দেয় আরো অসংখ্য সমস্যা—সৃষ্টি হয় বহুমুখী সামাজিক ব্যাধির, যেগুলো ক্রমাগত সংক্রামক ব্যাধিরূপে বিস্তারলাভ করতে থাকে অপ্রতিরোধ্য গতিতে।

❐

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا ج وَاُولٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ○ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا ج فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

"যারা পবিত্র চরিত্রের নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, অতপর স্বপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারে ; তাদেরকে আশিটি কোড়া মারবে, আর কখনো তাদের সাক্ষ কবুল করবে না। ওরা নিজেরাই তো ফাসেক। অবশ্য এরপর যারা তাওবা করে আর নিজেদের সংশোধন করে নেয়, তবে আল্লাহ তো অতিশয় ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।"–সূরা আন নূর ঃ ৪-৫

সতী নারীর প্রতি অপবাদ শাস্তিযোগ্য অপরাধ —সেই অপরাধীর সাক্ষ কখনো গ্রহণযোগ্য নয়

পূর্বোক্ত আয়াতে যিনার কদর্যতা, খারাবী ও শাস্তির বিধান বলা হয়েছে। অতপর আলোচ্য আয়াতে কাউকে যিনার ব্যাপারে মিথ্যা দোষারোপ করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করার এবং কেউ এমনটি করে থাকলে তারও শাস্তির বিধান থাকা আবশ্যক বলে সেই শাস্তির কথা আলোচনা করা হয়েছে। এ বিধানের তাৎপর্য হলো সমাজে লোকদের প্রণয়-প্রেম কাহিনী এবং পরস্পর অবৈধ সম্পর্কের গল্প-কাহিনীর চর্চা ও আলোচনাকে চিরতরে বন্ধ করে দেয়া। কারণ এ কাজে সমাজে কত যে অশান্তি ঘটে তার ইয়ত্তা নেই। এ ধরনের অনাকাংখিত চর্চা ও আলোচনার বড় খারাবী এই যে, এর ফলে অজ্ঞাতসারে ও অননুভূতভাবে একটা সাধারণ ব্যভিচারপূর্ণ পরিবেশ গড়ে উঠে। এক ব্যক্তি মজা করে আরেকজনের নামে সত্য-মিথ্যা ঘটনা বিভিন্ন লোকের কাছে রটনা করে বেড়ায়। দ্বিতীয়জন তাতে আরও কিছু লবণ-মরিচ যোগ করে তৃতীয় কারো কাছে পৌছে দেয়। এভাবে পাশবিক ভাবধারায় একটা প্রবাহ যে চলতে থাকে কেবল তাই নয়, বরং খারাপ ঝোঁকপ্রবণতার লোকেরা পুরুষ হোক বা স্ত্রী—জানতে পারে কোথায় কোথায় তাদের ভাগ্য পরীক্ষার সুযোগ রয়েছে। ইসলামী শরীয়ত প্রথম কদমেই এ খারাপ ভাবধারা বন্ধ করে দিতে চায়। এজন্যে ইসলাম একদিকে হুকুম দেয়, কেউ যিনা করলে

এবং সাক্ষ-প্রমাণে তা প্রমাণিত হলে এমন চরম শাস্তি দিতে হবে যা অন্য কোনো অপরাধেই দেয়া হয় না। আর তা হচ্ছে অবিবাহিত হলে একশত বেত্রাঘাত আর বিবাহিত হলে পাথর নিক্ষেপের শাস্তি। অপরদিকে কেউ যদি অন্যের উপর যিনার তোহমত দেয়, তাহলে সে হয় সাক্ষ-প্রমাণে তা সপ্রমাণ করবে, আর তা না পারলে তাকে মিথ্যা দোষারোপ করার শাস্তি পেতে হবে। আর সে শাস্তি হলো ৮০টি বেত্রাঘাত। যেন কেউ কারো নামে অযথা মিথ্যা দোষারোপ করতে না পারে।–তাফহীমুল কুরআন

আয়াতে يَرْمُوْنَ শব্দের মূল হলো رَمْىٌ অর্থ নিক্ষেপ করা। এখানে সতী-সাধ্বী নারীদের উপর মিথ্যা যিনার অপবাদ দেয়াকে তাদের পাথর নিক্ষেপের রূপক অর্থে নেয়া হয়েছে। যেন অপবাদকারী একজন সৎ ব্যক্তিকে পাথর নিক্ষেপ করেছে, আর শরীয়তে এটাকেই قذف (কযফ) বলে। এ আয়াতে পরিষ্কার নির্দেশ হলো যে কেউ কোনো সতী নারীর উপর যিনার তোহমত আরোপ করে অথচ সেজন্যে চারজন সাক্ষী আনতে না পারে ; তাহলে তাকে আশিটি বেত্রাঘাত করবে। আর কখনো তার সাক্ষ কবুল করা যাবে না, সে তো ফাসেক। অবশ্য সে যদি সত্যিকার তাওবা করে গুনাহর পথ ছেড়ে নেকের পথে চলে তবে তা স্বতন্ত্র কথা। আল্লাহ তো অধিক ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।–সূরা আন নূর ঃ ৪-৫

আয়াতে যদিও يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ চরিত্রবতী সতী-সাধ্বী নারীদের সম্পর্কে মিথ্যা দোষারোপ করার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু ফিকাহবিদগণ এ সম্পর্কে একমত যে, এখানে কেবল স্ত্রী লোকদের উপর মিথ্যা দোষারোপ করার কথাই বলা হয়নি, বরং চরিত্রবান পুরুষদের উপর মিথ্যা দোষারোপ করলেও এ বিধানই কার্যকর হবে। অনুরূপভাবে "দোষারোপকারী" বলতে কেবল পুরুষদেরকেই বুঝানো হয়নি, বরং স্ত্রীলোকেরাও যদি 'কযফ' মিথ্যা অপবাদের অপরাধ করে, তবে তাদের সম্পর্কে একই বিধান কার্যকর হবে। কারণ আয়াতে اَلَّذِيْنَ শব্দটি পুঃলিংগের হলেও যদি কোনো স্ত্রীলোক এমন অপরাধ করে বসে, তবে সে এ বিধানের ব্যতিক্রম হওয়ার কোনোই কারণ থাকতে পারে না। সুতরাং উক্ত শব্দটি স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের বেলাই عَلٰى سَبِيْلِ التَّغْلِيْبِ সাধারণভাবেই প্রযোজ্য হবে।

আলোচ্য আয়াতে 'কযফ' ও সাক্ষের বিধান বর্ণিত হয়েছে। তাহলো কেউ যদি সতী-সাধ্বী স্বাধীন স্ত্রীলোকের উপর যিনার অপরাধ আরোপ করে, তবে তাকে অবশ্যই এ অপরাধের চারজন প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ পেশ করতে হবে। যদি সে এরূপ নির্ভরযোগ্য চারজন সাক্ষী পেশ করতে না

পারে, তবে তাকে আশিটি কোড়া মারবে এবং তাকে চিরদিনের জন্য সাক্ষদানের আযোগ্য ঘোষণা করবে। এখানে উল্লেখ্য যে, কাউকে ইসলামী সমাজে চিরজীবনের জন্য সাক্ষদানের অযোগ্য ঘোষণা করা চাট্টিখানী কথা নয়। বরং সমাজে এটা হবে তার সুনাম চিরতরে খতম হয়ে যাওয়ারই নামান্তর।–তাদাব্বুরে কুরআন

যিনার অপবাদের উল্লিখিত এ শাস্তি শুধু অপবাদের জন্যই নির্দিষ্ট। অন্য কোনো অপবাদের বেলায় এ শাস্তি প্রযোজ্য হবে না। অবশ্য বিচারকের বিবেচনা অনুযায়ী প্রত্যেক অপরাধের অপবাদের জন্য দণ্ডমূলক শাস্তি দেয়া যেতে পারে। আল কুরআনে যদিও এ হদ কেবল যিনার অপবাদের শাস্তির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকার কথা উল্লেখ নেই, কিন্তু চারজন পুরুষের সাক্ষ্যের উপস্থিতির আবশ্যকতা সেই সীমাবদ্ধতাই প্রমাণ করে।–জাস্‌সাস সূত্রে মাআরেফুল কুরআন

'কযফ' বা যিনার অপবাদ শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হওয়ার জন্য কিছু জরুরী শর্ত রয়েছে। এসব শর্ত পাওয়া না গেলে কযফের হদ বা শাস্তির বিধান জারি করা যাবে না। এ অপবাদ শাস্তিযোগ্য হওয়ার শর্তাবলীকে ৩টি ভাগে শ্রেণী বিভাগ করা যায় ঃ প্রথমত, এমন শর্তাবলী যেগুলো অপবাদকারীর মধ্যে পাওয়া আবশ্যক। দ্বিতীয়ত, এমন শর্তাবলী যেগুলো যার বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করা হয় তার মধ্যে পাওয়া যেতে হবে। তৃতীয়ত, এমন কতিপয় শর্তও থাকতে হবে যেগুলো 'কযফ'–এর মধ্যে পাওয়া যাবে।

১. অপবাদকারীর মধ্যে যেসব শর্ত পাওয়া আবশ্যক সেগুলো হলো ঃ এক. তাকে বালেগ (প্রাপ্তবয়স্ক) হতে হবে। নাবালেগ এ অপরাধ করলে তার জন্য এ (হদ) শাস্তি প্রযোজ্য নয়। অবশ্য তাকে এ অপরাধের জন্য অন্য কোনো শাস্তি দেয়া যেতে পারে। দুই. তাকে সুস্থ বিবেকবান হতে হবে। কোনো পাগল বা নেশাগ্রস্তকে এ ধরনের শাস্তি দেয়া যাবে না। তিন. এ কাজ তাকে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে করতে হবে। কারো ফুসলানীতে বা জবরদস্তি কযফ করলে তার উপর এ হদ জারি করা যাবে না। চার. অপবাদকারী যার যিনার অপবাদ আরোপ করা হয়েছে তার পিতা কিংবা দাদা হলে 'কযফ' এর শাস্তি জারি করা যেতে পারে না। পাঁচ. অপবাদকারী বাকশক্তিসম্পন্ন হতে হবে। বোবা ব্যক্তি ইশারা-ইংগিতে অপবাদ করলে তাকে এ হদ (কযফের শাস্তি) দেয়া যাবে না। এটা হানাফী মাযহাবের হুকুম। কিন্তু ইমাম শাফেঈ ভিন্ন মত পোষণ করেন।

২. যার বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়া হয় তার মধ্যে নিম্নোক্ত শর্তগুলো পাওয়া যেতে হবে ঃ এক. তাকে সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন হতে হবে। অর্থাৎ সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি থাকা অবস্থায় যিনা করেছে বলে প্রমাণিত হতে হবে। কোনো পাগলের উপর এ অপবাদ দেয়া হলে তাকে 'কযফ' এর শাস্তি দেয়া যাবে না। কিন্তু ইমাম মালেক প্রমুখ ভিন্নমত পোষণ করেন। দুই. তাকে বালেগ পূর্ণ বয়স্ক হতে হবে। অর্থাৎ বালেগ অবস্থায় যিনা করেছে বলে দোষারোপ হতে হবে। কোনো নাবালেগ বালকের উপর এমন দোষারোপ করা হলে তাকে হদ (কযফের শাস্তি) দেয়া যাবে না। তিন. তাকে মুসলিম হতে হবে। অর্থাৎ মুসলিম অবস্থায় যিনা করার অপবাদ হতে হবে। কাফের বা কোনো মুসলিমের কাফের থাকা অবস্থায় যিনা করার অপবাদ আরোপ করলেও তার উপর এ হদ জারি করা যাবে না। চার. তাকে স্বাধীন হতে হবে। কোনো দাস-দাসীর উপর অথবা স্বাধীন ব্যক্তি স্বাধীন হওয়ার পূর্বে দাস-দাসী থাকা অবস্থায় যিনা করার অপবাদ দিলে এ শাস্তি কার্যকর করা যাবে না। পাঁচ. তাকে যিনা বা যিনার মত কোনো কাজের সন্দেহ হতে মুক্ত হতে হবে। অর্থাৎ পূর্বে কখনই তার যিনার অপরাধ প্রমাণিত হয়নি —এমন হতে হবে। আর যিনার মত কাজ থেকে পবিত্র হওয়ার মানে, সে কোনো বাতিল বিবাহ, গোপন বিবাহ বা প্রায় বিবাহে যৌন সংগম করেছে বলে প্রমাণিত হয়নি।

৩. 'কযফ' সম্পর্কে নিম্নোক্ত শর্তগুলো পাওয়া যাওয়া আবশ্যক ঃ এক. অভিযোগটি সুস্পষ্ট হতে হবে। ইশারা-ইংগিত কোনো হিসাবের মধ্যে ধরা হবে না। যেমন কাউকে ফাসিক, ফাজের, চরিত্রহীন, দুরাচারী ইত্যাদি বলা বা কোনো স্ত্রীলোককে বেশ্যা, দেহব্যবসায়ী, ছিনাল বলা। তেমনিভাবে গালাগালের শব্দে যেমন, হারামী, হারামযাদা ইত্যাদি বলাকে সুস্পষ্ট যিনার তোহমত বলা যায় না।-বিস্তারিত জানার জন্য তাফহীমুল কুরআন দেখুন।

আলোচ্য আয়াতে একটি ইসলামী সমাজের সুস্থতা, শান্তি ও শৃংখলা বিধানের ব্যবস্থা বর্ণিত হয়েছে। কোনো ছিদ্রান্বেষী দুশ্চরিত্র ব্যক্তি যেন সমাজে অকারণে ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করতে না পারে এখানে সে পথ চিরতরে বন্ধ করে দেয়ার বিধান জারী করা হয়েছে। এজন্যে কারও বিরুদ্ধে যিনা-ব্যভিচারের দোষ আরোপ করতে হলে অন্তত চারজন স্বচক্ষে দেখা লোকের সাক্ষ পেশ করতে হবে। অবস্থা এমন যে, কেউ যদি একাকী কাউকে যিনারত অবস্থায় নিজ চক্ষেও দেখে তবুঁও আরও তিনজন ব্যক্তির চাক্ষুষ প্রমাণ ছাড়া সে ব্যক্তি একা ঘটনাটি কারো কাছে প্রকাশ করার পথ নেই। সে যেন দেখেও চুপ থাকে। যেন যেখানের ময়লা সেখানেই থেকে যায়—

বাইরে যেন ছড়িয়ে গিয়ে গোটা সমাজকে দুর্গন্ধময় করে না ছাড়ে। অবশ্য সাক্ষীর যোগাড় করতে পারলে সমাজে এহেন খারাপ চর্চার দ্বার রুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে ব্যাপারটি যথার্থ কর্তৃপক্ষের গোচরিভূত করা উচিত এবং আদালতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অপরাধ প্রমাণ করে তাদের শাস্তি দেয়া কর্তব্য।

সমাজের যেসব কুলাংগার নিজেদের স্বার্থে, কোনো কুমতলব চরিতার্থ করার মানসে অথবা কাউকে অযথা বদনাম করার অসদোদ্দেশ্যে নির্বিকার চিত্তে কোনো ভদ্র মহিলার দুর্নাম রটিয়ে ঘুরে বেড়াতে চায়, তাদের যন্ত্রণা থেকে সাধারণভাবে মানুষের পেরেশানী ঘুচানোর জন্যে উপরোক্ত বিধান। মেহেরবান আল্লাহ মানুষের শান্তি ও কল্যাণের সুদূর প্রসারী লক্ষে দায়িত্ব বিবর্জিত কুৎসা-রটনাকারীদের জন্য এ কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা দিয়েছেন, যেন জেনেবুঝে কেউ এমন কঠিন পথে পা না বাড়ায়, সখের বশবর্তী হয়ে যেন কেউ কারো বদনাম করার দুঃসাহস না করে। যদি কারো নজরে সত্যিকারভাবে হঠাৎ করে কিছু পড়েও যায় এবং সেখানে আর কোনো বেশী মানুষ না থাকে, তবে সেখান থেকে শাস্তির ভয়ে দ্রুতগতিতে পালিয়ে যায় এবং সেকথা প্রকাশ করা থেকে নিজের জিহ্বাকে সামলে নেয়, যেহেতু তার একার দেখা ঘটনা প্রমাণের জন্য মোটেই যথেষ্ট নয়, বরং সে অপরাধে লিপ্ত ব্যক্তিদেরকে দুর্ঘটনায় পতিত মনে করে সময়স্তরে তাদেরকে তাওবা করার সৎ পরামর্শ দেয় এবং জীবনভর যেন একথা কারো কাছে প্রকাশ না করে। তাহলে নবী স.-এর ভাষায় আল্লাহ তাআলাও তার অনেক অপরাধ ঢেকে দেবেন। এসব ব্যবস্থা এজন্যে যে অপরাধজনক এসব অবস্থাও আচরণ দুর্গন্ধময় মলমূত্রের ন্যায়, এগুলো নাড়াচাড়া করলে এর থেকে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে সমাজ কলুষিত হয়, মানুষ কষ্ট পায় আর মানুষের মধ্যে এর বিষাক্ত ক্রিয়া ছড়িয়ে সমাজ দেহের ক্ষতি হতে থাকে। এতে করে যারা এ কাজকে ঘৃণা করতো তাদের মধ্যেও এর উস্কানী দেখা দেবে, শরীফ ঘরের মেয়েদের মানসম্ভ্রম ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং এর কুপ্রভাবে অনেকে প্রভাবিত হয়ে পড়ার আশংকাও দেখা দেবে।–ফী যিলালিল কুরআন

❐

তের

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَآءُ اِلاَّ اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهٰدٰتٍ بِاللّٰهِ ۙ اِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ○ وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ○ وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهٰدٰتٍ بِاللّٰهِ ۙ اِنَّهٗ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ○ وَالْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَآ اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ○ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ وَاَنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ حَكِيْمٌ ○

"যারা নিজেদের স্ত্রী সম্পর্কে ব্যভিচারের অভিযোগ উত্থাপন করে, অথচ নিজেরা ছাড়া তাদের কাছে (এ অপবাদের পক্ষে) কোনো সাক্ষী না থাকে ; তাদের প্রত্যেকের সাক্ষ এই হবে যে, সে চারবার আল্লাহর নামে কসম করে বলবে যে, সে অবশ্যই (তার আনীত অভিযোগে) সত্যবাদী। আর পঞ্চমবারে বলবে যে, সে মিথ্যাবাদী হলে তার উপর আল্লাহর লানত পড়ুক। পক্ষান্তরে, স্ত্রীর শাস্তি রহিত হবে—যদি সেও চারবার আল্লাহর নামে কসম করে বলে যে সে (পুরুষটি তার অভিযোগের ব্যাপারে) মিথ্যাবাদী। তারপর (সেও) পঞ্চমবারে বলবে সে (স্বামী) সত্যবাদী হলে তার নিজের উপর আল্লাহর গযব নেমে আসুক। আর যদি তোমাদের উপর (হে মুমিনগণ) আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকতো (তাহলে স্ত্রীদের উপর অভিযোগের বিষয়ে তোমরা বড় জটিলতার সম্মুখীন হতে) বস্তুত আল্লাহ তো তাওবা কবুলকারী, প্রজ্ঞাময়।"

—সূরা আন নূর ঃ ৬-১০

নিজের স্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেও সাক্ষ-প্রমাণ দিতে হবে

আলোচ্য আয়াতে কারীমা পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের অব্যবহিত পরে নাযিল হয়েছে। পূর্বে সতী-সাধ্বী নারীকে অপবাদ দেয়ার বিধান আলোচনা হয়েছে। 'কযফ' বা অপবাদ সংক্রান্ত আয়াত এবং এর শাস্তি সংক্রান্ত বিধান আলোচনা হলে লোকদের মনে প্রশ্ন জাগে যে ভিন্ন নারী-পুরুষের

অসৎকাজ দেখে ৪জন সাক্ষী না পেলে তো মানুষ সবর করতে পারে, মুখ বন্ধ রেখে ঘটনাটি এড়িয়ে যেতে পারে ; কিন্তু কেউ যদি নিজ স্ত্রীর দুষ্কৃতি স্বচক্ষে দেখতে পায়, তখন সে কি করবে ? তাকে হত্যা করলে উল্টো তার শাস্তি পেতে হবে। সাক্ষী খোঁজ করতে গেলে তো অপরাধীরা এতক্ষণ বসে থাকবে না—তাদের কাজ সেরে কোথায় পালিয়ে যাবে। আর নিজের স্ত্রীর ব্যাপারে এমনটি হলে কি সবর করা যায় ? স্ত্রীকে হয়ত তালাক দিয়ে দেয়া যায়, কিন্তু এতে তো তার যেমন কোনো শাস্তি হলো না তেমনি তার প্রেমাস্পদও রেহাই পেয়ে গেল। তদুপরি স্ত্রীর অবৈধ সন্তান হলে পরের সন্তান লালন-পালনের দায়-দায়িত্বও বহন করতে হবে। প্রথমদিকে হযরত সাআদ ইবনে উবাদাহ রা. এরূপ একটি কল্পিত প্রশ্ন উত্থাপন করলেন। তিনি এমনভাবে বললেন, "আল্লাহ্ না করুন, আমি যদি এরূপ ঘটনা আমার ঘরে হতে দেখি ; তাহলে কি সাক্ষী তালাশ করতে যাব, না তলোয়ার দিয়ে তৎক্ষণাৎ কাজ সমাধা করে দেব।" কয়েক দিনের মধ্যেই রাসূলের দরবারে এ ধরনের বাস্তব ঘটনা পেশ হতে শুরু করে। স্বামী-স্বচক্ষে এরূপ ঘটনা দেখে নবী করীম স.-এর দরবারে পেশ করতে থাকে।–তাফহীমুল কুরআন

হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, যখন কুরআনে যিনার অপবাদের শাস্তি (হদ) সম্পর্কিত আয়াত وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً আয়াত অবতীর্ণ হলো, তখন মুসলমানদের মধ্যে কিছুটা চাঞ্চল্য দেখা দিল। কারণ, এতে নারীর প্রতি যিনার অপবাদ আরোপকারী পুরুষকে স্বচক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে হবে। যাদের একজন হবে সে নিজে। অন্যথা অপবাদকারীকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হয়ে আশিটি বেত্রাঘাত পেতে হবে এবং তার সাক্ষ চিরতরে প্রত্যাখ্যাত হবে। এ আয়াতগুলো শুনে আনসারদের সরদার হযরত সাদ ইবনে উবাদা রা. রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আয়াতগুলো কি ঠিক এভাবেই নাযিল হয়েছে ? রসূলুল্লাহ স. সাদ ইবনে উবাদা রা.-এর মুখে একথা শুনে বিস্মিত হলেন। তিনি আনসারদের লক্ষ করে বললেন, তোমরা কি শুনেছ তোমাদের সরদার কি কথা বলেছেন ? আনসারগণ- বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তাঁকে তিরস্কার করবেন না, তিনি তো নিজের তীব্র আত্মমর্যাবোধ থাকার কারণে একথা বলেছেন। অতপর হযরত সাদ ইবনে উবাদা নিজেই আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি কুরবান হোক, আমার পুরো বিশ্বাস রয়েছে যে, আয়াতগুলো সত্য এবং আল্লাহর পক্ষ থেকেই নাযিল হয়েছে। কিন্তু আমার আশ্চর্য লাগে, যদি আমি লজ্জাহীনা স্ত্রীকে এমতাবস্থায়

দেখি যে তার উপর ভিন্ন পুরুষ সওয়ার হয়ে আছে, তখন কি আমার জন্য বৈধ হবে না যে, আমি সেজন্যে তাকে শাসিয়ে দেই এবং সেখান থেকে ভাগিয়ে দেই ; না আমার জন্য এটা জরুরী যে আমি চারজন লোক ডেকে এনে অবস্থা দেখাই তাদের সাক্ষী বানাই ? যতক্ষণ আমি সাক্ষী ডাকতে যাব ততক্ষণে কি তারা উদ্দেশ্য সাধন করে পলায়ন করবে না ?–কুরতুবী থেকে মাআরেফুল কুরআন

কযফের আয়াত নাযিল হওয়ার পর এবং হযরত সাদ ইবনে উবাদার অল্প কিছুদিন পরেই একটি ঘটনা সংঘটিত হয়। হিলাল ইবনে উমাইয়া এশার সময় ক্ষেত থেকে ফিরে এসে স্ত্রীর সাথে একজন পুরুষকে স্বচক্ষে দেখলেন এবং তাদের কথাবার্তা নিজ কানে শুনলেন। কিন্তু কিছুই বললেন না। সকালে তিনি ঘটনাটি রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে বর্ণনা করলে তিনি খুব দুঃখিত হলেন এবং ব্যাপারটি গুরুতর মনে করলেন। এদিকে আনসারগণ একত্রিত হয়ে বলতে লাগলেন, আমাদের সরদার সাদ যে কথা বলেছিলেন, এক্ষণে আমরা তাতেই লিপ্ত হয়ে পড়লাম। এখন তো শরীয়তের আইন অনুযায়ী রসূলুল্লাহ স. হিলাল ইবনে উমাইয়াকে আশিটি কোড়া মারবেন আর জনগণের মধ্যে চিরতরে তার সাক্ষ প্রত্যাখ্যাত হবে। কিন্তু হিলাল ইবনে উমাইয়া জোর দিয়ে বললেন, আল্লাহর কসম আমার পূর্ণ বিশ্বাস যে আল্লাহ তাআলা আমাকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন। বুখারীর রেওয়ায়াতে আরও বলা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ স. হিলালের ব্যাপার শুনে কুরআনের বিধান মোতাবেক তাকে বলেও দিলেন যে, হয় দাবীর স্বপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করো, না হয় অপবাদের শাস্তি স্বরূপ তোমার পিঠে আশিটি বেত্রাঘাত পড়বে। হিলাল উত্তরে আরয করলেন, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, তাঁর কসম, আমি আমার কথায় সত্যবাদী এবং আল্লাহ তাআলা অবশ্যই এমন কোনো বিধান নাযিল করবেন, যা আমার পিঠকে অপবাদের শাস্তি থেকে মুক্ত করে দেবে। এই কথাবার্তা চলছিল, এমতাবস্থায় জিবরাঈল আ. وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ আয়াত নিয়ে অবতীর্ণ হলেন।

আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর রসূলুল্লাহ স. হিলালকে সুসংবাদ দিলেন যে, আল্লাহ তাআলা তোমার সমস্যার সমাধান নাযিল করেছেন। হিলাল আরয করলেন, আমি আল্লাহ তাআলার কাছে এ আশাই পোষণ করেছিলাম। অতপর রসূলুল্লাহ স. হিলালের স্ত্রীকেও ডেকে আনলেন, স্বামী-স্ত্রীর উপস্থিতিতে স্ত্রীর জবানবন্দী নেয়া হলো। সে বললো, আমার স্বামী হিলাল আমার প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছেন। রসূলুল্লাহ স. বললেন,

তোমাদের মধ্যে একজন যে মিথ্যাবাদী তা আল্লাহ জানেন। প্রশ্ন হলো তোমাদের কেউ কি আল্লাহর আযাবের ভয়ে তাওবা করবে এবং সত্য কথা প্রকাশ করবে ? হিলাল আরয করলেন, আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি কুরবান, আমি সম্পূর্ণ সত্য কথা বলেছি। তখন রসূলুল্লাহ স. আয়াত অনুযায়ী উভয়কে 'লিআন' করানোর আদেশ দিলেন। [لعان (লিআন)-এর শাব্দিক অর্থ কারো প্রতি আল্লাহর গযব নেমে আসার বদদুআ করা। শরীয়তের পরিভাষায় স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে আলোচ্য আয়াতে (সূরা আন নূর ৬-১০) বর্ণিত বিশেষ কয়েকটি শপথের মাধ্যমে আল্লাহর গযব দেয়ার কসমকে 'লিআন' বলে।]

প্রথমে হিলালকে বলা হলো, তুমি কুরআনে বর্ণিত ভাষায় চারবার সাক্ষ দাও, অর্থাৎ আমি আল্লাহকে হাযির-নাযির বিশ্বাস করে বলছি যে, আমি সত্যবাদী। হিলাল আদেশ অনুযায়ী চারবার সাক্ষ দিলেন। পঞ্চম সাক্ষের কুরআনী ভাষা হলো যদি আমি মিথ্যা বলি, তবে আমার প্রতি আল্লাহর লানত বর্ষিত হবে। .এ সাক্ষের সময় রসূলুল্লাহ স. হিলালকে বললেন, দেখ হিলাল, আল্লাহকে ভয় করো। কেননা দুনিয়ার শাস্তি পরকালের শাস্তির তুলনায় অনেক হাল্কা। আল্লাহর আযাব মানুষের দেয়া শাস্তির চেয়ে অনেক কঠোর। এ পঞ্চম সাক্ষই শেষ সাক্ষ। এরই ভিত্তিতে ফায়সালা হবে। হিলাল আরয করলেন, আমি কসম খেয়ে বলতে পারি, আল্লাহ তাআলা আমাকে এ সাক্ষ্যের কারণে পরকালে আযাব দেবেন না। এরপর তিনি পঞ্চম সাক্ষের শব্দগুলোও উচ্চারণ করে দিলেন। অতপর হিলালের স্ত্রীর কাছ থেকেও এমনি ধরনের কসম সহ চার সাক্ষ নেয়া হলো। পঞ্চম সাক্ষের সময় রসূলুল্লাহ স. বললেন, একটু থাম, আল্লাহকে ভয় করো। এ সাক্ষই শেষ সাক্ষ। পরকালে আল্লাহর আযাব দুনিয়াতে মানুষের আযাবের চেয়ে অনেক কঠোর। একথা শুনে সে কসম খেতে ইতস্তত করতে লাগলো। এ অবস্থায় কিছুক্ষণ অতিবাহিত হলে অবশেষে সে বললো ঃ আল্লাহর কসম, আমি আমার গোত্রকে লাঞ্ছিত করবো না। অতপর সে পঞ্চমবার একথা বলে সাক্ষ দিল, আমার স্বামী সত্যবাদী হলে আমার উপর আল্লাহর গযব পড়বে। এভাবে লিআনের কার্যধারা সমাপ্ত হয়ে গেলে স্বামী-স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন—অর্থাৎ তাদের বিবাহ নাকচ করে দিলেন। তিনি আরও ফায়সালা দিলেন যে, এ গর্ভে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, সে এই স্ত্রীর সন্তান বলে গণ্য ও কথিত হবে—পিতার সাথে সম্বন্ধযুক্ত হবে না। অথচ সন্তানটিকে ধিকৃত করাও যাবে না।–তাফসীরে মাযহারী থেকে মাআরেফুল কুরআন

তাফহীমুল কুরআনে আরও কিছু কথা যোগ করা হয়েছে, তাহলো ঃ যে কেউ তার বা তার সন্তানের উপর দোষারোপ করবে তার উপর কযফের শাস্তি জারি হবে। ইদ্দতের সময়ের খরচ ও বাসস্থান হিলালের কাছ থেকে পাওয়ার আর কোনো অধিকার থাকবে না। কেননা সে তালাক কিংবা মৃত্যু ছাড়াই স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। তারপর নবী করীম স. লোকদের বললেন, এ স্ত্রীলোকটি সন্তান প্রসব করলে তোমরা লক্ষ রাখবে সে সুরাত-সেকেলে কার সাথে সামঞ্জস্য রাখে। হিলালের সাথে সামঞ্জস্য থাকলে তা হিলালের সন্তান বিবেচিত হবে। অন্যথা এটা ঐ ব্যক্তির সন্তান বলে গণ্য হবে যার সাথে স্ত্রীলোকটি হারামী করেছে বলে অভিযোগ এসেছে। সন্তান ভুমিষ্ঠ হলে দেখা গেল যে সন্তানটি শেষোক্ত ব্যক্তির সুরাত-সেকেলের হয়েছে। তখন নবী করীম স. বললেন ঃ

لَوْلاَ الْاَيْمَانَ (او لولا مضى مِن كتٰب اللّٰهِ لَكَان لى ولهاشان)

যদি কসম করা না হতো (অথবা আল্লাহর কিতাব আগেই ফায়সালা করে না দিতো) তাহলে আমি ওকে মারাত্মক পরিণতির সম্মুখীন করে ছাড়তাম।–তাফহীমুল কুরআন,

লিআন সংক্রান্ত আইন বিষয়ে ফকীহগণের বিস্তারিত মতামত জানার জন্য দেখুন 'তাফহীমুল কুরআন'।

❐

চৌদ্দ

اِنَّ الَّذِيْنَ جَآءُوْ بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ ط لَا تَحْسَبُوْهُ شَرًّا لَّكُمْ ط بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ط لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْاِثْمِ ج وَالَّذِىْ تَوَلّٰى كِبْرَهٗ مِنْهُمْ لَهٗ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ○

"যারা এ মিথ্যা অভিযোগ রচনা করেছে তারা তো তোমাদের মধ্যেরই কতিপয় লোক। এটাকে তোমরা নিজেদের জন্য ক্ষতিকর ভেবো না, বরং এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর ; ওদের প্রত্যেকের জন্য রয়েছে ওদের কৃত পাপের ফল। আর ওদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা নিয়েছে তার জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।"–সূরা আন নূর ঃ ১১

নিষ্কলুস সম্ভ্রান্ত নারীর বিরুদ্ধেও অপবাদ রটানো হয়

সূরা আন নূর-এর প্রথম থেকে যিনার অপরাধ, যিনার শাস্তি, যিনার মিথ্যা অপবাদকারীর শাস্তি এবং নিজ স্ত্রী বা স্বামীর বিরুদ্ধে অপবাদের মিমাংসা—ইত্যাদি বিষয়ে সুস্পষ্ট বিধান বর্ণিত হয়েছে। অপবাদের হদ (শাস্তি) প্রসংগে চারজন সাক্ষী হাজির করতে না পারলে কোনো সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করাকে মহাপাপ ঘোষণা করা হয়েছে। এরূপ অপবাদ আরোপকারীর শাস্তি আশিটি কোড়া নির্ধারণ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত যিনা ও এতদসংক্রান্ত অপবাদ ও মিথ্যা তোহমত দেয়ার বিষয়টি সম্পৃক্ত ছিল সাধারণ মুসলিম সতী নারীদের সাথে। কিন্তু উপরোক্ত ১১ আয়াতে আলোচ্য জঘন্য মিথ্যা অপবাদ রচনার বিষয়টিকে স্বয়ং রসূলের পবিত্র সহধর্মীনী সম্পর্কে রটানো হয়েছিল।

ষষ্ঠ হিজরীতে কতিপয় মুনাফিক উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রা.-এর প্রতি এমনি ধরনের অপবাদ রটনা করেছিল এবং তাদের অনুসরণ করে কয়েকজন মুসলিম ব্যক্তি সেই আলোচনায় জড়িয়ে পড়েছিল। মানুষ হিংসার বশবর্তী হয়ে কত জঘন্য কাজ করতে পারে এটা তারই একটা দৃষ্টান্ত।

আরবের মধ্যে আগত মানবকুল শিরোমণি শ্রেষ্ঠনবী ও দয়ামায়ার মূর্তপ্রতীক প্রাণ প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ স.-এর পরিবারের প্রতি নিছক কল্পনার ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে যে কলংক লেপন করা হয়েছিল, তার বিষাক্ত

ছোবল-বেদনায় তৎকালীন গোটা মুসলিম সমাজকে জর্জরিত করেছিল। এ কঠিন জঘন্য মিথ্যা বানোয়াট অপবাদের ঘটনাটি আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজেই ১১ থেকে ২৬ আয়াত সম্বলিত দীর্ঘ একটি অধ্যায় ব্যাপী বিবৃত করেছেন।

এসব আয়াতে যে ঘটনা বিবৃত হয়েছে তা ছিল একটা সম্পূর্ণ বানোয়াট রটনা মাত্র। এ ঘটনা মানব ইতিহাসের সবচেয়ে পবিত্র কিছু মানুষের জীবনকে কষ্টের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল, তাঁদের জীবনকে অসহনীয় বেদনায় ভরে দিয়েছিল যাতে তাঁদের অন্তর অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করছিল, গোটা মুসলিম উম্মাহকে এমন এক অব্যক্ত কষ্টের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল যার নজীর সুদীর্ঘ ইতিহাসের পাতায় আর কোথায়ও খুঁজে পাওয়া যায় না। এর ব্যথা দরদের নবী আল্লাহর প্রিয়তম হাবীবকে জর্জরিত করেছিল। তাঁর পরম প্রিয় পত্নী উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশার হৃদয়কে ভেংগে চুরমার করে দিয়েছিল। সিদ্দীকে আকবার ও তাঁর মমতাময়ী পত্নীর অন্তরকে পেরেশান করে দিয়েছিল। সরল-সহজ নিরপরাধ রসূলের পরম আস্থাভাজন মুয়াত্তাল ইবনে সফওয়ানের সম্ভ্রম ও ব্যক্তিত্বকে ধুলায় মিশিয়ে দিয়েছিল। তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা দুর্নাম ছড়িয়ে মানুষের মনে তাঁর সম্পর্কে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করা হয়েছিল।

নিদারুন সে ব্যথা-বেদনার করুণ কাহিনী আমরা মা আয়েশা রা.-এর যবানীতেই শুনবো—তিনি বলেন, রসূলে করীম স.-এর নিয়ম ছিল কোনো সফরে গেলে যে কোনো একজন স্ত্রীকে সাথে নিয়ে যেতেন। কাকে সাথে নিবেন সে বিষয়ে 'কারআ' বা লটারী দিয়ে যার নাম উঠতো তাকে সাথে নিতেন। পঞ্চম হিজরীতে সংঘটিত গাযওয়ায়ে বনী মুসতালিক-এ রওয়ানা হওয়ার সময় লটারীতে আমার নাম উঠলো। অতপর তাঁর সাথে আমি রওয়ানা হই। এ সময় হিজাব বা পর্দার আয়াত নাযিল হয়েছিল। আর আমাকে উটের পিঠে রক্ষিত হাওদাজে তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। এ হাওদাজে আমি নিজেই উঠানামা করতাম। এভাবেই আমরা এগিয়ে গেলাম। অবশেষে যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে রসূলুল্লাহ স. আমাদের নিয়ে মদীনার পথে রওয়ানা হলেন। পথে একস্থানে কাফেলা যাত্রা বিরতি করলো। আমরা তখন মদীনার নিকটে পৌঁছে গিয়েছিলাম। এমন সময় রাত্রিতে কাফেলাকে রওয়ানা হওয়ার ঘোষণা শুনানো হলো। যখন ঘোষণা হচ্ছিলো, তখন আমি প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাইরে গিয়েছিলাম। কাজ সেরে আসার সময় বুকে হাত দিয়ে দেখলাম আমার গলার হারটি নেই। বুঝলাম নখে লেগে হারটি ছিড়ে গেছে। হারটি খুঁজতে ফিরে গেলাম। খুঁজতে খুঁজতে বেশ কিছু দেরী

হয়ে গেল। ইতিমধ্যে কাফেলা রওয়ানা করার সময় হয়ে গেছে। আমার হাওদাটি উটের পিঠে উঠিয়ে দেয়ার দায়িত্বে যারা ছিল, তারা আমাকে ভিতরে মনে করে হাওদাটি উটের পিঠে তুলে দিল। আমি যে ভিতরে নেই তা তারা টেরও পায়নি। তখন আমার বয়স ছিল কম আর শরীর ছিল ক্ষীণ, হালকা-পাতলা। এভাবে তারা উটটিকে কাফেলার সাথে চালিয়ে দিল। আমি হারটি খুঁজে পেয়ে ফিরে এসে দেখি সবাই বেশ পথ চলে গেছে। এজন্যে যেখানে ছিলাম সেখানেই বসে পড়লাম। ভাবলাম, কিছুদূর গিয়ে তারা অবশ্যই আমার অনুপস্থিতি টের পেয়ে আমার খোঁজে ফিরে আসবে। আমি বসে থাকতে থাকতে প্রবল ঘুম পেলে ঘুমিয়ে পড়লাম। এ সময় সাফওয়ান ইবনে মুআত্তাল, যাকে পেছনে পড়ে থাকা কোনো কিছু কুড়িয়ে নেয়ার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। সে দূর থেকে এক ব্যক্তিকে ঘুমন্ত দেখে আমার কাছে এলো এবং আমাকে চিনতে পেল। কারণ সে হিজাবের আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে আমাকে দেখেছিল। সে বুঝতে পেল নিশ্চয়ই কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে, আর আমাকে দেখে অমনি বলে উঠলো, "ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন।" তার এ আওয়ায শুনে আমি জেগে উঠি চাদর দিয়ে মুখ ঢেকে রাখি। আল্লাহর কসম সে আমার সাথে একটি কথাও বলেনি আর আমি তার ইন্না লিল্লাহি ..... পড়া ছাড়া আর কোনো আওয়ায শুনিনি।

সে ব্যক্তি একটু চিন্তা করে নেয়ার পর তার উটনীটিকে বসতে বললো। উটনী তার সামনের দুপা বাড়িয়ে বসে পড়লো। তারপর আমি তার উপর সওয়ার হলাম। তখন সে এটিকে এগিয়ে নিয়ে চললো। অবশেষে আমরা আমাদের বাহিনীর কাছে পৌছে গেলাম। সেখানে তারা পেছনে কিছু ছুটে গেল কিনা তা খোঁজার জন্য যাত্রা বিরতি করছিল। রেওয়ায়াতকারী বলেন, হযরত আয়েশা রা. বলেছেন, এ সময় যে বা যারা আমার মান-সম্মান ধ্বংস করতে গিয়েছিল, মূলত সে বা তারাই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। তোহমতের এ গুনাহের কাজে যে বিরাট অংশ নিয়েছিল সে হলো আবদুল্লাহ ইবনে উবাই (মুনাফিক সরদার)। তারপর আমরা মদীনায় পৌছলাম। এরপর আমি পুরো মাস অসুস্থ ছিলাম। এ সময় রটনা সম্পর্কে মানুষ অনেক কিছু বলাবলি করেছে। কিন্তু আমি এর কিছুই জানতে পারিনি। তবে আমার অসুস্থ অবস্থায় একটা কথা আমার মনে খটকা জাগাতো। তা হচ্ছে অন্য সময় আমি অসুস্থ হয়ে পড়লে রসূলুল্লাহ হৃদয়াবেগ নিয়ে আমার কাছে আসতেন, বসতেন, খোঁজখবর নিতেন। এ সময় আমি কিন্তু তাঁর পক্ষ থেকে অনুরূপ মায়া মমতাপূর্ণ ব্যবহারটা দেখলাম না। তিনি অবশ্য আসতেন,

সালাম করতেন আর জিজ্ঞেস করতেন "কেমন আছো" ব্যাস, এই বলে চলে যেতেন। এ আচরণটা তাঁর সম্পর্কে আমার মনে বেশ কিছু সংশয় সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারিনি।

তারপর এক রাতে আমি ও মেসতাহের মা প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারার জন্য মাঠের দিকে যাচ্ছিলাম, সেখানে রাত্রিতে গিয়ে আমরা প্রয়োজন সেরে আসতাম। কারণ তখনও শৌচাগার তৈরি হয়ে উঠেনি, আর সেজন্যে আমরা রাত ছাড়া বের হতাম না। আমরা প্রয়োজন সেরে ফিরে আসার পথে উম্মে মেসতাহ হঠাৎ করে তার চাদরের আঁচলে বেধে পড়ে গেল। আর অমনি বিরক্ত হয়ে সে বলে উঠলো, "তায়েসা মেসতাহ" (মেসতার মৃত্যু হোক) একথা শুনে আমি বললাম, ছিঃ তুমি বড়ই নিকৃষ্ট কথা বললে, তুমি গালি দিলে এমন এক ব্যক্তিকে যে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। তখন সে বললো, রাখ তার কথা, হায় তুমি শোননি সে কি কথা বলেছে ? জিজ্ঞেস করলাম, কি বলেছে সে ? তখন সে ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে বললো। ফলে আমার অসুস্থতা আরও বেড়ে গেল। তারপর আমি বাড়ীতে ঢুকতেই রসূলুল্লাহ স. ঘরে ঢুকলেন এবং বললেন, কেমন আছ ? তখন আমি শুধু বললাম, আমাকে বাপের বাড়ী যাওয়ার অনুমতি দিন। সেখানে গিয়ে তাদের সামনেই ব্যাপারটা সম্পর্কে আমি নিশ্চিত হতে চাচ্ছিলাম। তখন তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন। আমি বাপ-মার কাছে চলে গেলাম। তারপর মাকে বললাম, লোকেরা এসব কি বলাবলি করছে ? তিনি বললেন, তোর উপর এ রটনার ব্যাপারটা আমার মান-সম্ভ্রম শেষ করে দিয়েছে। এটাই দুনিয়ার রীতি, যখনি কোনো মেয়ে সৌভাগ্যবতী হয়ে যায়, স্বামী সোহাগিনী হয়, স্বামীও তাকে ভালবাসেন, উপরন্তু যদি কয়েকজন সতীন থাকে, তখন তার বিরুদ্ধে কিছু হিংসুটে লোক এ ধরনের মিথ্যা রটনা করে তার মান-সম্ভ্রম নষ্ট করার অপপ্রয়াস চালায়, সতীনরাও এতে সুযোগ নেয়ার চেষ্টা করে। এসব শুনে আমি বললাম, সুবহানাল্লাহ! এ নিয়ে লোকেরাও এভাবে বলাবলি করতে পারছে ? রেওয়ায়াতকারী বলেন, তিনি (হযরত আয়েশা রা.) বললেন, অতপর আমি সারারাত ধরে কাঁদলাম, সকাল হয়ে গেল, এক মুহূর্তের জন্যও আমার চোখের পানি থামেনি, আর সারারাত একটি বারের জন্যও আমার চোখের পাতা বন্ধ হয়নি। এভাবে ক্রন্দনরত অবস্থাতেই সকাল করেছি।

–ফী যিলালিল কুরআন

তিনি বলেন, অন্তত এক মাসকাল পর্যন্ত এ মিথ্যা দোষারোপের ভিত্তিহীন কথা সমাজে উড়ে বেড়াতে লাগলো। নবী করীম স. মানসিক কষ্ট ও দ্বন্দ্ব অনুভব করতে লাগলেন। আমি কান্নাকাটি করতে থাকলাম। আমার পিতা-

মাতা অপরিসীম উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তায় দিন কাটাতে লাগলেন। অবশেষে একদিন নবী করীম স. এসে আমার কাছে বসলেন। এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তিনি কখনো আমার কাছে এসে বসেননি। হযরত আবু বকর রা.ও উম্মে রোমান (হযরত আয়েশার মা) ভাবলেন, আজ কোনো সিদ্ধান্তমূলক কথা হয়ে যাবে। এজন্যে তাঁরা দুজনও নিকটে এসে বসলেন। নবী করীম স. বললেন, "আয়েশা তোমার সম্পর্কে এসব কথা আমার কাছে পৌঁছেছে। তুমি যদি নিষ্পাপ হয়ে থাক, তবে আশা করি আল্লাহ তোমার নির্দোষিতা প্রকাশ করে দিবেন। আর তুমি যদি বাস্তবিকই কোনো প্রকার গুনাহে লিপ্ত হয়ে থাক, তাহলে আল্লাহর কাছে তাওবা করে ক্ষমা চাও। বান্দা নিজের গুনাহ স্বীকার করে তাওবা করলে আল্লাহ মাফ করে দেন।" একথা শুনে আমার চোখের পানি শুকিয়ে গেল। আমি পিতাকে বললাম, "আপনি রসূলুল্লাহর কথার জবাব দিন।" তিনি বললেন, মারে, আমি কি বলবো—বুঝে উঠছি না।" আমি মাকে বললাম, "আপনিই কিছু বলুন।" তিনিও বললেন, "আমার বুঝে আসে না যে, আমি কি বলবো।" তখন আমি বললাম, আপনাদের কানে একটা কথা এসেছে, আর অমনি তা মনের মধ্যেও বসে গেছে। এখন আমি যদি বলি, "আমি নির্দোষ, আর আল্লাহ সাক্ষী আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ—তবে আপনারা তা বিশ্বাস করবেন না। আর যদি শুধু শুধুই এমন একটা কথা স্বীকার করে নেই যা আমি আদৌ করিনি—আল্লাহ তো জানেন আমি কোনো দোষের কাজ করিনি—তবে আপনারা তা সত্য বলে মেনে নেবেন। হযরত আয়েশা রা. বলেন, আমি তখন হযরত ইয়াকুবের নাম নিতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু তা স্মরণে আসলো না। শেষ পর্যন্ত আমি বললাম, এ পরিস্থিতিতে আমি সে কথা বলা ছাড়া উপায় দেখছি না, যা বলেছিলেন হযরত ইউসুফের পিতা—"ফা-সাবরুন জামীল" فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ—একথা বলে আমি শুয়ে পড়লাম। আর অপরদিকে পাশ ফিরে শুইলাম। তখন আমি মনে মনে বলছিলাম, আল্লাহ তো আমার নির্দোষিতা সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত। নিশ্চয়ই তিনি প্রকৃত ঘটনা লোকদের সামনে উন্মোচিত করে দেবেন। অবশ্য আমার মনে এমন ধারণা আসেনি যে আমার পক্ষে ওহী নাযিল হবে, আর তা কিয়ামত পর্যন্ত পড়া হবে। আল্লাহ নিজে আমার ব্যাপারে কথা বলবেন, তা আমি কখনো ধারণা করতে পারিনি। আমি এতটুকু ভেবেছিলাম যে, রসূলুল্লাহ স. কোনো স্বপ্ন দেখবেন, যাতে আল্লাহ আমার নির্দোষিতা প্রমাণ ও প্রকাশ করে দেবেন।

এরি মধ্যে নবী করীম স.-এর উপর ওহী নাযিল হওয়ার অবস্থা দেখা দিল। ওহী নাযিলের সময় ভীষণ শীতের মধ্যেও তাঁর চেহারা মোবারক

হতে ঘামের ফোঁটা টপ টপ করে পড়তে থাকতো। এ অবস্থা দেখে আমরা সবাই চুপ হয়ে গেলাম। আমি তো পূর্ণ মাত্রায় নির্ভয় ছিলাম। কিন্তু আমার পিতা-মাতার অবস্থা ছিল এতই মর্মান্তিক যে কাটলেও রক্ত পড়তো না। আল্লাহ কোন্ মহাসত্য উদ্‌ঘাটিত করে দেন সে চিন্তায় তাঁরা ছিলেন খুবই উদ্বিগ্ন। ওহী নাযিলের অবস্থা শেষ হয়ে গেলে রসূলে করীম স.-কে খুবই উৎফুল্ল দেখা গেল। তিনি হাস্যাবস্থায় প্রথম যে কথাটি বললেন, তা ছিল এই, "আয়েশা, তোমাকে সুসংবাদ। আল্লাহ তোমার নির্দোষিতা নাযিল করেছেন। অতপর তিনি ১১ থেকে ২১ পর্যন্ত দশটি আয়াত পড়ে শুনালেন। আমার মা বললেন, "উঠো, রসূলুল্লাহর শুকরিয়া আদায় করো।" আমি বললাম, আমি না ওনার শুকরিয়া আদায় করবো, না আপনাদের দুজনের ; আমি তো আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি যিনি আমার নির্দোষিতা সম্পর্কে কুরআনের আয়াত নাযিল করেছেন। আপনারা তো এ মিথ্যা অভিযোগকে অসত্য বলেও ঘোষণা করেননি।"–তাফহীমুল কুরআন

হযরত আয়েশা রা.-এর নামে যারা এ মিথ্যা গুযব ছড়িয়েছিল হাদীস শরীফে তাদের কয়েকজনের নাম পাওয়া যায়। তারা হলো, আবদুল্লাহ ইবনে উবাই, যায়েদ ইবনে রেফায়া (সম্ভবত সে ছিল রেফায়া ইবনে যায়েদ নামক ইহুদী মুনাফিকের পুত্র) মিছতাহ ইবনে উছাছা, হাস্‌সান ইবনে ছাবেত ও হামনা বিনতে জাহাশ। এদের প্রথম দুজন ছিল মুনাফিক। বাকী তিনজন মুমিন। এ তিনজন দুর্বলতা ও ভ্রম বশত এ ফিতনায় জড়িয়ে গিয়েছিলেন। এছাড়া আর যারা কমবেশী এ গুনাহে অংশ নিয়েছিল, হাদীস ও জীবন চরিত গ্রন্থে তাদের কোনো উল্লেখ নেই।–তাফহীমুল কুরআন

আলোচ্য আয়াতে বুঝা যায় যে, হযরত আয়েশা রা.-এর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনাকারী মিথ্যা অপবাদ ছড়ানোর কাজ কোনো এক ব্যক্তি বা কয়েক ব্যক্তির সমষ্টি মাত্র নয়, বরং তারা হচ্ছে এক বিশেষ উদ্দেশ্যে সংগঠিত একটি দল—এতে জড়িত কেবল মুনাফিক সরদার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সলুলই নয়, হাঁ সে এ কুচক্রী দলের প্রধান, সে-ই গোটা মুসলিম সংগঠন ও জনশক্তিকে ভেংগে চুরমার করে দেয়ার জন্য ষড়যন্ত্র করেছিল, সে-ই পারস্পরিক অবিশ্বাস সৃষ্টি করার জন্য আল্লাহর প্রিয় এ নবগঠিত ও সুসংহত দলটির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে চেয়েছিল, পরস্পরের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ ও ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি করে একের বিরুদ্ধে অন্যকে লেলিয়ে দিয়ে মুসলিম জাতিকে বিপর্যস্ত করতে চেয়েছিল। এরা মূলত সেই জনগোষ্ঠী, যারা প্রকাশ্য যুদ্ধে মুসলমানদের হারাতে না পেরে গোপনে এক মাসের মধ্যেই এ মহাপরিকল্পনা তৈরি করে ফেলেছিল। পর্দার আড়ালে থেকে

তারা কয়েকজন নিষ্ঠাবান মুসলিমকে তাদের কাজে লাগিয়েছিল। এ ঘটনাটি ছিল ইসলামকে ধ্বংস করার চক্রান্তগুলোর মধ্যে অত্যন্ত মারাত্মক ষড়যন্ত্র। এতে করে তারা ইসলামের মূলকেন্দ্র স্বয়ং নবীর ঘরেই আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। যে মহান ব্যক্তির নেতৃত্বে বিশ্বব্যাপী ইসলামের চূড়ান্ত অভিযান পরিচালিত হচ্ছিল সেই মহা বিপ্লবী বীরকে হতবল করার উদ্দেশ্যে তাঁর হৃদয়কে ভেংগে চুরমার করে দিতে চেয়েছিল তারা। কত আশ্চর্যজনক-ভাবে তারা রসূলের একান্ত ঘরের মানুষ হামনা বিনতে জাহাশ, তাঁর বিশ্বস্ত সহচর ও গুনমুগ্ধ কবি হাসসান ইবনে সাবেত, তাঁর নিজ গোষ্ঠীর মানুষ বদরী সাহাবী মেস্‌তা ইবনে উছাছা প্রমুখ ব্যক্তিকেও সে এ ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িয়ে ফেলেছিল, যার জন্য তারা এটা-ওটা দায়িত্বহীন মন্তব্য করে বসেছিল। কিন্তু মূল ষড়যন্ত্রের হোতা ছিল মুনাফিক সরদার আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই নিজে।

এ মহা চক্রান্তের পরিণাম জানাতে গিয়ে আল্লাহ্ তাআলা মুসলমানদের পূর্ণ নিশ্চয়তা সহকারে বলছেন যে, চক্রান্তকারীরা যাই আশা করুক না কেন এবং যত ক্ষতি করার চেষ্টা চালাক না কেন, আসলে ওরা কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। ওদের সকল প্রচেষ্টা বুমেরাং হয়ে ওদের উপরেই ফিরে আসবে। তাই আল কুরআন ঘোষণা করছে, তোমরা ভেব না যে, ওদের এসব চক্রান্ত তোমাদের জন্য ক্ষতিকর, বরং তোমাদের জন্য এটা হবে সবদিক থেকেই কল্যাণকর।—ফী যিলালিল কুরআন

হযরত আয়েশা রা.-এর বিরুদ্ধে উত্থাপিত এ মিথ্যা অভিযোগকে কুরআনের ভাষায় বলা হয়েছে ইফ্‌ক (افك) ; মানে মূল কথাকে উল্টে দেয়া, প্রকৃত সত্যের বিপরীত যা ইচ্ছা বলে বেড়ানো। স্বয়ং আল্লাহ তাআলা এ অভিযোগের পূর্ণ প্রতিবাদ করেছেন।

ইফ্‌কের এ ঘটনাটি মুসলমানদের জন্য যে কল্যাণকর প্রমাণিত হয়েছে তার তিনটি দিক রয়েছে। একটি হলো, মুসলমানদের মধ্যে ঘাপটি মেরে থাকা একটি গোষ্ঠীর স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়ে পড়েছিল। মিথ্যা অপবাদের এ ঘটনাটি সংগঠিত না হলে এ গোষ্ঠী কত মারাত্মক আকার ধারণ করতো আর তাদের দ্বারা মুসলমানরা কত যে ক্ষতিকর অবস্থার সম্মুখীন হতো—সে কথা হয়তো কখনো প্রকাশ পেত না। দ্বিতীয় দিক হলো, মুসলমানদের মধ্যে যেসব ঈমানী দুর্বলতা গোপন ছিল তা এ পরীক্ষার দ্বারা প্রকাশিত হয়ে পড়েছে এবং যথাসময়ে তা সংশোধন হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সামাজিক স্বচ্ছতার দৃষ্টিকোণ থেকে এর গুরুত্ব অপরিসীম। তৃতীয় দিকটি

হলো, এ ঘটনাটি সমাজের সংশোধন ও সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত বহু আহকাম ও হেদায়াত নাযিল হওয়ার একটা মোক্ষম পরিবেশ পরিস্থিতি সৃষ্টি করে দিয়েছে। এ ঘটনায় সৃষ্ট পরিস্থিতির উদ্ভব না হলে অনেক লোক এতদসংক্রান্ত হুকুম-আহকামের কোনো মূল্যই দিতো না।–তাদাব্বুরে কুরআন

আল কুরআন 'ইফ্ক' বা তোহমতের এ ঘটনাকে মুমিনদের জন্য বিশেষত যাঁদের বিরুদ্ধে সেই জঘন্য মিথ্যা অপবাদ রটানো হয়েছিল তাঁদের জন্য কল্যাণকর বলার পেছনে আমরা উপরোক্ত দিকসমূহ দেখতে পেলাম। একথাটাই আল কুরআন এভাবে বলেছে ঃ

لَا تَحْسَبُوْهُ شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ -

"এটাকে তোমরা নিজেদের জন্য ক্ষতিকর ভেব না, বরং এটাতো তোমাদের জন্য কল্যাণকর।"

এভাবে সুদীর্ঘ একটি মাস ধরে নবী পরিবারকে চরম ঈমানী পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। অবশেষে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হযরত আয়েশা রা.-এর পবিত্রতা সম্পর্কে দশটি আয়াত নাযিল করে তাঁদের পরীক্ষার সমাপ্তি টানলেন। রসূলুল্লাহ স. সহাস্যবদনে হযরত আয়েশা রা.-কে বললেন ابشرى يا عائشة اما الله فقد ابراك–"আয়েশা! সুসংবাদ শোন। আল্লাহ তাআলা তোমার নির্দোষিতা প্রকাশ করেছেন।"

উম্মুল মুমিন হযরত আয়েশা রা.-এর কতিপয় বৈশিষ্ট্য

ইমাম বাগভী রহ. উপরোক্ত আয়াতসমূহের তাফসীরে বলেছেন, হযরত আয়েশা রা.-এর এমন অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেগুলো অন্য কোনো মহিলার ভাগ্যে জোটেনি। তিনি নিজেও আল্লাহর নিয়ামত প্রকাশার্থে এসব বিষয় বর্ণনা করতেন। এক. রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে বিবাহ হওয়ার পূর্বে ফেরেশতা জিবরাঈল রেশমী কাপড়ে তাঁর ছবি নিয়ে রসূলুল্লাহ স.-কে দেখিয়ে বলেন, এ আপনার স্ত্রী। কোনো কোনো রেওয়ায়াতে আছে, জিবরাঈল তাঁর হাতের তালুতে এই ছবি নিয়ে এসেছিলেন। দুই. রসূলুল্লাহ স. তাঁকে ছাড়া আর কোনো কুমারীকে বিবাহ করেননি। তিন. তাঁর কোলে রসূলুল্লাহর ওফাত হয়। চার. তাঁর ঘরেই রসূলুল্লাহ স. সমাধিস্থ হন। পাঁচ. তাঁর সাথে একই লেপের নীচে শায়িত অবস্থায় রসূলুল্লাহর উপর ওহী নাযিল হয়। অন্য কোনো বিবির এ বৈশিষ্ট্য ছিল না। ছয়. তাঁর নির্দোষিতা সম্পর্কে আসমান থেকে আয়াত নাযিল হয়েছে। সাত. তিনি রসূলুল্লাহর খলীফার কন্যা ও সিদ্দীকা ছিলেন।

তাফসীরে কুরতুবীতে বর্ণিত আছে, হযরত ইউসুফ আ.-এর প্রতি অপবাদ আরোপ করা হলে একটি কচি শিশুকে বাকশক্তি দান করে তার সাক্ষ দ্বারা তাঁর দোষমুক্ততা প্রকাশ করা হয়। হযরত মারইয়ামের প্রতি অপবাদ আরোপ করা হলে তাঁর পুত্র ঈসা শিশুর সাক্ষ দ্বারা তাঁকে দোষমুক্ত করা হয়। আর হযরত আয়েশা সিদ্দীকার প্রতি অপবাদ আরোপ করা হলে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা কুরআনের দশটি আয়াত নাযিল করে তাঁর দোষমুক্ততা প্রকাশ করেন।–মাআরেফুল কুরআন

❐

পনের

لَوْلَآ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بِاَنْفُسِهِمْ خَيْرًا ۙ وَّقَالُوْا
هٰذَآ اِفْكٌ مُّبِيْنٌ ○ لَوْلَا جَآءُوْ عَلَيْهِ بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ ۚ فَاِذْ لَمْ يَاْتُوْا
بِالشُّهَدَآءِ فَاُولٰٓئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ○ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ
وَرَحْمَتُهٗ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِىْ مَآ اَفَضْتُمْ فِيْهِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ○

"তোমরা যখন একথা শুনতে পেয়েছিলে, তখন মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা নিজেদের সম্পর্কে ভাল ধারণা পোষণ করলো না ? আর কেনই বা বলে দিল না যে এটা তো নির্জলা অপবাদ ? ওরা কেন এ ব্যাপারে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করলো না ? এখন যেহেতু ওরা চারজন সাক্ষী পেশ করলো না, কাজেই ওরাই আল্লাহর কাছে মিথ্যুক। তোমাদের প্রতি দুনিয়া ও আখিরাতে যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকতো, তাহলে তোমরা যেসব কর্থাবার্তায় জড়িত হয়ে পড়েছিলে, সে জন্যে গুরুতর আযাব তোমাদের গ্রাস করতো।"–সূরা আন নূর ঃ ১২-১৪

নিষ্কলুষ সম্ভ্রান্ত নারীর অপবাদ শুনে মুমিনদের কি করা উচিত ?

ইফ্কের ঘটনা সাজিয়ে মুসলিম সমাজে মারাত্মক বিভ্রান্তি সৃষ্টি ও ইসলামী সমাজের চরম বিরূপ চিত্র রটানোর অপচেষ্টা চলেছিল। স্বয়ং রসূলের স্ত্রীর চরিত্রে কল্পিত কালিমা লেপনের মাধ্যমে ইসলামী সমাজের ভিত প্রকম্পিত করে চিরতরে ইসলামের আলো ধরাপৃষ্ঠ হতে মুছে ফেলার ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। মেহেরবান আল্লাহ সেই কঠিন বিপদ থেকে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহকে রক্ষা করেছিলেন প্রকৃত সত্য প্রকাশ করে দিয়ে। উপরোক্ত আয়াত কটিতে সেই অসহনীয় যন্ত্রণা ও অস্বস্থিকর পরিস্থিতিতে ঈমানদারদের করণীয় বিষয়ে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। উড়ে চলা ভিত্তিহীন মিথ্যা কথায় কান না দিয়ে মুমিন নারী-পুরুষের সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয় নিয়ে চলার জন্য রাব্বুল আলামীন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা দিয়েছেন এসব আয়াতে। এসব আয়াতে যাকিছু বলা হয়েছে তাহলো ইফ্কের এ ঘটনাটি তো তেমন কোনো গভীর চিন্তা-গবেষণার বিষয় ছিল না। এটা শুনার সাথে সাথেই

প্রত্যেক মুসলিমেরই উচিত ছিল একে সম্পূর্ণ মিথ্যা, মনগড়া ও অমূলক বলে প্রথম চোটেই উড়িয়ে দেয়া। আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

لَوْلَآ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بِاَنْفُسِهِمْ خَيْرًا ۙ

তোমরা যে সময় একথা শুনতে পেলে সে সময় মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা নিজেদের সম্পর্কে ভাল ধারণা পোষণ করলে না কেন ? আয়াতাংশের আরেকটি তরজমা হতে পারে এই ঃ ঘটনাটি সাজিয়ে যখন রটানো হলো তখন মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা নিজেদের লোক সম্পর্কে বা নিজেদের সমাজ ও মিল্লাতের লোকদের সম্পর্কে নেক ধারণা পোষণ করলো না কেন ? আয়াতের শব্দগুলোর এ দু প্রকারের অর্থই হতে পারে। আল কুরআন এরূপ দ্ব্যর্থবোধক শব্দ বা বাক্য ব্যবহার করে একটি অতি সূক্ষ্ম তত্ত্ব প্রকাশ করেছে।

কথা হলো, হযরত আয়েশা রা. এবং সাফওয়ান ইবনে মুআত্তাল রা. সম্পর্কে রটানো বিষয়টি ছিল কেবল এতটুকু যে, কাফেলার একজন মহিলা কাফেলা থেকে পেছনে পড়ে যায়। কাফেলার অপর এক ব্যক্তি যিনি পেছনে থেকে কোনো পড়ে থাকা জিনিস কুড়িয়ে নেয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন—তাঁকে দেখে নিজের উটের উপর বসিয়ে নিয়ে এসেছেন। এখন কেউ যদি বলে, খোদা না খাস্তা তাঁরা দুজন পরস্পরকে একাকীত্বে পেয়েই গুনাহর কাজে লিপ্ত হয়েছে, তাহলে তার একথার বাহ্যিক শব্দের দুটো অর্থ ধরে নিতে হয়। এক. যে লোক এরূপ কথা বলে—সে স্ত্রী হোক বা পুরুষ—সে নিজেই যদি এরূপ অবস্থায় হতো, তাহলে সে গুনাহ না করে থাকতে পারতো না। যদি সে গুনাহ হতে বিরত থেকেই থাকে, তবে তা শুধু এজন্যে যে, সে বিপরীত লিঙ্গের কাউকে কখনো একাকীত্বে পায়নি। পেলে কখনো এ মহাসুযোগ সে ছেড়ে দিতো না। দ্বিতীয় অর্থ হলো, সে যে সমাজের লোক, সে সমাজের নৈতিক অবস্থা সম্পর্কে তার ধারণা এই যে, এখানে কোনো নারী বা পুরুষ এমন নেই যে এ ধরনের কোনো সুযোগ পেলে গুনাহ থেকে বিরত থাকতো। অর্থাৎ কেউই বিরত থাকতো না। এটা তো তখন হতে পারে যখন তা কেবল একজন পুরুষ ও একজন নারীর ব্যাপার হয়। আর সেই নারী ও পুরুষ যদি একই শহরের অধিবাসী হয়। আর নারী ঘটনাচক্রে কাফেলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে যায়। সে যদি সেই পুরুষটির বন্ধু, আত্মীয়, প্রতিবেশী বা পরিচিত ব্যক্তির স্ত্রী, ভগ্নী বা কন্যা হয়। তাহলে ব্যাপারটি আরও কঠিন রূপ পরিগ্রহ করবে। কথাটির অর্থ দাঁড়ায় —যে ব্যক্তি একথা বলে সে নিজ ও তার সমাজ—উভয় সম্পর্কেই এমন

জঘন্য ধারণা পোষণ করে, যার সাথে শালীনতার দূরতম সম্পর্কও নেই। কোনো লোক যদি তার বন্ধু, প্রতিবেশী কিংবা পরিচিত ব্যক্তির ঘরের কোনো নারীকে ভুল-ভ্রান্তিতে পথে-ঘাটে পেতে পারে। তবে সে প্রথমেই মহিলাটির আবরু বিনষ্টের চেষ্টা করবে। তারপর হয়তো সে তাকে ঘরে পৌছানোর চেষ্টা করবে।

কিন্তু এ 'ইফ্ক'-এর ঘটনায় তদপেক্ষাও সহস্রগুণ বেশী কঠিন। স্ত্রীলোকটি তো অপর কেউ নয় ; তিনি রসূলে করীম স.-এর স্ত্রী। প্রত্যেক ঈমানদারই যাঁকে নিজের মা অপেক্ষা অধিক সম্মানযোগ্য বলে মনে করে। যাকে আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক মুসলমানের জন্যই মায়ের মতই হারাম করে দিয়েছেন। আর পুরুষ লোকটি সেই কাফেলারই এক লোক, সেই বাহিনীরই একজন সৈনিক এবং সে শহরেরই একজন নাগরিক ছিল—কেবল তাই নয়, বরং সে ছিল একজন মুসলিম, যে সেই মহিলার স্বামীকে আল্লাহর রসূল এবং নিজের হাদী ও নেতা রূপেই মেনে নিয়েছিল এবং তাঁর নির্দেশে নিজের জানপ্রাণ কুরবান করার জন্য বদর যুদ্ধের মত ভয়াবহ যুদ্ধে শরীক হয়েছিল। এমতাবস্থায় এরূপ কথার মানসিক পটভূমির জঘন্যতা চরম পর্যায়ে গিয়ে পৌছে। এর চেয়ে অধিক জঘন্য ও বিভৎস ধারণা আর কিছু হতে পারে না। এ কারণে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, মুসলিম সমাজের যেসব ব্যক্তি এ অপবাদের কথা মুখে উচ্চারণ করেছে, কিংবা অন্তত সন্দেহযোগ্য বলে মনে করেছে। তারা নিজেরা এতে করে নিজেদেরই সম্পর্কে অত্যন্ত খারাপ ধারণা পোষণ করেছে। আর নিজেদের লোকদের সম্পর্কে অত্যন্ত নিকৃষ্ট নৈতিকতার ধারক বলে মনে করেছে।

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, সেই লোকেরা নিজেদের অভিযোগ প্রমাণে চারজন সাক্ষী আনলো না কেন ? এখন যেখানে তারা তাদের আনীত অভিযোগ প্রমাণে সাক্ষী পেশ করতে পারলো না, তখন আল্লাহর কাছে তারাই মিথ্যুক। মূলত তাদের এ অভিযোগ তো আসলেই মিথ্যা ছিল। অভিযোগের সমর্থনে তারা সাক্ষ দিতে পারেনি—কেবল এ কারণেই তা মিথ্যা ছিল—তা নয়। বরং আসলেই ওদের অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। এখানে ওদের সাক্ষ পেশ করতে না পারাকেই অভিযোগ মিথ্যা হওয়ার ভিত্তি বলে উল্লেখ করা হয়নি। আর মুসলমানদেরও সাক্ষ চারজন পেশ করতে না পারায় ওদের অভিযোগকে মিথ্যা বলে জানার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়নি। সেখানে মূলত যা ঘটেছিল সেদিকে দৃষ্টি না থাকলেই এ ধরনের ভুল ধারণা হওয়ার কারণ ঘটে। অভিযোগ উত্থাপনকারীরা এজন্যে অভিযোগ তোলেনি যে, তারা বা তাদের কেউ সে ঘটনা প্রত্যক্ষ দেখতে পেয়েছিল, যা তারা মুখে প্রচার

করছিল। বরং হযরত আয়েশা রা. কাফেলার পেছনে পড়ে গিয়েছিলেন এবং সাফওয়ান রা. তাঁকে নিজের উটের উপর সওয়ার করিয়ে কাফেলার কাছে নিয়ে এসেছিলেন—শুধু এতটুকু ঘটনার উপরই তারা মিথ্যা অভিযোগের এক পাহাড় রচনা করে নিয়েছিল।

হযরত আয়েশা রা.-এর এভাবে কাফেলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া (নাউযুবিল্লাহ) কোনো গোপন ষড়যন্ত্রের ফল বলে কোনো সুস্থ বিবেকবান লোকই চিন্তা করতে পারে না। প্রধান সেনাধ্যক্ষের স্ত্রী চুপচাপ কাফেলার পেছনে একজন পুরুষের সাথে পড়ে থাকবে, পরে সেই ব্যক্তিই তার নিজের উটের উপর বসিয়ে প্রকাশ্যভাবে ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় সেই সেনাবাহিনীর কাছে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে—কোনো ষড়যন্ত্র কখনও এমনটি করতে পারে না। বস্তুত এহেন অবস্থাটাই তাঁদের উভয়ের নির্দোষিতা অকাট্যভাবে প্রমাণ করে। এতদসত্ত্বেও যদি এরূপ কোনো অভিযোগ তুলতেই হয়, তবে তা এ ভিত্তির উপর তোলা যেতে পারে যে, অভিযোগকারীরা স্বচক্ষেই তা দেখেছে। অন্যথা এসব যালিমরা যেসব লক্ষণের ভিত্তিতে অভিযোগ তুলেছে তাতে করে কোনোই সন্দেহ করা যেতে পারে না।–তাফহীমুল কুরআন

এখানে লক্ষণীয় বিষয়, মুসলিম সমাজের সামনে যে দু জনের বিরুদ্ধে তোহমত দেয়া হয়েছিল—একজন তো তাদেরই নবীর স্ত্রী অন্যজন তাদেরই ভাই—একজন সাহাবী ও মুজাহিদ ব্যক্তি। দুজনই তো তাদের নিজেদের লোক, তারা তো জাহেলী যুগের ও জাহেলী সমাজের এমন লোক নয় যাদের মধ্যে আল্লাহর ভয় বা আখিরাতে জবাবদিহিতার চিন্তা নেই। কাজেই এমন লোকদের ব্যাপারে তো প্রথম চোটেই ভাল চিন্তাটাই আসা উচিত ছিল। এটা কি তাদের মনে করা উচিত ছিল না যে, মুমিনদের নিজেদের কোনো মেয়ে এমন বিপদাপন্ন হলে এরূপ কিছু কি ঘটতে পারে ? 'ঈমান' মানে আল্লাহর ভয় ও আখিরাতে জবাবদিহিতার অনুভূতি ও বিশ্বাস যাদের আছে তারা প্রকাশ্যে ও গোপনে জীবনের শুদ্ধি রক্ষা করবে। আল্লাহর কাছে প্রতিটি কাজের জবাবদিহিতার বিশ্বাস মনের ভেতর জাগরূক রেখেই তো তারা দুনিয়ার জীবন অতিবাহিত করবে। সুতরাং তাদের ব্যাপারে উত্তম ধারণা পোষণ করাই তো ঈমানদারগণের কর্তব্য। তাদের দ্বারা এমনটি সম্ভব না হলে নবী স.-এর স্ত্রী দ্বারা এটা সম্ভব হতে পারে কি করে ?

আবু আইয়ুব খালেদ ইবনে যায়েদ আনসারী রা. ও তাঁর স্ত্রী এভাবেই চিন্তা করেছিলেন। ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, একদিন আইয়ুবের বাপকে আইয়ুবের মা বললেন ঃ আচ্ছা, আইয়ুবের বাপ, তুমি

কি শুননি লোকেরা আয়েশা রা. সম্পর্কে কি বলাবলি করছে ? তিনি বললেন, হাঁ—এটা তো ডাহা মিথ্যা। আইয়ুবের মা ! এমন পরিস্থিতি যদি তোমার হতো তাহলে কি তুমি এরূপ কোনো গুনাহর কাজে লিপ্ত হয়ে পড়তে ? তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, অবশ্যই আমি এমন কাজ করতাম না। আবু আইয়ুব বললেন, আল্লাহর কসম, আয়েশা রা. অবশ্যই তোমার চেয়ে উত্তম ব্যক্তি। আরেক বর্ণনা হতে একদিন আইয়ুবের মা আইয়ুবের বাপকে বললো, তুমি যদি সাফওয়ানের স্থানে হতে, তাহলে কি রসূলুল্লাহর ইয্যতের উপর হামলা করার কথা চিন্তা করতে পারতে ? তিনি বললেন, কখনও না। তখন আইয়ুবের মা বললেন, শোন, আমিও যদি আয়েশার স্থানে হতাম তাহলে কিছুতেই আল্লাহর রসূলের খেয়ানত করতে পারতাম না। অতপর অবশ্যই এটা সত্য যে, আয়েশা রা. আমার চেয়ে উত্তম এবং অবশ্যই সাফওয়ান তোমার চেয়ে উত্তম ব্যক্তি। এভাবে মুসলমানদের কেউ কেউ তাদের বিবেকের ডাকে সাড়া দিয়েছে এবং আন্তরিকভাবে ব্যাপারটা বুঝার চেষ্টা করেছে। সন্দেহের বশবর্তী হয়ে তাঁরা কারো সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করেননি এবং কোনো আলোচনাতে অংশ নেননি।

এ হচ্ছে যে কোনো বিষয়ে মাথা ঘামানোর জন্য আল কুরআনে উপস্থাপিত পদ্ধতি। অর্থাৎ কোনো সাক্ষ-প্রমাণ তালাশ করার আগে প্রথমে নিজের বিবেককে ব্যবহার করা। এ হচ্ছে মুসলমানদের প্রথম কর্তব্য এবং সমস্যাদির সমাধানে তাদের প্রথম পদক্ষেপ। দ্বিতীয় পদক্ষেপ হচ্ছে বাস্তব দলিল-প্রমাণ দ্বারা কোনো কিছুর ব্যাপারে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া।—ফী যিলালিল কুরআন

ইসলামী সমাজের চারিত্রিক মূলনীতি

ইসলামী সমাজের প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর অধিকার হলো সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি পরস্পরের ব্যাপারে সুধারণা পোষণ করবে। যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো দলিল-প্রমাণে তাদের ব্যাপারে সুধারণার বিপরীত কোনো কিছু সাব্যস্ত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের এ অধিকার সংরক্ষণ করতে হবে। মুসলিম নর-নারীর উক্ত অধিকারের দাবী হলো, যদি কোনো মুসলিম সম্পর্কে আরেক মুসলিমের কানে এমন কোনো কথা শোনা যায়, যাতে করে সেই মুসলিমের প্রতি সুধারণা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে তিনি ঐ কথাকে সওগাত মনে করে তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করে নেবে না। আর সে কথা বলে বেড়ানো শুরু করে দেবে না। বরং তখন তা অগ্রাহ্য করবে। এবং সে বিষয়ে কোনো নির্ভরযোগ্য যুক্তিভিত্তিক প্রমাণ পাওয়ার আগ পর্যন্ত তা বিশ্বাসই করবে

না। এ জাতীয় কার্যক্রমে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করাও জায়েয নেই। এটাকে অন্যের ঝগড়া-বিবাদ ভেবে পাশকেটে যাওয়া (এই বলে যে, এটা তো অন্যের বদনামের বিষয়, এতে আমার কি সম্পর্ক) বৈধ নয়। বরং যথাসাধ্য এ জাতীয় বিষয়ের প্রতিরোধ নিজের ভাই হিসেবে করা উচিত। কারণ প্রত্যেক মুসলিম ভাইয়ের উপর অন্য মুসলিম ভাইয়ের মান-সম্ভ্রমের যথাসাধ্য হেফাযত করা একটা ফরয—অবশ্য কর্তব্য।

ইসলামী সমাজের এ চারিত্রিক মূলনীতির বিষয়ে এখানে মুসলমানদের সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, যখন তোমাদের কানে এমন কথা আসলো, তখন তোমরা পরস্পরের প্রতি সুধারণা পোষণ করলে না কেন? আর কেন পরিষ্কার করে ঘোষণা করলে না যে, এটা তো একটা কল্পিত অভিযোগ—একটা সুস্পষ্ট তোহ্মত।

ইসলামী সমাজের এ মূলনীতি সামনে রেখে আজকের সামাজিক অবস্থার পর্যালোচনা করে দেখুন, তাহলে আপনি দেখতে পাবেন যে, আজ কাল এ নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা বিরাজ করছে। আজকের চিন্তাধারা হলো প্রত্যেক ব্যক্তিই কুধারণা পাওয়ার যোগ্য। তবে কারো সাথে ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত স্বার্থ থাকলে সে কথা স্বতন্ত্র। অন্যের ব্যাপারে কুৎসা রটনা করা এ যুগে একটি স্বতন্ত্র বিষয় ও একটি বিশেষ স্বার্থক ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছে। আমাদের জাতীয় পর্যায়ে কত শিক্ষিত ব্যক্তি এমন আছে যাদের দায়িত্বটাই যেন এই যে, তারা অন্যদের কুৎসা নিয়ে ঘুরে বেড়াবে।—তাদাব্বুরে কুরআন

মুসলিম উম্মাহর কেউ কারো পর নয়

আল কুরআন ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بِاَنْفُسِهِمْ বাক্যাংশ দ্বারা ইংগিত করেছে যে, যে মুসলমান অন্য মুসলমানের দুর্নাম রটায় ও তাকে লাঞ্ছিত করে, প্রকৃতপক্ষে সে নিজেকেই লাঞ্ছিত করে। কারণ ইসলামের সম্পর্ক নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মুসলিমকে এক করে দিয়েছে। যেমন অন্যত্র বলেছে لَا تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ তোমরা নিজেদের প্রতি দোষারোপ করো না। অর্থাৎ তোমরা এক মুসলিম অন্য মুসলিমকে দোষারোপ করো না—তেমনি কুরআনে বলা হয়েছে لَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ তোমরা নিজেদের হত্যা করো না। এখানে কোনো মুসলিমকে হত্যা করা বুঝানো হয়েছে। আরেক স্থানে বলা হয়েছে, وَلَا تُخْرِجُوْا اَنْفُسَكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ তোমরা নিজেদেরকে অর্থাৎ কোনো মুসলিম ভাইকে গৃহ ত্যাগে বাধ্য করো না। আরও বলা

হয়েছে, وَسَلِّمُوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ নিজেদেরকে অর্থাৎ মুসলিম ভাইদের সালাম করো, তাদের শান্তির ব্যবস্থা করো।

উপরোক্ত আয়াতাংশ সমূহের মাধ্যমে আল কুরআন মুসলিম উম্মাহর সবাইকে পরস্পর এক করে বর্ণনা করেছে। লিঙ্গ, স্থান, কাল, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মুসলিম এক। সুতরাং এক মুসলিম অন্য মুসলিমের ক্ষতি করলে বা তাকে দোষারোপ করলে প্রকৃতপক্ষে নিজেরই ক্ষতি করা হলো অথবা নিজেকেই দোষারোপ করা হলো।–মাআরেফুল কুরআন

❐

ষোল

اِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ الْغٰفِلٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ لُعِنُوْا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ص وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ○ يَّوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○ يَوْمَئِذٍ يُّوَفِّيْهِمُ اللّٰهُ دِيْنَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ ○

"যারা পবিত্র চরিত্রের ও সাদাসিদা মুমিন স্ত্রীলোকদের উপর (যিনার) অপবাদ আরোপ করে তাদের উপর দুনিয়া ও আখিরাতে লানত দেয়া হয়েছে। তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। যেদিন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ দেবে তাদের জিহ্বা, তাদের হাত, তাদের পা—তারা যা করতো সে সম্বন্ধে; সেদিন আল্লাহ তাদের প্রাপ্য প্রতিফল পুরোপুরি দিয়ে দেবেন আর তারা জানতে পারবে যে আল্লাহই সত্য, স্পষ্ট ব্যক্তকারী।"

–সূরা আন নূর ঃ ২৩-২৫

পবিত্র চরিত্রের নারীর প্রতি অপবাদ আরোপকারীরা দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত

আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত বিষয় পূর্বে বর্ণিত সূরা আন নূরের ৪ আয়াতের বিষয়বস্তুর সাথে মিল থাকায় একই বিষয়ের হুকুম পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে বলে মনে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উভয়ের মধ্যে রয়েছে একটি বিরাট পার্থক্য। আর তাহলো পূর্বোক্ত আয়াতে (৪ আয়াত) তাওবাকারীদের ব্যতিক্রম এবং তাদের জন্য মাগফিরাতের ওয়াদা রয়েছে। অথচ এখানে ২৩ আয়াতে কোনো ব্যতিক্রম ছাড়াই দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনে অভিশাপ এবং গুরুতর শাস্তির উল্লেখ করা হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, আলোচ্য ২৩ আয়াত সেসব লোকদের সাথে সম্পৃক্ত যারা হযরত আয়েশা রা.-এর চরিত্রে অপবাদ আরোপ করার পর তাওবা করেনি। এমনকি কুরআনে তাঁর দোষমুক্ত থাকার কথা নাযিল হওয়ার পরও তারা তাদের দুরভিসন্ধিতে অটল ও অপবাদ চর্চায় মশগুল থাকে। উল্লেখ্য, এমন কাজ কোনো মুমিনের পক্ষে সম্ভব নয়। কোনো মুমিন কুরআনের বিরোধীতা করতে পারে না।

বিরোধীতা করলে সে আর মুমিন থাকতে পারে না। তাই এ আয়াতগুলো ঐসব মুনাফিকদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে যারা দোষ মুক্ততার আয়াত নাযিল হওয়ার পরও এ অপবাদবৃত্তি পরিত্যাগ করেনি। তারা যে কাফির-মুনাফিক তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

তাওবাকারীদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা فَضْلُ اللّٰهِ وَرَحْمَتُهُ বলে দুনিয়া ও আখিরাতে রহমতপ্রাপ্ত আখ্যায়িত করেছেন। পক্ষান্তরে যারা তাওবা করেনি, তাদেরকে এ আয়াতে উভয় জাহানে অভিশপ্ত বলা হয়েছে। তাওবাকারীদেরকে আযাব থেকে মুক্তির সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। আর যারা তাওবা করেনি তাদের জন্য কঠোর আযাবের হুশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে। তাওবাকারীদেরকে اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ বলে মাগফিরাতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। আর যারা তাওবা করেনি তাদেরকে পরবর্তী يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ আয়াতে শাস্তির যোগ্য হওয়ার ধমক দেয়া হয়েছে।–মাআরেফুল কুরআন, বায়ানুল কুরআন থেকে।

এ আয়াতে সতী-সাধ্বী মুমিন নারীদেরকে غَافِلَاتٌ বলা হয়েছে। অর্থাৎ সরলমনা সেসব সাদাসিদা ভদ্র স্ত্রীলোক যারা কোনো ছল-চাতুরী জানে না, যাদের দিল পবিত্র, যারা চরিত্রহীনতা ও পাপ কি—কিরূপে তা করা হয়, তা জানে না। তাদের মতো মহিলাদের বিরুদ্ধেও কেউ কোনো চরিত্রহীনতার অভিযোগ তুলতে পারে, তা তাদের চিন্তা-ভাবনায়ও কখনো আসে না। হাদীস শরীফে এসেছে, নবী করীম স. বলেছেন, পাক চরিত্রের স্ত্রীলোকদের প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করা সেই সাতটি কবীরা গুনাহর মধ্যে শামিল যা অত্যন্ত মারাত্মক (موبقات) তিবরানী শরীফে হযরত হুযায়ফার বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে নবী করীম স. এরশাদ করেছেন ঃ قذف المحصنة يهدم عمل ماة سنة "একজন চরিত্রবান স্ত্রীলোকের উপর চরিত্রহীনতার মিথ্যা দোষারোপ করা একশ বছরের আমল বিনষ্ট করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট।"

–তাফহীমুল কুরআন

আয়াতে يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ মানে 'পবিত্র চরিত্রের ভদ্র মহিলাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করে।' অর্থাৎ তাদের চরিত্রে মিথ্যা দোষ আরোপ করা তাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করার মত জঘন্য মারাত্মক, দুঃখজনক ও যন্ত্রণাদায়ক। رَمْىٌ শব্দ থেকে يَرْمُوْنَ এর শাব্দিক অর্থ তীর নিক্ষেপ করা যা কারো পরে তোহমত বা অপবাদ আরোপের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।–তাদাব্বুরে কুরআন

সতী-সাধ্বী মুমিন নারীগণ সরলমনা হওয়ার কারণে তারা নিজেদের বিরুদ্ধে অপবাদ রটনা সম্পর্কে উদাসীন ও অসতর্ক থাকে। কারণ তারা তো

এমন কিছু করেই না, যে জন্য সতর্ক থাকার প্রয়োজন হতে পারে। সুতরাং এমন মহিলাদের চরিত্রে কালীমা লেপন করা এমন এক অপরাধ যা একদিকে যেমন পাশবিক অন্যদিকে তেমনি নোংরা মানসিকতারও পরিচায়ক। সে জন্যে এমন এমন অপরাধে লিপ্ত লোকদেরকে অভিশাপ দেয়া হয়েছে। তারা দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনে আল্লাহর অভিশাপগ্রস্থ এবং তাঁর রহমত হতে বঞ্চিত। এরপর আখিরাতে তাকে কি ভয়াবহ পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে তাহলো এই—

সেদিন তাদের জিহ্বা, তাদের হাত, তাদের পা তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ দেবে। সেই সাক্ষ হবে সত্য ও বস্তুনিষ্ঠ। অথচ তারা যে অপবাদ রটাতো তা ছিল মিথ্যে। সেদিন আল্লাহ তাদের উপযুক্ত সঠিক বদলা দিবেন। তাদের অত্যন্ত নিখুঁত ও ন্যায়সংগত প্রতিফল দিবেন আর তাদের কৃতকর্মের নির্ভুল হিসেব নিবেন। সেদিন তাদের সকল সন্দেহ দূর হবে আর তারা জানতে পারবে যে আল্লাহই সুস্পষ্ট সত্য।–ফী যিলালিল কুরআন

সতের

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ط ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ○ وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ص وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ -

"হে নবী! মুমিন পুরুষদের বলুন, তারা যেন তাদের চোখকে বাঁচিয়ে চলে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে এটা তাদের জন্য পবিত্রতম নীতি। নিশ্চয়ই তারা যা করে আল্লাহ সে বিষয়ে অবহিত। আর মুমিন নারীগণকেও বলুন তারাও যেন তাদের চোখকে বাঁচিয়ে চলে। এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। আর তারা যেন নিজেদের দেহের যা সাধারণত প্রকাশমান তাছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। তারা যেন নিজেদের বক্ষদেশের উপর মাথার ওড়নার আঁচল দিয়ে ঢেকে রাখে, আর নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে।–সূরা আন নূর ঃ ৩১

সমাজে নর-নারী পরস্পর থেকে কিভাবে পর্দা করবে ?

সূরা আন নূরের আলোচ্য আয়াতসমূহ বনী মুস্তালিক যুদ্ধ অথবা মুরাইসী যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে সংঘটিত অপবাদ ঘটনার সাথে সাথে অবতীর্ণ হয়। এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ষষ্ঠ হিজরী সালে। এ আলোচনা থেকে জানা যায়, সূরা আন নূরের পর্দা সম্পর্কিত আয়াতসমূহ পরে এবং সূরা আহযাবের পর্দা সম্পর্কিত আয়াতসমূহ আগে নাযিল হয়। সূরা আহযাবের আয়াতসমূহ নাযিল হওয়ার সময় থেকেই পর্দার বিধানাবলী প্রবর্তিত হয়।

–তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন

আয়াতে يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ 'তাদের চোখকে বাঁচিয়ে চলে' বলা হয়েছে। يَغُضُّوْا শব্দটির মূল শব্দ غض এর অর্থ কোনো জিনিসকে মাত্রায় কমিয়ে দেয়া, হ্রাস করা ও নীচু করা। আরবীতেও غض بصر মানে চক্ষু নীচু করা বা নীচু করে রাখা। কিন্তু এর মানে সবসময়ই কেবল নীচের দিকে দেখা নয়, বরং এর প্রকৃত অর্থ পূর্ণ মাত্রায় ও পূর্ণ দৃষ্টিতে বা চোখ ভরে না দেখা এবং দেখার কাজ সম্পাদন করার জন্য চোখকে অবাধ ও লাগাম

শূন্য করে ছেড়ে না দেয়া। অবশ্য 'চোখ বাঁচিয়ে চলা' বললে আয়াতের অর্থ সম্যক প্রকাশ পায়। অর্থাৎ যে জিনিস দেখা অবাঞ্ছনীয়, তা থেকে চোখ বাঁচিয়ে ও সরিয়ে রাখা—সে জন্যে চোখ নীচু করুক বা অন্যদিকে ফিরিয়ে নিক—তাতে কোনো পার্থক্য নেই। আবার مِنْ اَبْصَارِهِمْ বলে বুঝানো হয়েছে যে সকল দৃষ্টি বাঁচিয়ে চলা বা ফিরিয়ে নেয়াটা উদ্দেশ্য নয় বরং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে কোনো কোনো দৃষ্টিকে ফিরিয়ে নেয়া ও বাঁচিয়ে চলা। অন্য কথায়, 'কোনো কিছুই চোখ ভরে দেখা যাবে না' একথা আল্লাহর উদ্দেশ্য নয়, বরং বিশেষ পরিবেশে দৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রিত করাই একথার উদ্দেশ্য। এখন পূর্বাপর মিলিয়ে পড়লে জানা যায়, এ নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে পুরুষদের পক্ষে নারীদের দেখা, অপরের লজ্জাস্থানের প্রতি তাকানো কিংবা নির্লজ্জ ধরনের জিনিসের উপর চোখ ফেলা ইত্যাদি কথার উপর।

পুরুষদের পর্দা

নিজের স্ত্রী অথবা মুহাররম মহিলা ছাড়া অন্য কোনো মহিলাকে চোখ ভরে দেখা কারো জন্য হালাল নয়। একবার হঠাৎ চোখ পড়ে গেলে তা তো মাফ হয়ে যাবে। কিন্তু প্রথম দৃষ্টিতে আকর্ষিত হয়ে পুনর্বার দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে তা মাফ হবে না। এরূপ দৃষ্টি নিক্ষেপকে নবী করীম স. চোখের যিনা বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন, মানুষ নিজের পূর্ণ অনুভূতি শক্তি ও ইন্দ্রিয় দিয়ে যিনা করে থাকে। চোখের যিনা হচ্ছে দেখা, রসের ও মনভোলানো কথাবার্তা হচ্ছে বাকশক্তির যিনা, কণ্ঠস্বর শুনে মনে স্বাদ আস্বাদন করা হচ্ছে শ্রবণশক্তির যিনা, স্পর্শ করা ও অবৈধ উদ্দেশ্যে চলা হচ্ছে হাত-পায়ের যিনা। যিনার এসব প্রাথমিক কাজ সম্পন্ন হয়ে গেলে লজ্জাস্থান বা যৌনাঙ্গ হয় কার্যত কাজটির পূর্ণতা বিধান করে নতুবা তা অপূর্ণ থেকে যায়।–বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ। হযরত আবু বুরাইদা রা-এর বর্ণনা এই যে ঃ নবী করীম স. হযরত আলী রা.-কে লক্ষ করে বলেছেন ঃ

يَا عَلِيُّ لاَتَتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَاِنَّ لَكَ الْاَوْلٰى وَلَيْسَتْ لَكَ الْاُخْرٰى - احمد، ترمذى، ابو داؤد، دارمى

"হে আলী! একবার দেখার পর আবার তাকাবে না। প্রথমবারের হঠাৎ দেখা মাফ হয়ে যাবে। কিন্তু দ্বিতীয়বার দেখলে তা মাফ হবে না।"

হযরত জরীর ইবনে আবদুল্লাহ বাজালী রা. বলেন, আমি নবী করীম স.-এর কাছে জানতে চাইলাম, হঠাৎ চোখ পড়ে গেলে কি করবো ? তিনি বললেন, অবিলম্বে চোখ ফিরিয়ে নাও অথবা নীচু করে দাও।–মুসলিম,

আহমদ, আবু দাউদ, নাসাঈ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বর্ণনা করেন, নবী করীম স. বলেছেন, আল্লাহ তাআলার ইরশাদ হয়েছে ঃ

اِنَّ النَّظْرَ سَهْمٌ مِّنْ سِهَامِ اِبْلِيْسَ مَسْمُوْمٌ مَنْ تَرَكَهَا مَخَافَتِىْ اَبْدَلْتُهُ اِيْمَانًا يَّجِدُ حَلاَوَتَهُ فِىْ قَلْبِهِ -

"দৃষ্টি তো ইবলীসের বিষাক্ত তীরগুলোর একটি। যে ব্যক্তি আমাকে ভয় করে এ দৃষ্টি ত্যাগ করবে, বিনিময়ে আমি তাকে এমন ঈমান দিব, যার স্বাদ সে অন্তরে অনুভব করবে।"–তিবরানী

আবু উমামার বর্ণনায় বলা হয়েছে নবী করীম স. বলেছেন ঃ

مَامِنْ مُّسْلِمٍ يَّنْظُرُ اِلٰى مَحَاسِنِ امْرَاَةٍ ثُمَّ يَغُضُّ بَصَرَهُ اِلاَّ اَخْلَفَ اللّٰهُ لَهُ عِبَادَةً يَّجِدُ حَلاَوَتَهَا -

"যে কোনো মুসলিমের দৃষ্টি কোনো নারীর উপর পড়ে আর সে ঐ দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল, তাহলে আল্লাহ তার ইবাদাতে স্বাদ ও আনন্দ সৃষ্টি করে দেবেন।"–মুসনাদে আহমদ

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ আনসারী রা. থেকে বর্ণিত আছে, বিদায় হজ্জের সময় নবী করীম স.-এর চাচাতো ভাই ফজল ইবনে আব্বাস রা. যিনি তখন যুবক বয়সের ছিলেন—মাশআরে হারাম থেকে ফিরে আসার সময় নবী করীম স.-এর সাথে একই উটের পিঠে সাওয়ার ছিলেন। পথে যখন স্ত্রীলোকেরা চলে যাচ্ছিল, তখন ফজল রা. তাদের প্রতি তাকাচ্ছিল। নবী করীম স. তাঁর মুখের উপর হাত রাখলেন ও তাঁকে অন্যদিকে ফিরিয়ে দিলেন। বিদায় হজ্জের সময়ের আরেকটি ঘটনা এই–খাসআম কবিলার এক স্ত্রীলোক পথের মধ্যে নবী করীম স.-কে থামিয়ে হজ্জ সম্পর্কে একটা মাসআলা জিজ্ঞেস করছিলেন। তখন ফজল ইবনে আব্বাস রা. তার প্রতি চোখ জমিয়ে অপলকনেত্রে তাকে দেখছিল। নবী করীম স. তার মুখ ধরে অন্যদিকে ফিরিয়ে দিলেন।–বুখারী, আবু দাউদ, তিরমিযী

উপরোল্লিখিত ঘটনারাজি থেকে কেউ যেন এমনটি না ভাবেন যে তখন বোধহয় মহিলারা খোলামুখে চলাফেরা করার অনুমতি পেয়েছিল। আর সে জন্যেই তাদের থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়ার ও নিচু করার নির্দেশ এসেছিল। না হয় চেহারা ঢেকে রাখার প্রচলন থাকলে তো চোখ বাঁচানোর আর না বাঁচানোর প্রশ্ন উঠতো না। কারণ বাস্তবে চেহারা ঢেকে রাখার পর্দা প্রচলিত থাকলেও কোনো কোনো সময় এমন অবস্থা দেখা যেতে পারে যখন একজন

নারী ও একজন পুরুষ মুখোমুখি হয়ে যেতে পারে। আর একজন পর্দানশীল স্ত্রীলোকও অনেক সময় নিজের চেহারা খুলে ফেলতে বাধ্য হতে পারে। তাছাড়া মুসলিম মহিলারা পর্দা করলেও এবং মুখ ঢেকে রাখলেও অমুসলিম মহিলাদের বেপর্দা চলাফেরা করার সমস্যা তো থেকেই যাবে। কাজেই চোখ নীচু করার হুকুমটি প্রমাণ করে না যে, মহিলারা বুঝি মুখ খোলা রেখে চলাফেরা করতো। কেননা সূরা আহযাবে পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার পর মুসলিম সমাজে যে পর্দা প্রথা চালু করা হয়, তাতে মুখাবয়বের পর্দাও শামিল ছিল। আর খোদ নবী করীম স.-এর জীবদ্দশাতেই যে তা কার্যকর হয়েছিল তা অনেকগুলো বর্ণনা থেকেই প্রমাণিত হয়। 'ইফ্ক'-এর ঘটনা সংক্রান্ত হযরত আয়েশা রা.-এর বর্ণনাসমূহ তো অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তাতে তিনি বলেন, জংগল হতে ফিরে এসে আমি যখন দেখলাম যে কাফেলা চলে গেছে। তখন আমি বসে পড়লাম, আর ঘুমের চাপ এতবেশী ছিল যে আমি সেখানে পড়ে ঘুমাতে লাগলাম। সকাল বেলা সাফওয়ান ইবনে মুয়াত্তাল সেস্থান দিয়ে যাওয়ার সময় দূর থেকে দেখলেন কে যেন পড়ে আছে। আর সেদিকে তিনি আসলেন।

فَعَرَفَنِىْ حِيْنَ رَأٰنِىْ وَكَانَ قَدْرَأٰنِىْ قَبْلَ الْحِجَابِ فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِيْنَ عَرَفَنِىْ فَخَمَّرْتُ وَجْهِىْ بِجِلْبَابِىْ-

"তিনি আমাকে দেখেই চিনতে পেলেন। কেননা পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার পূর্বে তিনি আমাকে দেখেছিলেন। আমাকে দেখেই তিনি 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ....." বলে উঠলেন। তাঁর এ আওয়াজ শুনেই আমি ঘুম থেকে জেগে উঠি। তখন আমি আমার চাদর দিয়ে আমার মুখ ঢেকে নিলাম।"–তাফহীমুল কুরআন–বুখারী, মুসলিম, আহমদ, ইবনে জরীর, সীরাতে ইবনে হিশাম থেকে।

আবু দাউদ শরীফের কিতাবুল জিহাদে একটি ঘটনার উল্লেখ প্রসংগে বলা হয়েছে, উম্মে খাল্লাদ নামী এক মহিলার পুত্র এক যুদ্ধে শহীদ হয়েছিল। মহিলাটি পুত্রের সম্পর্কে খবর নিতে নবী করীম স.-এর নিকট আসলো। তখন তার চেহারা চাদর দিয়ে ঢেকে রেখেছিল। কোনো কোনো সাহাবী বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, এমন মুহূর্তেও তোমার মুখাবয়বে নেকাব রয়েছে ! অর্থাৎ পুত্রের শহীদ হওয়ার খবর শুনে তো একজন মা এতদূর উদ্ভ্রান্ত হয়ে যায় যখন তার কাপড়-চোপড় বা দেহের ব্যাপারে কোনো হুঁশ থাকার কথা নয়। অথচ তুমি তো নিশ্চিন্তে বেশ পর্দা সহকারেই এখানে এসেছ। জবাবে মহিলাটি বললেন ঃ

ان ارزا ابنى فلن ارزا حيائى

"আমি আমার পুত্রকে তো হারিয়েছি, কিন্তু নিজের লজ্জা-শরম হারাইনি।"

আবু দাউদ শরীফে হযরত আয়েশা রা.-এর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, এক মহিলা পর্দার ভিতর থেকে হাত বাড়িয়ে নবী করীম স.-এর নিকট কোনো বিষয়ে দরখাস্ত পেশ করলে নবী করীম স. জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি মহিলার হাত না পুরুষের হাত ? সে ভিতর থেকে বললো এটা মহিলার হাত। তখন নবী করীম স. বললেন, মহিলার হাত হলে তো অন্তত নখগুলো মেহেদীর রঙ্গে রঙ্গীন করা উচিত ছিল।"

পূর্বে বর্ণিত রসূলুল্লাহ স.-এর চাচাত ভাই ফজল ইবনে আব্বাস রা. সম্পর্কিত বিদায় হজ্জ কালীন সময়ের দুটো ঘটনা নবী করীম স.-এর সময়ে চেহারার পর্দা চালু না হওয়ার কোনো দলিল হতে পারে না। কেননা ইহরামের পোশাকে মুখাবরণ ব্যবহার নিষিদ্ধ। এতদসত্ত্বেও এক্ষেত্রে সতর্ক মহিলারা পর পুরুষের সামনে মুখাবয়ব উন্মুক্ত করে দেয়া পসন্দ করতে পারে না। হযরত আয়েশা রা. বর্ণনা করেছেন, "বিদায় হজ্জের সফরে আমরা ইহরাম অবস্থায় মক্কার দিকে যাচ্ছিলাম। পথিক যখন আমাদের কাছাকাছি এসে পড়তো, তখন আমরা মহিলারা নিজেদের মাথার উপর থেকে চাদর টেনে মুখের উপর দিয়ে মুখাবয়ব ঢেকে ফেলতাম। আবার তারা চলে গেলে মুখ খুলে ফেলতাম।–আবু দাউদ

চক্ষু নীচু করা বা দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়ার হুকুমটার কিছু ব্যতিক্রমও আছে। যেমন কোনো পুরুষ কোনো মহিলাকে বিবাহ করতে চাইলে তাকে দেখা আবশ্যক—অন্ততপক্ষে মুস্তাহাব। মুগিরা ইবনে শো'বা রা. বর্ণনা করেছেন, "আমি একস্থানে বিবাহ প্রস্তাব পাঠালাম। নবী করীম স. জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি মেয়েটিকে দেখে নিয়েছ ? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, اُنْظُرْا اِلَيْهَا فَاِنَّهٗ احرى ان يؤدم بينكما "তুমি তাকে দেখে নাও, এতে তোমাদের উভয়ের মাঝে বনিবনা হবে বলে আশা করা যায়।–তাফহীমুল কুরআন–তিরমিযী, নাসাঈ, আহমদ, ইবনে মাজা, দারেমী থেকে।

হযরত আবু হুরাইরা রা. বলেন, এক ব্যক্তি কোথাও বিবাহের পয়গাম পাঠিয়েছিল, নবী করীম স. তাকে বললেন, اُنْظُرْ اليها فان فى اعين الانصار شيئًا "তুমি তাকে দেখে নাও, কেননা আনসার বংশের লোকদের চোখে কিছু দোষ থাকে।–তাফহীমুল কুরআন–মুসলিম, নাসাঈ, আহমদ থেকে।

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. বলেন, নবী করীম স. বলেছেন ঃ

اِذَا خَطَبَ اَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَقَدِرَ اَنْ يَّرَى مِنْهَا بَعْضَ مَا يَدْعُوْهُ اِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ

"তোমাদের কেউ যখন কোনো মেয়েকে বিবাহ করার প্রস্তাব দেয়, তখন যথাসম্ভব তাকে দেখে এ নিশ্চয়তা অর্জন করতে হবে যে, মহিলার মাঝে এমন কোনো গুণ বৈশিষ্ট্য আছে কিনা যা তাকে বিয়ে করার জন্য উদ্বুদ্ধ করার কারণ হতে পারে।"–আহমদ, আবু দাউদ, নাসাঈ

মুসনাদে আহমাদে আবু হুমায়দার বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, এ উদ্দেশ্যে মেয়ে দেখা সম্পর্কে নবী করীম স. বলেছেন, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ "এতে কোনো দোষ নেই।" স্ত্রীলোকটির অলক্ষে ও অজ্ঞাতে তাকে দেখে নেয়ারও অনুমতি রয়েছে। ফিকাহবিদগণ এ থেকে এ নীতি নির্ধারণ করেছেন যে, বিবাহ ছাড়া অন্যান্য প্রয়োজনেও মহিলাদের দেখা জায়েয আছে। যেমন, অপরাধ অনুসন্ধান ব্যাপদেশে কোনো স্ত্রীলোককে দেখা জায়েয। তেমনিভাবে আদালতে সাক্ষ্যদানের সময় বিচারকের কোনো সাক্ষী মহিলাকে দেখা। কিংবা চিকিৎসার জন্য চিকিৎসকের কোনো স্ত্রী রোগীকে দেখা ইত্যাদি।–তাফহীমুল কুরআন

মহিলাদের পর্দা

মহিলাদের জন্যও চক্ষু নীচু করে দেয়া বা দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়ার একই বিধান প্রযোজ্য। ইচ্ছে করে কোনো স্ত্রীলোকের জন্য পর পুরুষের প্রতি তাকানো উচিত নয়। কোনো পর পুরুষের প্রতি তাদের চোখ পড়লে তৎক্ষণাৎ চোখ ফিরিয়ে নেয়া কর্তব্য। অপরের লজ্জাস্থানের প্রতি তাকানো উচিত নয়। এ ক্ষেত্রে নারী পুরুষ পরস্পরের প্রতি তাকানো তেমনি পুরুষ পুরুষের লজ্জাস্থানের প্রতি আর নারী নারীর লজ্জাস্থানের প্রতি তাকানো একই পর্যায়ভুক্ত।

কিন্তু পুরুষদের মহিলার প্রতি তাকানো আর মহিলাদের পুরুষদের প্রতি তাকানোর বিষয়ে শরীয়তের বিধানে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। এ পর্যায়ে তাফহীমুল কুরআনে উল্লিখিত তিনটি হাদীসের তিনটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। এক. হযরত উম্মে সালমা ও হযরত মায়মুনা রা. নবী করীম স.-এর কাছে বসা ছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম রা. সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। নবী করীম স. উভয় স্ত্রীকে বললেন, اِحْتَجِبَا مِنْهُ তোমরা উভয়েই ওর থেকে পর্দা করো। তাঁরা উভয়ই তাঁকে বললেন ঃ

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلَيْسَ اَعْمٰى لَايُبْصِرُنَا وَلَا يَعْرِفُنَا ـ

"হে আল্লাহর রসূল ! এ লোকটি কি অন্ধ নয় ? ওতো আমাদের দেখতেও পাবে না চিনতেও পারবে না।"

তখন নবী করীম স. বললেন ঃ

اَفَعُمْيَانِ اَنْتُمَا اَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهٖ

"তোমরা দুজনও কি অন্ধ হয়ে গেছো ? তোমরা উভয়ে কি তাকে দেখতে পাবে না ?"

হযরত উম্মে সালমা রা. স্পষ্ট করে বলেছেন ঃ ذٰلِكَ بَعْدَ اَنْ اُمِرْنَ بِالْحِجَابِ এ ঘটনা পর্দার আদেশ নাযিল হওয়ার পর ঘটেছিল।-আহমদ, তিরিমিযী, আবু দাউদ

মুয়াত্তা কিতাবে উদ্ধৃত একটি বর্ণনা হতেও উক্ত বিষয়ের সমর্থন পাওয়া যায়। হযরত আয়েশা রা.-এর কাছে একজন অন্ধ লোক আসলো। তিনি তার থেকে পর্দা করলেন। তাঁকে বলা হলো, আপনি এর থেকে পর্দা করছেন, এতো আপনাকে দেখতে পায় না ? জবাবে উম্মুল মুমিনীন বললেন ঃ لكني انظر اليه "কিন্তু আমি তো তাকে দেখতে পারি।"-তাফহীমুল কুরআন

দুই. হযরত আয়েশা রা.-এর আর একটি বর্ণনাও আমরা দেখতে পাই। হিজরী ৭ম সনে আবিসিনিয়ার এক প্রতিনিধি দল মদীনায় আসে। তারা মসজিদে নববীর চৌহদ্দির মধ্যে একটা বিশেষ খেলার আয়োজন করে। নবী করীম স. নিজে হযরত আয়েশা রা.-কে এ খেলা দেখিয়েছিলেন।-বুখারী, মুসলিম, আহমদ, থেকে তাফহীমুল কুরআন।

তিন. ফাতেমা কায়েসকে তার স্বামী তালাক দিলে প্রশ্ন উঠেছিল সে কোথায় ইদ্দত পালন করবে ? প্রথমে নবী করীম স. বললেন, উম্মে শরীফ আনসারিয়ার কাছে বসবাস করো। পরে বললেন, তার সেখানে তো আমার সাহাবারা খুব বেশী আশা যাওয়া করে। (কেননা তিনি একজন বড় ধনী ও দানশীলা মহিলা ছিলেন। অনেক লোকই তার কাছে মেহমান হয়ে থাকতো, তিনি তাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতেন।) সুতরাং তুমি ইবনে উম্মে মাকতুমের ঘরে থাক। সে একজন অন্ধ ব্যক্তি। তুমি সেখানে কোনোরূপ অসুবিধা ছাড়াই থাকতে পারবে।-মুসলিম, আবু দাউদ

উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহ একত্রিত করলে জানা যায়, নারীদের পক্ষে পুরুষদের দেখার বিষয়টিতে অতটা কড়াকড়ি নেই যতটা পুরুষদের বেলায়

রয়েছে স্ত্রীলোকদের দেখার বিষয়ে। এক মজলিসে বসে দেখা নিষিদ্ধ কিন্তু পথের মধ্যে চলাচলের সময় কিংবা দূর থেকে কোনো বৈধ খেলাধূলা অবলোকন কালে পুরুষদের উপর দৃষ্টি পড়া নিষিদ্ধ নয়। কোনো প্রকৃত প্রয়োজন দেখা দিলে একই বাড়ীতে বসবাস করতে গিয়ে দেখায়ও কোনো দোষ নেই। ইমাম গাযালী ও ইবনে হাজার আসকালানীর বর্ণনা থেকেও প্রায় এ ধরনের কথাই পাওয়া যায়। ইমাম শওকানী 'নায়লুল আওতার' গ্রন্থে ইবনে হাজারের একথা উদ্ধৃত করেছেন। এটা জায়েয হওয়ার সমর্থন এ থেকেও পাওয়া যায় যে, স্ত্রীলোকদের বাইরে যাতায়াতের ব্যাপারটি সবসময় জায়েয রূপেই সমর্থিত হয়েছে। মসজিদে, হাট-বাজারে ও সফর ব্যাপদেশে মহিলারা মুখের উপর নেকাব রেখেই যাতায়াত করে। উদ্দেশ্য এই যে, পুরুষেরা যেন তাকে দেখতে না পারে। কিন্তু পুরুষদের তো কখনো চেহারায় নেকাব দিয়ে বাইরে যেতে বলা হয়নি যাতে করে মহিলারা তাদের দেখতে না পারে। এ থেকেই বুঝা যায় যে, নারী-পুরুষের পর্দার ব্যাপারে শরীয়তের বিধান একরূপ নয়—বরং ভিন্ন ভিন্ন। এতদসত্ত্বেও মহিলারা আগ্রহ সহকারে পরপুরুষকে দেখবে আর তাদের যৌবন সৌন্দর্য সুধায় চক্ষু পিপাসা মিটাবে—এটা কখনও জায়েয হতে পারে না।–তাফহীমুল কুরআন

সূরা আন নূরের ৩১ আয়াত যা নারী-পুরুষের পর্দা করার বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে তাতে নারী-পুরুষ উভয়কেই غض بصر অর্থাৎ পরস্পর থেকে চোখ ফিরিয়ে রাখার নির্দেশ দেয়ার পর তেমনি উভয়কেই পৃথকভাবে حفاظت فروج বা লজ্জাস্থানের হেফাযত করার জন্যেও নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে লজ্জাস্থান বা যৌনাঙ্গের হেফাযত করবে। অর্থাৎ অবৈধ যৌন লালসা চর্চা থেকে বিরত থাকবে। নিজেদের লজ্জাস্থান অপরের সামনে খুলতে কখনো প্রস্তুত হবে না। এ পর্যায়ে নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য শরীয়তের বিধান অভিন্ন। যদিও মহিলাদের 'সতর' বা লজ্জাস্থানের সীমানা পুরুষদের চেয়ে ভিন্ন পরিধির। আবার মহিলাদের লজ্জাস্থান পুরুষদের ব্যাপারে এক রকম আর তাদের সমজাতীয় লিংগ মহিলাদের জন্য আরেক রকম। পুরুষদের জন্য মহিলাদের সতর হাতের কব্জি ও মুখাবয়ব ছাড়া দেহের সমগ্র অংগ। সেসব অংগ স্বামী ছাড়া অন্য কোনো পুরুষের সামনে এমনকি নিজের পিতা ও ভাইয়ের সামনেও খোলা যাবে না। স্ত্রীলোকদের জন্য এমন পাতলা ও আঁটসাট পোশাক পরিধান করা উচিত নয়, যাতে দেহের অংগ-সৌষ্ঠব ও যৌবন-শ্রী বাইরে বিচ্ছুরিত হয়ে পড়তে পারে। হযরত আয়েশা রা. বলেন, তাঁর বোন হযরত আসমা বিনতে আবু বকর রা. রসূলে করীম স.-এর

সামনে আসলেন। তিনি ছিলেন খুব পাতলা কাপড় পরিহিতা। নবী করীম স. তখন মুখ ফিরিয়ে নিলেন আর বললেন ঃ

يَا اَسْمَاءَ اِنَّ الْمَرْأَةَ اِذَا بَلَغَتِ الْحَيْضَ لَمْ يُصْلِحْ لَهَا اَنْ يُّرٰى مِنْهَا اِلاَّ هٰذَا اَوْ هٰذَا وَاَشَارَ اِلٰى وَجْهِهٖ وَكَفَّيْهِ

"হে আসমা! জেনে রেখ, মেয়ে যখন বালেগা হয় তখন তার হাত-কব্জি ও মুখাবয়ব ছাড়া দেহের অন্য কোনো অংগ প্রকাশিত হওয়া উচিত নয়।"

অবশ্য নিজের পিতা ও ভাইয়ের দেহের এ পরিমাণ প্রকাশ করা যায় যে পরিমাণ কাজকর্ম করার জন্য আবশ্যক হয়। যেমন, আটা তৈরির জন্য আস্তিন গুটানো।

মহিলার সামনে মহিলার সতর হলো ঠিক একজন পুরুষের সামনে আরেকজন পুরুষের সতরের মত।

অর্থাৎ নাভী ও হাটুর মধ্যবর্তী অংশ। অবশ্য এর অর্থ এ নয় যে, মহিলারা একে অপরের সামনে অর্ধোলংগ হয়ে থাকবে। বরং একথার তাৎপর্য হলো হাঁটু ও নাভীর মধ্যবর্তী অংশ ঢেকে রাখা ফরয। অন্যান্য অংশ অন্য মহিলার সামনে ঢেকে রাখা ফরয নয়।-তাফহীমুল কুরআন

আলোচ্য আয়াতে নারী-পুরুষের দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ ও যৌনাঙ্গের হেফাযত সংক্রান্ত বিধান আলোচনার পর وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا "আর তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তবে যা এমনিতেই প্রকাশমান।" বলে মহিলাদের বিষয়ে বিশেষভাবে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। বলা হচ্ছে তাদের পুরুষদের চেয়ে অতিরিক্ত যে বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত, তাহলো মহিলারা নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ করতে পারবে না। উক্ত বাক্যাংশে বলা হয়েছে তারা যেন নিজেদের সৌন্দর্য, সাজ-সজ্জা প্রকাশ করে না বেড়ায়। তবে যা আপনা হতে এমনিতেই প্রকাশ হয়ে পড়ে, তা দূষণীয় নয়। এখানে তবে আপনা হতে যা প্রকাশ হয়ে পড়ে—যেমন চাদরটা বাতাসে উড়ে পড়লো আর তাতে সৌন্দর্য ও সাজসজ্জা কিছুটা প্রকাশিত হয়ে পড়লো। এটা তো স্বেচ্ছায় সৌন্দর্য প্রকাশের আওতায় নয়। তবে যা আপনিতে প্রকাশিত অবস্থায় থাকে যেমন এমন চাদর যা গায়ে জড়ানো হয়েছে। কেননা এ চাদর তো আর ঢেকে রাখা বা লুকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। অধিকন্তু মহিলার দেহাবরণ হওয়ার কারণে তাতে কিছুটা আকর্ষণ থেকেই যায়। সেজন্য তো আল্লাহর পক্ষ থেকে পাকড়াও হবে না। এ আয়াতের এমন

অর্থই বুঝিয়েছেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা., হাসান বসরী, ইবনে সীরীন ও ইবরাহীম নখঈ, প্রমুখ মনীষী।

নবী করীম স.-এর যামানায় পর্দার হুকুম নাযিল হওয়ার পর সমাজের মহিলারা মুখ খোলা রেখে চলতো না। মুখাবয়ব আবৃত করা ও পর্দার বিধানের অন্তর্ভুক্ত ছিল। 'ইহরাম' ছাড়া অন্য সব অবস্থাতেই মুখাবরণকে মহিলাদের পোশাকের একটি অপরিহার্য অংশ রূপে ঘোষণা করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য এ পর্যায়ে কেউ কেউ বলেন যে, মুখ ও হাত মহিলাদের সতরের মধ্যে শামিল নয়। অথচ সতর ও পর্দার মাঝে আকাশ-পাতাল পার্থক্য বিরাজমান। 'সতর' হলো যা মুহাররম পুরুষদের সামনেও অনাবৃত ও উন্মুক্ত করা জায়েয নয়। আর 'পর্দা' ও তো 'সতর' থেকেও অধিক এবং ব্যাপক যাকে নারী ও গায়ের মুহাররম পুরুষের মধ্যে অন্তরায় করে দেয়া হয়েছে। আর এখানে তো আলোচনাটা হচ্ছে 'পর্দা' সম্পর্কে সতর সম্পর্কে নয়।–তাফহীমুল কুরআন

আয়াতের শেষাংশে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তারা যেন নিজেদের বুকের উপর মাথার ওড়নার আঁচল দিয়ে ঢেকে রাখে। জাহেলিয়াতের যামানায় নারীরা মাথার উপর এক প্রকার চাদর দিয়ে পেছনে খোপা বেঁধে রাখতো। সামনের দিকের বোতাম থাকতো খোলা। এতে করে গলা ও বুকের উপরাংশ স্পষ্টভাবে দেখা যেতো। বুকের উপর জামা ছাড়া আর কিছুই থাকতো না। পেছনের দিকে দুটি বা তিনটি চুলের মুঠি বা বেণী ঝুলিয়ে রাখতো। এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর মুসলিম নারীদের মধ্যে দোপাট্টা ব্যবহার করার রেওয়াজ চালু হয়। আধুনিকা যুবতীদের মতো তা ভাঁজ করে শুধু গলদেশে সাপের মতো বেড়ী দিয়ে ফেলে রাখাই দোপাট্টা ব্যবহারের উদ্দেশ্য ছিল না। বরং উদ্দেশ্য ছিল তা দিয়ে মাথা, বুক ও কোমর—সব অংগ ভালভাবে ঢেকে রাখা। ঈমানদার মহিলারা কুরআনের এ নির্দেশ শুনেই অবিলম্বে সে মোতাবেক আমল করতে শুরু করেন। এরি প্রশংসা করে হযরত আয়েশা রা. বলেছেন, যখন সূরাটি নাযিল হয়, তখন নবী করীম স. থেকে তা শুনে লোকেরা নিজেদের ঘরে ফিরে এসে নিজেদের স্ত্রী, কন্যা ও বোনদের এ আয়াত শুনায়। আনসার বংশের কোনো স্ত্রীলোকই এমন ছিল না যে, আয়াতটি শুনে নিজের জায়গায় বসে রয়েছিল। বরং প্রত্যেকে উঠে কেউ নিজ কোমর থেকে কাপড় খুলে, কেউ গায়ের চাদর উঠিয়ে দোপাট্টা বানিয়ে সর্বাংগ জড়িয়ে রাখলো। পরদিন ফযরের জামায়াতে যত মহিলারা মসজিদে নববীতে উপস্থিত হলো, তারা সবাই দোপাট্টা পরেছিল। এ পর্যায়ে আরেকটি বর্ণনায় হযরত আয়েশা রা. ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, মহিলারা পাতলা কাপড়

পরিত্যাগ করে মোটা কাপড় বাছাই করে দোপাট্টা বানিয়ে নিয়েছিল।
–ইবনে কাসীর, আবু দাউদ, কিতাবুল লিবাস

দোপাট্টা পাতলা কাপড়ে হওয়া উচিত নয়। তাই আনসার বংশের মহিলারা এ হুকুম শুনার সাথে সাথে বুঝেছিলো যে কোন্ ধরনের কাপড় দিয়ে দোপাট্টা তৈরি করলে এ হুকুমের উদ্দেশ্য পূরণ হতে পারে। নবী করীম স. কথাটি বুঝে নেয়ার বিষয়টি লোকদের উপর ছেড়ে দেননি। বরং নিজেই তা স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন, হযরত দাহইয়ায়ে কলবী রা. বলেন, নবী করীম স.-এর কাছে মিসরের তৈরি পাতলা মলমলের কাপড় আসলো, তিনি তা থেকে এক টুকরা আমাকে দিয়ে বললেন, এটির একাংশ দিয়ে তোমার নিজের জামা তৈরি করো, আরেক অংশ দিয়ে তোমার স্ত্রীর দোপাট্টা বানিয়ে দাও। কিন্তু তোমার স্ত্রীকে বলে দিবে যে, এটির নীচে যেন আরেক খণ্ড কাপড় লাগিয়ে দেয়, যাতে করে ভিতর থেকে দেহসৌষ্ঠব প্রদর্শিত না হয় বা তা বিচ্ছুরিত হয়ে না পড়ে।–আবু দাউদ, কিতাবুল লিবাস

পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত কতিপয় মুহাররম ব্যক্তি ছাড়া একজন স্ত্রীলোক নিজের পূর্ণ অলংকার ও সাজ-সজ্জা সহকারে আযাদী প্রদর্শীর মাধ্যমে অন্য কোনো লোকের মধ্যে চলাফেরা করতে পারে না। এদের বাইরে যারা থাকবে তারা আত্মীয় হোক বা অনাত্মীয় তাদের সামনে কোনো মহিলা স্বীয় সাজ-সজ্জা সহকারে আসতে পারে না।–তাফহীমুল কুরআন

❐

আঠার

وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَائِهِنَّ اَوْ اٰبَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَائِهِنَّ
اَوْ اَبْنَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِىْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِىْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ
نِسَائِهِنَّ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ
اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَاءِ ص وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ
لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ط وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○

"মুসলিম নারীগণ তাদের সাজ-সজ্জা প্রকাশ করতে পারবে কেবল তাদের স্বামী, তাদের পিতা, তাদের শ্বশুর, তাদের ছেলে, তাদের স্বামীর (অন্য স্ত্রীর) ছেলে, তাদের ভাই, তাদের ভাইয়ের ছেলে, তাদের বোনের ছেলে, তাদের মেলা-মেশার মহিলাগণ, নিজেদের অধিকারভুক্ত দাসীগণ, যৌন কামনামুক্ত পুরুষ এবং এমন বালকগণ, যারা নারীদের গোপন বিষয় সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নয়। তারা যেন এমনভাবে পদচারনা না করে যাতে তাদের গোপন করা সাজ-সজ্জা প্রকাশিত হয়ে পড়ে, আর তোমরা মুমিনগণ, সবাই আল্লাহর কাছে তাওবা করো যেন সফলকাম হতে পার।"–সূরা আন নূর ঃ ৩১

যাদের সাথে মহিলাদের পর্দা না করা ও দেখা দেয়া জায়েয

আলোচ্য আয়াতে মহিলাদের যাদের সাথে দেখা দেয়া পর্দা না করা যাবে তাদের সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে বারজন এমন পুরুষের উল্লেখ করা হয়েছে যাদের সাথে পর্দা করা প্রয়োজনীয় নয়—যাদের সামনে মহিলারা সাজগোজ করে দেখা দিতে পারে। আয়াতে বর্ণিত ৮ প্রকার মুহাররম পুরুষ এবং ৪ প্রকার অন্যান্য পুরুষের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। পর্দার ব্যতিক্রমী এ বারজন থেকে মহিলাদের পর্দা না করার কারণ দুটো। এক. পর্দার ব্যতিক্রমী এ বারজন পুরুষ এমন যে, এদের থেকে মহিলাদের কোনো অনর্থের বা সমস্যা দেখা দেয়ার আশংকা নেই। তারা এমন স্বভাবের যে আল্লাহ তাআলা তাদের স্বভাবকে সৃষ্টিগতভাবে এমন করে তৈরি করেছেন

যে, এরা নারীর সতীত্ব রক্ষা করে। স্বয়ং তাদের পক্ষ থেকে কোনো অনর্থের আশংকা নেই। দুই. সদাসর্বদা একই জায়গায় বসবাস করার প্রয়োজনেও মানুষ পরস্পর সরল-সহজ সম্পর্ক বজায় রাখে। উল্লেখ্য, স্বামী ছাড়া অন্যান্য যেসব ব্যতিক্রমী পুরুষ রয়েছে—এটা পর্দার বিধান থেকে ব্যতিক্রমী—গোপন অংগ অনাবৃত করা থেকে ব্যতিক্রম নয়। নারীর যেসব অংগ নামাযে খোলা রাখা জায়েয নয় তা দেখা মুহাররমদের জন্যও জায়েয নয়।

—মাআরেফুল কুরআন

ফিকাহবিদদের পরিভাষায় যাদের সাথে বিবাহ জায়েয নেই তাদেরকে মুহাররম বলা হয়। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে সেই অর্থ উদ্দেশ্য নয়। আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত বার প্রকারের ব্যতিক্রমী পুরুষের বিবরণী নিম্নরূপ ঃ

প্রথম, স্বামী ; যার সাথে স্ত্রীর কোনো অংগের পর্দা নেই। তবে বিনা প্রয়োজনে বিশেষ অংগ না দেখাই উত্তম। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. বলেন, مَا رَأَى مِنِّي وَمَا رَأَيْتُ مِنْهُ অর্থাৎ রসূলুল্লাহ স. আমার বিশেষ অংগ দেখেননি, আর আমিও তাঁর দেখিনি। **দ্বিতীয়** পিতা ; দাদা, পরদাদা সবাই এর অন্তর্ভুক্ত। **তৃতীয়**, শ্বশুর ; তাতেও স্বামীর দাদা, পরদাদা অন্তর্ভুক্ত আছে। **চতুর্থ**, নিজ গর্ভজাত পুত্র। **পঞ্চম**, স্বামীর অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র। **ষষ্ঠ**, ভাই, সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় সবাই এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু মামা, খালা ও ফুফুর পুত্র—যাদের সাধারণ ভাই বলা হয়ে থাকে, তারা এ ব্যতিক্রমীদের অন্তর্ভুক্ত নয়। অর্থাৎ তাদের সাথে দেখা দেয়া জায়েয নেই। **সপ্তম**, ভাতিজা (ভাইয়ের পুত্র) এখানেও শুধু সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় ভ্রাতার পুত্র বুঝানো হয়েছে। অন্যরা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। **অষ্টম**, বোনের ছেলে। এখানেও সহোদরা, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় বোন বুঝানো হয়েছে। এ আট প্রকার পুরুষ হলো মুহাররাম। **নবম**, أَوْ نِسَائِهِنَّ অর্থাৎ নিজেদের স্ত্রীলোক উদ্দেশ্য মুসলিম নারী। তাদের সামনেও যেসব অংগ খোলা যায় যেগুলো নিজ পিতা ও পুত্রের সামনে খোলা যায়। পূর্বেও বলা হয়েছে, এ ব্যতিক্রম পর্দার বিধান থেকে গোপন অংগ আবৃত করা থেকে নয়। তাই নারী যেসব অংগ মুহাররাম পুরুষের সামনে খুলতে পারে না সেসব অংগ কোনো মুসলিম মহিলার সামনেও খোলা জায়েয নয়। তবে চিকিৎসা ইত্যাদি প্রয়োজনে খোলা ভিন্ন কথা। 'মুসলিম নারী' বলার কারণে কাফির মুশরিক নারীদের থেকেও পর্দা করা ওয়াজিব। তারা বেগানা পুরুষদের মধ্যে গণ্য। **দশম**, প্রকার ব্যতিক্রমী পুরুষ হলো নারীদের মালিকানাধীন লোক। এতে দাস-দাসী উভয়ই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু অধিকাংশ ফিকহ্‌বিদের মতে এখানে শুধু দাসী বুঝানো হয়েছে। পুরুষ দাস এ

হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাদের কাছে সাধারণ মুহাররমের মত পর্দা করা ওয়াজিব। হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব তাঁর সর্বশেষ উক্তিতে বলেন ঃ لايغرنكم اية النور فانه فى الاماء دون الذكور তোমরা সূরা আন নূরের আয়াতে এ অর্থ গ্রহণ করো না যে ملكت ايمانكم শব্দের মধ্যে দাসরাও শামিল রয়েছে। এ আয়াতে শুধু দাসীদেরকে বুঝানো হয়েছে। পুরুষ দাস এর অন্তর্ভুক্ত নয়। **একাদশ**, পর্দার ব্যতিক্রমী পুরুষ হলো যৌন কামনা মুক্ত পুরুষ লোক। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, এখানে এমন নির্বোধ ও ইন্দ্রিয়বিকল ধরনের লোক বুঝানো হয়েছে যাদের নারীর প্রতি কোনো আগ্রহ, উত্তেজনা ও ঔৎসুক্যই নেই।–ইবনে কাসীর আয়াতে এমনসব পুরুষকে বুঝানো হয়েছে যাদের মধ্যে নারীদের প্রতি কোনো আগ্রহ ও কামভাব নেই এবং তাদের রূপগুণের প্রতিও কোনো ঔৎসুক্য নেই যে, অপরের কাছে গিয়ে বর্ণনা করবে। তবে নপুংসক ধরনের লোক যারা নারীদের বিশেষ গুণাবলীর সাথে সম্পর্ক রাখে তাদের থেকেও পর্দা করা ওয়াজিব। হযরত আয়েশা রা.-এর হাদীসে আছে, জনৈক নপুংসক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ স.-এর বিবিদের কাছে আসা-যাওয়া করতো। বিবিগণ তাকে আয়াতে বর্ণিত কামভাবমুক্ত পুরুষ মনে করে তার সামনে আগমন করতেন। রসূলুল্লাহ স. তাকে গৃহে প্রবেশ করতে নিষেধ করে দিলেন। এ কারণেই ইবনে হজর মক্কী মিনহাজের টীকায় বলেন, পুরুষ যদিও পুরুষত্বহীন লিংগ কর্তিত অথবা খুব বেশী বৃদ্ধ হয় তবুও সে غير اولى الاربة শব্দের অন্তর্ভুক্ত নয়। তার থেকে পর্দা করা ওয়াজিব। **দ্বাদশ প্রকার**, এমন অল্প বয়স্ক বালক যে নারীদের বিশেষ আকর্ষণ, কমনীয়তা ও গতিবিধি সম্পর্কে সম্পূর্ণ বেখবর। ইমাম জাস্‌সাস বলেন, এখানে এমন বালককে বুঝানো হয়েছে যে বিশেষ কাজ-কারবারের দিক থেকে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য বুঝে না।"–মাআরেফুল কুরআন

আলোচ্য আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ "মুমিন নারীগণ যেন এমনভাবে পদচারণা না করে যাতে করে তাদের গোপন রাখা সাজসজ্জা প্রকাশিত হয়ে পড়ে।" এ পর্যায়ে নবী করীম স. এ হুকুমকে কেবলমাত্র অলংকারাদির সুর-ঝংকার পর্যন্ত সীমিত রাখেননি। বরং তিনি এ থেকে এ মূলনীতি ঠিক করেছেন যে, দৃষ্টি ছাড়াও যেসব জিনিস যৌন অনুভূতিকে উত্তেজিত করে সেসবও ঐ উদ্দেশ্যের খেলাফ, যে জন্যে আল্লাহ তাআলা নারীদেরকে নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ করতে নিষেধ করেছেন। এজন্যেই তো তিনি নারীদের নির্দেশ দিলেন, "সুগন্ধি লাগিয়ে বের হবে না।"

হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম স. বলেছেন ঃ

لَا تَمْنَعُوا اِمَاءَ اللّٰهِ مَسٰجِدَ اللّٰهِ وَلٰكِنْ لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلَاتٌ ـ

"আল্লাহর বান্দী নারীদেরকে আল্লাহর মসজিদ থেকে নিষেধ করো না। তবে তারা যেন সুগন্ধি মেখে বাইরে না আসে।"–আবু দাউদ, আহমদ, তাফহীমুল কুরআন

আরেকটি হাদীসে বলা হয়েছে, এক মহিলা মসজিদ থেকে বের হয়ে যাচ্ছিল, হযরত আবু হুরাইরা রা. তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি অনুভব করলেন যে মহিলাটি সুগন্ধি ব্যবহার করেছে। তিনি তাকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হে মহাশক্তিমান আল্লাহর বান্দী ! তুমি মসজিদ থেকে আসছো ? সে বললো, জি-হাঁ। তিনি বললেন, আমি আমার প্রিয়নবী আবুল কাসেম স.-কে বলতে শুনেছি—যে মহিলা মসজিদে সুগন্ধি মেখে আসবে, তার নামায ততক্ষণ পর্যন্ত কবুল হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে ঘরে গিয়ে অপবিত্রতার গোসল—ফরয গোসল সেরে না নেয়।-আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, আহমদ, নাসাঈ–তাফহীমুল কুরআন

হযরত আবু মূসা আশআরী রা. বলেন, নবী করীম স. বলেছেন ঃ

اِذَا اسْتَعْطَرَتِ الْمَرْأَةُ فَمَرَّتْ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوا رِيْحَهَا فَهِيَ كَذَا وَكَذَا

..... قَالَ قَوْلاً شَدِيْدًا ـ

"যে মহিলা আতর-সুগন্ধি লাগিয়ে পথে-ঘাটে চলাফেরা করে এ উদ্দেশ্যে যে এতে লোকেরা মেতে উঠবে—সে তো এমন এমন ..... খুব শক্ত কথাই বললেন তিনি।–তিরমিযী, নাসাঈ, আবু দাউদ

প্রয়োজন ছাড়াও মহিলারা নিজেদের কণ্ঠস্বর পর-পুরুষদের শোনাবে —তা নবী করীম স. আদৌ পসন্দ করতেন না। প্রয়োজন বশতঃ কথা বলার অনুমতি তো স্বয়ং কুরআন মজীদই দিয়েছে। নবী করীম স.-এর স্ত্রীগণ তো লোকদেরকে দীনি বা নৈতিক মাসয়ালা-মাসায়েল বলে দিতেন। যেখানে এমন কোনো দীনি প্রয়োজন বা নৈতিক ফায়দা নেই, সেখানে পর-পুরুষদেরকে মহিলাদের আওয়ায শুনানো আদৌ সমর্থনযোগ্য নয়। এজন্যে নামাযে ইমাম ভুল করলে কেবল পুরুষ নামাযীদের হুকুম করা হয়েছে, তারা 'আল্লাহু আকবার' বা 'সুবহানাল্লাহ' বলে ইমামকে সংশোধন করে দেবে। অথচ মহিলাদের বলা হয়েছে, তারা হাতে হাত মেরে শব্দ করে ইমামকে সাবধান করবে। বলা হয়েছে, التسبيح للرجال والتصفيق

للنساء -বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাযাহ, নাসাঈ, তাফহীমুল কুরআন।

নারীর অলংকারের আওয়ায বেগানা পুরুষকে শোনানো জায়েয নেই। আয়াতের শুরুতে বেগানা পুরুষদের কাছে নারীদের সাজসজ্জা প্রকাশ করতে নিষেধ করা হয়েছে। উপসংহারে এর প্রতি আরও জোর দেয়া হয়েছে যে, সাজসজ্জার স্থান মস্তক, বক্ষদেশ ইত্যাদি আবৃত করা তো ওয়াজিব ছিলই—গোপন সাজসজ্জা যে কোনোভাবেই প্রকাশ হোক, তাও জায়েয নয়। অলংকারাদির ভিতর এমন জিনিস রাখা যদ্দরুণ অলংকার ঝংকৃত হতে থাকে কিংবা অলংকারাদির পারস্পরিক সংঘর্ষের কারণে বাজা, কিংবা মাটিতে সজোরে পা রাখা, যার ফলে অলংকারের শব্দ হয় এবং তা বেগানা পুরুষের কানে পৌঁছে—এসব বিষয় আলোচ্য আয়াতের আলোকে নাজায়েয। এজন্যেই অনেক ফিকহবিদ বলেন, যখন অলংকারের আওয়ায বেগানা পুরুষকে শোনানো এ আয়াত দ্বারা অবৈধ প্রমাণিত হলো, তখন স্বয়ং নারীর আওয়ায আরও কঠোর এবং প্রশ্নাতীতরূপে অবৈধ হবে। তাই তাঁরা নারীর আওয়াযকেও গোপন অংগের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। 'নাওয়াযেল' গ্রন্থে বলা হয়েছে যতদূর সম্ভব নারীগণকে কুরআন শিক্ষা নারীদের থেকেই গ্রহণ করা উচিত। অবশ্য নিরুপায় অবস্থায় পুরুষদের থেকে গ্রহণ করা জায়েয।

সহীহ আল বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, নামাযে যদি কেউ মুসল্লির সন্মুখ দিয়ে পথ অতিক্রম করতে থাকে তবে পুরুষ মুসল্লির উচিত 'সুবহানাল্লাহ' বলে তাকে সতর্ক করে দেয়া। কিন্তু নারী আওয়ায করতে পারবে না ; বরং সে এক হাতের পিঠে অন্য হাত মেরে তাকে সতর্ক করে দেবে।–মাআরেফুল কুরআন

এতে আরও প্রমাণিত হয় যে, নারীরাও মসজিদে নামাযের জামায়াতে শরীক হতো।

নারীর আওয়ায গোপন অংগের অন্তর্ভুক্ত কিনা এবং বেগানা পুরুষকে আওয়ায শোনানো জায়েয কিনা—এ সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ রয়েছে। ইমাম শাফেঈ র.-এর গ্রন্থসমূহে নারীর আওয়াযকে গোপন অংগের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। হানাফীগণের উক্তি বিভিন্নরূপ। ইবনে হুমাম নাওয়াযেল-এর বর্ণনার ভিত্তিতে গোপন অংগের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। হানাফীগণের মতে মহিলার আযান মাকরূহ। তবে হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ স.-এর স্ত্রীগণ পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার পরেও পর্দার আড়ালে থেকে বেগানা পুরুষদের সাথে কথাবার্তা বলেছেন। উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বিশুদ্ধ ও অধিক সত্য কথা এই যে, যেখানে মহিলার

আওয়াযের কারণে অনর্থ সৃষ্টি হওয়ার আশংকা থাকে সেখানে তা নিষিদ্ধ ; আর যেখানে আশংকা নেই সেখানে তা জায়েয।-(জাস্‌সাস) কিন্তু অপ্রয়োজনে পর্দার অন্তরাল থেকেও কথাবার্তা না বলার মধ্যে সাবধানতা নিহিত। নারী বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন থাকলে সে বাইরে যাবে। তবে পর্দা সহকারে। এবং সুগন্ধি লাগিয়ে নয়। কেননা, সুগন্ধিও গোপন সাজ-সজ্জারও অন্তর্ভুক্ত। বেগানা পুরুষের কাছে ঐ সুগন্ধি পৌঁছা 'নাজায়েয'। তিরমিযী শরীফে হযরত আবু মূসা আশআরীর হাদীসে সুগন্ধি লাগিয়ে বাইরে গমনকারী নারীর নিন্দা করা হয়েছে।

সুশোভিত বোরকা পরিধান করে বের হওয়াও জায়েয নয়। ইমাম জাস্‌সাস বলেন, কুরআনুল করীম নারীর আওয়াযকেও যখন নিষিদ্ধ করেছে, তখন সুশোভিত রঙীন ও কারুকার্যখচিত বোরকা পরিধান করে বের হওয়া আরও কঠোররূপে নিষিদ্ধ। এতে আরো বুঝা গেল যে, নারীর চেহারা যদিও গোপন অংগের অন্তর্ভুক্ত নয়, কিন্তু তা সৌন্দর্যের সর্ববৃহৎ কেন্দ্র হওয়ার কারণে একেও আবৃত রাখা ওয়াজিব। তবে প্রয়োজনের কথা স্বতন্ত্র।-[জাস্‌সাস থেকে মাআরেফুল কুরআন]

আলোচ্য আয়াতের সর্বশেষে বলা হয়েছে ঃ

وَتُوبُوٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○

"তোমরা সবাই আল্লাহর কাছে তাওবা করো, হে মুমিনগণ! যেন তোমরা কল্যাণ ও সফলতা লাভ করতে পারো।"

আলোচ্য আয়াতে প্রথমে পুরুষদেরকে দৃষ্টি নত রাখার ও লজ্জাস্থান হেফাযতের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তারপর মহিলাদেরও তেমনি হুকুম দেয়া হয়েছে অতপর নারীদেরকে বেগানা পুরুষদের থেকে পর্দা করার জন্য আলাদা আলাদা আদেশ দেয়া হয়েছে। সর্বশেষে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তাহলো কাম-প্রবৃত্তি ব্যাপারটি খুবই সূক্ষ্ম। অপরের তা জানা কঠিন। কিন্তু আল্লাহ তাআলার কাছে প্রত্যেক প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য বিষয় সমান দেদীপ্যমান। তাই উপরোল্লিখিত বিধানসমূহে যদি কোনো সময় কারো দ্বারা কোনো ত্রুটি হয়ে যায়, তবে সে জন্যে তাওবা করা খুবই জরুরী। সে অতীত কর্মের জন্য তাওবা করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে এবং ভবিষ্যতে এরূপ না করার জন্য দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করবে।

এ ক্ষেত্রে প্রদত্ত হুকুম আহকাম নাযিল হওয়ার পর নবী করীম স. কুরআনের ভাবধারা অনুসারে ইসলামী সমাজে যেসব সংশোধনী কার্যকর করেছিলেন, তার অতি সংক্ষিপ্ত কিছু বিষয় নিম্নরূপ ঃ

এক. নবী করীম স. কোনো মুহরিম আত্মীয়ের অনুপস্থিতিতে অন্য লোকদের সাথে (এমনকি আত্মীয় হলেও) কোনো মহিলার একাকীত্বে দেখা-সাক্ষাত করা বা একত্রে বসা ও চলাফেরা করা নিষেধ করে দিয়েছেন। যেমন হযরত যাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. বলেন, নবী করীম স. বলেছেন ঃ

لاَ تَلِجُوْا عَلَى الْمُغِيْبَاتِ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِىْ مِنْ اَحَدِكُمْ مَجْرَى الدَّمِ

"স্বামী অনুপস্থিত—এমন স্ত্রীলোকদের কাছে তোমরা যাবে না। কেননা শয়তান তোমাদের প্রত্যেকের রক্ত ধারায় (শিরা-উপশিরায়) প্রবাহিত হয়।"–তিরমিযী

তাঁর অপর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, নবী করীম স. বলেছেন ঃ

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلاَ يَخْلُوْا بِامْرَاَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُوْ مُحْرِمٍ مِّنْهَا - فَاِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ -

"যে লোক আল্লাহ ও পরকালের উপর ঈমান রাখে সে কখনো একাকিত্বে কোনো মহিলার সাথে বসবে না, যতক্ষণ সে মহিলার সাথে তার কোনো মুহরিম পুরুষ উপস্থিত না থাকবে। কেননা তা করলে সেখানে তৃতীয় লোক থাকে শয়তান।"–আহমদ

ইমাম আহমদ আমের ইবনে রবীআ প্রায় এরূপ অর্থেরই আর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

এ ব্যাপারে নবী করীম স.-এর নিজের সতর্কতার অবস্থা ছিল এই ঃ একবার রাত্রিকালে তিনি হযরত সফিয়া রা.-কে সাথে করে তাঁর ঘরের দিকে ফিরছিলেন। পথিমধ্যে দুজন আনসারী তাঁদের অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন। তিনি তাদের থামিয়ে বললেন, "আমার সাথে আমার স্ত্রী সফিয়া, অন্য কেউ নয়। তাঁরা বললেন, হে রসূল! আল্লাহ পাক তো পবিত্র। আপনার সম্পর্কে কি আমাদের কোনো খারাপ ধারণা হতে পারে ?" নবী করীম স. বললেন, "শয়তান ব্যক্তির দেহে রক্তের মতই প্রবাহিত হয়। সে তোমাদের মনে আমার সম্পর্কে যেন কোনো খারাপ ধারণা সৃষ্টি করতে না পারে সে আশংকায়ই আমি তোমাদের কাছে একথা বলা দরকার মনে করেছি।"–আবু দাউদ-কিতাবুস সওম থেকে তাফহীমুল কুরআন

দুই. বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম স. এক ভাষণে বলেছিলেন ঃ

لاَيَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَاَةٍ اِلاَّ وَمَعَهَا ذُوْ مُحْرِمٍ وَلاَ تُسَافِرُ الْمَرْاَةُ اِلاَّ مَعَ ذِىْ مُحْرِمٍ

কোনো পুরুষ কোনো পরনারীর সাথে নিভৃতে মিলিত হবে না, যতক্ষণ না তার সাথে কোনো 'মুহরিম পুরুষ উপস্থিত থাকে। আর কোনো মহিলা কোনো মুহরিম পুরুষ সংগী ছাড়া একাকিনী কোনো দূরবর্তী স্থানে সফর করবে না। এক ব্যক্তি বলে উঠলো, আমার স্ত্রী হজ্জে যাচ্ছে। আর আমার নাম তো অমুক অভিযানে গমনকারীদের তালিকায় লিস্ট ভুক্ত হয়ে আছে। এখন কি করা যাবে ? নবী করীম স. বললেন ঃ

فَانْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَاَتِكَ

"তাহলে তুমি চলে যাও, তোমার স্ত্রীর সাথে গিয়ে হজ্জ করো।"

নির্ভরযোগ্য হাদীস গ্রন্থাবলীতে এ বিষয়ে বহু সংখ্যক হাদীস ইবনে উমর রা., আবু সাঈদ খুদরী রা. ও আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত ও উদ্ধৃত হয়েছে। এসব হাদীসের বক্তব্যে শুধু সফরের মেয়াদ কিংবা দূরত্বের ব্যাপারে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু সব কটি হাদীসই একত্রে ঘোষণা করে যে, আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী কোনো মহিলার পক্ষে কোনো মুহরিম পুরুষ ছাড়া একাকী সফর করা জায়েয নয়। এ জাতীয় হাদীস-সমূহের শিক্ষা হলো মেয়াদ কিংবা দূরত্ব নির্বিশেষে প্রচলিত অর্থের যে কোনো সফরে কোনো মহিলা মুহরিম পুরুষ ছাড়া সফর করতে পারবে না।–তাফহীমুল কুরআন

নারীদের জুমআ ও জামায়াত

নবী করীম স. নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা বন্ধ করার কার্যত চেষ্টাও করেছিলেন, মুখে সুস্পষ্টভাবে নিষেধ করেছেন। ইসলামে জুমআ ও জামায়াতের যে গুরুত্ব, তা অভিজ্ঞ কারো অজানা নয়। জুমআর নামায তো আল্লাহ নিজে ফরয করেছেন। আর জামায়াতের সাথে নামাযের গুরুত্ব এভাবে উপলব্ধি করা যায়, যে ব্যক্তি বিনা ওজরে মসজিদে অনুপস্থিত থেকে নিজের ঘরে বসে নামায আদায় করলো, নবী করীম স.-এর ঘোষণা মতে তার নামাযই কবুল হয় না।-(আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, দারে কুতনী, হাকেম ইবনে আব্বাস থেকে–তাফহীমুল কুরআন। কিন্তু নবী করীম স. মহিলাদের জন্য জুমআর নামায ফরয করেননি।-আবু দাউদ, উম্মে আতিয়া থেকে, দারে কুতনী ও বায়হাকী–জাবের রা. থেকে, আবু

দাউদ ও হাকেম–তারেক ইবনে শিহাব থেকে।) আর তিনি মহিলা সমাজ কে জামায়াতে শরীক হয়ে নামায আদায়ে বাধ্য করেননি ; বরং তার অনুমতি দিয়েছেন এ ভাষায় যে, তারা যদি আসতেই চায়, তাহলে তাদের নিষেধ করবে না। তার সাথে একথাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তাদের জন্য ঘরের নামায মসজিদের নামায অপেক্ষা উত্তম। আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেছেন, নবী করীম স. বলেছেন لَاتَمْنَعُوْا اِمَاءَ اللّٰهِ مَسَاجِدَ اللّٰهِ আল্লাহর দাসীদের আল্লাহর ঘরে (মসজিদে) আসতে নিষেধ করো না।- আবু দাউদ। এরি অনুরূপ ইবনে উমর রা.-এর আরেকটি বর্ণনা হলো ঃ اِئْذَنُوا النِّسَاءَ اِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ মহিলাদের রাত্রিবেলায় মসজিদে আসতে দাও।–বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ।

আরেকটি বর্ণনার ভাষা হলো ঃ

لَاتَمْنَعُوا نِسَائَكُمُ الْمَسْجِدَ وَبُيُوْتُهُنَّ خَيْرٌ لَّهُنَّ-

"তোমাদের মহিলাদের মসজিদে আসতে নিষেধ করো না, যদিও তাদের ঘরই তাদের জন্য অধিক উত্তম।"–আহমদ, আবু দাউদ

উম্মে হুমাইদ সায়েদীয়া বলেন, আমি নিবেদন করলাম, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার পেছনে নামায আদায় করতে আমার বড় ইচ্ছে করে। তিনি বললেন, তোমাদের নিজেদের কামরায় নামায আদায় করা দহলিজে নামায আদায় করার চেয়ে উত্তম। তোমাদের নিজেদের ঘরে নামায আদায় করা মসজিদে নামায আদায় করার চেয়ে উত্তম। আর তোমাদের মহল্লার মসজিদে নামায আদায় করা জামে মসজিদে নামায আদায় করার চেয়ে উত্তম।

প্রায় এ রকম কথাই বর্ণিত হয়েছে আবু দাউদ শরীফে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে। হযরত উম্মে সালমা রা.-এর বর্ণনায় নবী করীম স.-এর ভাষা নিম্নরূপ ঃ

خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوْتِهِنَّ মহিলাদের জন্য সর্বোত্তম মসজিদ হচ্ছে তাদের ঘরের নিভৃততম কক্ষ (আহমদ ও তিবরানী) কিন্তু হযরত আয়েশা রা. বনী উমাইয়া যুগের পরিবেশ দেখে বলেছিলেন, "নবী করীম স. যদি মহিলাদের বর্তমান সময়ের চাল-চলন নিজ চক্ষে দেখতে পেতেন, তাহলে তিনি তাদের মসজিদে আসা তেমনিভাবে বন্ধ করে দিতেন যেমন বনী ইসরাঈলীদের মহিলাদের মসজিদে আসা বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল।- বুখারী, মুসলিম ও আবু দাউদ। মসজিদে নববীতে মহিলাদের জন্য নবী করীম স. আলাদা প্রবেশ পথ নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। হযরত উমর রা.

তাঁর খেলাফত আমলে পুরুষদেরকে সে পথে যাতায়াত করতে কঠোরভাবে নিষেধ করে দিয়েছিলেন।

ابو داؤد باب اعتزل النساء فى المساجد، باب ما جاء فى خروج النساء الى المساجد

জামায়াতে মহিলাদের কাতার রাখা হতো পুরুষদের পেছনে। আর নামায শেষ করে সালাম ফিরিয়ে নবী করীম স. কিছুক্ষণ দেরী করতেন, যেন পুরুষদের উঠার আগেই মহিলারা বের হয়ে চলে যেতে পারে। আহমদ, বুখারী, উম্মে সালমা থেকে–তাফহীমুল কুরআন।

নারীদের সাজসজ্জা করার জন্য নবী করীম স. অনুমতি দিয়েছেন, বরং সে জন্যে তিনি তাদের উপদেশও দিয়েছেন। কিন্তু এ ব্যাপারে সীমালংঘন করতে তিনি কঠোর ভাষায় নিষেধ করেছেন। তৎকালে যে ধরনের সাজ-সজ্জা করা নারীদের মধ্যে রেওয়াজ ছিল, তার মধ্যে নিম্নোক্তগুলোকে তিনি লানত যোগ্য এবং অভিসম্পাতের কারণরূপে নির্ধারিত করেছেন ঃ ১. নারীদের পরচুলা লাগিয়ে অধিক লম্বা বা ঘন বানাতে চেষ্টা করা, ২. দেহের বিভিন্ন অংগে নকশা বা ছবি অংকন করা, ৩. কৃত্রিমভাবে তিল রচনা করা, ৪. চুল উপড়িয়ে ভ্রূ-কে বিশেষ ধরনের বানানো, ৫. লোম খুঁচে খুঁচে মুখ পরিষ্কার করা, ৬. দাঁত ঘষে ঘষে চিকণ ও শাণিত করানো, ৭. দাঁতসমূহের মধ্যে কৃত্রিম ফাঁক সৃষ্টি করা, ৮. জাফরান বা পাউডারের কৃত্রিম সংযোগে চেহারার কৃত্রিম রঙ বানানো। সীহাহ সিত্তাহ মুসনাদে আহমদ-এ হযরত আয়েশা রা. হযরত আসমা বিনতে আবি বকর রা. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা, আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এবং আমীর মুআবিয়া রা. থেকে নির্ভরযোগ্য সূত্রে এসব নিষেধ বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহ ও রসূলের এসব সুস্পষ্ট হেদায়াত দেখে নেয়ার পর একজন ঈমানদারের জন্য দুটো পথ খোলা রয়েছে ঃ (ক) সে এসব মেনে নিয়ে নিজের ঘর ও পরিবেশকে এসব ফেতনা ও বিপর্যয়মূলক আপদ থেকে পবিত্র করে নেবে অথবা (খ) সে নিজের ঈমানী দুর্বলতার কারণে এসব নির্দেশের বা কোনো কোনোটির বিরোধীতা করবে, তবে এটাকে গুনাহ মনে করেই করবে। এ সবের অপব্যাখ্যা করে গুনাহকে সওয়াবের কাজ বানাবে না। বস্তুত পাশ্চাত্য কৃষ্টি ও সভ্যতার হুবহু অনুসরণ করেও মুসলিম নাম ধারণ করার মত আত্ম প্রবঞ্চনার উদাহরণ পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি হতে পারে না। আল্লাহ মুসলিম উম্মাহর হেফাযত করুন।–তাফহীমুল কুরআন অনুসরণে

উনিশ

وَاَنْكِحُوْا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَآئِكُمْ ط اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ط وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ○ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَايَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ط ـ

"তোমাদের মধ্যে যারা জুড়িহীন, তাদের বিয়ে সম্পাদন করে দাও। তাছাড়া তোমাদের দাস-দাসীদের যারা চরিত্রবান তাদেরও। তারা যদি অভাবগ্রস্ত হয়ে থাকে তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন। আল্লাহ তো প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। আর যাদের বিয়ে করার সামর্থ নেই, তারা যেন নৈতিক পবিত্রতা অবলম্বন করে। যতক্ষণ না আল্লাহর নিজ অনুগ্রহে তাদের অভাবমুক্ত করে দেন।"

—সূরা আন নূর ঃ ৩২-৩৩

বিবাহযোগ্য নর-নারীর বিয়ের ব্যবস্থা করে দেয়া অভিভাবক ও সমাজপতিদের কর্তব্য। অসমর্থরা যেন চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষা করে

আলোচ্য আয়াতে اَيَامَ (আয়ামা) শব্দটি ايم শব্দের বহুবচন। এর অর্থ যে পুরুষের স্ত্রী নেই অথবা যে নারীর স্বামী নেই। আয়াতের তরজমায় 'জুড়িহীন' শব্দ দিয়ে একথাটি বুঝানো হয়েছে। শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ যে নারী বা পুরুষের এখনো বিয়ে হয়নি, অথবা বিয়ে হয়েছে ; কিন্তু নারীটির স্বামী বা পুরুষটির স্ত্রী মারা গেছে ; অথবা তালাক হয়ে গেছে। এসবের যে কোনো কারণে স্বামী-স্ত্রীবিহীন নর-নারীকে বিয়ে করানোর নির্দেশ রয়েছে আলোচ্য আয়াতে।

ইসলাম যেমন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। তেমনি ইসলামী শরীয়ত একটি সুষম শরীয়ত। এর যাবতীয় বিধি-বিধানে সমতা নিহিত আছে। একদিকে মানুষের স্বভাবগত কামনা-বাসনার প্রতি লক্ষ রাখা হয়েছে, আর অপরদিকে এসব ব্যাপারে বাড়াবাড়ী ও সীমালংঘনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। তাই একদিকে মানুষকে অবৈধ পন্থায় নিজ কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে, অপরদিকে স্বভাবগত চাহিদা ও কামনা-বাসনার প্রতি লক্ষ রেখে এর বৈধ বিশুদ্ধ পথও বলে দেয়া হয়েছে।

তাছাড়া মানব জাতির অস্তিত্ব অক্ষুণ্ন রাখার উদ্দেশ্যে কতিপয় সীমার ভেতরে থেকে নর-নারীর মেলামেশার কোনো পন্থা প্রবর্তন করাটা যুক্তি ও শরীয়তের দাবী। কুরআন-সুন্নাহর পরিভাষায় এ পন্থার নাম বিবাহ। আলোচ্য আয়াতে এ সম্পর্কে স্বাধীন নর-নারীদের অভিভাবক এবং দাস-দাসীদের মালিকদেরকে এদের বিবাহ সম্পাদন করার আদেশ দেয়া হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতের বর্ণনাভংগী থেকে একথা প্রমাণিত হয় এবং এ ব্যাপারে ইমামগণও একমত যে নিজের বিয়ে নিজেই সম্পাদন করার জন্য কোনো পুরুষ ও নারীর প্রত্যক্ষ পদক্ষেপ নেয়ার পরিবর্তে অভিভাবকদের মাধ্যমে একাজ সম্পাদন করাই বিবাহের মসনূন তরিকা ও উত্তম পন্থা। এতে অনেক ধর্মীয় ও পার্থিব উপকারিতা আছে। বিশেষত মেয়েদের বিবাহ, তারা নিজেরাই সম্পন্ন করবে—এটা যেমন একটা নির্লজ্জ কাজ, তেমনি এতে অশ্লীলতার পথ খুলে যাওয়ারও সমূহ সম্ভাবনা থাকে। এ কারণেই কোনো কোনো হাদীসে নারীদেরকে অভিভাবকদের মাধ্যম ছাড়া নিজেদের বিবাহ নিজেরা সম্পাদন করা থেকে বাধাও দেয়া হয়েছে। ইমাম আযম ও অন্য ইমামের মতে এ বিধানটি একটি বিশেষ সুন্নাত ও শরীয়তগত নির্দেশের মর্যাদা রাখে। যদি কোনো প্রাপ্তবয়স্কা বালিকা নিজের বিবাহ অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া 'কুফু' সম্মত তথা সমতুল্য লোকের সাথে সম্পাদন করে, তবে বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যাবে। যদিও সুন্নাতের খেলাপ হওয়ার কারণে বালিকাটি তিরস্কারের যোগ্য হবে, যদি সে কোনোরূপ বাধ্যবাধকতার পরিপ্রেক্ষিতে এ পদক্ষেপ না নিয়ে থাকে।

ইমাম শাফেঈ ও অন্য ইমামের মতে অভিভাবকদের মাধ্যমে না হলে প্রাপ্তবয়স্কা বালিকার বিবাহও বাতিল বলে গণ্য হবে। আলোচ্য আয়াত থেকে অধিকতরভাবে একথাই প্রমাণিত হয় যে, বিবাহে অভিভাবকের মধ্যস্থতা বাঞ্ছনীয়। এখন কেউ যদি অভিভাবকের মধ্যস্থতা ছাড়াই বিবাহ করে, তবে তা শুদ্ধ হবে কিনা আয়াত সে ব্যাপারে নিরব। বিশেষত এ কারণেই যে اَيَامٰى শব্দের মধ্যে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও নারী উভয়ই অন্তর্ভুক্ত। প্রাপ্তবয়স্ক বালকদের বিবাহ অভিভাবকের মধ্যস্থতা ছাড়া সবার মতেই শুদ্ধ—কেউ এটাকে বাতিল বলে না। এমনিভাবে বাহ্যত বুঝা যায় যে, প্রাপ্তবয়স্কা বালিকা নিজের বিবাহ নিজেই সম্পাদন করলে তাও শুদ্ধ হয়ে যাবে। তবে সুন্নাত পরিপন্থী হওয়ার কারণে উভয়কেই তিরস্কার করা হবে।–মাআরেফুল কুরআন

আলোচ্য আয়াতে অভিভাবক ও মুসলিম সমাজকে আদেশ দেয়া হয়েছে তারা যেন প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়েদের বিয়ে সম্পাদন করে দেয়। অধিকাংশ

ইমাম ও তাফসীরকারের মতে এ আদেশ বাধ্যতামূলক নয়, বরং উপদেশ-মূলক। তাদের প্রমাণ হলো রসূলের যুগে অনেক লোক স্বামীহীন স্ত্রীহীন অবস্থায় জীবন কাটিয়েছে। তাদের তো বিয়ে দেয়া হয়নি। এ আয়াতের আদেশ বাধ্যতামূলক হলে তাদেরকে অবশ্যই বিয়ে দেয়া হতো। কিন্তু তাফসীরে "ফী যিলালিল কুরআন"-এর লেখক সাইয়েদ কুতুব শহীদ এর মতে এ আদেশ অবশ্যই বাধ্যতামূলক। তবে তা এ অর্থে নয় যে, রাষ্ট্র ও সরকার স্বামী-স্ত্রীহীন নর-নারীকে বিয়ে করতে বাধ্য করবে। বরং তার অর্থ এই যে, তাদের মধ্যে যারা বিয়ে করতে ইচ্ছুক, তাদেরকে আর্থিক সহায়তা দিয়ে তাদের সতীত্ব ও শ্লীলতাকে নিরাপদ রাখা ও সংরক্ষণ করা ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য অবশ্য কর্তব্য বা ওয়াজিব। কেননা বিয়ে হচ্ছে সতীত্বকে কার্যকরভাবে সংরক্ষণ এবং সমাজকে ব্যভিচার ও অশ্লীলতা থেকে পবিত্র করা ও পবিত্র রাখার পন্থা ও উপায়। সমাজকে ব্যভিচার থেকে পবিত্র রাখা যখন ওয়াজিব, তখন তার পন্থা ও উপায় অবলম্বন করাও ওয়াজিব।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে যাবতীয় অর্থনৈতিক সমস্যার মৌলিক সমাধানও দিয়ে থাকে। তাই ইসলাম সকল সুস্থ ও সবল মানুষকে নিজের যাবতীয় মৌলিক প্রয়োজন পূরণের উপযোগী অর্থ ও জীবিকা উপার্জনের সমর্থ বানায়। মানুষ যেন অপরের মুখাপেক্ষী না থাকে সে ব্যবস্থা করে থাকে। সকল নাগরিকের কর্মসংস্থান ও পর্যাপ্ত পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা করাকে ইসলাম রাষ্ট্রের কর্তব্যরূপে ধার্য করে দেয়। এতদসত্ত্বেও ইসলামী সমাজে যদি কখনো এমন কিছু অবিবাহিত নর-নারী বিদ্যমান থাকে, যাদের নিজস্ব সহায় সম্পদ বিয়ের খরচের জন্য যথেষ্ট নয়, তাহলে তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। তবে তাদের অভিভাবক যতক্ষণ তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করতে সক্ষম, ততক্ষণ এটা তাদেরই দায়িত্ব থাকবে।

নারী হোক বা পুরুষ হোক যারা বিয়ের যোগ্য ও বিয়ে করতে ইচ্ছুক, তাদের বিয়ে শুধু অর্থাভাবে আটকে থাকবে, এটা অন্যায় ও অবৈধ। মনে রাখতে হবে, জীবিকা আল্লাহর হাতে। আর আল্লাহই তাদের অভাব দূর করার নিশ্চয়তা দিয়েছেন যদি তারা নিজেদের সতীত্ব ও শ্লীলতা রক্ষার পবিত্র পথ অবলম্বন করে। তারা যদি অভাবী হয় তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের অভাব দূর করে দেবেন। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, "তিন ব্যক্তির সাহায্য করা আল্লাহর দায়িত্ব ঃ আল্লাহর পথে জিহাদকারী, যে পরাধীন ব্যক্তি মুক্তিপণ দিয়ে মুক্তিলাভে ইচ্ছুক এবং যে ব্যক্তি বিয়ে করে নিজের সতীত্ব ও শ্লীলতাকে নিরাপদ করতে চায়।–তিরমিযী ও নাসাঈ সূত্রে ফী যিলালিল কুরআন।

সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক স্বামীহীন নারী ও স্ত্রীহীন পুরুষকে বিয়ে দেয়ার উদ্যোগ গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত তারা যাতে নিজেদের সতীত্ব ও শ্লীলতা রক্ষায় সচেষ্ট থাকে, সে জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে পরবর্তী আয়াতে। বলা হয়েছে, যারা বিয়ে করার সামর্থবান নয় তাদের উচিত নিজ নিজ শ্লীলতা রক্ষা করা—যতক্ষণ না আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের অভাবমুক্ত করেন ..... বস্তুত আল্লাহ তাআলা সৎজীবন যাপনে ইচ্ছুকদের পথ সংকীর্ণ করেন না। কেননা তিনি তাদের ইচ্ছা ও সততা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। এভাবে ইসলাম সমস্যার বাস্তবানুগ সমাধান দেয়। বিয়ের যোগ্য কোনো ব্যক্তি কেবল আর্থিক অক্ষমতার কারণে বিয়ে করতে না পারলে সে তাকে আর্থিক আনুকূল্য দিয়ে বিয়ে করার ক্ষমতা যোগায়। বিয়ে করার পথে সম্ভবত অর্থাভাবই সবচেয়ে দুর্লংঘ বাধা।–ফী যিলালিল কুরআন

এখানে ৩২ আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ

اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ـ

"তারা যদি অভাবগ্রস্ত হয়ে থাকে তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন।" এর অর্থ এ নয় যে, যে ব্যক্তিরই বিবাহ সম্পন্ন হবে তাকেই আল্লাহ খুব মাল-দৌলত দিয়ে দেবেন। বরং এর মানে বিয়ে করার ব্যাপারে লোকেরা যেন বড় হিসাবী হয়ে না দাঁড়ায়। রিযকের সংকীর্ণতা এসে যাওয়ার আশংকা যেন কাউকে কাবু করে না বসে। বস্তুত এখানে কন্যা পক্ষকে এ হেদায়াত দেয়া হয়েছে যে, কোনো ভাল চরিত্রের ছেলের পক্ষ থেকে যদি তাদের কাছে বিয়ের পয়গাম পাঠায়, তবে কেবল তার দরিদ্র অবস্থার কথা চিন্তা করে যেন তা প্রত্যাখ্যান করে না বসে। পক্ষান্তরে ছেলের পক্ষের প্রতি হেদায়াত এই যে, ছেলে এখনো বেশী কামাই রোজগার করতে পারছে না বলে তাকে যেন অবিবাহিত না রাখা হয়। আর সাধারণভাবে সকল যুবকের প্রতি হেদায়াত ও শিক্ষা এই যে, অধিক আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রাচুর্যের আশায় বিয়ের ব্যাপারটিকে মুলতবী করে রাখা তাদের উচিত হবে না। অল্প আয় হলেও আল্লাহর উপর ভরসা করে বিয়ে করা উচিত। অনেক সময় শুধু বিয়ের ফলেই মানুষের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল হয়ে যায়। স্ত্রীর সাহায্যে ব্যয় নির্বাহের কাজটা সহজ ও নিয়ন্ত্রিত হয়। তাছাড়া দায়িত্ব মাথার উপর এসে গেলে মানুষ অধিক পরিশ্রম করতে ও আয় বৃদ্ধি করতে স্বতঃই প্রবৃত্ত হয়। রুজী রোজগারের ব্যাপারে স্ত্রীও সহযোগীর ভূমিকা পালন করে থাকে। আর সবচেয়ে বড় কথা, কার ভাগ্যে ভবিষ্যতের জন্য কি লেখা আছে তা কেউ বলতে পারে না। ভাল অবস্থাও পরিবর্তিত হয়ে খারাপ হয়ে যেতে পারে আবার খারাপ অবস্থাও

পরিবর্তিত হয়ে ভাল হয়ে যেতে পারে। সুতরাং অত্যধিক হিসেবী হয়ে চলা ভাল কাজ নয়।–তাফহীমুল কুরআন

তাদাব্বুরে কুরআনে আল্লামা আমীন আহসান ইসলাহী বলেন, পুরুষের ব্যাপারে বিয়ে না করে থাকার সাধারণ কারণ হলো দারিদ্র। দরিদ্র ব্যক্তি কোনো পরিবারের দায়িত্ব গ্রহণে প্রথমে নিজেই তো শংকিত হয়ে যায়। এমতাবস্থায় কোনো মহিলা নিজেকে ঐ ধরনের পুরুষের সাথে বিয়ের সূত্রে আবদ্ধ হতে সম্মত হবে কি করে ? এ ধরনের প্রতিবন্ধকতা বিদূরীত করার জন্য আল্লাহ তাআলা সুসংবাদ দিয়েছেন যে, যারা দরিদ্র তারা এবং অপরপক্ষও যেন নিশ্চিন্ত থাকে যে বিবাহ দারিদ্র বৃদ্ধি করে না বরং আল্লাহর রিয্ক ও অনুগ্রহের বৃদ্ধি সাধন করে থাকে। যে লোক নিজের ঈমান ও চরিত্রের হেফাযতের জন্যে বিবাহ করে তার প্রতি আল্লাহ তাআলার কৃপাদৃষ্টি বর্ষিত হয় ও তার প্রতি সাহায্যের হাত সম্প্রসারিত করা হয়। পুরুষ যতদিন পর্যন্ত স্ত্রীবিহীন থাকে ততদিন সে যাযাবর জীবন যাপন করে এবং তার অনেক যোগ্যতা সংকুচিত ও প্রদমিত হয়ে থাকে। তেমনিভাবে মহিলা যতদিন স্বামীহীন অবিবাহিতা থাকে তার উদাহরণ হলো সেই লতা-গুল্মের মত যা কোনো ভর না পাওয়ার কারণে প্রসারণ, বর্ধন ও ফলন থেকে বঞ্চিত থাকে। তবে স্ত্রীলোক যখন স্বামী পেয়ে যায় আর পুরুষ যদি স্ত্রীর সান্নিধ্য লাভ করতে পারে, তাহলে উভয়ের যোগ্যতা বৃদ্ধিলাভ করে। জীবন ক্ষেত্রে যখন তারা উভয়ে মিলে চেষ্টা-সাধনা চালায়, তখন আল্লাহ তাআলা তাদের সেই চেষ্টা-সাধনায় বরকত দান করেন আর তখন তাদের অবস্থার সার্বিক পরিবর্তন সূচিত হয়।–তাদাব্বুরে কুরআন

এতো গেল স্বল্প আয়ের লোকদের কথা। পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَايَجِدُوْنَ نِكَاحًا "আর যাদের বিয়ে করার সামর্থ নেই, তারা যেন নৈতিক পবিত্রতা অবলম্বন করে।" এখানে সেসব লোকদের কথা বুঝানো হয়েছে যারা এতই অসচ্ছল যে তাদের পক্ষে বিয়ে করা মোটেই সম্ভব নয়। এ ধরনের লোকদের হেদায়াত দেয়া হয়েছে তারা যেন আল্লাহর অনুগ্রহে অভাবমুক্ত হওয়া পর্যন্ত সবর করে আর নিজেদের পবিত্র রাখে। এ পর্যায়ে নবী করীম স.-এর একটি হাদীস খুবই প্রণিধানযোগ্য। তাহলো হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বর্ণনা করেন, নবী করীম স. বলেছেন ঃ

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَائَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ - بخارى، مسلم

"হে যুব সমাজ ! তোমাদের মধ্যে যে বিবাহ করতে সক্ষম সে যেন বিবাহ করে। কেননা, বিবাহ খারাপ দৃষ্টি থেকে আত্ম রক্ষার এবং নিজের পবিত্রতা রক্ষা করার বড় উপায়। আর যে লোক এর সামর্থ রাখে না সে যেন রোযা রাখে। কেননা রোযা তার যৌন প্রবৃত্তিকে দমন করে রাখে।"–বুখারী, মুসলিম

হযরত আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেন, নবী করীম স. বলেছেন ঃ

ثلثة حق على الله عونهم الناكح يريد العفاف والمكاتب يريد الاداء والغازى فى سبيل الله - ترمذى، نسائى، ابن ماجه، احمد

"তিনজন লোকের সাহায্য আল্লাহর জিম্মায়। একজন সেই ব্যক্তি যে পবিত্র-চরিত্র থাকার উদ্দেশ্যে বিয়ে করে। দ্বিতীয় চুক্তিকারী দাস যে মালিকের প্রাপ্য আদায় করার নিয়ত রাখে। তৃতীয় সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়।"

এ পরবর্তী আয়াত ৩৩ এ ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বলা হয়েছে। পূর্বের আয়াতে ছিল সমাজের প্রতি হেদায়াত আর এ আয়াত ৩৩ এ ব্যক্তির নৈতিক দায়িত্ব ব্যক্তির উপরই বর্তাবে বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি যদি বিবাহ করার মত সামর্থ থেকে বঞ্চিত থাকে, তাহলে তার এ বঞ্চনা কোনো অবস্থাতেই নৈতিকতা বিরোধী কাজের কারণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এ ধরনের লোকের কর্তব্য হলো তারা নিজেদেরকে নিজেরা নিয়ন্ত্রণে রাখবে। আবার আল্লাহর রহমত ও করুণার জন্য অপেক্ষা করবে। যে ব্যক্তি নিজের ঈমান ও চরিত্রের হেফাযতের জন্য এভাবে জিহাদ করতে থাকবে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য পথ করে দেবেন। আয়াতের শব্দগুলো থেকে একথাই প্রকাশ পায়।–তাদাব্বুরে কুরআন

❐

বিশ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰى اَهْلِهَا ط ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ○ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَآ اَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ ج وَاِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوا هُوَ اَزْكٰى لَكُمْ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ○ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ فِيْهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ ○

"হে তোমরা যারা ঈমান এনেছ! তোমরা নিজেদের ঘর ছাড়া অন্য কারো ঘরে তাদের অনুমতি ছাড়া এবং তাদের সালাম না করে প্রবেশ করো না। এ নিয়ম তোমাদের জন্য কল্যাণময়, তোমরা এ দিকে খেয়াল রাখবে বলে আশা করা যায়। যদি তোমরা ঘরে কাউকেও না পাও তবে তাতে প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ না তোমাদের অনুমতি দেয়া হয়। আর যদি তোমাদের বলা হয়, 'ফিরে যাও' তবে তোমরা ফিরে যাবে ; এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতম কর্মনীতি। তোমরা যাকিছু করো, আল্লাহ তা ভাল করেই জানেন। অবশ্য তোমাদের জন্য এমন ঘরে প্রবেশ করায় কোনো দোষ নেই যাতে কেউ বসবাস করে না। আর সেখানে তোমাদের কোনো জিনিসপত্রও রয়েছে। আল্লাহ তো জানেন যা তোমরা প্রকাশ করো আর যা তোমরা গোপন করো।"-সূরা আন নূর ঃ ২৭-২৯

কারও ঘরে প্রবেশের অনুমতি গ্রহণ ঃ দেখা-সাক্ষাতের শিষ্টাচার

সূরা আন নূরের শুরু থেকে অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতাজনিত অপরাধের শাস্তির বর্ণনা, কারও প্রতি তোহমত বা অপবাদের নিন্দা ও শাস্তি এবং এতদসংক্রান্ত কিছু ইতিহাস আলোচনা করে ইসলামী সমাজের স্বচ্ছতা ও পবিত্রতা বিধানের ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। ইসলাম তার ইপ্সিত পরিচ্ছন্ন ও সৎ সমাজ গড়ার ব্যাপারে কেবল কোনো অপরাধ সংঘটিত হয়ে গেলে তার শাস্তি বিধানের উপরই নির্ভর করে না, বরং সবকিছুর আগে ইসলাম প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের উপরই গুরুত্ব আরোপ করে। ইসলাম

মানুষের স্বভাবগত চাহিদাকে দমন বা প্রতিহত করে না, বরং এগুলোকে সুশৃংখল ও পরিশীলিত করে এবং এগুলোর জন্য এমন পরিচ্ছন্ন পরিবেশ নিশ্চিত করে যেখানে কোনো কৃত্রিম উত্তেজনা সৃষ্টিকারী উপকরণ থাকবে না। অর্থাৎ ইসলাম সমাজের পরিচ্ছন্নতা বিধানের জন্য কেবল অপরাধ সংঘটিত হলে পরে শাস্তির বিধান দিয়েই ক্ষান্ত হয় না, বরং শুরু থেকেই অপরাধ সংঘটিত হওয়ার যাবতীয় পথ রুদ্ধ করার ব্যবস্থা নিয়ে থাকে। এভাবে ইসলাম অপরাধ সৃষ্টির সকল চোরাপথ বন্ধ করার ব্যবস্থা (Preventive Check) নিয়ে থাকে। তারপরও কোথায়ও যদি কখনও কোনো অপরাধ ঘটেই যায়, তবে তার প্রতিবিধান ব্যবস্থাও (Curative Measure) বাস্তবায়ন করে থাকে। অবশ্য ইসলাম সর্বপ্রথম ভেতরের মানুষটিকেই তো স্বচ্ছ করে গড়ে তোলে তার নৈতিক শক্তি সৃষ্টি করে দিয়ে। আর যখন কোনো ব্যক্তির মন-মানসিকতা উন্নত চরিত্রের অধিকারী হয়ে যায়, তখন তার থেকে অপরাধ সংঘটিত হওয়ার আশংকাও হ্রাস পায়। এরূপ ব্যক্তিবর্গ সমন্বয়ে গঠিত সমাজই প্রকৃত অর্থে পরিচ্ছন্ন সমাজ—উন্নত সমাজ। আলোচ্য আয়াতে কারও ঘরে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি গ্রহণ সংক্রান্ত বিধান উন্নত সমাজের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী ব্যবস্থা। সূরা আন নূরের ৩১ আয়াতে শরীয়তসম্মত পন্থায় যৌন চাহিদা পূরণের জন্য বিবাহ যোগ্য নর-নারীকে বিবাহ দেয়ার বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। মূলত বিবাহ হচ্ছে যাবতীয় যৌন অপরাধের প্রতিরোধমূলক স্বাভাবিক ব্যবস্থা। ইসলাম নারী-পুরুষের বিয়ের পথকে সুগম করেছে আর ব্যভিচারের পথকে করেছে রুদ্ধ।

ইসলাম মুসলমানদের বাড়ী-ঘরকে এতটা পবিত্র ও সুরক্ষিত করেছে যে, ইসলাম বাড়ী-ঘরের পবিত্রতা বিনষ্ট করার প্রাথমিক ধাপকেই নস্যাৎ করে দিয়েছে। তাই তো কোনো আগন্তুকের গৃহকর্তার অনুমতি না নিয়ে কারো ঘরে প্রবেশ করা ইসলাম কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। বিনা অনুমমিতে অপরের ঘরে প্রবেশের ফল দাঁড়ায় এই যে, হঠাৎ কোনো গোপনীয় ও অবাঞ্ছিত দৃশ্য চোখে পড়ে যেতে পারে, কোনো আপত্তিকর কামোত্তেজনা সৃষ্টিকারী ব্যাপারও দৃষ্টিগোচর হয়ে যেতে পারে। অনিচ্ছাকৃত আকস্মিক দৃষ্টিপাত বার বার হতে গেলে ইচ্ছাকৃত দৃষ্টিপাতে রূপান্তরিত হয়ে বিপথগামীতার সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে। অতপর ক্রমশ তা পাপাচারমূলক এবং অবৈধ সম্পর্কেরও জন্ম দিতে পারে।

জাহেলী যুগে এমন রীতি প্রচলিত ছিল যে, একজন আরব অতর্কিতে অন্যের ঘরে ঢুকে পড়তো আর বলতো, 'ঢুকে পড়েছি'। এভাবে কখনো গৃহকর্তাকে স্বীয় স্ত্রীর সাথে এমন অবস্থায় দেখতে পেতো যা অন্য কারো

দেখা উচিত নয়। অথবা নারী বা পুরুষকে নগ্ন কিংবা দেহের গোপনীয় অংশ অনাবৃত অবস্থায় দেখতে পেতো। এটা গৃহকর্তার জন্য বিব্রতকর ও কষ্টদায়ক হতো এবং গৃহের নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা বিঘ্নিত হতো। তাছাড়া উত্তেজনাকর দৃষ্টি বহিরাগতের চোখে পড়ার কারণে স্থানে স্থানে গণ্ডোগোল ও উচ্ছৃংখলতার ঘটনাও ঘটতো।

এসব কারণে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে এ উঁচুমানের আদব ও ভদ্র আচরণ শিক্ষা দিয়েছেন যে অন্যের ঘরে প্রবেশ করতে হলে ঘরের অধিবাসীর অনুমতি নিতে হবে। তাদেরকে সালাম দিয়ে তাদের আপন করে নিতে হবে এবং তাদের মন থেকে যাবতীয় বিরূপ ভাব ও শংকা দূর করতে হবে।–ফী যিলালিল কুরআন

আলোচ্য আয়াতে কারো ঘরে ঢুকতে হলে কি করতে হবে সে সম্পর্কে বলা হয়েছে حَتّٰى تَسْتَانِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰى اَهْلِهَا –অর্থাৎ "যতক্ষণ না গৃহকর্তার সন্তোষময় অনুমতি নাও ও ঘরে বসবাসকারীদের প্রতি সালাম না পাঠাও।" এখানে মূল কুরআনী আয়াতে حَتّٰى تَسْتَاْذِنُوْا বলা হলে অর্থ হতো অনুমতি নেয়া পর্যন্ত কিন্তু বলা হয়েছে حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا এখানে تَسْتَاْنِسُوْا শব্দ এসেছে اِسْتِيْنَاسٌ থেকে, যার مَادَه বা মূল হলো اُنْسٌ শব্দ। اِسْتِيْنَاسٌ শব্দের অর্থ দাঁড়ায় 'পরিচয় জানা' অথবা 'নিজের সাথে পরিচিত করা' তাহলে আয়াতের যথার্থ মানে দাঁড়ায়, 'অন্যদের ঘরে প্রবেশ করো না যতক্ষণ না তাদেরকে পরিচিত করে নাও।" অথবা যতক্ষণ তাদের আপন হিসেবে নিজেকে পরিচিত করতে না পারো। অর্থাৎ নিজেকে তাদের পরিচিতজন হিসেবে বুঝিয়ে দিতে পারলে এবং তারাও যেন আগন্তুককে পরিচিত বলে উপলব্ধি করতে পারে অথবা আগমনকারীর ব্যাপারে সন্দেহমুক্ত ও শংকামুক্ত হতে পারে।–তাফহীমুল কুরআন

দ্বিতীয়ত, ঘরের অধিবাসীদের প্রতি সালাম দেয়া কর্তব্য। কোনো কোনো তাফসীরকারক আয়াতের অর্থ করেছেন কারো ঘরে প্রবেশের জন্য প্রথমে অনুমতি নেবে অতপর ঘরে ঢোকার সময় সালাম করবে। কুরতুবীতে এ অর্থকেই পসন্দনীয় বলা হয়েছে। ইমাম বুখারী রহ. আদাবুল মুফরাদ গ্রন্থে হযরত আবু হুরাইরা থেকে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি প্রথমে অনুমতি চায় তাকে অনুমতি দিও না। কারণ সে আগে সালাম না দিয়ে সুন্নাত তরিকার খেলাফ করেছে।-রহুল মাআনী থেকে মুফতী শফী রহ.

আবু দাউদ শরীফের এক হাদীসে আছে, বনী আমেরের জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে এসে বাইর থেকে বললো اَ اَلِجُ আমি কি ঢুকে

পড়বো ? তখন তিনি খাদেমকে বললেন, লোকটি অনুমতি চাওয়ার নিয়ম জানে না। বাইরে গিয়ে তাকে নিয়ম শিখিয়ে দাও। সে যেন বলে, اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَاَدْخُلُ –অর্থাৎ সে যেন সালাম দিয়ে বলে "আমি কি ভিতরে আসতে পারি ?" খাদেম বাইরে যাওয়ার আগেই লোকটি রসূলুল্লাহ স.-এর কথা শুনে বললো, اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَاَدْخُلُ অতপর তিনি তাকে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দিলেন।-ইবনে কাসীর

বায়হাকী হযরত জাবের রা.-এর রেওয়ায়াতে রসূলুল্লাহ স.-এর এ উক্তি বর্ণনা করেছেন, لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام যে প্রথমে সালাম করে না তাকে ভিতরে আসার অনুমতি দিও না।-মাযহারী থেকে মাআরেফুল কুরআন। উপরোক্ত হাদীস থেকে রসূলুল্লাহ স.-এর দুটো সংশোধনী জানা যায়। এক. প্রথমে সালাম করা উচিত, দুই. اَ اَلِجُ –আমি কি ঢুকে পড়বো ? একথার পরিবর্তে বলবে اَاَدْخُلُ আমি কি ভিতরের আসতে পারি ? উল্লেখ্য, আয়াতে যে সালামের উল্লেখ করা হয়েছে তাহলো আগন্তুক বাইরে থেকে প্রবেশের অনুমতি পাওয়ার জন্য সালাম। এতে করে ভেতরের লোকজন এদিকে মনোনিবেশ করতে পারে ও অনুমতি চাওয়ার বাক্য শুনতে পায়। অনুমতি পাওয়ার পর ঘরে প্রবেশ করার সময় পুনরায় যথারীতি সালাম করতে হবে।

উল্লিখিত হাদীস থেকে প্রমাণিত হলো যে, প্রথমে সালাম ও পরে প্রবেশের অনুমতি চাইতে হয়। তবে এতে নিজের নাম উল্লেখ করা উত্তম। হযরত উমর রা. তাই করতেন। একদা তিনি রসূলুল্লাহ স.-এর দ্বারে এসে বললেন, اَلسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَيَدْخُلُ عُمَرُ অর্থাৎ তিনি সালাম দিয়ে বললেন, 'উমর আসতে পারে কি ?' অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামও তাই করতেন।-মাআরেফুল কুরআন

আমাদের সমাজে ইসলামের এমন রুচীশীল মার্জিত আচরণ বিলুপ্ত প্রায়। কেউ কেউ তো দরজা নক করে মাত্র। সালাম তো করেই না। অধিকন্তু দরজা নক করার আওয়ায শুনে যদি ভিতর থেকে জিজ্ঞেস করা হয়—কে ? তখন জবাবে বলে দেয় 'আমি'। কিন্তু আমি শব্দ দ্বারা তো প্রশ্নের উত্তর হলো না, বরং তা গৃহকর্তার জন্য আরো বিভ্রান্তিকর ও আশংকার কারণ হয়ে পড়ে।

খতীব বাগদাদী বর্ণনা করেন, আলী ইবনে আসেম বসরায় হযরত মুগীরা ইবনে শোবার সাক্ষাত প্রার্থী হন। তিনি এসে দরজার কড়া নাড়লেন। হযরত মুগীরা ভিতর থেকে প্রশ্ন করলেন, কে ? উত্তর আসলো, اَنَا -

'আমি'। হযরত মুগীরা বললেন, আমার বন্ধুদের কারো নাম তো أَنَا - 'আমি' নেই! এরপর তিনি বাইরে এসে তাকে হাদীস শুনালেন। একদিন হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. রসূলুল্লাহ স.-এর দ্বারে উপস্থিত হয়ে অনুমতির জন্যে দরজার কড়া নাড়লেন। রসূলুল্লাহ স. ভিতর থেকে প্রশ্ন করলেন, কে ? উত্তরে জাবের أَنَا -'আমি' বলে জবাব দিলেন। এতে রসূলুল্লাহ স. তাকে শাসিয়ে বললেন, أَنَا ؟ أَنَا ؟ অর্থাৎ আমি, আমি বললে কাউকেও চেনা যায় নাকি ?-মাআরেফুল কুরআন

আজকাল অনেক শিক্ষিত লোককে এর চেয়ে মন্দ পন্থা অবলম্বন করতে দেখা যায়। দরজা নক করার পর যখন ভিতর থেকে জিজ্ঞেস করা হয় কে ? তখন তারা নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকে—কোনো জবাবই দেয় না। এটা তো গৃহকর্তাদেরকে উদ্বিগ্ন করার নিকৃষ্টতম পন্থা।

দরজা নক্ করার পর যদি কোনো জবাব না আসে অথবা অন্য কোনোভাবে জানা যায় যে, ঘরে কোনো লোক নেই, তখন ঘরের ভিতরে প্রবেশ করার চেষ্টা করা যাবে না। অথবা যদি ভিতর থেকে ফিরে যাওয়ার জন্য বলা হয়, তখন বিরক্ত না হয়ে ফিরে যেতে হবে। এভাবে চলাটা নিজের জন্য পবিত্রতম পন্থা। ঘরে বসবাসকারীগণ কি কারণে এখন চলে যেতে বললো—তা তো জানা যায়নি। তবুও নিজের আত্মসম্মানবোধের চেয়ে গৃহকর্তার সুবিধা-অসুবিধার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে ফিরে যাওয়ার মধ্যেই রয়েছে হেকমত ও শয়তানের ফিতনা থেকে বেঁচে যাওয়ার রহস্য।–তাদাব্বুরে কুরআন

কারো দরজায় অনুমতি চাওয়ার পর যদি ভিতর থেকে জবাব না আসে, তবে দ্বিতীয়বার ও তৃতীয়বার অনুমতি চাওয়া সুন্নাত। তৃতীয়বারও যদি জবাব না আসে তবে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ রয়েছে। কারণ তৃতীয়বার অনুমতি চাওয়াতে এটা নিশ্চিত হয়ে যায় যে, আওয়ায শুনেছে কিন্তু নামাযরত থাকায় অথবা গোসলখানায় অথবা পায়খানায় থাকার কারণে সে জবাব দিতে পারছে না। কিংবা এ মুহূর্তে তার কোনো ব্যক্তিগত কারণে সে কথা বলতে ইচ্ছুক নয়। সর্বাবস্থায় সেখানে অটল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা, অবিরাম দরজা নক করতে থাকা কষ্টের কারণ বিধায় তা থেকে বেঁচে থাকা ওয়াজিব। কারণ অনুমতি চাওয়ার আসল লক্ষই কষ্টদান থেকে বিরত থাকা। হযরত আবু মূসা আশআরী রা. বর্ণনা করেন, একবার রসূলুল্লাহ স. বললেন ঃ

إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ

"তিনবার অনুমতি চাওয়ার পরও যদি জবাব না আসে তবে ফিরে যাওয়া উচিত।"–ইবনে কাসীর

অবশ্য কোনো বিশিষ্ট আলেমে দীন বা বুযুর্গের দরজায় অনুমতি না চেয়ে তাঁর অপেক্ষায় বসে থাকে—আশা রাখে যে তিনি বেরিয়ে আসলে সাক্ষাত করবে, তবে তা উপরোক্ত বিধানের অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং এটাই আদব ও উচ্চপর্যায়ের শিষ্টাচার। অবশ্য সাইয়্যেদুল মুরসালীন মুহাম্মদ স.-এর শানে কুরআন এমনি ঘোষণা দিয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوْا حَتّٰى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ ط لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ

"ওরা যদি রাসূলুল্লাহ স.-কে ডাকাডাকি না করে সবর করতো যতক্ষণ না তিনি তাদের কাছে বেরিয়ে আসতেন, তবে তা ওদের জন্য ভাল হতো।"–সূরা হুজুরাত ঃ ৫

হযরত আবু বকর রা. থেকে বর্ণিত, যখন কারো বসবাসের ঘরে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করা নিষেধ সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হলো, তখন তিনি রাসূলুল্লাহ স.-এর কাছে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, এ নিষেধাজ্ঞার পর কুরাইশ ব্যবসায়ী লোকেরা কি করবে ? মক্কা ও মদীনা থেকে সুদূর শ্যাম দেশ পর্যন্ত তারা বাণিজ্যিক সফর করে পথিমধ্যে স্থানে স্থানে সরাইখানা আছে। তারা এগুলোতে অবস্থান করে না। এগুলোতে কোনো বাসিন্দা থাকে না। এখানে অনুমতি চাওয়ার কি উপায় ? কার কাছ থেকে অনুমতি চাওয়া হবে। এরি প্রেক্ষিতে নাযিল হয় ঃ

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ فِيْهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ ط ـ

"তোমাদের জন্য এমন ঘরে প্রবেশ করায় কোনো দোষ নেই, যাতে কেউ বসবাস করে না ; অথচ সেখানে তোমাদের কোনো জিনিসপত্রও রয়েছে।"–সূরা আন নূর ঃ ২৯

শানে নুযূলের উক্ত ঘটনা থেকে জানা গেল, আয়াতে بُيُوْتًا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ বলে এমন ঘর বুঝানো হয়েছে যা কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বাসগৃহ নয়। বরং সেখানে সকলের ভোগ করার বা অবস্থান করার অধিকার রয়েছে। যেমন, খানকাহ, মুসাফিরখানা, ধর্মীয় পাঠাগার, হাসপাতাল, ডাকঘর, রেলস্টেশন, বিমান বন্দর, জাতীয় চিত্তবিনোদন কেন্দ্র ইত্যাদি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানও এ বিধানের অন্তর্ভুক্ত। এসব স্থানে প্রত্যেকে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করতে পারে। অবশ্য জনহিতকর যেসব প্রতিষ্ঠানে তত্ত্বাবধায়ক বা মোতাওয়াল্লী রয়েছে সেগুলোর নিয়ম-নীতি পালন করা ওয়াজিব। উদাহরণ

স্বরূপ যে রেলস্টেশনের প্লাটফরমে টিকেট ছাড়া ঢোকার অনুমতি নেই তাতে অবশ্য টিকেট নিতে হবে। সরকারী রেস্ট হাউস, গেস্ট হাউস, সার্কিট হাউস ইত্যাদির বেলায় নির্ধারিত বিধি-বিধান অবশ্যই পালন করতে হবে।

আয়াতের বিনা অনুমতিতে কারো ঘরে প্রবেশাধিকারের কিছু ব্যতিক্রমও আছে। যেমন, কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে আগুন ধরে গেলে, বাসগৃহ ধ্বসে পড়তে লাগলে, চোর ডাকাত ঢুকলে তাদের সাহায্যের জন্য বিনা অনুমতিতেই ঘরে প্রবেশাধিকার রয়েছে। বরং তখন সাহায্যার্থে প্রবেশ করা কর্তব্য। –তাফসীরে মাযহারী থেকে মাআরেফুল কুরআন

কোনো বাড়ীর মালিকের দূতের সাথে ঐ ঘরে প্রবেশের অনুমতির প্রয়োজন নেই। দূতের সাথে থাকাটাই অনুমতি। যেমন রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ

اِذَا دُعِىَ اَحَدُكُمْ فَجَاءَ مَعَ الرَّسُوْلِ فَاِنَّ ذٰلِكَ لَه اِذْنٌ -

"যাকে ডেকে পাঠানো হয় সে যদি দূতের সাথেই আগমন করে, তবে এটাই তার ভিতরে আসার অনুমতি।"–আবু দাউদ, মাহযারী

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, কারো ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি গ্রহণের উক্ত নির্দেশ কেবল পুরুষদের জন্যই প্রযোজ্য নয় বরং নারী-পুরুষ সকলের বেলায় তা কার্যকর। আল কুরআনের বহু স্থানে পুরুষবাচক শব্দে নারীদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বলে দেখা যায়। যেমন রোযা-নামায ফরয হওয়ার আয়াতসমূহে রয়েছে। সাহাবায়ে কিরামের স্ত্রীরা কারো ঘরে যেতে প্রথমে অনুমতি নিতেন। হযরত উম্মে আয়াস রা. বলেন, আমরা চারজন মহিলা প্রায়ই হযরত আয়েশা রা.-এর ঘরে যেতাম এবং প্রথমে তাঁর অনুমতি চাইতাম। তিনি অনুমতি দিলে আমরা ভিতরে প্রবেশ করতাম।-ইবনে কাসীর

আলোচ্য আয়াতে ঈমানদারদের সাধারণভাবে সম্বোধন করার ব্যাপকতায় অন্য কারো ঘরে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি গ্রহণের বিধানে নারী-পুরুষ এবং মুহ্‌রিম গায়রে মুহ্‌রিম সবাই শামিল রয়েছে। নারী-নারীর ঘরে যেতে হলে, পুরুষ পুরুষের ঘরে যেতে হলে সবাইর জন্যই অনুমতি চাওয়া ওয়াজিব। এমনিভাবে কেউ যদি নিজের মা, বোন অথবা কোনো মুহ্‌রিম নারীর কাছে যেতে চায়—তারও এসব অবস্থায় অনুমতি চাওয়া আবশ্যক। ইমাম মালেক মুয়াত্তা গ্রন্থে আতা ইবনে ইয়াসার রা. থেকে বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ স.-কে জিজ্ঞেস করলেন, "আমি কি আমার মায়ের কাছে যেতেও অনুমতি চাইবো ? তিনি বললেন, হাঁ, অনুমতি চাইবে।

লোকটি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো আমার মায়ের ঘরেই বসবাস করি। তিনি বললেন, তুবও অনুমতি ছাড়া ঘরে প্রবেশ করবে না। সে আবার বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো সর্বদা তাঁর কাছে থাকি। তিনি বললেন, তবুও তুমি অনুমতি ছাড়া ঘরে যাবে না ; اَتُحِبُّ اَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً؟ তুমি কি তোমার মাকে উলঙ্গ অবস্থায় দেখা পসন্দ করো ? সে বললো, না। তিনি বললেন, তাই অনুমতি চাওয়া আবশ্যক। কারণ, ঘরের ভিতরে কোনো প্রয়োজনে তার দেহের কোনো অপ্রকাশযোগ্য অংগ খোলা থাকতে পারে।–মাযহারী থেকে মাআরেফুল কুরআন

যে ঘরে শুধু নিজের স্ত্রী থাকে সে ঘরে প্রবেশ করার জন্য অনুমতি গ্রহণ ওয়াজিব না হলেও সুন্নাত-মোস্তাহাবের পর্যায়ভুক্ত। হঠাৎ সেখানেও বিনা খবরে যাওয়া উচিত নয়। পদধ্বনী বা গলা ঝেড়ে হুঁশিয়ার করে ঘরে যাওয়া দরকার। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর স্ত্রী বলেন, আবদুল্লাহ যখন বাইর থেকে ঘরে আসতেন তখন প্রথমে দরজার কড়া নেড়ে আমাকে হুঁশিয়ার করে দিতেন, যাতে তিনি আমাকে অপসন্দনীয় অবস্থায় না দেখেন।-ইবনে কাসীর

এখানে আয়াতে বলা হয়েছে ঘরে প্রবেশের অনুমতি না পেলে আগন্তুক ফিরে যাবে। তেমনি এক হাদীসে বাড়ীওয়ালার কর্তব্যও বলে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে اَن لِزورك عليك حقا সাক্ষাত প্রার্থী ব্যক্তির হক আছে আপনার (বাড়ী ওয়ালার) উপর। তাকে কাছে ডাকুন, বাইরে এসে তার সাথে সাক্ষাত করুন, তার কথা শুনুন, তাকে সম্মান করুন এবং গুরুতর ওযর না থাকলে সাক্ষাত করতে অস্বীকার করবেন না। এটাই তার হক।

–মাআরেফুল কুরআন

❐

একুশ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَاْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلٰثَ مَرّٰتٍ ط مِنْ قَبْلِ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَحِيْنَ تَضَعُوْنَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيْرَةِ وَمِنْۢ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ قف ثَلٰثُ عَوْرٰتٍ لَّكُمْ ط لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌۢ بَعْدَهُنَّ ط طَوّٰفُوْنَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ط كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○

"হে তোমরা যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের মালিকানাধীন লোক আর তোমাদের মধ্যে যারা প্রাপ্তবয়স্ক হয়নি তারা তোমাদের কক্ষে প্রবেশ করতে তিন সময় যেন তোমাদের কাছে অনুমতি গ্রহণ করে—ফজরের নামাযের পূর্বে, দুপুরে যখন তোমাদের পোশাক শিথিল করো এবং ইশার নামাযের পরে। এ তিন সময় তোমাদের গোপনীয়তার সময়। এ তিন সময় ছাড়া তোমাদের ও তাদের কোনো গুনাহ নেই—তোমাদের একে অপরের কাছে তো যাতায়াত করতেই হয়। আল্লাহ এভাবেই তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ বিবৃত করেন। আল্লাহ তো সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।"–সূরা আন নূর ঃ ৫৮

যে তিন সময়ে মা-বাবার কক্ষে প্রবেশের আগে অনুমতি নিতে হবে

আয়াতের ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ তাআলা ঈমানদারদের সম্বোধন করে বলেছেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের দাস-দাসী তথা চাকর-চাকরানীগণ আর তোমাদের যারা এখনো বুদ্ধির পরিপক্কতার পর্যায়ে পৌঁছেনি অর্থাৎ প্রাপ্তবয়স্ক হয়নি, তারা তোমাদের কক্ষে যেতে হলে এমন তিনটি সময় আছে যখন ওরা তোমাদের কাছ থেকে প্রবেশের অনুমতি গ্রহণ করবে। কারণ এ তিনটি সময় হচ্ছে তোমাদের পর্দার সময়। অর্থাৎ এ তিনটি সময় মানুষের সাধারণ অভ্যাস অনুযায়ী একান্তবাস ও বিশ্রাম নেয়ার সময়। এ সময়

মানুষ খোলামেলা থাকতে চায়, একান্তে এ সময়ে কখনো কখনো আবৃত অংগও খুলে যায় অথবা শরীর হালকা করার জন্য মানুষ কিছুটা অনাবৃত অবস্থায় থাকে বা প্রয়োজনে কোনো অংগ খোলা হয়ে থাকে। তাই এমন তিনটি সময়ে নিজের চাকর-চাকরানী বা ছেলেমেয়েরা তোমাদের কক্ষে যেতে হলে অবশ্যই আগে তোমাদের অনুমতি নিতে হবে। সেই তিনটি সময় হলো ঃ ১. ফজরের নামাযের পূর্বে, ২. দুপুরে যখন তোমরা দেহের শিথিলতাকল্পে কিছুটা অনাবৃত হয়ে থাক, ৩. ইশার নামাযের পর। এ তিন সময় ছাড়া ওদের তোমাদের কাছে তোমাদের কক্ষে প্রবেশ করতে কোনো বাধা নেই। কেননা তোমাদের একে অন্যের কাছে বার বার আসা যাওয়া করতেই হয়। সুতরাং সবসময় অনুমতি চেয়ে প্রবেশ করা কষ্টকর। আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য এমনিভাবে বিধানাবলী সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন, যেন তোমরা দুনিয়ার জীবনে ভাল হয়ে থাকতে পার। আল্লাহ তো সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়। কাজেই মানুষের জন্য কিসে কল্যাণ আর কিসে ক্ষতি তা তিনিই ভাল জানেন। মানুষের স্বভাব-প্রকৃতির স্রষ্টা রব্বুল আলামীন। তিনিই সম্যক উপলব্ধি করতে পারেন মানুষের সার্বিক অবস্থা। আর সেভাবেই তিনি মানুষের জন্য হুকুম-আহকাম দিয়ে থাকেন।

আল কুরআনে উক্ত তিন সময়কে বলা হয়েছে ثَلٰثُ عَوْرَاتٍ অর্থাৎ এ হচ্ছে তোমাদের জন্য তিনটি 'আওরাত'। আরবীতে 'আওরাত' বলতে সাধারণত স্ত্রীলোকদের বুঝায়। শব্দটির অর্থ 'ফাঁক ও বিপদের স্থান'। আর যে স্থান উন্মুক্ত হয়ে যাওয়ায় লজ্জার কারণ হয় কিংবা যার প্রকাশিত হয়ে যাওয়া অবাঞ্ছনীয় তাকেও 'আওরাত' বলা হয়। অরক্ষিত জিনিসকেও আওরাত বলা হয় এবং শব্দটি এ অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এসব অর্থ পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর আয়াতের বক্তব্যের সাথে এর প্রত্যেকটি অর্থের কোনো না কোনোরূপ সংগতি রয়েছে। আয়াতের তাৎপর্য হলো, এ তিনটি সময়ে একাকী কিংবা নিজের স্ত্রীকে নিয়ে এমন অবস্থায় পড়ে থাকো, যখন ঘরের ছেলেমেয়েদের চাকর-চাকরাণীদের হঠাৎ করে তোমাদের কাছে এসে পড়া বাঞ্ছনীয় নয়। সুতরাং তাদের বলে রাখ তারা এ তিন সময়ে যদি তোমাদের কাছে আসতে চায় তবে তারা যেন তোমাদের অনুমতি নিয়ে আসে।

এ তিন সময় ছাড়া অন্য যে কোনো সময়ে নাবালেগ ছেলেমেয়েও ঘরের চাকর-চাকরানী নারী-পুরুষের কাছে তাদের কক্ষে বা নিভৃত স্থানে অনুমতি ছাড়া যেতে পারবে। এ সময় তোমরা যদি অসতর্ক অবস্থায় থাক, আর তারা পূর্বানুমতি ছাড়াই তোমাদের কক্ষে প্রবেশ করে বসে তাহলে তোমাদের কড়া কথা বলার বা শাসানোর অধিকার থাকবে না। কেননা

কাজকর্মের সময় নিজেদেরকে অসতর্কাবস্থায় রাখা তোমাদের নিজেদেরই নির্বুদ্ধিতা। তারা যদি নিভৃতির পূর্বোক্ত তিন সময়ের কোনো এক সময়ে তোমাদের কক্ষে বিনা অনুমতিতে আসে, তবে তারা দোষী হবে ; অন্যথা তোমরা নিজেরাই দোষী হবে, কারণ, তোমরা ঘরের ছেলে মেয়েদের এবং খাদেম-চাকরদের এমনি ধরনের সুশিক্ষা দাওনি। এ তিনটি সময় ছাড়া অন্য সবসময়ে ছেলেমেয়েদের ও দাস-দাসীদের কক্ষে প্রবেশের সাধারণ অনুমতি দেয়া হয়েছে, তার কারণ উল্লেখ করা হয়েছে এই বলে যে,

لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ ط طَوّٰفُوْنَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ط -

এ তিন সময় ছাড়া তোমাদের ও তাদের গুনাহ নেই—তোমাদের একে অপরের কাছে তো যাতায়াত করতেই হয়। এখান থেকে ফিক্‌হ নীতির একথা বুঝতে পারা যায় যে, শরীয়তের বিধান কল্যাণমূলক ভাবধারার উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রত্যেকটি বিধানের মূলে কোনো না কোনো কারণ নিহিত রয়েছে। সে কারণ বলে দেয়া হোক বা নাই বলা হোক।–তাফহীমুল কুরআন

ইতিপূর্বে বর্ণিত সূরা আন নূরের ২৭, ২৮, ২৯ আয়াতে মুসলিম সমাজে পারস্পরিক দেখা-সাক্ষাতের উত্তম রীতিনীতি বর্ণনা করতে গিয়ে আল কুরআনে ঘর-বাড়ীর মালিক ও অধিবাসীদের অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করার বিধান বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, কেউ কারো সাথে সাক্ষাত করতে গেলে অনুমতি ছাড়া তার ঘরে প্রবেশ করো না। পুরুষের ঘর হোক কিংবা নারীর, আগন্তুক পুরুষ হোক বা নারী হোক—সকলের জন্যই অন্যের ঘরে প্রবেশ করতে হলে পূর্বেই প্রবেশের অনুমতি গ্রহণ করাকে ওয়াজিব করা হয়েছে। এসব বিধানাবলী তো ছিল বাইর থেকে আগমনকারী অপরিচিত বা অনাত্মীয়দের জন্য।

আলোচ্য আয়াতসমূহে অন্য প্রকার অনুমতি গ্রহণের বিধানাবলী বর্ণিত হয়েছে। এগুলোর সম্পর্ক এমন আত্মীয় ও মুহ্‌রিম ব্যক্তিগণের সাথে, যারা সাধারণত একই ঘরে বসবাস করে এবং সর্বক্ষণ যাতায়াত করতে থাকে আর তাদের সাথে নারীগণের পর্দা করাও জরুরী নয়। এ ধরনের লোকদের ঘরে প্রবেশ করতে হলে খবর দিয়ে কিংবা অন্তত সশব্দ পদচারণা করে অথবা গলা ঝেড়ে ঘরে প্রবেশ করার আদেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু এ অনুমতি গ্রহণ এরূপ আত্মীয়দের জন্য ওয়াজিব নয়—মোস্তাহাব। এটা তরক করা মাকরূহ তান্‌জিহী। তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে ঃ

فمن اراد الدخول فى بيت نفسه وفيه محرماته يكره له الدخول فيه من غير استيذان تنزيها الاحتمال رواية واحدة منهن عريانة وهو احتمال ضعيف مقتضاه التنزه۔

উপরে ঘরে প্রবেশের পূর্বের বিধান বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ঘরে প্রবেশের পর তারা সবাই এক জায়গায় একে অপরের সামনে থাকে এবং একে অপরের কাছে যাতায়াত করে। এমতাবস্থায় তাদের জন্যে উক্ত তিনটি বিশেষ সময়ে আরেক প্রকার অনুমতি চাওয়ার বিধান আলোচ্য ৫৮ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে।

উক্ত তিন সময়ে মুহ্‌রিম আত্মীয়-স্বজন এমনকি সমঝদার অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক-বালিকা এবং দাস-দাসীদের আদেশ করা হয়েছে যে, তারা যেন কারও নির্জন কক্ষে অনুমতি ছাড়া প্রবেশ না করে। এসব সময়ে কোনো বুদ্ধিমান বালক অথবা ঘরের কোনো নারী অথবা নিজ সন্তানদের মধ্য থেকে কেউ অনুমতি ছাড়া ঘরে বা কক্ষে প্রবেশ করলে প্রায়ই লজ্জার সম্মুখীন হতে হয় ও অত্যন্ত কষ্টবোধ হয়। কমপক্ষে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির খোলাখুলিভাব ও বিশ্রামে বিঘ্ন সৃষ্টি হওয়া তো বলাই বাহুল্য। তাই আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদের জন্যে বিশেষ অনুমতি চাওয়ার বিধানাবলী বর্ণিত হয়েছে।

—মাআরেফুল কুরআন

পূর্বে সূরা আন নূরের ৩১ আয়াতে ঘরে প্রবেশের জন্য অনুমতি গ্রহণের যে শর্ত আরোপ করা হয়েছিল, তা থেকে বালক এবং নাবালেগ শিশুদের বাদ রাখা হয়েছিল। অতপর তাদের জন্যও এ শর্ত আরোপ করা হয়েছে যে, তিনটি বিশেষ সময়ে তারাও যেন প্রবেশের অনুমতি গ্রহণ করে। উক্ত তিনটি বিশেষ সময়ে বিশেষ সাবধানতার কারণ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, উক্ত তিনটি সময় হলো অসাবধানতা ও পর্দাহীনতার সময়। ফজরের পূর্বের আর ইশার পরের সময়ে সাবধানতার বিষয়টি তো পরিষ্কার। বাকী দুপুরের সময়টাও সাধারণত বিশ্রামের সময় বিশেষত আরব দেশে গরমের দেশ হওয়ার কারণে এ সময় লোকেরা কায়লুলা করে থাকে। 'কায়লুলা' মানে দুপুরের খাবার পর বিশ্রামের উদ্দেশ্যে শুয়ে পড়া। এ সময় শিশু-কিশোরগণ অনুমতি ছাড়া কক্ষে ঢুকে পড়লে সম্ভাবনা থাকে যে, ওরা কক্ষের লোকদের এমন অবস্থায় দেখে ফেলবে যে অবস্থায় তাদেরকে দেখা অপসন্দনীয়। এসব কারণে উল্লিখিত বিধান ও শর্তাবলী আরোপ করা হয়েছে। আর এসব বিধি-বিধানে একটা ক্রমিক ধারার প্রতি লক্ষ রাখা হয়েছে যেন এ

বিধান পালনে মন-মানসিকতায় কঠোরতার ছাপ না লাগে। উক্ত তিন সময় ছাড়া ওদের জন্য অনুমতি গ্রহণের কোনো শর্ত নেই। কারণ ঘরের সকলকেই পরস্পরের কাছে আসা-যাওয়া করতে হয়। এজন্যে আল্লাহ তাআলা কাউকে কঠোর অবস্থায় ফেলতে চান না।

তবে এসব নাবালেগ শিশুরাও অনুমতি গ্রহণ থেকে ব্যতিক্রমধর্মী হবে তখন পর্যন্ত যখন পর্যন্ত তারা নাবালেগ থাকে। বালেগ হওয়ার পর তাদের উপরও ঐসব শর্তাদী ও বিধি-বিধান কার্যকর হবে যা অন্যদের বেলায় প্রযোজ্য। ওরা শিশুকাল থেকে তো এ ঘরে আসা-যাওয়া করে আসছে— এ অজুহাতে ওদের জন্য কোনো ছাড় নেই।

আলোচ্য ৫৮ আয়াতের সাথে ৫৯ আয়াত মিলিয়ে দেখলে বুঝা যাবে যে, পরবর্তী আয়াত পূর্বোক্ত আয়াতের বিধানের ব্যাখ্যা স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে। আর এটা আল্লাহ তাআলার ইল্‌ম ও হিকমতের উপরই ভিত্তিশীল। কেবল আল্লাহ তাআলাই জানেন যে বান্দাদের প্রশিক্ষণ ও সংশোধনের জন্য কি বিধান দরকার এবং কি রকম ক্রমধারায় বিধানাদি নাযিল করা দরকার।

-তাদাব্বুরে কুরআন

❐

বাইশ

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِيْ لَا يَرْجُوْنَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَّضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجٰتٍۢ بِزِيْنَةٍ ط وَاَنْ يَّسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ط وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

"নারীদের মধ্য হতে যারা যৌবনকাল অতিবাহিত করেছে, বিবাহ করার আকাংখী নয় ; তারা নিজেদের চাদর খুলে রাখলে কোনো দোষ নেই। অবশ্য যদি তারা সৌন্দর্য প্রদর্শনকারী না হয়। তবে তা থেকে বিরত থাকাটাই তাদের জন্য উত্তম। আল্লাহ তো সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ।"

–সূরা আন নূর ঃ ৬০

যেসব বৃদ্ধার জন্য পর্দার বিধান শিথিলযোগ্য

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা ঃ ইসলামী শরীয়তে পর্দার বিধানের কঠোরতা অঘটনের আশংকার উপর নির্ভরশীল। যেখানে স্বভাবত কোনো অঘটনীয় কাজের আশংকা থাকে না সেখানে পর্দার বিধান শিথিলযোগ্য। যেমন এমন নারী যে বিবাহের উপযুক্ততা হারিয়ে ফেলেছে অর্থাৎ যার কোনো প্রকার যৌন আকাংখা আর নেই এবং যাকে দেখলে কোনো পুরুষ আকর্ষিত হয় না। এ ধরনের বৃদ্ধা নারীরা শরীরের পর্দার জন্য ব্যবহৃত কাপড় গায়রে মুহরিম পুরুষদের সামনেও খুলে রাখতে পারবে—এতে তাদের গুনাহ হবে না। তবে শর্ত হলো এতে করে তাদের মনে যেন কোনো প্রকার সৌন্দর্য দেখানোর ভাব না থাকে। অথবা তারা যেন সৌন্দর্য প্রকাশের স্থানসমূহ প্রকাশ না করে। অর্থাৎ মুখাবয়ব, হাতের তালু এবং কারো কারো মতে পদযুগল খোলা রাখতে পারবে। কিন্তু অঘটনের আশংকা থাকলে যুবতী নারীর মুখাবয়ব, হাতের তালু ও পদযুগল ইত্যাদির পর্দা জরুরী। বৃদ্ধা মহিলার জন্য এসব খোলা রাখার অনুমতি থাকলেও এ থেকে বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম। কারণ এর উদ্দেশ্য পর্দাহীনতাকে সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ করা। আল্লাহ তাআলা সবকিছুই শোনেন আর সবকিছুই তাঁর ভালভাবে জানা আছে।

আলোচ্য আয়াতে নারীদের পর্দার একটা ব্যতিক্রম অবস্থার উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ যে বৃদ্ধা নারীর প্রতি কেউ আকর্ষণবোধ করে না, আর

সে বিবাহেরও যোগ্য নয় তার জন্য পর্দার বিধান এমনভাবে শিথিল করা হয়েছে যে, একজন অনাত্মীয় ব্যক্তিও তার জন্য মুহরিমের মত হয়ে যায়। মুহরিমের সামনে যেসব অংগ আবৃত করা জরুরী নয় এ বৃদ্ধা নারীর জন্য বেগানা পুরুষদের সামনেও সেসব অংগ আবৃত করা জরুরী নয়। কিন্তু তবুও সাবধানতা রক্ষার জন্যে তাদের এমনটি না করাই শ্রেয়। তাছাড়া এসব অংগ খোলার পেছনে তার সৌন্দর্য প্রকাশের সামান্যতম ভাবও থাকতে পারবে না।–মাআরেফুল কুরআন

আলোচ্য আয়াতে اَلْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ-এর অর্থ যেসব মহিলা বসে গেছে অর্থাৎ বিবাহের বয়স যাদের আর বাকী নেই, যাদের প্রতি পুরুষদের আকর্ষণ নেই ; তাদের জন্য পর্দার এক বিশেষ অবস্থার বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে বসে যাওয়া মহিলা বলে এমন সব মহিলাকে বুঝানো হয়েছে, যারা সন্তান হওয়ার বিষয়ে নিরাশ হয়ে গেছে। যাদের সন্তান ধারণের ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে গেছে। যাদের নিজেদের যৌন কামনা-বাসনা অবশিষ্ট নেই যাদের দেখে পুরুষদের মনে যৌন-বাসনা জাগ্রত হয় না। আবার আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَّضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ-

তাদের কাপড় খুলে রাখাতে কোনো গুনাহ হবে না। এখানে কাপড় খুলে রাখার মানে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হয়ে যাওয়া বা উলংগ হয়ে যাওয়া নয়। এ ব্যাপারে সকল ফেকাহবিদ ও তাফসীরকার একমত হয়ে এর অর্থ করেছেন এখানে কাপড় মানে সেই চাদর যা দিয়ে মহিলাদের দেহের সৌন্দর্য ঢেকে রাখার জন্য সূরা আহযাবে বলা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে ঃ

يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيْبِهِنَّ-

"তারা যেন তাদের চাদর দিয়ে শরীর ঢেকে রাখে।"

এখানে اَنْ يَّضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ অর্থাৎ "বৃদ্ধা মহিলার কাপড় খুলে রাখলে কোনো দোষ নেই" বলে সে কাপড়কে বুঝানো হয়েছে, যা মহিলারা সেলোয়ার-কামীসের উপরে বড় চাদর অথবা বোরকা ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকে। তবে শর্ত হলো কাপড় খুলে রাখার উদ্দেশ্যে যেন নিজের সৌন্দর্য ও দেহের গঠন দেখান না হয়। এর মানে কোনো মহিলা নিজের যৌন আকর্ষণ হারিয়ে যাওয়ার পরেও যদি সেগেগুজে দেহের গঠন প্রদর্শনী করার রোগে আক্রান্ত হয়, তাহলে পর্দার এ শিথিলতা তার বেলায় প্রযোজ্য হবে না। বরং তাকে পুরোপুরি শরয়ী পর্দা করতে হবে।–মাওলানা সালাহুদ্দীন ইউসুফ ঃ কুরআনুল কারীম

আলোচ্য সূরা আন নূরের ৬০ আয়াতে চাদর খুলে রাখার এ অনুমতি সেসব বৃদ্ধা মহিলার জন্য দেয়া হয়েছে যাদের মধ্যে সেজেগুজে থাকার প্রবর্ণতা আর অবশিষ্ট নেই, যাদের যৌন স্পৃহা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। কিন্তু এ ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া আগুনের কোনো স্ফুলিংগ এখনো বাকী থেকে থাকে আর তা তার রূপ-সৌন্দর্য প্রদর্শনে পরিণত হয়, তাহলে এমন মহিলার জন্য এ বিধান প্রযোজ্য হবে না।–তাফহীমুল কুরআন

আলোচ্য আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ–আল্লাহ সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ—অর্থাৎ তিনি সবকিছু শুনেন ও সবকিছু জানেন। মানুষ মুখে কি বলেন, সে সম্পর্কে যেমন তিনি অবগত আছেন তেমনি মনের গভীরে কি সব জল্পনা-কল্পনা চলে সে সম্পর্কেও তিনি অবগত আছেন। কারণ গোটা বিষয়টি হচ্ছে বিবেক নির্ভর ও সদিচ্ছা নির্ভর। বিবেকের খবরও যেহেতু আল্লাহর জানা আছে, কাজেই এখানে কপটতার কোনো অবকাশ নেই।–ফী যিলালিল কুরআন

❐

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا ○

"আর যারা দুআ করতে থাকে এই বলে যে, হে আমাদের রব! তুমি আমাদের এমন জোড় ও সন্তান-সন্ততি দান করো যারা আমাদের জন্য হবে চক্ষু শীতলকারী। আর তুমি আমাদেরকে মুত্তাকীগণের ইমাম বানাও।"–সূরা ফুরকান ঃ ৭৪

দীনদার স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের জন্য ও সন্তানাদির জন্য মুত্তাকী হওয়ার দুআ করে

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণের একটি বিশেষ গুণ-বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা করা হয়েছে। সূরা ফুরকানের ৬৪ আয়াত থেকে ৭৪ আয়াত পর্যন্ত আল্লাহর বিশেষ ও প্রিয় বান্দাদের তেরটি গুণ-বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে তাদের সর্বশেষ বৈশিষ্ট্য প্রসংগে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ কেবল নিজেদের সংশোধন ও সৎকর্ম নিয়েই ব্যস্ত থাকে না, বরং তাদের সন্তান-সন্ততি এবং স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের সংশোধন ও চরিত্র উন্নয়নের চেষ্টা করে থাকে। এ চেষ্টার চূড়ান্ত অংশ হলো তারা পরস্পরের জন্য ও সন্তান-সন্ততির জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করে থাকে। আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا আমাদেরকে মুত্তাকীগণের ইমাম বানিয়ে দিন। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ পরিবারের নেতা ও ইমাম স্বাভাবিকভাবেই হয়ে থাকেন। কাজেই এ দুআর সারমর্ম এই যে, আমাদের সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজনকে মুত্তাকী বানিয়ে দিন। তারা সবাই মুত্তাকী হলে স্বাভাবিকভাবেই সেই লোক মুত্তাকীগণের ইমাম ও নেতা বলে সাব্যস্ত হবেন।

এখানে নিজের উন্নতির জন্য দুআ করা হয়নি ; বরং সন্তান-সন্ততি ও নিজ নিজ জোড়ের (স্ত্রী স্বামীর জন্য এবং স্বামী স্ত্রীর) জন্যেও দুআ করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত ইবরাহীম নখঈ বলেন, এ দুআয় নিজের জন্য কোনো সরদারী ও নেতৃত্বের প্রার্থনা করা উদ্দেশ্য নয় ; বরং এতে উদ্দেশ্য এই যে, আমাদের এমন যোগ্য করে দিন, যাতে সবাই ধর্ম ও

আমলের দিক থেকে আমাদের অনুসরণ করে এবং আমাদের ইল্‌ম ও আমল দ্বারা সবাই উপকৃত হতে পারে। হযরত মকহুল শামী বলেন, এ দুআর উদ্দেশ্য নিজের জন্য তাকওয়া ও আল্লাহভীতির এমন স্তর অর্জন করা যদ্বারা মুত্তাকীগণ লাভবান হয়।–মাআরেফুল কুরআন

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহর অনুগত বান্দাদের নিজেদের পরিণাম চিন্তার সাথে সাথে তারা যে পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্ততির পরিণামও চিন্তা করে থাকে সেকথা প্রতিভাত হয়েছে। তারা তো আল্লাহর নবীর বাণীর তাৎপর্য সম্পর্কে জ্ঞাত ও সচেতন থাকে। নবীর বাণী اَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ পরিবার-পরিজনের জন্য রাখাল তুল্য দায়িত্বশীল আর প্রত্যেকে নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের মধ্যে এ দায়িত্বানুভূতি পূর্ণভাবে বিরাজমান থাকার কারণে তারা নিজেদের পরিবার-সদস্যদের লাগামহীন জীবন যাপনকারীর ন্যায় জীবনযাপন করতে দেয় না। লাগামহীন জীবন-যাপনকারী লোকেরা কেবল দুনিয়ার জীবনের তুষ্টি কামনা করে, তাদের পরিবার সদস্যরা ভাল পথে দীনের পথে জীবন পরিচালিত করার জন্য তো তাদের কোনো মাথা ব্যথা থাকে না। পক্ষান্তরে আল্লাহর পথের পথিকরা তো নিজের লোকদের জন্য দুনিয়ার সুখ শান্তির চেয়ে আখিরাতের সুখ-শান্তির প্রতি অধিক মনোযোগী হয়ে থাকে। সন্তান-সন্ততির কেউ যেন শয়তানের পদাংক অনুসরণে পথভ্রষ্ট না হয়ে পড়ে—এটাই হয় তাদের কাম্য। সূরা আত তূর-এর ২৬ আয়াত اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِىْ اَهْلِنَا مُشْفِقِيْنَ–"আমরা ইতিপূর্বে আমাদের পরিবার-পরিজনের মধ্যে শংকিত অবস্থায় ছিলাম।" এ আয়াতে তাদের এ চিন্তা ও আশংকার দিকে ইংগিত করা হয়েছে। এ আশংকার কারণে তারা প্রতিনিয়ত নিজেদের রবের কাছে দুআ করতে থাকে—হে আমাদের রব! আমাদেরকে নিজেদের পরিবার-পরিজনের পক্ষ থেকে চক্ষুর শীতলতা দান করো ; তাদের আমল-আখলাক তোমার পসন্দনীয় আর আমাদের আকাংখা মোতাবেক হোক ; এবং আমরা যেন এ দুনিয়াতে সৎলোক ও মুত্তাকীগণের নেতারূপে উঠতে পারি—অসৎ ও ফাসেক লোকদের নেতারূপে যেন না উঠি। এখানে আয়াতের যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তাতে প্রতিভাত হচ্ছে যে, এটা নেতৃত্ব পাওয়ার জন্যে দুআ নয় ; বরং প্রত্যেক পরিবার ও গোত্রের বাস্তবে যে নেতৃত্ব হাসিল হয় তার দায়িত্বসমূহ যথাযথ আনজামদানে সক্ষম হওয়ার জন্য দুআ।–তাদাব্বুরে কুরআন

এটাই হচ্ছে স্বভাবজাত অনুভূতি যা গভীর ঈমান থেকে উৎসারিত। একজন প্রকৃত মুমিন স্বভাবতই কামনা করবে যেন আল্লাহর পথের পথিকদের

সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। আর এ পথিকদের প্রথম সারিতে তার স্ত্রী বা স্বামী ও সন্তান সন্ততিরা থাকুক। কারণ তারা হচ্ছে তার আপনজন ও তাদের কাছে আল্লাহর আমানত স্বরূপ। যাদের ব্যাপারে তার কাছে অবশ্যই কৈফিয়ত তলব করা হবে। একজন প্রকৃত ও খাঁটি মুমিন এটা কামনা করবে সে যেন সত্য ও কল্যাণের দিশারী হতে পারে এবং আল্লাহর পথের পথিকদের নেতৃত্ব দিতে পারে। এ কামনার মধ্যে নিজেকে বড় মনে করার কিছুই নেই। এতে আত্ম গরিমারও কিছু নেই। কারণ, তারা সবাই তো একই কাফেলার লোক। তারা সবাই আল্লাহর পথের পথিক।–ফী যিলালিল কুরআন

❐

চব্বিশ

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ ○ اَئِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ
الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءِ ط بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ ○ فَمَا كَانَ
جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اَخْرِجُوْٓا اٰلَ لُوْطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ج اِنَّهُمْ اُنَاسٌ
يَّتَطَهَّرُوْنَ ○ فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَهْلَهٗٓ اِلَّا امْرَاَتَهٗ ز قَدَّرْنٰهَا مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ○ وَاَمْطَرْنَا
عَلَيْهِمْ مَّطَرًا فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ ○

"আর লূতকে পাঠালাম, সে তার কওমকে বলেছিল ঃ তোমরা কি দেখেশুনে এমন কুকাজ করছো ? তোমরা কি যৌন তৃপ্তির জন্য নারীদের ছেড়ে পুরুষদের কাছে গমন করছো ? তবে তো তোমরা এক বর্বর সম্প্রদায় ! উত্তরে তার কওম একথাই বললো, নিজেদের লোকালয় থেকে লূতের লোকদেরকে বের করে দাও। এরাতো বড্ড পবিত্রতা দেখাচ্ছে। অতপর আমরা তাকে ও তার পরিজনকে নাজাত দিলাম ; কিন্তু তার স্ত্রীকে নয়—তাকে তো আমরা পেছনে পড়ে থাকা লোকদের অন্তর্ভুক্ত করে রেখেছি। তাদের উপর আমরা ভয়ংকর বৃষ্টি বর্ষণ করলাম। সেই সতর্ককৃত লোকদের উপর বর্ষিত বৃষ্টি কতই না মারাত্মক ছিল।"

—সূরা আন নামল ঃ ৫৪-৫৭

আল্লাহর অবাধ্য হওয়ায় নবীর স্ত্রী হয়েও রক্ষা পেল না যে নারী

হযরত লূত আ. ছিলেন হযরত ইবরাহীম আ.-এর ভাই 'বারান.-এর ছেলে। হযরত লূত আ. একবার যুদ্ধে রোমানদের হাতে বন্দী হয়ে পড়লে হযরত ইবরাহীম তাকে বন্দীমুক্ত করে দেন। এক সময় সারা দেশে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। কিন্তু হযরত লূত আ.-এর আশপাশের গ্রামগুলো ছিল কিছুটা সচ্ছল। ফলে দূরদুরান্ত থেকে লোকজন সেখানে এসে খাদ্য সংগ্রহ করার জন্য ভিড় জমাতো। অসভ্য গ্রামবাসীরা এতে হিংসার বশবর্তী হয়ে একটা অতি খারাপ ফন্দি আঁটলো। তারা খাদ্য সংগ্রহকারীদের সাথে কুকাজে (সমকামিতায়) লিপ্ত হতো। ফলে বাইরের লোকদের আগমন হ্রাস পেয়ে গেল। কিন্তু তারা আর সেই কু-অভ্যাস ছাড়তে পারলো না। অতপর যখনি

তারা কোনো সুন্দর বালক পেতো নিজেদের চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী কুকাজে লিপ্ত হতো আর তাদের স্ত্রীদের সাথে সম্পর্ক একেবারেই ছেড়ে দিল। তাদের এহেন চরিত্র বিধ্বংসী অমানুসিক কাজ থেকে বিরত রাখার ব্যবস্থা করার জন্য আল্লাহ তাআলা তাদের হেদায়াতের জন্য হযরত লূত আ.-কে পাঠালেন। আলোচ্য আয়াতে وَلُوطًا শব্দ থেকে একথাই বুঝানো হয়েছে।–কুরআনের দৃষ্টিতে বন্ধু ও শত্রু

সূরা আল আরাফের ৮০-৮২ আয়াতে বিষয়টি সংক্ষেপে বিবৃত হয়েছে এভাবে, আমি লূত আ.-কে পাঠালে সে তার জাতিকে বললো তোমরা কি এমন লজ্জাহীনতার কাজে লিপ্ত হয়ে পড়লে, যে কাজে তোমাদের পূর্বে কোনো লোককে লিপ্ত হতে দেখা যায়নি ? তোমরা তো নারীর পরিবর্তে পুরুষের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে সীমালংঘনকারী জাতিতে পরিণত হয়েছ। এর কোনো সদুত্তর না দিয়ে তারা পরস্পরকে বলতো, এদেরকে— লূত ও তার সাথীদেরকে দেশ থেকে বের করে দাও, এরা তো বড্ড পবিত্র সেজে বসতে চায়।

সূরা আন নমলের আলোচ্য আয়াতে হযরত লূত আ.-এর কাহিনী সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে দেখানো হয়েছে তাঁর জাতি কিভাবে তাঁকে দেশ থেকে বহিষ্কার করতে ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল। অথচ তাঁর অপরাধটা কি ছিল ? তিনি তাদের জঘন্য কুৎসিৎ ও অশ্লীল কাজের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন মাত্র। তারা তাদের এ অপকর্মের ব্যাপারে এতোই অন্ধ হয়ে পড়েছিল যে, এ ব্যাপারে সমগ্র জাতিই ঐক্যবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। মানব জাতি কেন, কোনো প্রাণী জগতেও এ কাজের উদাহরণ পাওয়া যাবে না কোথাও। বরং এ ছিল আল্লাহ তাআলার সৃষ্টিগত রীতিনীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

যেহেতু সৃষ্টিজগতের নিয়মনীতিতে জোড়ায় জোড়ায় জন্মানোই জীবনের ভিত্তি। অন্য কথায় জোড়া জোড়া হওয়া ছাড়া জীবনের অস্তিত্ব ও বিকাশ সম্ভব নয়। সেহেতু আল্লাহ তাআলা নর ও নারীর মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণকে জন্মগত বৈশিষ্ট্যে পরিণত করেছেন। এ আকর্ষণ শিখিয়ে দেয়ার বা উদ্বুদ্ধ করার অপেক্ষা রাখে না। এরূপ ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্য স্বতস্ফূর্ত জন্মগত তাড়নার ভিত্তিতেই যেন জীবনের বিকাশ ও অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকে। প্রত্যেক প্রাণী তার এ জন্মগত তাড়না চরিতার্থ করে আনন্দ পায়। প্রাণীর দেহের ভিতরে সংরক্ষিত এ স্বাদ ও আনন্দের ভিতর দিয়ে মহান স্রষ্টা আল্লাহ তাআলা আপন ইচ্ছা এমনভাবে বাস্তবায়িত করেন যে, তারা নিজেরাও তা টের পায় না। আর অন্য কেউ তাকে সে সম্পর্কে কোনো

দিকনির্দেশনা দিতে পারে না। আল্লাহ তাআলা নারী-পুরুষের অংগ-প্রত্যংগগুলোকে এমন সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে গঠন করেছেন যেন উভয়ের মিলন স্বাভাবিক আনন্দকে বাস্তবায়িত করে। এ সামঞ্জস্য বা সমন্বয় তিনি একই লিংগের দুই ব্যক্তির অংগ-প্রতংগের মধ্যে সৃষ্টি করেননি। এ জন্মগত বৈশিষ্ট্যের যেরূপ সর্বব্যাপী বিকৃতি হযরত লূত আ.-এর জাতির ভিতরে সংঘটিত হয়েছিল তা যথার্থই বিস্ময়কর ও স্বাভাবিক নিয়মনীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এজন্যেই হযরত লূত আ. জাতির এ অপকর্মের প্রতিবাদে বিস্ময় জড়িত ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন।

তাদের বিকৃতির এ প্রতিবাদের জবাবে হযরত লূতের জাতি সঠিক জবাবদানের পরিবর্তে কেবল একথাই বলেছিল যে, লূত ও তার অনুসারীরা খুব সৎ ও পবিত্র মানুষ সাজতে চায়। ওদের স্থান এখানে নেই। ওদেরকে এদেশ থেকে বের করে দিতে হবে। হযরত লূত আ.-এর অনুসারীরা তাঁর পরিবার-পরিজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, কেবল তাঁর স্ত্রী ছাড়া। নবীর স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও এ মহিলাটি ছিল চরিত্রহীনা, সে তৎকালীন সমাজে প্রচলিত সমকামিতাকে সমর্থন করতো। তাই আল্লাহর ইনসাফের বিধান অনুযায়ী অন্যান্য দুশ্চরিত্রের লোকদের সাথে লূত আ.-এর স্ত্রীকেও ধ্বংস করে দেয়া হলো।–ফী যিলালিল কুরআন

আল্লাহর বাণী قَدَّرْنٰهَا مِنَ الْغٰبِرِيْنَ তাকে পেছনে পড়ে 'থাকা লোকদের অন্তর্ভুক্ত করেছি' কথা দ্বারা কেবল এটা বুঝানো হয়নি যে, হযরত লূত আ.-এর স্ত্রী আল্লাহর নাজাতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। বরং কথাটার অর্থ এও হতে পারে যে, এ পাথর বৃষ্টির শাস্তি তার জন্য বিশেষভাবে নির্ধারণ করা ছিল। এটা এজন্যে যে, একজন নবীর স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও যখন তার সহানুভূতি ছিল সেই অযোগ্য জাতির প্রতি তখন অন্যদের তুলনায় আল্লাহর আযাব তার প্রতি অধিক হওয়াই উচিত। কারণ আল্লাহর অবাধ্যদের প্রতি তার অনুকম্পা তাকে আল্লাহর গযবের অধিকতর যোগ্য করে তুলেছে। আল্লাহ যাকে শিক্ষা ও হেদায়াতের সুযোগ যত বেশী পরিমাণে সংস্থান করে দেবেন, সে তার যথাযথ গুরুত্ব ও মর্যাদা না দিলে তার প্রতি আল্লাহর শাস্তিও সেই হারেই হতে থাকবে। আল্লাহ তাআলা তো দায়িত্ব অনুপাতেই পারিতোষিক দিয়ে থাকেন।–তাদাব্বুরে কুরআন

কোনো কোনো বর্ণনানুযায়ী কওমে লূতের প্রতি আল্লাহর আযাব নাযিল হওয়ার পূর্বেই নবীর সাথীগণকে লোকালয় থেকে দৌড়ে বেরিয়ে যেতে বলা হয়েছিল। আর নির্দেশ ছিল কেউ যেন পেছনের দিকে না তাকায়। এ

নির্দেশ সবাই যথাযথ মেনে চলেছিল। কিন্তু হযরত লূত আ.-এর স্ত্রী সকলের পেছনে থেকে পেছনের দিকে তাকাতে ছিল। পরিণামে সেও আল্লাহর আযাবগ্রস্তদের সাথে ধ্বংস হয়ে গেল। সে তো একদিকে নবীর আদর্শ বিরোধীদের সহযোগী ছিল। আবার আল্লাহর আযাব থেকে পালিয়ে যাওয়ার সময় পেছনের দিকে তাকিয়ে না দেখার আল্লাহর নির্দেশও অমান্য করেছিল। সুতরাং নবী স্বামীর আদর্শ বিচ্যুতির অপরাধের শাস্তি থেকে তাকে নবী স্বামীর স্ত্রী হওয়ার সম্পর্ক আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করতে পারেনি।

❐

পঁচিশ

اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلاَ فِى الْاَرْضِ وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا يَّسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ اَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْيِ نِسَآءَهُمْ ط اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ○

"ফিরাউন পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে বসলো। সে দেশবাসীকে দলে দলে বিভক্ত করে রেখেছিল, যাদের একদলকে সে হীনবল করে রেখেছিল—ওদের পুত্র সন্তান হলে তাকে সে হত্যা করে ফেলতো, আর কন্যা সন্তান হলে তাকে জীবিত থাকতে দিতো। সে তো বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।"–সূরা আল কাসাস ঃ ৪

অনৈসলামী সমাজে নারী-নিরাপত্তাহীনতার করুণ ইতিহাসের একটি দিক

হযরত মূসা আ.-এর জন্ম হবার বছরের এ ঘটনাটি কুরআন শরীফের বিভিন্ন সূরায় বর্ণনা করা হয়েছে। সূরা আল বাকারার ৪৯ আয়াতেও বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। যা এ বইয়ের প্রথম খণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

তৎকালীন মিশরের বাদশাদের উপাধী ছিল 'ফিরাউন'। আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত বিষয়টি হযরত মূসা আ. জন্মের সময়কার অবস্থা। সে সময়ে মিশরের যে অধিপতি ছিল, সে ছিল মিশরের দ্বিতীয় ফিরাউন একজন জালিম জঘন্য চরিত্রের রাজা। সে স্বপ্নে দেখলো যে, বনী ইসরাঈলের এক লোকের হাতে তার রাজত্ব শেষ হয়ে যাবে। এ স্বপ্ন দেখার পর জালিম বাদশাহ রাজ্যের নবজাত পুত্র সন্তানদের হত্যা করার নির্দেশ জারি করে দিলো, কিন্তু কন্যা সন্তানদের জীবিত রেখে দিত। এভাবে সে তার বিভক্তিকৃত জনপদের একটি গোত্রকে পদানত করে রাখার পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করে নিয়েছিল।

আলোচ্য আয়াতে اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلٰى فِى الْاَرْضِ –"ফিরাউন পৃথিবীর বুকে তার বড়ত্ব প্রদর্শন করে বসলো। সে অহংকারে মেতে উঠে পড়লো। সে রাজ্যের জনগণকে যিম্মি করে রেখেছিল। সে নানা কূটকৌশল অবলম্বনে মিশরবাসীকে বহু বিবাদমান দলে বিভক্ত করে রেখেছিল, যাতে তারা কোনো ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে পরিণত হতে না পারে এবং কখনো একজোট

হয়ে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে না পারে। তার অহংকার, যুলুম ও দমননীতির প্রধান শিকার ছিল বনী ইসরাঈলরা। কারণ তাদের আকীদা-বিশ্বাস ও নিয়ম-নীতি তার ও তার কওমের নীতি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের। তারা তাদের দাদা ইবরাহীম আ. ও পিতা ইয়াকুব আ.-এর প্রবর্তিত নিয়ম ও বিধান মেনে চলতো। ক্রমান্বয়ে তাদেরও জীবনযাপন পদ্ধতিতে পরিবর্তন আসতে লাগলো। এতদসত্ত্বেও বিশ্বজগতের মালিক সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ তাআলা—এ মূল বিশ্বাস তখনও তাদের মধ্যে জীবন্ত ছিল। শত নিষ্পেষণেও তারা ফিরাউনের 'সর্বময় ক্ষমতার মালিক' হওয়ার দাবীকে স্বীকার করতো না, সবাই তার শিরক ও পৌত্তলিকতার বিরোধী ছিল।

এভাবে চরম অহংকারী ফিরাউন অনুভব করতে লাগলো যে, এ ভিন্ন মতাবলম্বী জাতির আকীদা-বিশ্বাস ও মিশরে তাদের স্বাধীন অস্তিত্ব তার ক্ষমতা ও রাজত্বের জন্য এক মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সংখ্যায় তারা এতবেশী যে, সামগ্রিকভাবে তাদেরকে মিশর থেকে বহিষ্কার করাও কঠিন। আদম শুমারীতে দেখা গেছে তাদের সংখ্যা কয়েক লক্ষ পরিমাণের। সে আরও সন্দেহ করতো যে, তারা বিরুদ্ধবাদী প্রতিবেশী দেশগুলোর সহযোগিতা নিয়ে তাকে উৎখাত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। তাই সে এ অনমনীয় ও তার অবাধ্য জাতিকে দমন করার উদ্দেশ্যে নানা প্রকার জঘন্য ও নিপীড়নমূলক উপায় উদ্ভাবন করতে লেগে গেল। বিভিন্ন শাস্তির ব্যবস্থা আবিষ্কার করলো, তাদেরকে দেশের কর্মসংস্থান প্রকল্পগুলো থেকে দূরে সরিয়ে রাখলো, তাদের জীবনকে সর্বদিক থেকে দুর্বিসহ করে তুললো, তাদের জীবনে এনে দিল নানা প্রকার জ্বালা-যন্ত্রণা আর অশান্তির সীমাহীন অত্যাচার-অনাচার। সর্বশেষে তাদের সংখ্যা কমানোর হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার মানসে কুরআনে বর্ণিত বিষয়ে অর্থাৎ তাদের পুত্র সন্তানদের হত্যা করার ব্যবস্থা নিলো। ফিরাউন তার প্রশাসনের প্রতি নির্দেশ জারি করলো, যখনি বনী ইসরাঈলীদের কোনো পুত্র সন্তান জন্ম নেয় তখনি যেন তাকে হত্যা করা হয়। আর কন্যা সন্তান হলে যেন তাকে জীবিত রেখে দেয়া হয়। তার উদ্দেশ্য নানা ধরনের যুলুম-অত্যাচারের পাশাপাশি এ পুত্র নিধনযজ্ঞ চালাতে থাকলে ক্রমান্বয়ে তাদের বংশ হ্রাস পেতে থাকবে। অবশেষে তারা দুর্বল হয়ে পড়বে। এ দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা নিয়ে এ যালিম শাসক বনী ইসরাঈলীদের উপর দমননীতি চালানোর সময় একটু ভেবে দেখলো না যে, সে নিজে কত দিন বাঁচতে পারবে। তার চেয়ে শক্তিধর কত রাজাধিরাজ এ

সুন্দর পৃথিবীতে কত জাকজমকের সাথে চলেছিল, কিন্তু তাদের আয়ূ শেষ হওয়ার পর এক মুহূর্তের জন্যও তো তারা দুনিয়াতে টিকে থাকতে পারেনি। নির্দিষ্ট সময় শেষে তারা সবাই এ সুন্দর ভুবন ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে।–ফী যিলালিল কুরআন

হযরত মূসা আ.-এর জন্ম ও লালন-পালন হয়েছিল এমনি এক প্রতিকূল পরিস্থিতিতে—সম্পূর্ণভাবে মহান আল্লাহর অপ্রতিরোধ্য ইচ্ছার ফলে। মূসা আ.-এর এ ইতিহাস প্রমাণ করে যে, আল্লাহ কোনো ব্যক্তি বা জাতিকে বাঁচিয়ে রাখতে চাইলে পৃথিবীর কোনো শক্তিই তাকে বা তাদেরকে ধ্বংস করতে পারে না। আর আল্লাহ কাউকে ধ্বংস করতে চাইলে পৃথিবীর সকল শক্তি একত্রিত হয়েও তাকে বাঁচাতে পারে না।

মানব জাতির মুক্তি ও শান্তির একমাত্র ব্যবস্থা ইসলামী জীবন বিধান কোনো সমাজ বা রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত না থাকলে সেখানে কি রকম নিরাপত্তাহীনতা বিরাজ করে তার কিছু বর্ণনাও আমরা আলোচ্য আয়াত থেকে উপলব্ধি করতে পারি। ঔদ্ধ্যত ফিরাউন যেমন ধরাকে সরা জ্ঞান করে তার বিরোধী ইসরাঈলীদের বংশ ধ্বংস করার লক্ষে রাজ্যের মধ্যে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল ; তেমনি যুগে যুগে আল্লাহদ্রোহী রাজ শক্তিসম্পন্ন ঔদ্ধ্যত ব্যক্তিবর্গ আল্লাহর যমীনে আল্লাহর বান্দাদের নানাবিধ কষ্ট-যন্ত্রণার অক্টোপাশে আবদ্ধ করে রাখার সকল প্রকার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে থাকে। মূসা আ.-এর যুগের ফিরাউনের মত সকল যুগের নব্য ফিরাউনরাও রাজ্যের জনগণকে নানা দল-উপদলে বিভক্ত করে কাউকে দেয় সীমাহীন প্রশ্রয় আর কারো উপর চালায় অত্যাচারের স্টীম রোলার। নিজের মতের বিরোধীদের প্রতি চালাতে থাকে যুলুম-অত্যাচারের চরম দমননীতি। এ জাতীয় জালিমদের হাতে অত্যাচারিত হয় অবলা-অসহায় নারী সমাজ সর্বাধিক। যেমন ফিরাউন ইসরাঈলীদের কন্যা সন্তানকে হত্যা না করে জীবিত রাখতো অথচ পুত্র সন্তানকে জন্মের সাথে সাথে হত্যা করতো। এতে করে সে আসলে নারী জাতিকে চরম অসহায়ত্বের মুখে ঠেলে দিতো। কারণ পুত্র সন্তানগুলোকে হত্যা করার ফলে ঐ সমাজ পুরুষ বিহীন সমাজে পরিণত হতো। ওরা নারীদের বানাতো নিজেদের দাসী, আর তাদের সাথে আচরণ করতো অমানবিক ও পাশবিক ধরনের। এভাবে নারীগণ চরমভাবে নির্যাতিত ও নিগৃহিত হতো তাদের হাতে। বস্তুত সমাজকে উত্তম ও অধম তথা সুবিধাভোগী ও বঞ্চিত শ্রেণী—দুটো গ্রুপে বিভক্ত করা হয় মানব সাধারণকে। কারণ একটা অনৈসলামী সমাজে সমাজপতিরা হয় স্বেচ্ছাচারী

চরিত্রের তারা স্বীয় স্বার্থকে দেখে সবকিছুর উর্ধে। কাউকে সুবিধা দেয়া আর কাউকে অধিকারহত করাই হয় তাদের স্বভাব।

আল কুরআন হয় যে সমাজের দিকনির্দেশক, সেই ইসলামী সমাজে মানবতা আর মানবাধিকার রক্ষিত থাকে গোটা সমাজব্যাপি। সেখানে আল্লাহর হকের চেয়ে বান্দার হকের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয় সর্বাধিক। আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন নারী-পুরুষ সৃষ্টি করেছেন এবং উভয়ের জীবনযাপন প্রণালীও দিয়েছেন পূর্ণাঙ্গভাবে। আল্লাহর বিধানে যেমন ভেদাভেদ নেই সাদা মানুষ আর কালো মানুষে, ঠিক তেমনি এতে পার্থক্য নেই নারী-পুরুষের মর্যাদা ও অধিকারে। বরং স্ত্রীর ভরণ-পোষণের সার্বিক দায়িত্ব দেয়া হয়েছে স্বামীর উপর। এতে নর হত্যাকে যতটুকু পাপ নারী হত্যাও ঠিক ততটুকুই পাপ। অধিকন্তু আল্লাহর সৃষ্টিরাজিকে ভালবাসা মুমিনের কর্তব্য। ইসলামী বিধান যেমন মানব ও জিন জাতির জীবন পথের একমাত্র কল্যাণব্যবস্থা তেমনি একমাত্র ইসলামই সৃষ্টিকূলের প্রকৃত রক্ষাকবচ। তাফহীমুল কুরআনের লেখক মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র. আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় ফিরাউনের মিশর অধিবাসীদেরকে বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত করে কাউকে অধিক সুযোগ-সুবিধা দিয়ে শাসক-গোষ্ঠীর মর্যাদা দিতো, আর কাউকে অধীন ও প্রজাসাধারণে পরিণত করতো বলে উল্লেখ করেছেন। অধিকন্তু, সে বনী ইসরাঈলের জনসংখ্যা হ্রাস করার জন্য কার্যকর নীতি ও কর্মপন্থা গ্রহণ করেছিল। তাদের বংশের পুত্র সন্তানকে হত্যা করার কারণে তাদের স্ত্রীরা ধীরে ধীরে কিবতীদের অধীনে আসতো এবং তাদের গর্ভে ইসরাঈলী নয়—কিব্তী সন্তান জন্মগ্রহণ করতো। এভাবে জাতীয় পর্যায়ে আল্লাহদ্রোহী ফিরাউনীরা ইসরাঈলী নারীদের নাজেহাল করতো।

তাফহীমুল কুরআন তালমূদ থেকে লিখেছে যে, ফিরাউনের সরকার প্রথমত, বনী ইসরাঈলকে তাদের শস্য-শ্যামল উর্বর ভূমি-ক্ষেত, তাদের ঘরবাড়ী ও বিত্ত-সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে দেয়। অতপর তাদেরকে সকল প্রকার পদ ও ক্ষমতা থেকে বহিষ্কার করে দেয়। তারপরও শাসকগণ যখন মনে করলো বনী ইসরাঈল এবং তাদের সম ধর্মের লোক মিশরে যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠেছে, তখন তারা ইসরাঈলীদের লাঞ্ছিত ও অপমানিত করতে শুরু করে দেয়, তাদেরকে সব ধরনের ও প্রণান্তকর পরিশ্রম করতে বাধ্য করে ; বিনিময়ে হয় অতি সামান্য পারিশ্রমিক দেয়া হতো, নয়তো কোনো মজুরীই দেয়া হতো না। সূরা আল বাকারায় বলা হয়েছে ঃ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ ফেরাউনীরা বনী ইসরাঈলকে নির্মম শাস্তি ও

কঠোর আযাব দিতো। ওদের এ আযাবের ধরণই ছিল অমানবিক। তার মধ্যে পুরুষদের নিপাত করে বংশ বৃদ্ধির পথ রুদ্ধ করা, নারীদেরকে নিজেদের দাসী বানিয়ে ইসরাঈলীদের নাম-নিশানা নিঃশেষ করতে গিয়ে বাস্তবে মহিলাদের উপরই চলতো মানসিক, দৈহিক এবং সাংস্কৃতিক যাতনা, সর্বোপরী তাদের জাতিসত্তার উপর চরম আঘাত।

❐

ছাব্বিশ

وَاَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اُمِّ مُوْسٰٓى اَنْ اَرْضِعِيْهِ ج فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَاَلْقِيْهِ فِى الْيَمِّ وَلَا
تَخَافِىْ وَلَا تَحْزَنِىْ ج اِنَّا رَآدُّوْهُ اِلَيْكِ وَجَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ○ فَالْتَقَطَهٗٓ
اٰلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُوْنَ لَهُمْ عَدُوًّا وَّحَزَنًا ط اِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَجُنُوْدَهُمَا
كَانُوْا خٰطِئِيْنَ ○ وَقَالَتِ امْرَاَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّىْ وَلَكَ ط لَاتَقْتُلُوْهُ ق
عَسٰٓى اَنْ يَّنْفَعَنَآ اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا وَّهُمْ لَايَشْعُرُوْنَ ○ وَاَصْبَحَ فُؤَادُ اُمِّ
مُوْسٰى فٰرِغًا ط اِنْ كَادَتْ لَتُبْدِىْ بِهٖ لَوْلَآ اَنْ رَّبَطْنَا عَلٰى قَلْبِهَا لِتَكُوْنَ مِنَ
الْمُؤْمِنِيْنَ ○ وَقَالَتْ لِاُخْتِهٖ قُصِّيْهِ ز فَبَصُرَتْ بِهٖ عَنْ جُنُبٍ وَّهُمْ
لَايَشْعُرُوْنَ ۝ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰٓى
اَهْلِ بَيْتٍ يَّكْفُلُوْنَهٗ لَكُمْ وَهُمْ لَهٗ نٰصِحُوْنَ ○ فَرَدَدْنٰهُ اِلٰٓى اُمِّهٖ كَىْ تَقَرَّ
عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَايَعْلَمُوْنَ ۝

"আমি মূসার মায়ের অন্তরে ইংগিতে নির্দেশ করলাম যে, শিশুটিকে বুকের দুধ খাওয়াতে থাক। অতপর যখন তার ব্যাপারে আশংকা করবে তখন তাকে নদীতে ছেড়ে দিবে, তার জন্যে ভয় করবে না চিন্তিত হবে না, আমি তাকে অবশ্যই তোমার কাছে ফিরিয়ে দিব আর তাকে রসূলদের মধ্যে শামিল করে নেবো। শেষ পর্যন্ত ফিরাউনের লোকেরা তাকে নদী থেকে তুলে আনলো। পরে যেন সে ওদের দুশমন আর দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। নিশ্চয়ই ফিরাউন, হামান ও তাদের সৈন্য-সান্তরাই তো ছিল অপরাধী। ফিরাউনের স্ত্রী তাকে বললো, শিশুটি আমার ও তোমার চক্ষু শীলতকারী, একে হত্যা করো না। এতো আমাদের উপকারে আসতে পারে, আমরা তাকে আমাদের পুত্র বানিয়ে নিতেও পারি। প্রকৃতপক্ষে তারা পরিণামটা বুঝতেই পারেনি। এদিকে মূসার মায়ের অন্তর অস্থির হয়ে উঠলো। আমি তার অন্তরকে দৃঢ় করে না দিলে তো সে ওদের কাছে শিশুর পরিচয় প্রকাশ করেই দিতো। সে শিশুর ভগ্নিকে বললো, "এর পিছে পিছে যাও।" মেয়েটি দূরে থেকে শিশুকে এমনভাবে

দেখতে লাগলো যে, শত্রুরা টেরও পেল না। আমি তো শিশুর জন্য ধাত্রীদের দুধ বন্ধ করে রেখেছি সে কারো স্তনে মুখ লাগাচ্ছিলো না। মূসার ভগ্নি বললো, আমি তোমাদেরকে এমন পরিবারের সন্ধান দেব কি, যারা তোমাদের জন্য একে লালন-পালন করবে এবং কল্যাণ-কামনা সহকারে এর রক্ষণাবেক্ষণ করবে ? এভাবে আমি মূসাকে তার মার কাছে ফিরিয়ে দিলাম, যেন তার চোখ জুড়ায় ও সে চিন্তায় কাতর না হয়ে পড়ে। এবং সে যেন জানতে পারে যে আল্লাহর ওয়াদা সত্য ; যদিও অনেক লোকই তা জানে না।"–সূরা আল কাসাস ঃ ৭-১৩

যে তিন নারীর মাধ্যমে আল্লাহ্ শিশু মূসাকে ফিরাউনের হাত থেকে বাঁচালেন

যে সময়ে হযরত মূসা আ.-এর জন্ম হয়েছিল, সে সময়ে বনী ইসরাঈলের ছেলে সন্তানদের ধ্বংস করার স্কীম চলছিল খুব জোরেশোরে। প্রথমদিকে ফিরাউন ও তার সহায়তাকারীরা ধাত্রীদের মাধ্যমে এ কাজ আনজাম দিতো। কিন্তু তাওরাত থেকে জানা যায় যে, ধাত্রীগণ এ কাজে তেমন একটা সহায়তা করতো না। অবশেষে ফিরাউন কিবতীদের এ সাধারণ নির্দেশ দিয়ে দিল যে, বনী ইসরাঈলীদের ঘরে যে ছেলে শিশু জন্ম নেবে, তাকে নদীতে নিক্ষেপ করবে। ঠিক সেই ভয়াবহ সময়েই জন্মগ্রহণ করেন হযরত মূসা আ.। তাঁর ব্যাপারে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলার ইচ্ছাই কার্যকর হয়। তিনজন মহিলা—১. মূসা আ.-এর মা, ২. তাঁর বোন এবং ৩. খোদ ফিরাউনের স্ত্রী আছিয়া—এদের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা পূরণ হয় আর ফিরাউনের সকল নীলনকশা ব্যর্থ হয়ে যায়। হযরত মূসা আ. এতসব বাধা সত্ত্বেও বেঁচে যান।

হযরত মূসা আ.-এর জন্ম হলে তাঁর মা সর্বক্ষণ আতংকে জড়ো হয়ে থাকতেন। আল্লাহ তাআলা মূসা আ.-এর মায়ের অন্তরে সস্থিরতা ঢেলে দিলেন। বললেন, তুমি ওকে বুকের দুধ পান করাতে থাক। যখন ওর ব্যাপারে আশংকা ঘনীভূত হয়ে দেখা দেয়, তখন শিশুটিকে বিনা দ্বিধায় সিন্দুকে ভরে নদীতে ছেড়ে দেবে। আর ওর জন্যে কোনো প্রকার চিন্তা-ভাবনা করবে না। আমি ওকে তোমারই কাছে ফিরিয়ে দেব। তাছাড়া ভবিষ্যতে ওকে আমি রিসালাতের মর্যাদায় ভূষিত করবো। উল্লেখ্য, আল্লাহ তাআলা মূসা আ.-এর মাতাকে নিজ সন্তানকে নদীতে ভাসিয়ে দেয়ার নির্দেশ

দানের মধ্যে যে রহস্য লুকায়িত আছে তাহলো ফিরাউন বনী ইসরাঈলদের ছেলে শিশুর ধ্বংসের জন্য যে পন্থা অবলম্বন করেছিল, ঠিক সে পন্থায়ই তিনি হযরত মূসা আ.-কে নাজাত দেয়ার জন্য স্থির করেছিলেন।–তাদাব্বুরে কুরআন

আল কুরআনের আয়াতের কথা এ ছিল না যে, সন্তান জন্ম নিলে সাথে সাথে তাকে নদীতে ভাসিয়ে দিতে হবে। বরং নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, যতদিন কোনো বিপদের আশংকা দেখা না দিবে ততদিন তাকে বুকের দুধ খাওয়াতে থাক। যখন এর গোপনীয়তা প্রকাশ হয়ে পড়ার আশংকা দেখা দিবে, অথবা যদি শিশুর আওয়ায শোনার অথবা অন্য কোনো উপায়ে শত্রুরা শিশুর জন্ম সম্পর্কে অবহিত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়, কিংবা বনী ইসরাঈলের কেউ হিংসা করে যদি সরকারকে জানিয়ে দেয়ার উপক্রম হয়, তখন কোনোরূপ ভয়ভীতি ছাড়াই শিশুটিকে একটি তাবুতে—সিন্দুকে ভরে নদীতে ভাসিয়ে দেবে। বাইবেলে বলা হয়েছে, হযরত মূসা আ.-এর মাতা তাঁকে তিন মাস পর্যন্ত লুকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। তালমূদে বলা হয়েছে তিন মাসের মাথায় ফেরাউনী সরকার গোয়েন্দা স্ত্রীলোক নিয়োগ দিয়েছিল। তারা নিজেদের সাথে ছোট শিশুকে নিয়ে ইসরাঈলীদের ঘরে যেতো এবং সেখানে গিয়ে তাদেরকে কৌশলে কাঁদিয়ে দিতো। উদ্দেশ্য ছিল এই যে, যদি কোনো ঘরে কেউ কোনো শিশু লুকিয়ে রাখে তাহলে এ শিশুর কান্না শুনে লুকিয়ে রাখা শিশুটিও কেঁদে উঠবে। এ নতুন পদ্ধতির গোয়েন্দাগিরিতে হযরত মূসা আ.-এর মাতা খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। তিনি বাঁচিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে নিজের সন্তানকে ভাসিয়ে দিলেন নদীর পানিতে। এ পর্যায়ে কুরআন শরীফ এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করেছে যা কোনো ইসরাঈলী বর্ণনায় পাওয়া যায় না। কথাটি হলো এই যে, হযরত মূসা আ.-এর মাতা তাঁকে সিন্দুকে ভরে নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন, আল্লাহ তাআলার দেয়া আশ্বাস ও তার নির্দেশক্রমে। আল্লাহ পূর্বেই তাঁকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলেছিলেন, এ কাজ করলে আমি কেবল তোমার সন্তানকেই বাঁচিয়ে রাখবো না, বরং তাকে আমি আবার তোমারই কোলে ফিরিয়ে আনবো, পরিশেষে তাকে আমি আমার রসূল বানিয়ে দেবো। কেবল আল্লাহর এ আশ্বাসবাণী ও নির্দেশনার প্রতি অবিচল বিশ্বাসই মূসা আ.-এর মাকে নিজ শিশুকে নদীতে ভাসিয়ে দেয়ার কাজে শক্তি-সাহস যুগিয়েছিল। অন্যথা কোনো মা কি কখনো নিজ শিশু সন্তানকে নদীতে ভাসিয়ে দিতে পারে ?–তাফহীমুল কুরআন ও তাদাব্বুরে কুরআন

হযরত মূসা আ. এভাবে তাঁর মায়ের সচেতন সংরক্ষণ ও সুকৌশল লালন-পালন ব্যবস্থাপনায় তিনটি মাস পর্যন্ত গোপনে প্রতিপালিত হচ্ছিলেন। সর্বশক্তিমান রব্বুল আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক মূসা আ.-এর মাতা যখন এভাবে গোপনে শিশুকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবেন না বলে আশংকা দেখা দিল, তখন তিনি শিশুটিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আল্লাহর নির্দেশনায় ভরসা করে বাক্সে করে নদীতে—নীল নদে ভাসিয়ে দিলেন। এ নদীটি ইসরাঈলী এলাকা থেকে ফিরাউনের বাড়ীর পাশ দিয়ে বয়ে গিয়েছিল। বাক্সটি ভেসে ভেসে ঠিক ফিরাউনের বাড়ীর দিকেই যাচ্ছিলো। এদিকে মূসা আ.-এর মায়ের অন্তর অস্থির ও বিচলিত হয়ে উঠেছিল। আল্লাহর উপর ভরসা রেখে তো শিশুকে নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু তবুও তো মার অন্তর কেঁপে উঠলো। মা মূসা আ.-এর বোনকে বললেন, তুমি বাক্সটি দেখতে দেখতে এটির পেছনে পেছনে যেতে থাক। এখান থেকে শুরু হলো মূসা এর বোনের ভূমিকা। ইসরাঈলী বর্ণনা অনুযায়ী হযরত মূসা আ.-এর এ বোনের বয়স ছিল তখন ১০/১২ বছর। সে ছিল খুবই বুদ্ধিমতি। মায়ের নির্দেশ মোতাবেক মেয়েটি শিশু মূসাকে রাখা সেই বাক্সটির প্রতি দৃষ্টি রেখে নদীর কিনারা দিয়ে চলতে লাগলো। সে খুব সতর্কতার সাথে বাক্সটি দেখতে দেখতে নদীর পাশ দিয়ে এমনভাবে চলছিল যেন কেউ বুঝতে না পারে যে, সে ঐ বাক্সটির অনুসরণ করছিল। অবশেষে বাক্সটি ফিরাউনের রাজপ্রাসাদের কাছে গিয়ে পৌছলো।

ঐ সময় ফিরাউনের চাকর-বাকররা বাক্সটি ধরে ফেলে এবং তা ফিরাউনের স্ত্রীর কাছে নিয়ে যায়। এমনও হতে পারে যে, ফিরাউনের স্ত্রী নদীর তীরে পরিভ্রমণে মশগুল ছিল আর চাকর-বাকররা তা দেখতে পেল। পরে তারই নির্দেশে ওটা তুলে নেয়া হয়। বাক্সে একটি শিশু দেখতে পেয়ে তাদের বুঝতে দেরী হলো না যে, এটি কোনো ইসরাঈলীর বাচ্চা। কারণ ঐ সময়টি ছিল ওদের শিশু হত্যা করে ফেলার নির্দেশ কার্যকর হওয়ার সময়কার (ঘটনা)। তাছাড়া বাক্সটি ভেসে আসছিল ইসরাঈলী মহল্লারই দিক থেকে। কাজেই ধারণা করা যেতে পারে যে, কোনো দম্পতি নিজের শিশু-সন্তানকে কিছুকাল লুকিয়ে রেখে লালন-পালন করতে থাকে। পরে ধরা পড়ে যাওয়ার আশংকা হলে শিশুটিকে নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হয় এ আশায় যে, হয়তো এতে করে ওর প্রাণ বেঁচে যাবে আর কেউ তাকে তুলে নিয়ে লালন-পালন করবে। এ কারণে কোনো কোনো অনুগত চাকর নিবেদন করলো, স্যার, একে এ মুহূর্তেই হত্যা করিয়ে ফেলুন। এও হয়তো অজগর সন্তান হয়ে থাকবে। কিন্তু ফিরাউনের স্ত্রী তো একজন নারী। সম্ভবত সন্তানহীনা নারী ছিলেন। আর শিশুটা

ছিল অত্যন্ত সুদর্শন। যেমন সূরা ত্বা-হায় হযরত মূসা আ.-কে বলেছিলেন وَاَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّىْ আমি নিজের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি মুহাব্বত ঢেলে দিয়েছিলাম (ত্বা-হা ঃ ৩১) অর্থাৎ তোমাকে এমন সুন্দর আকৃতি দিয়ে বানিয়েছিলাম যে, যে-ই দেখবে সে-ই তোমাকে স্নেহ করবে। এ কারণে শিশু মূসাকে দেখে স্থির থাকতে পারলো না। সে বললো, "একে হত্যা করবে না, বরং ওকে লালন-পালন করা হবে। আমাদের হাতে লালিত-পালিত হয়ে যখন সে বড় হবে আর আমরা তাকে নিজেদের পুত্র বানিয়ে নেব। তখন সে যে ইসরাঈলী বংশজাত তা তার মনে থাকবে না। বরং সে নিজেকে ফিরাউনী বংশের একজন মনে করবে। তখন তার যোগ্যতা কর্মক্ষমতা ইসরাঈলীদের পরিবর্তে আমাদেরই কাজে লাগবে।–তাফহীমুল কুরআন

এভাবে হযরত মূসা আ. শিশু অবস্থায় স্বয়ং ফিরাউনের স্ত্রীর আন্তরিকতা ও স্নেহ-মমতায় ফিরাউনেরই ঘরে লালিত-পালিত হওয়ার সুযোগ লাভ করবে। তিন মাস পর্যন্ত নিজের মায়ের সরাসরি তত্ত্বাবধানে তার প্রতিপালনের পর রাষ্ট্রীয় আইনের আওতায় হত্যা হয়ে যাওয়ার অবস্থার সম্মুখীন হলে সর্বশক্তিমান আল্লাহর কুদরতে সেই হত্যার নির্দেশদানকারীর ঘরেই শিশু মূসার প্রতিপালনের ব্যবস্থা হতে থাকে। শিশুটিকে ঘরে এনে দুধ পান করানোর জন্য ধাত্রী নিযুক্তির পালা এলো। কিন্তু কি আশ্চর্য! শিশুটি কোনো ধাত্রীর স্তনই যে মুখে নিচ্ছে না!

এদিকে মূসা আ.-এর বোন অতি সুকৌশলে ভাইয়ের কোনো ধাত্রীর দুধ পান না করার কথা জেনে গেল। সে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে রাজ প্রাসাদের আশপাশে ঘোরাফিরা করতে থেকে জেনে গেল যে শিশুটি (তার ভাই) কারো স্তন মুখে না নেয়াতে ফিরাউনের স্ত্রী ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লো এবং শিশুটির পসন্দসই কোনো ধাত্রী পাওয়া যায় কিনা সেই খোঁজ নিতে লাগলো। ঠিক সেই মুহূর্তে অতুলনীয় বুদ্ধিমত্তার মালিক শিশু মূসার বোনটি সোজাসুজি রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করলো এবং বললো আমি এমন এক ভাল পরিবারের খবর দেব কি, যে এ শিশুটিকে অতি যত্ন সহকারে লালন-পালন করবে এবং কল্যাণ কামনা সহকারে এর রক্ষণাবেক্ষণ করবে। এ বলে মূসার বোন তার মায়ের সন্ধান দিলে শেষ পর্যন্ত মূসার মা-ই ধাত্রী হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়। ঠিক এ ঘটনাংশটির প্রতি ইংগিত দিয়েই রাব্বুল আলামীন আল কুরআনে বলছেন ঃ

فَرَدَدْنٰهُ اِلٰى اُمِّهٖ كَىْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

"এভাবে আমি মূসাকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলাম, যেন তার চোখ ঠাণ্ডা হয় আর সে দুশ্চিন্তামুক্ত হতে পারে। তাছাড়া যেন দেখতে পায় যে আল্লাহর ওয়াদা বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। অবশ্য অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।"–সূরা আল কাসাস ঃ ১৩

হযরত মূসা আ. তাঁর জন্মকালের সেই অতি ভয়াবহ পরিস্থিতির শিকার হওয়া থেকে মহান রাব্বুল আলামীন তাকে বাঁচিয়ে রাখলেন। অধিকন্তু আল্লাহর কুদরত বুঝার ক্ষমতা আছে কার ! যে ফিরাউন সকল ইসরাঈলী নবজাতক হত্যা রাষ্ট্রীয় আইন করে দিয়েছিল। সেই রাষ্ট্রীয় আইন পুরোদমে রাষ্ট্রে জারি থাকা অবস্থায়ই মূসার লালন-পালন হতে থাকে। হতে থাকে স্বয়ং সেই আইন প্রণেতারই ঘরে তারই স্ত্রীর তত্ত্বাবধানে। এখানে মহান রাব্বুল আলামীনের কুদরতী রহস্যের আরেকটি দিক হলো শেষ পর্যন্ত মূসার প্রতিপালনের ভার মূসার মায়ের উপরই ন্যস্ত হলো এবং মূসার মা দুধ খাওয়ালেন নিজের সন্তানকে অথচ সে জন্য ভাতাও পেলেন ঐ শিশুটি হত্যার ঘোষণাকারীর পকেট থেকে। আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আকবার।

আল্লাহ তাআলার এ হিকমতময় ব্যবস্থার ফলে আরও যে ফায়দা পাওয়া গেল, তাহলো হযরত মূসাকে ফিরাউন তার শাহজাদা বানাতে পারলো না। বরং হযরত মূসা আ. নিজেরই মাতা-পিতা ও ভাই-বোনের মধ্য থেকে লালিত-পালিত হয়ে নিজ বংশের বৈশিষ্ট্য ও মৌলিকতা সম্পর্কে ভালভাবে ওয়াকিফহাল হয়েছিলেন। নিজের পারিবারিক ঐতিহ্য, পৈত্রিক ধর্ম ও স্বীয় জাতির সাথে তাঁর সম্পর্ক মোটেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়নি। তিনি একজন ফিরাউনী বা ফিরাউনী নীতিবাদী হয়ে গড়ে উঠার পরিবর্তে তাঁর মনের ভাবধারা, চিন্তা-চেতনা ও আবেগ-অনুভূতি ইত্যাদির দিক থেকে একজন ইসরাঈলী হয়েই বড় হয়ে উঠেছিলেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদীসে বলেন ঃ

مَثَلُ الَّذِىْ يَعْمَلُ وَيَحْتَسِبُ فِىْ صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ كَمَثَلِ اُمِّ مُوْسٰى، تَرْضِعُ وَلَدَهَا وَتَأْخُذُ اَجْرَهَا ـ

"যে ব্যক্তি নিজের রুজী-রোজগারের জন্য কাজ করে এবং এ কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভ করাই হয় তার লক্ষ ; সে তো মূসার মায়ের মত—সে নিজেরই সন্তানকে দুধ খাওয়ায়, আর তার বিনিময়ে মজুরীও গ্রহণ করে।"

অর্থাৎ এরূপ লোক যদিও নিজেরই ছেলেমেয়ে ও পরিবার-পরিজনের জন্য কাজ করে ; কিন্তু আল্লাহর সন্তোষলাভের উদ্দেশ্যে ঈমানদারী সহকারে কাজ করে, যার সাথেই কোনো কাজ করে তারই হক ঠিকভাবে আদায় করে এবং হালাল রিয্‌ক দিয়ে নিজের ও নিজের সন্তান-সন্ততির লালন-পালন করে আল্লাহর ইবাদাত হিসেবে। এ কারণে সেই নিজের রুজী-রোজগার করার জন্যও আল্লাহর নিকট থেকে পুরস্কার লাভ করার যোগ্য। ফলে সে রুজীও হাসিল করলো আবার সওয়াব এবং পুরস্কারও লাভ করলো।"–তাফহীমুল কুরআন

❐

সাতাইশ

وَلَمَّآ اَنْ جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا سِيْٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّقَالُوْا لَاتَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ قف اِنَّا مُنَجُّوْكَ وَاَهْلَكَ اِلَّا امْرَاَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ○ اِنَّا مُنْزِلُوْنَ عَلٰٓى اَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ○

"যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতারা লূতের কাছে এলো, তখন তাদের আগমনে সে খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লো এবং নিজেকে তাদের রক্ষায় অসমর্থ মনে করলো। তারা বললো, ভয় করো না, দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ো না। আমরা তোমাকে ও তোমার পরিজনবর্গকে রক্ষা করবোই ; তবে তোমার স্ত্রীকে নয়। সে তো ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত। আমরা এ জনপদের ওপর আকাশ থেকে শাস্তি নাযিল করবো। কেননা এরা পাপাচার করছিল।"

–সূরা আনকাবূত ঃ ৩৩-৩৪

কওমে লূতের অভূতপূর্ব নাফরমানী সমর্থন করায় নবী-পত্নী আল্লাহর গযবে পতিত হলো যেভাবে

হযরত লূত আ.-এর কওম চরিত্রহীনতার এমন এক পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল যা ইতিপূর্বে পৃথিবীর কেউ কোনোদিন করেনি। তারা কাম-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য স্বাভাবিক নিয়ম-নীতির বিপরীত নারীর পরিবর্তে পুরুষের কাছে গমন করার জঘন্য অপরাধে লিপ্ত হয়ে পড়লো। তাদের হেদায়াতের জন্য আল্লাহ তাআলা হযরত লূত আ.-কে পাঠালেন। হযরত লূত আ. তাদের অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য চরম চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন। অবশেষে আল্লাহর ফায়সালা হলো, অবাধ্য কাওমে লূতকে ধ্বংস করে দেয়ার।

একদা আল্লাহ তাআলা একদল ফেরেশতা পাঠালেন ওদের শাস্তি দেয়ার জন্যে। ফেরেশতারা সুশ্রী বালকের ছবি ধরে হযরত লূত আ.-এর বাড়ীতে গেলেন। ইতিমধ্যে ঐসব ফেরেশতাদের গ্রামের দুষ্ট লোকেরা মানুষ ভেবে দৌড়ে আসলো তাদের কুমতলব চরিতার্থ করার মানসে। হযরত লূত আ. তো ফেরেশতাদের দেখেই চরম অস্থিরতায় পড়ে গেলেন। তিনি ভাবলেন এ মেহমানদের যদি সেখানে থাকতে দেয়া হয়, তাহলে সেই চরিত্রহীন

দুষ্ট জাতির লোকদের হাত থেকে ওদের রক্ষা করাই কঠিন হয়ে পড়বে। পক্ষান্তরে মেহমানদের সেখানে থাকতে দেয়া না হলেও তা হবে নিতান্ত অভদ্রতা ও সৌজন্য পরিপন্থী। তাছাড়া এ বিদেশী মুসাফিরদেরকে নিজের ঘরে থাকতে না দিলে, তাদেরকে অন্য কোথায়ও রাত যাপন করতে দিতে হবে। আর সেটা হবে নিজের হাতেই তাদেরকে বাঘের মুখে ঠেলে দেয়ার মতো। পুরো ঘটনাটি সবিস্তারে বলা হয়েছে সূরা হূদ, আল হিজর ও আল কামার-এ। সেসব স্থানে বলা হয়েছে এ সুদর্শন বালকদের আগমনের খবর প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথে শহরের অগণিত লোক হযরত লূত আ.-এর বাড়ির উপর চড়াও হলো এবং অশ্লীল কর্মের জন্য বালকদেরকে ওদের কাছে সোপর্দ করার দাবী জানাতে থাকে।

সূরা হূদ-এ স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে যে, লোকেরা যখন হযরত লূত আ.-এর বাড়ীতে ভীড় জমিয়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করছিল, তখন তিনি আগত মেহমানদেরকে দুষ্ট লোকদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবেন না বলে মনে করলেন এবং নিরুপায় ও দিশেহারা হয়ে চিৎকার করে বলে উঠলেন ঃ

لَوْ اَنَّ لِىْ بِكُمْ قُوَّةً اَوْ اٰوِىْ اِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ ـ

"হায় আমার হাতে যদি তোমাদের দমন করার শক্তি থাকতো, কিংবা কোনো শক্তিমানের সাহায্য যদি পেতাম।"

তখন ফেরেশতাগণ বললেন ঃ

يَا لُوْطُ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَّصِلُوْا اِلَيْكَ ـ

"হে লূত! আমরা তো তোমার রবের প্রেরিত ফেরেশতা। এরা কিছুতেই তোমার পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না।"

অর্থাৎ আমাদের ব্যাপারে তোমার অস্থির হওয়ার কোনো কারণ নেই। এ দুষ্ট লোকেরা আমাদের কোনো ক্ষতি বা সৃষ্টির অসুবিধা করতে পারবে না। ওদের হাত থেকে আমাদের বাঁচানোর জন্য কোনো চিন্তা করো না, ফেরেশতারা এ সময় হযরত লূতকে জানিয়ে দিলেন যে, তাঁরা মানুষ নন, মানুষের বেশে ফেরেশতা তাঁরা। এ জাতির উপর আযাব নাযিল করার উদ্দেশ্যেই তাঁদেরকে পাঠানো হয়েছে।"–তাফহীমুল কুরআন

হযরত মাওলানা আবু মুহাম্মদ আবদুল হক হাক্কানী দেহলভী রহ. তাঁর তাফসীর 'তাফসীরে ফাতহুল মান্নান' (তাফসীরে হাক্কানী) তে উল্লেখ করেন ঃ

মানুষরূপী ফেরেশতারা হযরত লূত আ.-এর ঘরে এখনো শুইতে যায়নি —এমন সময় শহরের আবাল-বৃদ্ধ বহু লোক এসে তাঁর ঘর ঘেরাও করে

ফেলে। আর বলে এসব মেহমানদের আমাদের সোপর্দ করো। হযরত লূত আ. দরজা খুলে বাইরে গিয়ে তাদেরকে সাধ্যমত বুঝালেন যে এরা তো আমার মেহমান। দুষ্ট লোকেরা এবার ধমক দিয়ে বললো, তুমি কি এখানে বসবাস করার ইচ্ছে রাখ, না কি শাসন করতে এসেছো। এই বলে তারা দরজা ভেংগে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করলো। ফেরেশতারা লূত আ.-কে টেনে ভেতরে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন। আর ওদেরকে অন্ধ করে দিলেন। ওরা দরজা খুঁজতে খুঁজতে থেমে গেল। তখন মেহমানরা লূত আ.-কে বললেন, আপনি ভীতসন্ত্রস্ত হবেন না, আমরা তো ফেরেশতা। আমরা এসেছি এ শহরকে ধ্বংস করার জন্যে। আপনি ভোর হওয়ার পূর্বেই নিজের লোকদের নিয়ে বেরিয়ে পড়ুন। লূত আ. ভোর হওয়ার পূর্বেই বেরিয়ে পড়লেন। সূর্যোদয়ের সময় সাদুম ও আমুরায় গন্ধক ও আগুন বর্ষণ করা হলো। তাঁর স্ত্রী পেছনে ফিরে গেলে ওখানেই জমে গেল।–তাফসীরে হাক্কানী

আলোচ্য আয়াত দুটোতে হযরত লূত আ.-এর কওমের পরিণতির বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে অতিসংক্ষেপে। আয়াতগুলোর মাফহুমের আলোকে পূর্বোক্ত আলোচনা করা হয়েছে। সাইয়েদ কুতুব শহীদ রহ.-এর তাফসীর 'ফী যিলালিল কুরআন' থেকে নিম্নে মূল বিষয়টি সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো ঃ

হযরত লূত আ.-এর জাতির মধ্যে সব ধরনের অনাচার অপকর্ম ও দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়েছিল তার মধ্যে প্রধান অনাচারটি ছিল তারা সমকামে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল—যা ইতিপূর্বে কোনো মানুষের মধ্যে ছিল না ; এমনকি অদ্যাবধি কোনো পশুর মধ্যেও সংঘটিত হয়নি। তাদের পুরুষে পুরুষে সমকাম ছিল অত্যন্ত ঘৃণ্য ও নোংরা ধরনের এক বিরল কুকর্ম—যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বর্গের স্বভাব ও প্রকৃতির সার্বিক বিকৃতিরই লক্ষণ। নারীর সাথে যৌন সম্পর্কে ও স্বভাবের বিকৃতি ঘটতে পারে, যদি তা শালীনতা ও পবিত্রতার সীমা অতিক্রম করে যায়। সে ক্ষেত্রেও যৌন সম্পর্ক অশ্লীল অপরাধ বলে গণ্য হবে। কিন্তু তারপরও তা স্বাভাবিকতার গণ্ডীর মধ্যেই থাকবে। পক্ষান্তরে উপরোক্ত নযীরবিহীন বিকৃতি সমগ্র জীব জগতের স্বাভাবিক নিয়ম লংঘনের শামিল। ওটা মানসিক ও দৈহিক—উভয় ধরনের বিকৃতি। কেননা আল্লাহ তাআলা স্বামী-স্ত্রীর যৌন মিলনের স্বাদ ও আনন্দকে জীবনের বৃহত্তর ধারাবাহিকতার সাথে এবং এ মিলনঘটিত প্রজাতিক বিস্তৃতি ও বংশ বৃদ্ধির সাথে সমন্বিত করেছেন। আর স্বামী ও স্ত্রী—উভয়কে এ মিলনের আনন্দ উপভোগ করার শারীরিক ও মানসিক যোগ্যতাও তেমনি সমন্বিতভাবে দান করেছেন। কিন্তু একই লিংগধারী দু ব্যক্তির

অস্বাভাবিক যৌন মিলনের যেমন কোনো উদ্দেশ্য নেই তেমনি এ কাজের ভেতর স্বাভাবিক স্বাদ-আনন্দও নেই। যদি কেউ এতে কোনো স্বাদ ও আনন্দ পায়, তবে বুঝতে হবে যে সৃষ্টির স্বাভাবিক ধারা থেকে তার যোগসূত্র চূড়ান্তভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং তার এমন রুচীবিকৃতি ঘটেছে যে, তাকে আর কোনো সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন বলা যায় না।

তাদের আর একটি দুষ্কর্ম ছিল সড়ক পথে ডাকাতি ও রাহাযানি। পথচারীদের টাকা-পয়সা ও সহায়-সম্পদ লুণ্ঠন এবং সন্ত্রাস সৃষ্টি ছাড়াও তাদের উপর পাশবিক বলাৎকার করাও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। ছিনতাই, লুণ্ঠন এবং দেশব্যাপী নৈরাজ্য সৃষ্টি ইত্যাদি তাদের সমকামকে ব্যাপকতর করার মাধ্যম হয়ে উঠেছিল।

ওদের এ সমকামিতার কাজটা তারা করতো প্রকাশ্যে, সম্মিলিতভাবে ও সর্বসম্মতভাবে। কেউ কাউকে দেখে লজ্জা বা সংকোচবোধ করতো না। এভাবে তারা অশ্লীলতা, স্বভাব বিকৃতি, রুচীবিকৃতি ও ধৃষ্টতার সকল সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। ফলে তাদের সংশোধনের আর কোনো আশা বাকী ছিল না।

হযরত লূত আ. প্রথম দিকে তাদেরকে মিষ্টভাষায় সদুপদেশ দিচ্ছিলেন এবং অশ্লীলতা পরিহার করার আহ্বান জানাচ্ছিলেন। কিন্তু তারা তাদের অপকর্মের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। অবশেষে তিনি তাদের অপকর্মের জঘন্যতা বুঝাতে থাকেন এবং সে কারণে আল্লাহর আযাব আসার ভীতিপ্রদর্শন করতে থাকেন। কিন্তু তাঁর হতভাগা জাতির একটি মাত্র জবাব ছিল এই যে, 'তুমি যদি সত্যবাদী হয়ে থাক, তবে আল্লাহর আযাব নিয়ে এসো।'

তাদের একথার মাধ্যমে তাদের যে মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে তাহলো সাবধান করার মুকাবিলায় চরম ধৃষ্টতা ও ঔদ্ধ্যতা প্রদর্শন ; নবীর ভীতি প্রদর্শনকে মিথ্যা সাব্যস্তকরণের সাথে সাথে চ্যালেঞ্জ প্রদান এবং এমন এক বিদ্রোহ যা পরিত্যাগ করে আনুগত্যের পথে ফিরে আসার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। হযরত লূত আ. অনেক বুঝালেন, কিন্তু তাতে কোনো কাজ হলো না। অবশেষে তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে চূড়ান্ত সাহায্যের আবেদন জানালেনঃ

رَبِّ انْصُرْنِىْ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِيْنَ-

"হে রব! ফাসাদ সৃষ্টিকারী সম্প্রদায়ের মুকাবিলায় আমাকে সাহায্য করো।"–ফী যিলালিল কুরআন

হযরত লূত আ.-এর দোয়া কবুল হলো। আল্লাহ তাঁর সাহায্যের জন্য এবং দুষ্কৃতকারী কওমের ধ্বংসের উদ্দেশ্যে ফেরেশতা পাঠালেন। ফেরেশতাগণের আগমনের পরে ওদের ভীড় জমানোর আর লূত আ.-এর বিচলিত ও অস্থির হওয়ার বিষয় পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। হযরত লূত আ.-কে ফেরেশতাগণ বললো, আপনি ভয় পাবেন না, চিন্তিত হবেন না। আমরা আপনাকে আর আপনার স্বজনদের রক্ষা করবো। কিন্তু আপনার স্ত্রীকে নয়। কারণ সে ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।

আয়াত দুটোতে সেই জনপদের ও তার সমগ্র অধিবাসীর ধ্বংসযজ্ঞের চিত্র ফুটে উঠেছে। এ ধ্বংসযজ্ঞ থেকে হযরত লূত আ. ও তাঁর মুমিন সাথীরা রক্ষা পেয়েছিলেন। কাঁদামাটি মাখা পাথর বৃষ্টির মাধ্যমে এ ধ্বংসযজ্ঞ সম্পন্ন হয়েছিল। খুব সম্ভব এটা ছিল আগ্নেগিরির অগ্নুৎপাত জাতীয় ঘটনা—যা গোটা এলাকাকে ওলট-পালট করে গ্রাস করে ফেলেছিল। এ ধরনের গলিত লাভা বর্ষণ আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের অবিচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্য।

সেই ধ্বংসযজ্ঞের লক্ষণগুলো এখনো বিদ্যমান। চিন্তাশীল ও বুদ্ধিমান লোকদের জন্য এতে আল্লাহর নিদর্শনাবলী পরিস্ফুট রয়েছে যুগ যুগ ধরে। বস্তুত নোংরা ও বিকারগ্রস্ত বিষবৃক্ষরূপী এ ঘৃণ্য মানবগোষ্ঠীর পৃথিবীতে বেঁচে থাকার ও বংশ বিস্তারের কোনো যোগ্যতাই আর অবশিষ্ট ছিল না। শুধু ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়াই ছিল ওদের একমাত্র অনিবার্য পরিণতি।–ফী যিলালিল কুরআন

হযরত লূত আ.-এর স্ত্রী তাঁর থেকে পৃথক ছিল। ফলে সেও অন্যান্য ধ্বংসপ্রাপ্তদের সাথে ধ্বংস হয়ে গেছে। কারণ লূত আ.-এর স্ত্রীর অভিরুচী ছিল সে দেশের দুষ্কৃতকারী লোকদের মত। সে ওদের যাবতীয় অন্যায়, অনাচার, অপরাধ ও বিকৃতির সমর্থক ছিল। লূত আ.-এর কাছে কোনো মেহমান আসলে সেই মহিলাই এলাকাবাসীকে জানিয়ে দিতো এবং ওদেরকে কুকর্মের উৎসাহ যোগাতো। কারো কারো মতে তখনকার ঐ অঞ্চলে পুরুষদের সমকামিতার অনুরূপ মহিলাদের মধ্যেও সমমৈথুনের (مساحقه) রেওয়াজ জারি ছিল। এ মহিলাও তাতে জড়িত ছিল।–আল কুরআন করীম, শায়খুল ইসলাম মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী

নবীর স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও তার জীবনাচরণ ছিল নবীর শিক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত। ফলে তার পরিণতি নবী বিরোধীদের মতই সংঘটিত হলো।

❐

আটাইশ

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ج حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصٰلُهٗ فِىْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْلِىْ وَلِوَالِدَيْكَ ط اِلَىَّ الْمَصِيْرُ ○ وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰٓى اَنْ تُشْرِكَ بِىْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ لا فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا ز

"আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহারের জোর নির্দেশ দিয়েছি। তার মা কষ্টের পর কষ্ট করে তাকে পেটে বহন করেছে। তার দুধ ছাড়াতে লেগেছে দু বছর। সুতরাং আমার ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। শেষ পর্যন্ত আমারই কাছে তোমাদের ফিরে আসতে হবে। আর যদি তারা আমার সাথে শরীক করার জন্য চাপ দেয়, যে সম্পর্কে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তবে তুমি তাদের সে কথা কিছুতেই মেনে নেবে না। অবশ্য দুনিয়ার জীবনে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করে যাবে।"–সূরা লুকমান ঃ ১৪-১৫

পিতা-মাতার সাথে অবশ্যই সদ্ব্যবহার করে যেতে হবে এমনকি শির্ক করতে বাধ্য করলেও

পিতা-মাতার সাথে সদাচারণ করা সন্তানের অপরিহার্য কর্তব্য। এমনকি তাঁরা যদি সন্তানকে শিরকের প্রতি বিশেষ চাপ প্রয়োগও করে, তখন তো তাদের সেই কথা মেনে নেয়া যাবে না ঠিক, কিন্তু এজন্যে তাদের সাথে কোনোরূপ অসদাচারণ করা যাবে না। মাতা-পিতা যদি মুশরিক-কাফেরও হন, তবুও তাদের সাথে দুনিয়ার জীবনে সদাচারণ করতে হবে। তাঁরা নিজেরা শিরকে লিপ্ত হয়ে পড়লে অথবা সন্তানকে শিরক করতে বাধ্য করলে তাঁদের একথা মেনে নেয়া ঈমানের পরিপন্থী বিধায় তা কখনো মানা যাবে না। অবশ্য সেজন্যে তাঁদের প্রতি সামান্যতম অসদাচারণও প্রদর্শন করা যাবে না। বরং তাঁরা যতদিন বেঁচে থাকেন, ততদিন তাঁদের সাথে সদ্ব্যবহার করে চলতে হবে।

পিতার ইহসানসমূহ তো বয়প্রাপ্ত হওয়ার পরে দেখা যায়। তিনি সন্তানকে খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করেন, শিক্ষার ব্যবস্থা করেন ইত্যাদি। আর মাতা

তো সন্তানের অচেতন অবস্থা থেকেই তার প্রতি ইহসান করতে থাকেন। আলোচ্য আয়াতে মায়ের কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করা এবং সন্তানের জন্য অকাতরে সর্বশক্তি ব্যয় করে দেয়ার বিষয় স্মরণ করিয়ে দিয়ে রাব্বুল আলামীন মায়ের প্রতি ইহসান করার জোর তাগিদ দিচ্ছেন এই বলে ঃ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ –তার মা তাকে পেটে বহন করেছে কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে। কারণ সন্তান পেটে থাকাবস্থায় সময় যত অতিবাহিত হয়েছে শিশুর দেহ ততই বৃদ্ধি পেয়েছে। আর মায়ের কষ্ট ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়েছে। এখানেই শেষ নয়, বরং ভূমিষ্ট হওয়ার পরেও দীর্ঘ দু আড়াই বছর মা তাকে সাথেই রেখেছে—তার থেকে পৃথক হতে পারেনি। মা তাকে দুধ পান করিয়েছে, নিজের সাথে রেখে ঘুমাতে দিয়েছে। অতপর দুধ পান করানো শেষ হয়ে যাওয়ার পর মা থেকে পৃথক হয়েছে। এত দীর্ঘ সময়েও মা বেচারীর উপর কত কষ্টই না পতিত হয়েছে—মায়ের কষ্টের কি আর সীমা আছে ? ভীষণ শীতের রাতেও এ শিশু কতবার পায়খানা পেশাব করেছে আর মা শীতের মধ্যে ঠাণ্ডা স্থানে শুয়ে শিশুকে শুকনো স্থানে শোয়ায়ে দুধ পান করিয়েছে। তারপর এক মুহূর্তের জন্য শিশুর কোনো কষ্ট দেখলে অস্থির হয়ে মা তার কষ্ট বিদূরণে পেরেশান হয়ে যেতো।–তাফসীরে হাক্কানী

হাদীসে রসূল থেকে জানা যায় যে, রসূলে করীম স.-কে এক ব্যক্তি 'খিদমত ও সদ্ব্যবহারের কে অধিক হকদার' প্রশ্ন করলে রসূলুল্লাহ স. বললেন, তোমার মা, লোকটি বললো তারপর কে ? রসূলুল্লাহ স. বললেন, তোমার মা। লোকটি আবারও জিজ্ঞেস করলে রসূলুল্লাহ স. এবারও জবাব দিলেন তোমার মা। অতপর চতুর্থ বারের একই প্রশ্নের জবাবে রসূল স. জবাব দিলেন, তোমার পিতা।"

আরেক হাদীসে রসূলুল্লাহ স. এরশাদ করেন, মাতা-পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি আর মাতা-পিতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি।–তিরমিযী

অবশ্য মাতা-পিতা আল্লাহর হুকুমের বিপরীত কোনো নির্দেশ দিলে তা মান্য করা যাবে না। এতে মা-বাপ যতই চাপ প্রয়োগ করুক, অথবা যতই নাখোশ হোন না কেন তাতে কিছু আসে যায় না। আলোচ্য আয়াত থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ তাআলার নির্দেশের বিপরীত কাজে মাতা-পিতার হুকুম মানা ফরয নয় বরং এমতাবস্থায় তাঁদের হুকুম অমান্য করা কর্তব্য। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে যে, সেই অবস্থায়ও দুনিয়ার জীবনে তাঁদের সাথে সদ্ব্যবহার করা কর্তব্য। তারা মুশরিক বা কাফির হলেও তাদের সাথে সদাচরণ করতে হবে। আল কুরআন সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে ঃ

وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا অর্থাৎ দুনিয়ার জীবনে তাঁদের সাথে বিনম্র আচরণের সাথে দিন কাটাবে। তাঁরা কাফির-মুশরিক হলেও অবশ্যই তাঁদের সেবা-শুশ্রূষা, খানা-পিনার ব্যবস্থা ইত্যাদিতে কোনো ত্রুটি করা যাবে না।

হযরত আসমা বিনতে আবু বকর রা. বলেন, কুরাইশদের চুক্তির মেয়াদকালে একদা আমার মা আমার কাছে এসেছিলেন। তখনও তিনি মুশরিকা ছিলেন। আমি রসূলুল্লাহ স.-কে বললাম, "আমার মা এসেছেন, তিনি তো ইসলাম বিদ্বেষী। এখন আমি কি তাঁর সাথে সদ্ব্যবহার করবো ?" তিনি বললেন, হাঁ, তাঁর সাথে সদ্ব্যবহার করো।

মুফাসসিরীন এ ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন যে, সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা. যখন মুসলমান হলেন, তখন তাঁর মা কসম করে বললেন, আমি রোদ থেকে উঠে যাব না আর খানা খাব না—যতক্ষণ না সাদ ইসলাম ত্যাগ না করে। তখন সাদ রা. বললেন, আমি কখনো ইসলাম ত্যাগ করবো না। এভাবে তিনটি দিন অতিবাহিত হলো। বিষয়টি নবী করীম স.-এর কর্ণগোচর করা হলে এ আয়াত وَاِنْ جَاهَدَاكَ عَلٰى اَنْ تُشْرِكَ الاية অবতীর্ণ হয়েছে যে, মায়ের এ হুকুম পালন করা যাবে না। এ ধরনের অবস্থা অর্থাৎ ইসলাম পরিপন্থী বিষয়ে মাতা-পিতার হুকুম মানা যাবে না।—তাফসীরে হাক্কানী

❐

উনত্রিশ

اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهٗٓ اُمَّهٰتُهُمْ ط -

"নবী মুহাম্মদ স. মুমিনদের জন্য তাদের নিজের চেয়ে ঘনিষ্টতর আর তাঁর স্ত্রীগণ তাদের মাতা।"–সূরা আল আহযাব ঃ ৬

মুহাম্মদ স.-এর স্ত্রীগণ মুমিনদের মাতা হওয়ার তাৎপর্য

এ হচ্ছে সূরা আল আহযাবের ষষ্ঠ আয়াতের অংশ বিশেষ। সাইয়্যেদুল মুরসালীন খাতামুন নাবীয়্যীন মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মুমিনগণের সম্পর্ক কি ধরনের এবং তিনিই বা মুমিনগণের জন্য কতটুকু কল্যাণকামী ও হিতাকাংখী—এখানে মুমিনগণের দুনিয়ার জীবনে অনুসরণীয় সেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি অতি সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে। এখানে আলোচিত দুটো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের একটি হলো, নবী করীম স. মুমিনদের জন্য তাদের নিজেদের চেয়ে অধিক কল্যাণকামী। অর্থাৎ মানবজাতির প্রত্যেক ব্যক্তিই তো দুনিয়ার সবকিছুর উর্ধে নিজের স্বার্থকেই বেশী করে দেখে থাকে। মুমিনগণও স্বাভাবিকভাবেই নিজের কল্যাণকে অন্যসব কিছুর চেয়ে অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এদিক থেকে মুমিনদের সাথে নবীর সম্পর্ক অতি আশ্চর্যজনকভাবে ব্যতিক্রমধর্মী। কারণ, একজন মুমিন স্বাভাবিকভাবে তার নিজের জন্য যতটুকু কল্যাণকামী, নবী করীম স. সেই মুমিনের জন্য তার চেয়ে অধিক কল্যাণকামী।

বিষয়টি বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর তাফহীমুল কুরআনে বর্ণিত হয়েছে এভাবে ঃ

মুসলমানদের সাথে নবী করীম স.-এর এবং নবী করীম স.-এর সাথে মুসলমানদের যে সম্পর্ক—তা সকল প্রকার মানবীয় সম্পর্কের উর্ধে একটা ভিন্ন ধরনের সম্পর্ক। নবী করীম স. এবং ঈমানদারদের মধ্যকার সম্পর্ক ও আত্মীয়তার সাথে দুনিয়ার অপর কোনো আত্মীয়তা বা সম্পর্কের কোনো তুলনা হতে পারে না। নবী করীম স. মুসলমানদের জন্য তাদের মাতা-পিতা অপেক্ষাও অধিক বাৎসল্যপূর্ণ ও দয়ার্দ্র এবং তিনি তাদের জন্য তাদের নিজেদের চেয়েও অধিক কল্যাণকামী। তাদের পিতা-মাতা ও তাদের সন্তান তাদের ক্ষতি করতে পারে, তাদের সাথে ওরা স্বার্থপরতার আচরণ করতে পারে, ওরা তাদেরকে গোমরাহ করতে পারে, ওরা তাদের দিয়ে ভুল কাজ করাতে পারে, ওরা তাদেরকে জাহান্নামের দিকে ঠেলে দিতে পারে। কিন্তু

নবী করীম স. তো তাদের কেবল তাই করেন যাতে তাদের প্রকৃত কল্যাণ নিহিত। তাছাড়া তারা অজ্ঞতার কারণে নিজেদের পায়ে কুঠার চালাতে পারে, নিবুর্দ্ধিতার কারণে নিজেদের হাতেই নিজেদের ক্ষতি করতে পারে অথচ নবী করীম স. তাদের জন্য কেবল সেই ব্যবস্থাই গ্রহণ করবেন যাতে সত্যই তাদের কল্যাণ হতে পারে। প্রকৃত অবস্থা যখন এমনি ধরনের, তখন মুসলমানদের উপর নবী করীম স.-এরও এ অধিকার রয়েছে যে, তারা তাঁকে নিজের পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি এমনকি নিজেদের প্রাণ অপেক্ষাও অধিক ভালবাসবে। দুনিয়ার সবকিছুর তুলনায় তাঁর প্রতি সর্বাধিক ভালবাসা ও দরদ অনুভব করবে। নিজের মতের চেয়ে তাঁর মতকে এবং নিজের সিদ্ধান্তের উপর তাঁর সিদ্ধান্তকে অগ্রাধিকার দিবে, তাঁর প্রত্যেকটি নির্দেশের সামনে মাথানত করে দিবে।

নবী করীম স. একথাটি বলেছেন সেই হাদীসে যা বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে সামান্য শাব্দিক পার্থক্য সহকারে উদ্ধৃত হয়েছে। হাদীসটি হলো ঃ

لَايُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ

"তোমাদের কেউই মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ আমি তার কাছে তার মাতা-পিতা, সন্তান ও সমস্ত মানুষ অপেক্ষা অধিক প্রিয় না হবো।"–বুখারী

আয়াতে আলোচিত দ্বিতীয় বিষয়টি হলো, "নবী করীম স.-এর স্ত্রীগণ মুমিনগণের মাতা।" নবী করীম স.-এর একটি বিশেষত্ব এই যে, মুসলমানদের মুখ-ডাকা মা কোনো দিক দিয়েই মা নাহলেও রসূলুল্লাহ স.-এর স্ত্রীগণ তাদের জন্য ঠিক আপন মায়ের মতই হারাম। এ বিশেষ ব্যবস্থা দুনিয়ার মানুষের মধ্যে কেবলমাত্র নবী করীম স.-এর ব্যাপারেই গ্রহণ করা হয়েছে, অপর কারও এ বৈশিষ্ট্য নেই।

এখানে একথাও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, হযরতের স্ত্রীগণের মুসলমানদের মা হওয়ার অর্থ এই যে, তাদেরকে ঠিক আপন মায়ের মত সম্মান-শ্রদ্ধা মুসলমানদের জন্য ওয়াজিব, তাঁদের সাথে কোনো মুসলমানের বিবাহ সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে না। কিন্তু অন্যান্য কোনো ব্যাপারেই তাঁরা আপন মায়ের মত নন। যেমন, তাদের আপন আত্মীয় ছাড়া অন্যসব মুসলমানই তাঁদের জন্য গাঁয়রে মুহরিম ; তাঁদের সাথে পর্দা করা ওয়াজিব ছিল, তাঁদের কন্যা সন্তানগণ মুসলমানদের আপন বোন ছিলেন না— যাদের বিবাহ করা মুসলমানদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল না ; তাঁদের ভাইবোন

মুসলমানদের মামা-খালার মত ছিলেন না এবং আপন মায়ের সম্পত্তি থেকে যেমন মীরাসের অংশ পাওয়া যায়, তাঁদের মীরাস থেকে তা পাওয়া যেত না।-তাফহীমুল কুরআন

উপরোক্ত আয়াতাংশের শেষে হযরত ইবনে মাসউদের কেরাতে আরও একটি বাক্যাংশ অতিরিক্ত যোগ করা হয়েছে। তাতে আছে ঃ

وَاَزْوَاجُهٗٓ اُمَّهٰتُهُمْ وَهُوَ اَبٌ لَّهُمْ ـ

"তাঁর স্ত্রীগণ মুমিনদের মাতা আর তিনি তাদের (ধর্মীয়/রূহানী) পিতা।"

মুজাহিদ বলেন, প্রত্যেক নবীই উম্মতের পিতা ; আর এজন্যেই সকল উম্মত পরস্পর ভাই ভাই। অর্থাৎ সমস্ত ঈমানদার একই রূহানী পিতার (নবীর) সন্তান।

অন্যত্র আল্লাহ যা বলেছেন ঃ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ ـ

মুহাম্মদ স. তোমাদের কোনো পুরুষের পিতা নন—তা পূর্বের বাক্যাংশ وَهُوَ اَبٌ لَّهُمْ (তিনি তাদের পিতা) কথাটির সাথে সাংঘর্ষিক নয়। কারণ এখানে পিতা হওয়া আর নবীর স্ত্রীগণ মাতা হওয়ার অর্থ রূহানী মাতা-পিতা—বংশীয় মাতা-পিতা নয়। আর এ আয়াতে তোমাদের কোনো পুরুষের পিতা নয় বলে বংশীয় পিতা না হওয়ার কথা বলা হয়েছে। আর একথা তো সবারই জানা যে, পিতা বলতে সাধারণত বংশীয় পিতা বা দৈহিক পিতাকেই বুঝানো হয়ে থাকে।

আয়াতে وَاَزْوَاجُهٗٓ اُمَّهٰتُهُمْ (আর নবীর স্ত্রীগণ মুসলমানদের মাতা) বলার অর্থ যেভাবে প্রত্যেক মুসলমানদের জন্য মায়ের সম্মান ও আদব রক্ষা করা ওয়াজিব তেমনি নবীর স্ত্রীগণের প্রতি আদব-সম্মান প্রদর্শন ওয়াজিব এবং মায়ের সাথে বিবাহ যেমন হারাম, তেমনি নবী পত্নীদের সাথেও হারাম। কিন্তু নবী পত্নীগণের কন্যাগণ এ হুকুমের মধ্যে শামিল নন। তাদের সাথে তো মুসলমানদের বিবাহ জায়েয।-তাফসীরে হাক্কানী এ আয়াতাংশে পুণ্যবতী নবী পত্নীগণকে উম্মতে মুসলিমার মা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এর অর্থ ভক্তি শ্রদ্ধা ইত্যাদির ক্ষেত্রে তাঁরা মায়ের অন্তর্ভুক্ত, মা-ছেলের সম্পর্ক সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আহকাম—যথা পরস্পর বিয়ে-শাদী হারাম হওয়া। কিন্তু মুহরিম হওয়ার প্রেক্ষিতে পরস্পর পর্দা না করা এবং মীরাসের অংশীদার হওয়া প্রভৃতি ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য নয়।-মাআরেফুল কুরআন

❑

ত্রিশ

يَآيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ وَاُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ○ وَاِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ فَاِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِيْمًا ○

"হে নবী! তোমার স্ত্রীদের বল, তোমরা যদি দুনিয়ার জীবন ও তার চাকচিক্য পেতে চাও, তাহলে এসো, আমি তোমাদের ভোগ-সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দেই এবং সৌজন্যের সাথে তোমাদের বিদায় করে দেই। আর যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রসূল ও আখিরাতের ঘর চাও, তবে জেনে রেখ ; তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল, আল্লাহ তাদের জন্য মহাপুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন।"–আল আহযাব ঃ ২৮-২৯

নবী পত্নীদের দুনিয়ার স্বাচ্ছন্দ পরিত্যাগের অভিন্ন সিদ্ধান্ত

আলোচ্য আয়াতগুলোতে নবী করীম স.-এর পুণ্যবতী স্ত্রীগণের প্রতি বিশেষ নির্দেশ রয়েছে যেন তাদের কোনো কথা ও কাজের দ্বারা রসূলে করীম স.-এর প্রতি কোনো দুঃখ-যন্ত্রণা না পৌঁছে।—এ বিষয়ে যেন তাঁরা যথাযথ গুরুত্ব দেন। আর এটা তখনই সম্ভব, যখন তাঁরা আল্লাহ ও তার রসূলের প্রতি পূর্ণ অনুগত থাকেন। এখানে নবী পত্নীদের তালাক গ্রহণের অধিকার গ্রহণের কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

উপরোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল হওয়ার ব্যাপারে এমন ঘটনাবলীর বর্ণনা পাওয়া যায় যা ছিল নবী করীম স.-এর মর্জির পরিপন্থী, যাতে তিনি অনিচ্ছাকৃতভাবে দুঃখ পান। তন্মধ্য হতে সহীহ মুসলিমে বর্ণিত একটি ঘটনা হযরত জাবের রা.-এর রেওয়ায়াতে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। ঘটনাটি হলো, একদিন রসূলুল্লাহ স.-এর পুণ্যবতী স্ত্রীগণ তাঁর খেদমতে সমবেতভাবে হাজির হয়ে তাঁদের জীবিকা ও আনুসংগিক খরচাদির পরিমাণ বৃদ্ধির দাবী পেশ করেন। বিশিষ্ট মুফাস্সির আবু হাইয়ান এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা তাফসীরে বাহরে মুহীতে প্রদান করেন। তাহলো আহযাব যুদ্ধের পর বনু-নযীর ও বনু কুরাইযার বিজয় এবং গনীমতের মাল বণ্টনের ফলে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে খানিকটা স্বাচ্ছন্দ ফিরে আসে। এরই

পরিপ্রেক্ষিতে পুণ্যবতী স্ত্রীগণ রা. ভাবলেন যে, মহানবী স. হয়তো এসব গনীমতের মাল থেকে নিজস্ব অংশ রেখে দিয়েছেন। তাই তাঁরা সমবেতভাবে নিবেদন করে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ স. পারস্য ও রোমের সম্রাজ্ঞীরা নানাবিধ গহনাপত্র ও মূল্যবান পোশাক পরিচ্ছদ পরিধান করে থাকে। তাদের সেবা-যত্নের জন্যে রয়েছে অগণিত দাস-দাসী। আমাদের দারিদ্র-পীড়িত জীর্ণ-শীর্ণ করুণ অবস্থা তো আপনি নিজেই দেখতে পাচ্ছেন। তাই মেহেরবানী করে আমাদের জীবিকা ও অন্যান্য খরচাদির পরিমাণ কিছুটা বৃদ্ধির কথা বিবেচনা করুন।

রসূলুল্লাহ স. পুণ্যবতী স্ত্রীগণের পক্ষ থেকে দুনিয়াদার ভোগ-বিলাসী রাজা-বাদশাদের পরিবেশে বিদ্যমান জৌলুস ও সুযোগ-সুবিধা কিছুটা হলেও প্রদানের দাবীতে উপস্থাপিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ কারণে বিশেষভাবে মর্মাহত হন যে, তাঁরা এতদিনের সৎসংগ ও প্রশিক্ষণ লাভের পরও নবী-গৃহের প্রকৃত মর্যাদা অনুধাবন করতে সক্ষম হননি। ফলে নবী স. যে দুঃখিত হবেন, তা তাঁরা ধারণা করতে পারেননি। সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে প্রাচুর্য ও সম্পদ বৃদ্ধি দেখে তাঁদের মধ্যে কিছুটা প্রাচুর্যের অভিলাস উদয় হয়েছিল।

ভাষ্যকার আবু হাইয়্যান বলেন, আহযাবের যুদ্ধের পর এ ঘটনা বর্ণনার দ্বারা একথাই সমর্থিত হয় যে, নবী পত্নীগণের রা. এ দাবীই ছিল তাঁদেরকে তালাক গ্রহণের অধিকার প্রদানের কারণ।–মাআরেফুল কুরআন

এ আয়াতে পুণ্যবতী স্ত্রীগণকে রা. অধিকার প্রদান করা হয়েছে যে, তাঁরা নবী স.-এর বর্তমান দারিদ্র পীড়িত চরম আর্থিক সংকটপূর্ণ অবস্থা বরণ করে হয় তাঁর স. সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রেখে জীবনযাপন করবেন অথবা তালাকের মাধ্যমে তাঁর থেকে মুক্ত হয়ে যাবেন। প্রথম অবস্থায় অন্যান্য স্ত্রীলোকের তুলনায় পুরস্কার এবং পরকালে স্বতন্ত্র ও সুউচ্চ মর্যাদাসমূহের অধিকারী হবেন। আর দ্বিতীয় অবস্থায় অর্থাৎ তালাক গ্রহণের অবস্থায়ও তাঁদেরকে দুনিয়ার অপরাপর লোকের ন্যায় বিশেষ জটিলতা ও অপ্রীতিকর অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে না ; বরং সুন্নাত মোতাবেক যুগল বস্ত্র প্রভৃতি প্রদান করে সসম্মানে বিদায় দেয়া হবে।

তিরমিযী শরীফে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত আছে, যখন অধিকার প্রদান সংক্রান্ত এ আয়াত নাযিল হয় তখন রসূলুল্লাহ স. আমাদেরকে তা প্রকাশ-প্রচারের সূচনা করেন। তিনি আমাকে আয়াতটি শুনানোর পূর্বে বলেন, আমি তোমাকে একটি কথা বলবো—উত্তরটা কিন্তু

তাড়াহুড়া করে দেবে না। বরং তোমার পিতা-মাতার সাথে পরামর্শ করে দেবে। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. বলেন, আমাকে আমার পিতা-মাতার সাথে পরামর্শ না করে মতামত প্রকাশ করা থেকে তিনি যে আমাকে বারণ করেছিলেন, তা ছিল আমার প্রতি তাঁর অপার অনুগ্রহ। কেননা তাঁর অটুট বিশ্বাস ছিল যে, আমার পিতা-মাতা কখনো আমাকে রসূলুল্লাহ স. থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরামর্শ দেবেন না। এ আয়াত শোনার সাথে সাথেই আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ এ ব্যাপারে আমার পিতা-মাতার পরামর্শ গ্রহণের জন্য আমি যেতে পারি কি ? আমি তো আল্লাহ পাক, তাঁর রসূল ও পরকালকে বরণ করে নিচ্ছি।

আমার পরে অন্যান্য পুণ্যবতী স্ত্রীগণকে কুরআনের এ নির্দেশ শোনানো হলো। সবাই আমার মতই তাদের মত ব্যক্ত করলেন। রাসূলুল্লাহ স.-এর সাথে দাম্পত্য সম্পর্কের মুকাবিলায় দুনিয়ার প্রাচুর্য ও স্বাচ্ছন্দকে কেউ গ্রহণ করলেন না।-মাআরেফুল কুরআন

আলোচ্য আয়াতের শানে নুযূলের বিষয় তাফহীমুল কুরআনে মুসলিম শরীফের একটি রেওয়ায়াত বর্ণনা করা হয়েছে। তাহলো, একদিন হযরত আবু বকর রা. ও হযরত ওমর রা. নবী করীম স.-এর খেদমতে হাজির হয়ে দেখতে পেলেন যে, হযরতের পত্নীগণ তাঁর চারপাশে বসে আছেন আর রসূলে করীম স.ও চুপচাপ বসে আছেন। তিনি হযরত ওমর রা.-কে লক্ষ করে বললেন ঃ هن كما ترى يسألننى النفقة "তোমরা এদেরকে যেমন দেখছ, আমার কাছে খরচ-পাতির জন্য অর্থ দাবী করছে।" একথা শুনে হযরত আবু বকর রা. নিজ কন্যা হযরত আয়েশা রা.-কে এবং হযরত ওমর রা. তাঁর কন্যা হযরত হাফসা রা.-কে খুব শাসিয়ে দিয়ে বললেন, তোমরা আল্লাহর রসূলকে কষ্ট দিচ্ছ! আর এমন কিছু চাচ্ছ যা তাঁর কাছে নেই!

বস্তুত নবী করীম স. সে সময় কতদূর আর্থিক অনটনে ছিলেন তা এ ঘটনা থেকে আঁচ করা যায়। তাছাড়া ইসলাম ও কুফরের এ কঠিন দ্বন্দ্বের সময় নবী পত্নীগণের খরচ-পাতির অর্থের জন্য চাপ দেয়ার ফলে নবী করীম স.-এর উপর তার কিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে এ থেকে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

নবী পত্নীগণ এ দাবী করার পর আল্লাহর নির্দেশে আলোচ্য আয়াত দুটোর আলোকে তিনি তাঁদের এখতিয়ার বা অধিকার দিলেন যে, তাঁরা চাইলে নবী করীম স.-এর দাম্পত্য ঠিক রেখে চলবেন অথবা তাঁর থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে মুক্ত হয়ে যাবেন। শরীয়তের পরিভাষায় একে বলে تخيير (তাখ্‌য়ীর)

এখ্তিয়ার দান। এখতিয়ার পাওয়ার পর নবী পত্নীগণ একে একে সকলেই প্রথমটি অর্থাৎ নবী করীম স.-এর সাথে দাম্পত্যে আবদ্ধ থাকার সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন। তাঁর স্ত্রীগণের কেউ যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতেন, তবে তিনি আপনা আপনিই বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারতেন না। বরং রসূল তাঁকে আলাদা করে দিলেই তিনি বিচ্ছিন্ন বলে বিবেচিত হতেন। যেমন মূল আয়াতে বলা হয়েছে "আস, আমি তোমাদের ভোগ-সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দেই—সৌজন্যের সাথে তোমাদের বিদায় করে দেই।" অবশ্য এমতাবস্থায় তাঁকে আলাদা করে দেয়াই নবী করীম স.-এর কর্তব্য হয়ে পড়তো। কেননা নবী হিসেবে তাঁর নিজের কৃত ওয়াদা পূরণ না করা তাঁর পক্ষে কিছুতেই শোভা পায় না। এভাবে কোনো স্ত্রী যদি নবী করীম স. থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতেন, তবে তিনি আর 'উম্মুল মুমিনীন'—মুমিনদের মাতা রূপে বিবেচিত হতেন না এবং অন্য মুসলমানের সাথে তাঁর বিবাহও হারাম হতো না। কেননা তিনি তো দুনিয়া ও তার চাকচিক্যের জন্যই রসূল স.-এর নিকট থেকে আলাদা হতে চেয়েছিলেন, আর তাকে সে অধিকার দেয়া হয়েছিল।

অপরদিকে আয়াতের আরেকটি অর্থ হতে পারে। তাহলো রসূলের যে স্ত্রীগণ আল্লাহ, রসূল ও আখিরাতকে গ্রহণ করে নিয়েছেন তাদেরকে তালাক দেয়ার রসূলের আর কোনো অধিকার অবশিষ্ট থাকলো না। কেননা এখতিয়ার বা বাছাই করার দুটো দিকই মাত্র ছিল। একটি হলো দুনিয়ার ভোগ-সামগ্রী ও স্বাচ্ছন্দ গ্রহণ করলে তাকে আলাদা করে দেয়া হবে। দ্বিতীয়টি হলো, আল্লাহ, রাসূল ও আখিরাত চাইলে আলাদা করা হবে না—রসূলের স্ত্রী হিসেবে থাকতে দেয়া হবে। এমতাবস্থায় যে কেউ এ দুটির একটি গ্রহণ করবে অপরটি তার জন্য আপনা-আপনিই নিষিদ্ধ হয়ে যাবে।–তাফহীমুল কুরআন

নবী পত্নীগণের মানবীয় চাহিদাসমূহ ছিল একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। নবী পত্নী হলেও তো তাঁরা ছিলেন মানুষ। নবীর স্ত্রী হওয়ার মর্যাদা লাভ করা সত্ত্বেও তাদের এসব মানবীয় চাহিদা বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। তাঁরা নবুওয়াতের ঝর্ণাধারা থেকে সিঞ্চিত হয়েছেন সত্য, কিন্তু তাই বলে তাঁদের প্রকৃতিগত চাহিদাগুলো খতম হয়ে যায়নি। তাই যখন আল্লাহ তাআলা তাঁর রসূল ও মুমিনগণকে স্বচ্ছলতা ও প্রশস্ততা দান করলেন, তখন নবী পত্নীগণ তাদের খরচ-পাতির দরবার শুরু করে দিলেন। কিন্তু নবী করীম স. তাঁদের এ দাবী-চাহিদা হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করতে পারেননি। বরং মনের অসন্তোষ নিয়েই তাদের এসব দাবীতে সাড়া দিয়েছেন। কারণ

আল্লাহর নবী স. অত্যন্ত সহজ-সরল জীবনযাপন করতে অভ্যস্থ ছিলেন। আল্লাহ পাক তাঁকে যখন যে হালে রেখেছেন সেই অবস্থাতেই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন। তাই তাঁর স্ত্রীগণ যখন সম্মিলিতভাবে বিভিন্ন দাবী পেশ করলেন, তখন জীবনটা তাঁর কাছে বড়ই কঠিন মনে হলো। অবশ্য তাঁরা কোনো হারাম জিনিসের জন্য দাবী তুলেননি বরং দুনিয়ার অন্যান্য মানুষের মত একটু ভাল খাওয়া, ভাল পরা ও কিছু সচ্ছল জীবন যাপন করার জন্য যা প্রয়োজন কেবল তাই দাবী করেছিলেন মাত্র—যা দাবী করার ব্যাপারে প্রকৃতপক্ষে কোনো দোষ ছিল না। হযরত আবু বকর রা. ও হযরত ওমর রা. নিজ নিজ কন্যাকে এই বলে শাসিয়ে দিলেন যে, তোমরা আল্লাহর নবীর কাছে এমন কিছুর দাবী করছো যা তার কাছে নেই এবং দুজনই নিজ নিজ কন্যাকে প্রহার করতে উদ্যত হলেন। কিন্তু রসূলুল্লাহ তাদেরকে থামালেন। তখন তাঁর স্ত্রীগণ কসম করে বললেন, আমরা আর কখনো রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে এমন কিছু দাবী করবো না, যা তাঁর কাছে নেই। রসূলুল্লাহ স. বললেন, এর পরই আল্লাহ তাআলা (আলোচ্য) আয়াত নাযিল করলেন। এতে নবী স.-এর স্ত্রীগণকে এ এখতিয়ার দেয়া হলো যে, তাঁরা ইচ্ছে করলে কৃচ্ছ্রতা সাধনের জীবন নিয়ে রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে থাকতে পারেন অথবা ভালভাবে মান-সম্মানের সাথে বিদায় নিয়ে যেতে পারেন। নবী পত্নীগণ সকলেই প্রথম পথ অবলম্বন করলেন। অর্থাৎ তাঁরা রসূলের দাম্পত্য জীবন ছাড়তে রাজী হলেন না—সকলেই এ অভিন্ন সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন।–ফী যিলালিল কুরআন

মুফাস্‌সিরীনে কিরাম আলোচ্য আয়াত ..... يايها النبى قل لازواجك -এর পটভূমিকা তুলে ধরেছেন এভাবে যে, খায়বার যুদ্ধের পর মুসলমানদের সার্বিক সচ্ছলতা হাসিল হলো, তখন রসূলুল্লাহ স.-এর স্ত্রীগণও জীবনের আরাম-আয়েশ সামগ্রীর দাবী পেশ করেন। তাঁদের এ দাবী পেশের প্রেক্ষিতে ধমক স্বরূপ উক্ত আয়াত নাযিল হয়েছে। কিন্তু আল্লামা আমীন আহসান ইসলাহী রহ. নিম্নোক্ত কারণে উল্লিখিত পটভূমিকাকে দুর্বল বলে তাঁর তাফসীর তাদাব্বুরে কুরআনে উল্লেখ করেছেন। উল্লেখযোগ্য কারণ-গুলো নিম্নরূপ ঃ

১. যদি নবী পত্নীদের দাবী কেবল জীবন-জীবিকার স্বাচ্ছন্দের উদ্দেশ্যেই হতো, তাহলে তা তো এমন কোনো কথা ছিল না, যে কারণে তাঁদেরকে চিরদিনের জন্য বিদায় দেয়ার নোটিশ দেয়া দরকার ছিল। এ ধরনের কথার জন্য তো কোনো প্রকার সাবধান করার প্রয়োজনই ছিল না। আর প্রয়োজন

থাকলেও তাঁদের কেবল এতটুকু উপদেশ দেয়া যেত যে, নবী স.-এর সান্নিধ্যে থাকতে হলে সবর ও অল্পে তুষ্টির জীবন ধারণ করতে হবে।

২. উম্মাহাতুল মুমিনীন এর ব্যাপারে এমন বদ ধারণা করা যায় না যে, তাঁদের উপর দুনিয়ার আরাম-আয়েশের আগ্রহ এতই জেঁকে বসেছে, যে জন্যে তাঁরা সেই দাবী নিয়ে উঠেপড়ে লেগে যাবেন। আর বিষয়টি এতই প্রকট আকার ধারণ করেছে যে, এতে স্বয়ং রাব্বুল আলামীনকে হস্তক্ষেপ করতে হলো। এবং পরিস্থিতি এতদূর গড়ালো যে, উক্ত আয়াতের বর্ণিত নোটিশ পর্যন্ত তাঁদের দিতে হলো !

৩. এখানে যেসব বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে তা ছিল হিজরী চতুর্থ বা পঞ্চম সালের সাথে সম্পৃক্ত। এবং খন্দক ও বনু কুরাইযার যুদ্ধের বিষয়াদি আলোচনায় এসেছে। অতপর হযরত যায়েদ রা.-ও হযরত যয়নব রা.-এর ঘটনার প্রতি ইংগিত দেয়া হয়। এসব ঘটনাবলীর সম্পর্ক হিজরী পঞ্চম সালের সাথে সম্পৃক্ত। খায়বার তখনো জয় হয়নি। উপরে বর্ণিত আয়াত وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا এর অধীন স্বয়ং মুফাস্‌সিরীনই এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, এটা ছিল খায়বার বিজয়ের সুসংবাদ মাত্র।

আল্লামা আমীন আহসান ইসলাহী বলেন, প্রকৃতপক্ষে আলোচ্য আয়াতের নির্ভুল পটভূমিকা হলো— সে যুগে মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র সাধারণ মুসলমানদেরকে ইসলাম ও নবী স. সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টির ব্যাপারে চরম আকার ধারণ করেছিল। তেমনিভাবে মুনাফিক মহিলাদের মাধ্যমে তারা নবী করীম স.-এর পারিবারিক জীবনের শান্তি বিপন্ন করার জন্য এক মারাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। তখন মুনাফিক মহিলারা উম্মাহাতুল মুমিনীন বা মুমিন মাতাদের ঘরে গিয়ে অত্যন্ত দরদভরা ভাষায় তাদের বলতো, আপনারা তো অত্যন্ত ভদ্র ও সম্মানিত ঘরের মেয়ে। কিন্তু আপনাদের জীবনটা সব রকমের আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাস থেকে বঞ্চিত, সম্পূর্ণরূপে কয়েদীদের মতই কাটছে। আপনারা যদি অন্য কোনো পরিবারে থাকতেন তাহলে আপনাদের জীবন সম্রাজ্ঞীদের মত অত্যন্ত আরাম-আয়েশে কাটতো। এছাড়া ওরা আরও ওয়াস্‌ওয়াসা দিতো এই বলে যে, যদি এ লোক (মুহাম্মদ স.) আপনাদের তালাক দিয়ে দেয় তাহলে বড় বড় নেতারা আপনাদের বিয়ে করবে, ফলে আপনাদের জীবন ঈর্ষার বস্তুতে পরিণত হয়ে যাবে। পরবর্তী আয়াতসমূহেও দেখা যাবে যে, মুনাফিকগণ যখনি নবী করীম স.-এর ঘরে যাওয়ার এবং নবী পত্নীদের সাথে কথা বলার সুযোগ পেত, তখনি তারা এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে তাঁদের মাঝে

কিছু কিছু হলেও ওয়াস্‌ওয়াসা দেয়ার চেষ্টা অব্যাহত রাখতো। তাদের এ রকম চেষ্টার উদ্দেশ্য ছিল নবী পরিবারে এমন কিছু ফিতনার সৃষ্টি করা যেমন করে তারা হযরত আয়েশা রা.-এর সম্পর্কে অপবাদ দাঁড় করিয়েছিল। সূরা আন নূরে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা এসেছে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল এভাবে নবী পত্নীদের মাঝে অন্তত কিছুটা হলেও অস্থিরতা সৃষ্টি করা যাবে। এমনও হতে পারে যে, তারা নবী পত্নীদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের কুমতলব চরিতার্থ করার হীন উদ্দেশ্য পোষণ করতো।

—তাদাব্বুরে কুরআন

মুনাফিকদের এসব ষড়যন্ত্র সম্পর্কে যদিও নবী পত্নীগণ সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন না—এ ব্যাপারে তাঁদের কিছু তিক্ত অভিজ্ঞতাও ছিল ; কিন্তু ভদ্র, সহৃদয় ব্যক্তি ও বিনম্র স্বভাবের লোকদের অবস্থা এমন যে, যখনি কোনো লোক যদি দয়ার্দ্র হয়ে কল্যাণ কামনার ভাষায় কথা বলে, তখন তিনি ওর ত্রুটির বিষয় জেনেবুঝেও ওর সাথে নম্র আচরণই করে থাকে। উম্মাহাতুল মুমিনীন (মুমিন মাতাগণ)ও নিজের দয়াদ্রতা ও সহৃয়তার কারণে ওদের জবাবে নম্র আচরণই করে যেতেন। এতে ওসব ধূর্ত লোক নিজেদের ষড়যন্ত্র ফলপ্রসূ হয়েছে বলে মনে করতো এবং ওরা শীঘ্রই নিজেদের লক্ষ্য অর্জনে সফল হওয়ার আশা করতো। মূলত এমনি এক পরিস্থিতিতে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়েছে। মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীদের শোনানোর উদ্দেশ্যেই এসব আয়াত নাযিল হয়েছিল। কিন্তু ওরা তো ছিল পর্দার আড়ালে, এজন্যে কুরআন ওদের পরিবর্তে নবী ও নবী পত্নীদের উদ্দেশ্য করে যা বলার তা বলে দিয়েছেন। এখানে বালাগাতের সেই নিয়ম স্মরণ করা যেতে পারে যে, অনেক সময় শব্দ দিয়ে হয়ত কাউকে সম্বোধন করা হয় অথচ তাতে এমন ধিক্কার নিহিত থাকে, যার লক্ষ্য থাকে অন্য কারো প্রতি।

উপরোক্ত পটভূমিকা সামনে রেখে আলোচ্য আয়াত দুটোর প্রতি গবেষণা করা যেতে পারে। আয়াতদ্বয়ে নবী করীম স.-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, হে নবী ! তুমি স্বীয় পত্নীদের বলে দাও, তোমরা যদি দুনিয়ার আরাম-আয়েশ ও তার চাকচিক্য হাসিল করতে চাও, তাহলে এসো ! আমি তোমাদের ভালভাবে বিদায় করে দিচ্ছি। আর যদি তোমরা আল্লাহ, তার রসূল এবং আখিরাতের সফলতা কামনা করে থাক—তাহলে তোমরা মনে রেখ তোমাদের যে কেউ আল্লাহ ও তার রসূলের হক পুরোপুরি আদায়কারী হয় আর আখিরাতের দায়িত্বসমূহ যথাযথ বুঝে নেয় ; আল্লাহ তাদের জন্য বিরাট পারিতোষিক তৈরি করে রেখেছেন।

হাদীসের বর্ণনায় দেখা যায়, রসূলুল্লাহ স. এই এখতিয়ারনামা পবিত্র পত্নীবৃন্দের সামনে রাখলেন। আর সর্বপ্রথম তা রাখলেন তাঁর প্রিয়তমা হযরত আয়েশা রা.-এর সামনে। তিনি তাঁকে এটা বলে দিলেন যে, জবাবদানে যেন তাড়াহুড়া না করেন, বরং এ বিষয়ে যেন তার পিতা-মাতার সাথে আলাপ করে নেন। কিন্তু হযরত আয়েশা রা. তৎক্ষণাৎ জবাব দিয়ে বললেন, এ ব্যাপারে কারো সাথে পরামর্শ করার কি দরকার ? আমি আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে গ্রহণ করছি। মুনাফিকীন তো সবচেয়ে বেশী যাদু চালিয়েছিল তাঁরই উপর। যখন তাঁর জবাব ওদের সকল আশায় গুড়ে বালি হয়ে গেল তখন আর বাকীদের কি কথা !

এভাবে কুরআনুল কারীম একদিকে পুণ্যবতী নবী পত্নীদের ব্যাপারে মুনাফিকদের ষড়যন্ত্রকে চিরদিনের জন্য ঠাণ্ডা করে দিল। অন্যদিকে এ পরীক্ষার মাধ্যমে একথা সাব্যস্ত হয়ে গেল যে, পুণ্যবতী নবী-পত্নীগণ সকলেই আল্লাহ, রসূল ও আখিরাতের অন্বেষী ছিলেন। এ জিনিসটিই তাঁদেরকে আল্লাহর রসূলের সাথে সংযুক্ত রেখেছিল আর তাঁদের এ সংযুক্তি ছিল অত্যন্ত মজবুত-সুদৃঢ়, যা কোনো লোভ-লালসা ছিন্ন করতে পারছিল না।

উপরোক্ত সুদীর্ঘ আলোচনার সারসংক্ষেপ হলো, আলোচ্য আয়াত-গুলোতে পুণ্যবতী নবী পত্নীগণকে এজন্য তিরস্কার করা হয়নি যে, তাঁরা দুনিয়া লোভী ছিলেন—যা লোকেরা মনে করেছিল। বরং তাঁদের এ তাখ্য়ীর বা স্বাধীনতা (ইখতিয়ার) দেয়ার ফলে তাঁদের উচ্চ কৃতিত্বের প্রকাশ ঘটলো। এতে করে মুনাফিকদের সাহস চিরদিনের জন্য স্তিমিত হয়ে গেল যে, নবী পত্নীদের কোনো লোভের ফাঁদে ফেলে নিজেদের দিকে ফিরিয়ে আনা কখনো সম্ভব হবে না। অধিকন্তু এ তাখ্য়ীর বা ইখতিয়ারের ঘোষণা দিয়ে যেন সকলের মনোবলের পরীক্ষা করার সুযোগ করে দেয়া হলো। কিন্তু সকলের বেলায় একথাই প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল যে, নবী স.-এর আহলে বায়ত এর নির্বাচন করেছেন স্বয়ং আল্লাহ তাআলা এবং এই ব্যূহে কারো অনাধিকার চর্চা করার কোনো অবকাশই নেই।–তাদাব্বুরে কুরআন

❐

একত্রিশ

يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ○ وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ط اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ○ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِيْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَطِيْفًا خَبِيْرًا ○

"হে নবী পত্নীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নও। যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, তবে পরপুরুষের সাথে কোমল কণ্ঠে এমনভাবে কথা বলো না যাতে যার অন্তরে ব্যাধি আছে সে প্রলুব্ধ হয়ে পড়ে। তোমরা সংগত কথাবার্তা বলবে। তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করবে, পূর্বতন জাহেলী যুগের মত সাজগোজ দেখিয়ে বেরুবে না। তোমরা সালাত কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে। হে নবী পরিবারের সদস্যবর্গ! আল্লাহ চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে—তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পূত-পবিত্র রাখতে। আল্লাহর আয়াত ও হিকমত থেকে যাকিছু তোমাদের ঘরে পঠিত হয় তা স্মরণ রাখবে ; আল্লাহ তো অতি সুক্ষ্মদর্শী সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত।"–সূরা আল আহযাব ঃ ৩২-৩৪

পর্দা ও নারী মর্যাদা সংরক্ষণে নবী পত্নীদের থেকে সূচনায় আল্লাহর কতিপয় নির্দেশ

আলোচ্য আয়াত কটিতে ইসলামী সমাজে পর্দা ব্যবস্থা প্রবর্তন ও নারী মর্যাদা সংরক্ষণের আদেশের সূচনা হয়। এসব আয়াতে বাহ্যত নবী পত্নীদের সম্বোধন করা হলেও এতে করে সমগ্র মুসলিম সমাজে পরিবারের মান-সম্ভ্রম রক্ষা এবং এ বিষয়ে সংশোধন-সংস্কার কার্যকর করাই মূল উদ্দেশ্য। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুণ্যবতী স্ত্রীদেরকে এসব আয়াতে সম্বোধন করার উদ্দেশ্য কেবল এটাই যে, স্বয়ং নবীর ঘর

থেকেই যখন পবিত্র ও সম্ভ্রম জীবন পদ্ধতির সূচনা হবে, তখন সমগ্র মুসলিম পরিবারের স্ত্রীলোকেরা সেই ব্যবস্থার অনুসরণ ও অনুকরণ করতে শুরু করবে। কেননা এ ঘর ও পরিবারই ছিল তাদের সকলের জন্য আদর্শ ও অনুসরণীয়। কিন্তু আয়াতে নবী পত্নীদের সম্বোধন করা হয়েছে বিধায় কেউ কেউ দাবী করেছেন যে, আয়াতে বর্ণিত নির্দেশাদি কেবল তাঁদের জন্যই প্রযোজ্য, অন্য কোনো নারীর বেলায় প্রযোজ্য নয়। পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত সমস্ত নির্দেশ পর্যালোচনা করলে স্পষ্টভাবে বুঝা যায়, আলোচ্য আয়াতসমূহে এমন কোনো হুকুম দেয়া হয়নি যা কেবল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণই পালন করতে বাধ্য। অন্যান্য মুসলিম নারীদের ক্ষেত্রে তা পালন করা কর্তব্য বা বাঞ্ছনীয় নয়। তখন তো আয়াতের অর্থ হতো এই যে, কেবল নবীর স্ত্রীগণই অপর পুরুষের সাথে কথা বলতে কোমলতা পরিহার করবে, আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য করবে, নামায কায়েম করবে, যাকাত দিবে—অন্য কোনো মহিলার জন্যে তা কর্তব্য নয়। এমন হুকুম আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দিতে পারেন কিভাবে ? তা যদি না হতে পারে, তবে নিজেদের ঘরে আসন গেড়ে বসা, জাহেলী যুগের নগ্নতা, অশ্লীলতা পরিহার করা এবং ভিন পুরুষের সাথে কোমল কথা না বলার হুকুম কেবল তাঁদেরই জন্য কি করে খাস হতে পারে ? আর অন্যান্য মুসলিম নারী এ হুকুম থেকে কি করে মুক্ত থাকতে পারে ? একই ধারাবাহিকতায় বলা কথা সমষ্টির মধ্যে কোনো কোনো কথা বিশেষ লোকদের জন্য এবং কোনো কোনো কথা সাধারণ লোকদের জন্য নির্দিষ্ট করার পেছনে কি যৌক্তিকতা থাকতে পারে ?–তাফহীমুল কুরআন

আয়াতে আল্লাহর বাণী لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ 'তোমরা অন্য নারীদের মত নও'—এ বাক্যাংশের অর্থ কখনও এরূপ হতে পারে না যে, সাধারণ নারীরা তো বিভিন্ন রঙীন সাজে সজ্জিত হয়ে ভিন পুরুষের সাথে খুব মন গলানো কথাবার্তা বলে বেড়াবে ; কিন্তু তোমরা এমনটি করবে না। বরং আল্লাহর একথার অর্থ এর সম্পূর্ণ বিপরীত। যেমন একজন ভদ্রলোক নিজের ছেলে-সন্তানদের লক্ষ করে বললো, "তোমরা তো হাট-বাজারের ছেলেমেয়ের মত নও, গালি-গালাজ করা তোমাদের জন্য শোভা পায় না।" এরূপ কথা থেকে কোনো বুদ্ধিমান লোকই এ অর্থ গ্রহণ করে না যে সেই ভদ্রলোক কেবল নিজের ছেলে-সন্তানদের জন্যই গালি-গালাজ করা অন্যায় বলে মনে করে, অন্য ছেলেদের বেলায় গালমন্দ বলা তার কাছে কোনো আপত্তিকর বিষয় নয়। সুতরাং পূর্বোক্ত আয়াতাংশের

নির্দেশটিও কেবল নবীর স্ত্রীদের জন্যই খাস নয়, বরং এ হুকুম সমগ্র মুসলিম নারীকুলের বেলায় সমভাবে প্রযোজ্য।-তাফহীমুল কুরআন

মুফতী শফী রহ. তাঁর তাফসীরে মাআরেফুল কুরআনে বলেন, আলোচ্য আয়াতগুলোতে নবী পত্নীদের কর্মের পরিশুদ্ধি এবং তাঁদেরকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্য ও দাম্পত্য সম্পর্কের যোগ্য করে গড়ে তোলার জন্য কয়েকটি হেদায়াত দান করা হয়েছে। এসব হেদায়াত যদিও রসূলের পুণ্যবতী স্ত্রীগণের জন্য নির্দিষ্ট নয়, বরং সমগ্র মুসলিম নারীগণের প্রতিই নির্দেশিত। কিন্তু এখানে বিশেষভাবে তাঁদেরকে সম্বোধন করার উদ্দেশ্য তাঁদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট করা হয়েছে যে, এসব আ'মাল ও আহকাম সমস্ত মুসলিম নারীর জন্য অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। তাই এগুলোর প্রতি নবী পত্নীদের বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা উচিত।

আয়াতে لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ 'তোমরা অন্যান্য নারীদের মত নও' বলে নবী পত্নীদের শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দান করার পর বলা হয়েছে اِنِ اتَّقَيْتُنَّ। অর্থাৎ "যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করো।" এ শর্ত আরোপ করার উদ্দেশ্য এ বিষয়ে সতর্ক করে দেয়া যেন তারা নবীজীর স্ত্রী হওয়ার উপর ভরসা করে বসে না থাকেন। বস্তুত তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের শর্ত হলো তাঁদের তাক্ওয়া এবং আহকামে ইলাহিয়্যার অনুসরণ অনুকরণ।-কুরতুবী ও মাযহারী থেকে মাআরেফুল কুরআন।

আলোচ্য আয়াতসমূহে মুসলিম নারীকুলের সম্ভ্রম সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে নবী পত্নীদের সম্বোধন করে পাঁচটি মৌলিক বিষয়ে হেদায়াত দেয়া হয়েছে। এক. নারীদের কণ্ঠস্বর নিয়ন্ত্রিত রাখা। অর্থাৎ যদি পর্দার মধ্যে থেকে কোনো পুরুষের সাথে কথা বলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তবে বাক্যালাপের সময় নারী কণ্ঠের স্বভাবসুলভ কোমলতা ও নাজুকতা পরিহার করবে। এর মানে নারী কণ্ঠের কোমলতা ও মুধরতার আকর্ষণীয় আওয়ায যা পুরুষ শ্রোতার মনে অবাঞ্ছিত লোভ-লালসা বা কামভাবের সঞ্চার করে তোলে। অন্তরে ব্যাধি থাকা লোকেরা তো এমনিতেই কুবাসনায় মেতে উঠে। এমনকি দুর্বল ঈমানের লোকেরাও এতে আকৃষ্ট হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এ হেদায়াতের মর্মার্থ হলো, নারীরা যেন পর পুরুষ থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে পর্দার এমন উন্নত স্তর অর্জন করে যাতে কোনো দুর্বল ঈমানবিশিষ্ট লোকের অন্তরে নারীর মধুর আওয়াযে কোনো কামনা ও লালসার উদ্রেক না করে বরং তার নিকটেও না পৌঁছে। উম্মাহাতুল মুমিনীন বা মুমিন-মাতাদের উপরোক্ত হেদায়াত দেয়ার পর তাঁদের কেউ

যদি পরপুরুষের সাথে কথা বলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতো তবে তাঁরা মুখে হাত দিয়ে কথা বলতেন—যাতে করে কণ্ঠস্বর পরিবর্তিত হয়ে যেত। হযরত আমর ইবনুল আস রা. কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীসে আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদেরকে নিজ নিজ স্বামীর অনুমতি ছাড়া কোনো পুরুষের সাথে কথা বলতে নিষেধ করেছেন।

দুই. নারীদের স্বাভাবিক অবস্থান হবে তাদের গৃহে। আয়াতে বলা হয়েছে وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى তোমরা তোমাদের গৃহে অবস্থান কর এবং প্রাচীন জাহেলীয়াতের নারীদের মত সাজগোজ করে সৌন্দর্য প্রদর্শন করে ঘোরাফেরা করো না।

এ আয়াতে মূলত নারী-পুরুষের স্বাভাবিক সৃষ্টিগত পার্থক্য সার্বিক সামর্থ ও জন্মগত কর্মক্ষমতার ভিত্তিতে দায়িত্ব ক্ষেত্র বণ্টন করে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে নারীগণ তাদের পারিবারিক দায়িত্ব পালন ব্যাপদেশে নিজ নিজ গৃহে অবস্থান করবে। এর অর্থ এ নয় যে, কোনো অবস্থাতেই তারা ঘরের বাইরে যেতে পারবে না। সংগত কারণে শরয়ী প্রয়োজনে তারা বাইরেও বের হতে পারবে। তবে বের হওয়াটা অবশ্যই শালীনতা ও শরয়ী পর্দা সহকারে হতে হবে। যেন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত পূর্ব জাহেলী যুগের মহিলাদের ন্যায় শরীরটাকে সাজগোজ করে আকর্ষণীয়রূপে বের না হয়। আয়াতের শেষাংশে এ বিষয়টির প্রতিই দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে—বলা হয়েছে وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى পূর্বতন জাহেলী যুগের নারীদের মত সাজগোজ করে পরিপাটি হয়ে বেরুবে না। পরপুরুষদের সামনে রূপসৌন্দর্য প্রকাশ করা যাবে না। একথারই সামনে আরেকটি আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে, বলা হয়েছে غَيْرَ مُتَبَرِّجٰتٍ بِزِيْنَةٍ "সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে।" নারীগণ প্রয়োজনের তাগিদে বাড়ী থেকে বেরুবে, তবে যেন দেহ সৌষ্ঠব ও রূপ-সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে বের হয়। যেন বোরকা বা সমস্ত শরীর আবৃত করে ফেলে এমন চাদর ব্যবহার করে। বিষয়টি আরও পরিষ্কারভাবে বলে দেয়া হয়েছে এ সূরার ৬০ আয়াতে। يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ অর্থাৎ তারা যেন তাদের চাদরের কিছু অংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বোরকা পরিধান করা এবং চাদরের কিছু অংশ নিজেদের উপরে টেনে দেয়ার নির্দেশনাকে পুরোপুরি বাস্তবায়ন করতে চেহারার উপরে নেকাব পরার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। নেকাব ছাড়া শুধু বোরকা ও বড় চাদর ব্যবহার যথার্থ হতে পারে কিভাবে? বস্তুত নারী দেহের সৌন্দর্য ও আকর্ষণ তো তাদের চেহারাতে ফুটে উঠে। পর্দার প্রকৃত উদ্দেশ্যই তো সামাজিক শান্তি

ও নিরাপত্তা বিধানের কার্যকর ব্যবস্থা করা। যাবতীয় অশ্লীলতা, বেহায়াপনা ও যৌন অনাচার থেকে নারী সমাজের হেফাযত করা। আর এসবের সূচনা হয়ে থাকে সাধারণত নারী পুরুষের পারস্পরিক আকর্ষণ থেকে। আর এ আকর্ষণ সৃষ্টির প্রথম ও প্রধান নারী অংগ হলো তাদের চেহারা। এমতাবস্থায় মুখমণ্ডল খোলা রেখে বোরকা বা বড় চাদর পরিধান করা পর্দার উদ্দেশ্য সাধনের কতটুকু সহায়ক হতে পারে ?

আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত নারী সমাজের জন্য তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম হেদায়াত হলো সালাত কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করা।

উপরোক্ত পাঁচটি হেদায়াত সমস্ত মুসলিম নারীর জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। এগুলোর মধ্যে শেষোক্ত তিনটি নবীজীর পুণ্যবতী বিবিগণের জন্য নির্দিষ্ট না হওয়া সম্পর্কে তো কারো সন্দেহের অবকাশ নেই। কোনো মুসলিম নারী-পুরুষই নামায, যাকাত এবং আল্লাহ ও রসূলের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের আওতা বহির্ভূত নয়। নারীদের পর্দা সম্পর্কিত বাকী দুটো হেদায়াত সম্পর্কে একটু চিন্তা করলে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, তাও কেবল নবীজীর পুণ্যবতী স্ত্রীগণের জন্য নির্দিষ্ট নয়—বরং সমস্ত মুসলিম নারীর প্রতি একইভাবে প্রযোজ্য আল্লাহর হুকুম ; যদিও আয়াতের শুরুতে নবী পত্নীগণকে সম্বোধন করা হয়েছে।–মাআরেফুল কুরআন

আয়াতে কুরআনীতে নারীদের সেজেগুজে আকর্ষণীয় রূপ পরিগ্রহ করে ঘরের বাইরে গিয়ে প্রদর্শনী করাকে আল্লাহর ভাষায় جَاهِلِيَّتِ اُوْلٰى প্রাচীন জাহেলিয়াত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। হাদীসের ভাষায় এসব নারীদের পরিচয় দেয়া হয়েছে এভাবে যে, ওদের অবস্থা হলো كَاسِيَات عَارِيَات مميلات مائلات অর্থাৎ পোশাক পরিধান করেও উলংগ থাকবে ; রূপ-সৌন্দর্য ও সাজগোজ করে ওরা পর-পুরুষকে নিজের দিক আকর্ষিত করবে, আর ওরা নিজেরাও পর-পুরুষের প্রতি থাকবে আকর্ষিতা হয়ে। আল কুরআন একে 'প্রাচীন জাহেলিয়াত' বলায় যা বুঝা যায় তাহলো ঃ

এক. আখেরী নবীর নবুওয়াতপূর্ব সময়ে তা ছিল নারী সমাজের বেহায়াপনার চিত্র ও পশুত্বের বহিঃপ্রকাশ। যা ইসলামী শিক্ষার ফলে ইসলামী সমাজ থেকে বিদূরীত হয়ে যায়। তাই আল কুরআনের আহ্বান হলো মুসলিম নারী সমাজ যেন অনাগত কালেও ইসলামের এ তাহযীব-তমদ্দুন সমাজে জারি রাখে, আর পূর্বের সেই জাহেলী সংস্কৃতির পুনঃপ্রচলন রোধে সোচ্চার থাকে।

দুই. আল কুরআনের প্রাচীন জাহেলিয়াত অথবা প্রাথমিক জাহেলিয়াত বলার মধ্যে এমন ইংগিত রয়েছে যে, সেই যুগের জাহেলিয়াত পরবর্তী কোনো এক যুগে পুনরায় আত্মপ্রকাশ করতে পারে। আজকের সমাজে নারী-প্রগতি ও নারী ক্ষমতায়নের নামে যে রকমের জাহেলিয়াত বিরাজ করছে তৎপ্রতি লক্ষ্য করলে আল কুরআনের সেই শাশ্বত বাণীর সত্যতাই প্রমাণিত হয়।

তিন. আজকের সমাজে মানবতা বর্জিত বল্গাহারা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে 'প্রগতি' বলে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। আর ইসলামের শাশ্বত বিধান ও চিরসুন্দর ব্যবস্থাকে চিত্রায়িত করা হচ্ছে সেকেলে, সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ ইত্যাদি বিশেষণে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে ইসলামী সংস্কৃতিই যে মানবজাতির জন্য উন্নতি, প্রগতি ও চিরকল্যাণের গ্যারান্টি—যা সর্বকালের সকল মানুষের প্রকৃত কল্যাণ নিশ্চিত করার একমাত্র ব্যবস্থা, যা বিশ্বস্রষ্টা তথা মানব স্রষ্টার অমোঘ বিধান। যার বিপরীতে মানবরচিত ও মানব প্রচলিত যে কোনো রীতি প্রথাই উন্নতি ও প্রগতি পরিপন্থী ; এটা নতুন আংগিকে নতুন খোলসে নতুন নামে নতুন সমাজে যতবার যতভাবেই আত্মপ্রকাশ করুক না কেন। সুতরাং প্রকৃত অর্থে আখেরী নবীর মাধ্যমে আল্লাহ প্রদত্ত আসমানী জীবন বিধান ইসলামী রীতিনীতি ছাড়া বাকী সকল ব্যবস্থাই প্রগতি পরিপন্থী।

চার. جـــاهـلـيت اولى বা 'প্রাচীন জাহেলিয়াত' বলে ইসলাম বিরোধী সকল প্রকার জাহেলিয়াত খতম হয়ে যাওয়ার প্রতি ইংগিত দেয়া হয়েছে। কারণ ইসলামপূর্ব সকল ব্যবস্থাই স্থায়ী হওয়ার অযোগ্য বলে প্রমাণিত সত্যে পরিণত হয়েছে। যদিও যুগে যুগে মুনাফিকরা আর ইসলাম বিদ্বেষীরা তাকে বুকে ধরে রেখে সেই জাহেলিয়াত প্রতিষ্ঠার মিথ্যা স্বপ্নে বিভোর আর তার ব্যর্থ চেষ্টায় গলদঘর্ম। আল কুরআনের ঘোষণা ঃ

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ـ

"সত্য সমাগত অসত্য বিতাড়িত, আর অসত্য তো স্থায়ী হবার অযোগ্যই বটে।"–তাদাব্বুরে কুরাআন এর আলোকে

পাঁচ. মহাগ্রন্থ আল কুরআনের এ অবিস্মরণীয় আয়াত প্রাচীন জাহেলী বা আদিম মূর্খ যামানার কদর্য ও ঘৃণিত রীতিনীতির দিকে ইশারা করতে গিয়ে বলছে, বাইরে বের হওয়ার সময় সাজগোজ করার অভ্যাসটি জাহেলিয়াতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি। এটা অনুসরণে আধুনিক জাহেলিয়াতের উপর আরও

এক কদম এগিয়ে গেছে এবং তার যাবতীয় চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা ও অনুভূতি সব প্রাচীন জাহেলিয়াত থেকেই গৃহীত।

ছয়. বস্তুত জাহেলিয়াত (মূর্খতা-অজ্ঞতা) কোনো একটি নির্দিষ্ট যামানার বৈশিষ্ট্য নয় যে তা একটি নির্দিষ্ট কালে বা কোনো এক নির্দিষ্ট দেশে থাকবে। আসলে এ হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট সামাজিক ব্যবস্থা, এর পেছনে জীবনের এক নির্দিষ্ট চিন্তা-ভাবনা সক্রিয় রয়েছে। হতে পারে এ অবস্থা আবারও আসবে, এ চিন্তা আবারও পুনরুজ্জীবিত হবে। পূর্বের জাহেলিয়াত তখন নব্য জাহেলিয়াতের জন্য দিশারী হিসেবে কাজ করবে—তা যখন যেভাবে এবং যেখানেই হোক না কেন।

সাত. আধুনিক বিশ্বের প্রতি তাকালে দেখা যায় মানুষ এখন এক অন্ধ জাহেলিয়াতের দিকে এগিয়ে চলছে। যা ভালমন্দ কিছুই দেখতে পাচ্ছে না, যা স্রোতের গতিতে গা ভাসিয়ে দিয়ে স্থূল অনুভূতি নিয়ে এগিয়ে চলছে। যার চিন্তাধারার মধ্যে পাশববৃত্তিই অধিক ক্রিয়াশীল। এটি মানব জাতিকে মানবতাবোধ থেকে সরিয়ে নিয়ে হীনতার অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করার জন্য বদ্ধপরিকর।–ফী যিলালিল কুরআন

❑

বত্রিশ

اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمٰتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْقٰنِتٰتِ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالصّٰدِقٰتِ وَالصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰبِرٰتِ وَالْخٰشِعِيْنَ وَالْخٰشِعٰتِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقٰتِ وَالصَّائِمِيْنَ وَالصّٰئِمٰتِ وَالْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحٰفِظٰتِ وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرٰتِ لا اَعَدَ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا ○

"মুসলমান পুরুষ ও মুসলমান নারী, মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, সবরকারী পুরুষ ও সবরকারী নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, রোযাদার পুরুষ ও রোযাদার নারী, যৌন অংগ হেফাযতকারী পুরুষ ও যৌন অংগ হেফাযতকারী নারী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও অধিক স্মরণকারী নারী—এদের সকলের জন্য আল্লাহ তাআলা ক্ষমা ও মহা প্রতিদান রেখে দিয়েছেন।"

–সূরা আল আহযাব ঃ ৩৫

নির্দিষ্ট গুণবৈশিষ্ট্যের সকল পুরুষ-নারীর জন্য রয়েছে আল্লাহর অভিন্ন ক্ষমা ও পুরস্কার

আদম সন্তান পুরুষ ও নারী—দুটো শ্রেণীতে বিভক্ত। মানব বংশ সংরক্ষণ ও বিস্তারের জন্য এতদোভয়ের সৃষ্টি, উভয়ের দৈহিক মানসিক গঠন পার্থক্য এবং তদানুযায়ী উভয়ের মধ্যে কর্মবন্টন আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সৃষ্টি রহস্যের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিকবিশেষ। আল্লাহ তাআলার এ বিধানের পরিবর্তন-পদক্ষেপ তাঁর সৃষ্টি রহস্যের স্বাভাবিক নীতি বা প্রাকৃতিক বিধান ধ্বংস করারই নামান্তর। এ জাতীয় পদক্ষেপ মানব জাতির জন্য দীর্ঘ মেয়াদে বা পরিণামের দিক থেকে কখনো কোনো কল্যাণ বয়ে আনতে পারেনি—আর তা সম্ভবও নয়। কিন্তু তবুও বিভ্রান্ত মানব বংশের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এমনি কর্মকাণ্ডের ব্যর্থ প্রচেষ্টায় সদাতৎপর। অথচ ইতিহাস থেকে সবক গ্রহণের কোনো মনোভাবই তাদের মধ্যে জাগ্রত হতে দেখা যায় না।

ফলে এরা গোটা মানব জাতিকে বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিয়ে চলছে অহরহ। নিজেদের চিন্তা-চেতনা ও কর্মকাণ্ডের যথার্থ মূল্যায়ণ ও ফলপ্রসূ পর্যালোচনা করে প্রকৃত কল্যাণের দিকে এগিয়ে যাওয়ার কোনো মনোভাবের উদ্রেক হচ্ছে না তাদের। ফলে তারা ধাবিত হচ্ছে মানব জীবনের সার্বিক বিপর্যয়ের পথে ; আর রুদ্ধ করে দিচ্ছে মানবজাতির প্রকৃত কল্যাণের রাজতোরণ।

ইসলাম মানব সমাজের সার্বিক দায়িত্ব পালনে পুরুষ নারীর দায়িত্বের নির্ভুল ও সুষ্ঠু কর্মবিভাজন করে দিয়েছে। উভয়ের দুনিয়ার জীবনে স্ব স্ব দায়িত্ব পালনের আবশ্যকীয় দৈহিক-মানসিক শক্তি-সামর্থসহ তাদের উভয়কে পরস্পরের মধ্যে প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসার আকর্ষণ দিয়ে রাব্বুল আলামীন মানব বংশ সংরক্ষণ সম্প্রসারনের এক স্বাভাবিক নিয়ম-নীতি প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন। মর্যাদা, অধিকার ও কর্মফল প্রাপ্তির দিক থেকে তাদের মধ্যে ইসলাম কোনোই পার্থক্য করে না। পার্থক্য করেছে কেবল কর্মবন্টন ও দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে। ভরণ-পোষণ, আয়-রোজগার ও তত্ত্বাবধানের গুরু দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেয়া হয়েছে কোমলমতি প্রেমাধার নারী জাতিকে। ইসলাম সেই গুরুদায়িত্বের ভার অর্পণ করেছে দৃঢ়চেতা কঠোরমনা পুরুষের উপর। এ কর্মবন্টন ও দায়িত্ব বিভাজন তো সেই সত্তারই সুবিজ্ঞ ও কৌশলময় নির্দেশনা যিনি সামর্থ ও যোগ্যতার বিভিন্নতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন পুরুষ ও নারীকে। কিন্তু মর্যাদা ও পারিতোষিক প্রদানের ক্ষেত্রে তিনি যে এতদোভয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য সূচিত করেননি, আলোচ্য আয়াতে সবিস্তারে সে কথাই ঘোষণা করা হয়েছে।

আল কুরআন নারী ও পুরুষ সকলের জন্যই সমানভাবে জীবন পথের নির্দেশিকা। তবে কুরআনুল কারীমের নির্দেশাবলীর সাধারণ নীতি হলো এতে মানব জাতিকে সম্বোধন করা হয়েছে পুরুষ বাচক শব্দ দিয়ে আর নারীদেরকে এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে পরোক্ষভাবে। উদাহরণ স্বরূপ আল কুরআনের সর্বত্রই ঈমানদারকে সম্বোধন করা হয়েছে يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا পুরুষবাচক শব্দ সমষ্টি দিয়ে। আর নারীদেরকেও আনুসংগিকভাবে এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এতে ইংগিত রয়েছে যে, নারীদের সকল বিষয়ই প্রচ্ছন্ন ও গোপনীয় থাকবে—এরি মধ্যে তাদের মর্যাদা নিহিত। তাছাড়া পুরো কুরআনে কেবল মারইয়াম বিনতে ইমরান ছাড়া আর কোনো নারীর নাম উল্লেখ করা হয়নি। কোনো বিশেষ মহিলার প্রসংগ উল্লেখ করার প্রয়োজন হলে তা করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট পুরুষের সম্পর্ক সূচক শব্দ দিয়ে। যেমন اِمْرَاَةُ فِرْعَوْنَ ফিরাউন পত্নী اِمْرَاَةُ نُوْحٍ নূহ পত্নী ইত্যাদি। হযরত মারইয়ামের নাম উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই যে, হযরত ঈসা আ.-এর

পিতা না থাকায় বাধ্য হয়েই তাঁকে মায়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত করতে হয়েছে। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

কুরআনুল কারীমের এ প্রকাশভংগি এক বিশেষ প্রজ্ঞা, যৌক্তিকতা ও কল্যাণের ভিত্তিতেই অনুসৃত হয়েছিল ; কিন্তু এতে নারীদের হীনমন্যতার উদ্রেক হওয়াই ছিল একান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। তাই বিভিন্ন হাদীসে এমন বহু রেওয়ায়াত রয়েছে, যাতে নারীগণ রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এ মর্মে আরজ করেছে—আমরা দেখতে পাচ্ছি আল্লাহ পাক কুরআনের সর্বত্র পুরুষদেরই উল্লেখ করেছেন, তাদেরকেই সম্বোধন করেছেন। এতে বুঝা যায় যে, আমাদের (নারীদের) মধ্যে কোনো পুণ্য ও কল্যাণ নেই। তাই আমাদের কোনো ইবাদাতই গ্রহণযোগ্য নয় বলে আশংকা হচ্ছে। তিরমিযী শরীফে হযরত ইবনে আম্মারা থেকে আবার কোনো কোনো রেওয়ায়াতে হযরত আসমা বিনতে উমাইস থেকে এ ধরনের আবেদন উপস্থাপনের কথা বর্ণিত আছে—আর এসব রেওয়ায়াতে এ আবেদন উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহ নাযিল হওয়ার কারণ (শানেনুযূল) বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতসমূহে নারীদের সান্ত্বনা ও স্বস্তি প্রদান এবং তাদের আমল গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্তাবলী সংশ্লিষ্ট বিশেষ আলোচনা রয়েছে। বলা হয়েছে আল্লাহ তাআলা সমীপে মান-মর্যাদা ও তাঁর নৈকট্য লাভের ভিত্তি হলো সৎকার্যাবলী, আল্লাহর আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার করা। এ ক্ষেত্রে পুরুষ হওয়া বা নারী হওয়ার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

—মাআরেফুল কুরআন

এসব আয়াতে নারীদের স্মরণ করানো হয়েছে যে, তাদের মর্যাদা বৃদ্ধির ব্যাপারে পুরুষদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এবং ইসলামের নির্দেশসমূহ পালন করার মাধ্যমে নারীদেরকে পুরুষদের সাথে সমভাবে সমাজে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে যেতে হবে। আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধির ব্যাপারে পুরুষ ও নারীর সকল অধিকার ও সুযোগ রয়েছে।

মহিলাদের উপরোক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে আল্লাহর পক্ষ থেকে আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হয়। মুসলিম জাতি সত্ত্বার বিশাল প্রাসাদটি গড়ে উঠার মত ভিত্তির জন্য যেসব গুণাবলীর প্রয়োজন, এ আয়াতে ওসব গুণাবলীর বহু মূল্যবান নির্দেশিকা বর্ণিত হয়েছে। আর সেসব গুণাবলী হলো, ইসলাম, ঈমান, আনুগত্য, সত্যবাদীতা, সবর, বিনয়-নম্রতা, দানশীলতা, সিয়াম সাধনা, চরিত্রের হেফাযত এবং আল্লাহ তাআলার বেশী বেশী স্মরণ।

এসব কটি গুণই আল্লাহতে আত্মসর্পণকারী মুসলিম জাতি সত্তার বিশাল প্রাসাদের এক একটি মূল্যবান ইট। পুরুষ নারী নির্বিশেষে উক্ত গুণাবলীর অধিকারী সকল মুসলিমের জন্যই রয়েছে আল্লাহর ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান। একটি সুন্দর ও শান্তিময় সমাজ বিনির্মাণে এসব গুণাবলীতে সুসজ্জিত সকল পুরুষ-নারীর স্ব স্ব ভূমিকা পালন উন্নতির সোপানরূপে কার্যকরী হতে পারে।–তাফহীমুল কুরআন

আয়াতে উল্লিখিত গুণাবলী সম্পর্কিত প্রতিটি পরিভাষাই আজকের মুসলিম সমাজে অহরহ ব্যবহৃত হতে দেখা গেলেও এসবের যথার্থরূপ ও এসবের প্রকৃত ধারণা না থাকায় মুসলিম নর-নারীর মাঝে এসবের প্রভাব পড়তে দেখা যায় না—ফলে ইপ্সিত ফলাফল লাভও সম্ভব হচ্ছে না। সুতরাং আজকের মুসলিম উম্মার জন্য বর্ণিত গুণ-বৈশিষ্ট্যসমূহের পরিচিতিমূলক আলোচনা দরকার বলে মনে করি।

আলোচ্য প্রথম বিষয়টি হচ্ছে 'ইসলাম'। ইসলামী যিন্দিগীর অনুসারী নারী-পুরুষরাই 'মুসলিম'। অর্থাৎ যারা ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে কবুল করে নিয়েছে। অতপর ইসলামের অনুসরণ করেই দুনিয়ার জীবন অতিবাহিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে—যাঁর প্রতি আত্মসমর্পণ করা হয়েছে, তাঁরই নির্দেশ মেনে চলার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাওহীদ ভিত্তিক অবিভক্ত চেতনা-বিশ্বাসই হচ্ছে মুসলিমের দুনিয়ার জীবনের প্রতিটি ধাপের মূল চালিকাশক্তি ও নিয়ন্ত্রক চাবিকাঠি।

দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে 'ঈমান'। সুদৃঢ় বিশ্বাস। এ গুণের অধিকারী নারী-পুরুষই হচ্ছে মুমিন বা মযবুত আস্থা স্থাপনকারী। অর্থাৎ যারা কেবল বাহ্যিকভাবেই দীন ইসলাম মেনে চলে না বরং যারা আন্তরিকভাবেই ইসলামের পথনির্দেশকে সত্য, সঠিক ও নির্ভুল বলে স্বীকার করে, তারা বিশ্বাস করে যে, চিন্তা ও কাজের যে পথ কুরআন ও সুন্নাহ দেখিয়েছে, তা-ই সরল-সোজা ও সম্পূর্ণ সঠিক পথ, যে জিনিসকে আল্লাহ ও তাঁর রসূল ভুল বলে চিহ্নিত করেছেন, তাদের নিজেদের মতেও তা সন্দেহাতীতভাবে ভুল। পক্ষান্তরে আল্লাহ ও তাঁর রসূল যা সঠিক ও হক বলে ঘোষণা দিয়েছেন, তাদের মন-মগজ তাকেই সঠিক ও সত্য বলে বিশ্বাস করে। কুরআন-সুন্নাহর কোনো হুকুমকে তারা অবজ্ঞা করে প্রচলিত রীতিনীতি বা স্বীয় মতামতের অনুসারী হয় না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈমান স্বরূপ বর্ণনা করে বলেছেন, ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ رَّسُوْلًا -ঈমানের স্বাদ সেই গ্রহণ করতে পেরেছে

যে আল্লাহকে রব, ইসলামকে দীন—জীবন বিধান এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রসূল হিসেবে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিয়েছে। এর আরেক ব্যাখ্যা করা হয়েছে এভাবে لَايُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهٖ তোমাদের কেউই ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ তাদের মন-মানসিকতা আমার উপস্থাপিত বিধানের অধীনতা স্বীকার করে না নিবে।

তৃতীয় বিষয়টি হচ্ছে 'আনুগত্য'। আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্যকারী قَانِتٌ হবে একজন মুসলিম। সুতরাং অনুগত নারী-পুরুষ বলতে বুঝায় সেসব মুসলিমকে যারা ইসলামের বিধান কেবল মৌখিকভাবে মেনে নিয়েই ক্ষান্ত হয় না, বরং বাস্তবে তার যথাযথ অনুসরণও করে থাকে। দৈনন্দিন জীবনে তারা নিজেদের ঈমানের দাবী মোতাবেকই বাস্তব জীবন আন্তরিকভাবেই অতিবাহিত করে থাকে।

আয়াতে বর্ণিত চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হলো 'সত্যবাদিতা'। সত্যবাদিতা বা সত্য পন্থাবলম্বন হলো একজন মুসলিমের ঈমানের একান্ত দাবী। একজন মুসলিম নিজের কথায় যেমন সত্যবাদী তাকে কাজকর্ম, লেনদেন ইত্যাদিতেও সত্যানুসারী হতে হবে। মিথ্যা, ধোকা, প্রতারণা, অসদুদ্দেশ্য ও ধূর্তামি প্রভৃতি দোষ তাদের জীবনে পাওয়া যাবে না। তাদের মুখে সে কথাই ধ্বনিত হবে যাকে তাদের মন নিসন্দেহে সত্য বলে জানে। তারা এমন কাজই করে যাকে তারা সত্য বলে জানে। আর যার সাথেই তারা কোনোরূপ সম্পর্ক স্থাপন করে, লেনদেন করে, তাতে ন্যায়পরায়ণতা, সুবিচার ও সততা পুরোপুরি রক্ষা করে থাকে। তাদের কথা, বিশ্বাস ও কাজের মধ্যে কোনোরূপ ব্যতিক্রম নেই।

পঞ্চম বিষয়টি হচ্ছে 'সবর-ধৈর্য'। ধৈর্যশীলতা একজন মুসলিমের অপরিহার্য নৈতিক গুণ-বৈশিষ্ট্য। ধৈর্যশীলতা গুণের তাৎপর্য হলো আল্লাহ ও রসূলের প্রদর্শিত সরল-সঠিক পথে আল্লাহর দীন কায়েমের ব্যাপারে যত বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়—যেসব কষ্ট ও দুঃখ সহ্য করার প্রয়োজন হয়, আর যেসব ক্ষতি-লোকসান স্বীকার করতে হয় ; তা সবই তারা পূর্ণ ধৈর্য-সহিষ্ণুতা সহকারে এবং অকাতরে বরদাশত করে নেয়। কোনো ভয়ভীতি, লোভ-লালসার কোনো দাবী বা উত্তেজনা তাদেরকে সরল-সোজা পথ থেকে কখনো বিচ্যুত করতে পারে না।

এখানে ষষ্ঠ বিষয় হলো 'বিনয়-নম্রতা'। একজন মুসলিম সদা-সর্বদা আল্লাহর সম্মুখে থাকবে خَاشِعٌ বা অবনত হয়ে। অর্থাৎ গৌরব, অহংকার,

দাম্ভিকতা হতে তাদের অন্তর হবে মুক্ত। তারা পূর্ণ চেতনা ও অনুভূতি সহকারে মনে করে যে, তারা আল্লাহর বান্দা ছাড়া আর কিছুই নয়, বান্দাহর উর্ধে তাদের কোনোই স্থান বা পজিশন নেই। এ কারণে তাদের দেহ ও মন উভয়ই সদা অবনত থাকে আল্লাহর সামনে। তাদের উপর সদা সর্বদাই আল্লাহর ভয় থাকে বিজয়ী ও প্রভাবশালী হয়ে। দাম্ভিক, অহংকারীও আল্লাহ থেকে গাফেল লোকদের মত কোনো আচরণ কখনো তাদের দ্বারা সংগঠিত হয় না।

আয়াতের সপ্তম বিষয়টি হলো 'দানশীলতা'। সদকা দানকারীর পরিভাষা 'মুতাসাদ্দেকীন'। কেবল ফরয যাকাত আদায় করা এর অর্থ নয়। সাধারণ দান-খয়রাতও এর মধ্যে শামিল। তারা আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করে, উন্মুক্ত হস্তে খরচ করে। আল্লাহর বান্দাদের সাহায্য করার ব্যাপারে নিজেদের সাধ্য ও সামর্থ মোতাবেক সাহায্য করতে কোনো ত্রুটি করে না। কোনো ইয়াতীম, রুগ্ন, বিপদগ্রস্ত, দুর্বল, অক্ষম, অভাবী ও দরিদ্র ব্যক্তি তাদের এলাকায় সাহায্যবঞ্চিত হয়ে থাকতে পারে না। উপরন্তু আল্লাহর দীন কায়েম ও বিজয়ী করে তোলার জন্য প্রয়োজন হলে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলে নিজেদের ধনমাল লুটিয়ে দিতে কখনো কার্পণ্য করে না। এ গুণটি দিয়ে অন্তরের সংকীর্ণতা নিয়ন্ত্রিত হয়, আল্লাহর বান্দাদের প্রতি দয়া-মায়া প্রদর্শনের চেতনা জাগ্রত হয়। বান্দার হক আদায় করার, মানুষকে ভালবাসার প্রেরণা জাগে এবং উপকারীর উপকার স্বীকার করে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মনোভাব জাগ্রত হয়।

বর্ণিত অষ্টম গুণটি হলো 'সওম বা রোযা'। রোযাদার বা সিয়াম সাধনাকারী নারী-পুরুষকে তার সিয়াম পালন আত্ম নিয়ন্ত্রণের শক্তি পয়দা করে এবং জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগে শান্তি-শৃংখলা ফিরিয়ে এনে দেয়। সে বা তারা সিয়ামের মাধ্যমে বৈধ ভোগবস্তু পরিত্যাগ করার সেই কষ্টসাধ্য কাজটির জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে নিতে পারে। এ মহান গুণটির প্রধানতম তাৎপর্য হচ্ছে মানব দেহের চাহিদার উপর মনের চাহিদার নিয়ন্ত্রণ লাভ, জীবনের প্রধান প্রধান চাহিদাকে নিজের আয়ত্বে আনার শক্তি অর্জন, ইচ্ছা শক্তিকে বিজয়ী ও প্রতিষ্ঠিত করা এবং মানবতাকে পাশববৃত্তির উপর বিজয়ী করা। মানুষের দেহ ও রূহের সমন্বিত শক্তি সিয়াম পালনের মাধ্যমেই অর্জিত হয়। সিয়াম পালন আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। ফলে মানুষের প্রধান অংশ/উপাদান 'রূহ' বিশুদ্ধতা লাভে ধন্য হতে পারে। এ ব্যাপারেও নারী-পুরুষের মাঝে কোনো তারতম্য নেই।

মুসলিম নারী-পুরুষের জন্য আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত নবম বৈশিষ্ট্য হলো লজ্জাস্থানের হেফাযত। 'লজ্জাস্থানের হেফাযত' মানে মানুষের জৈবিক চাহিদা প্রশমিত করা নয় বরং তা যেন নিয়ন্ত্রিতভাবে ব্যবহৃত হয়। এ গুণ মানুষকে আল্লাহর বিধানের অনুগামী বানায় এবং পৃথিবীকে আরও সুন্দর স্বচ্ছ করে গড়ে তোলার ও জীবনকে সমৃদ্ধ করার দিকে মানুষকে এগিয়ে দেয়। 'লজ্জাস্থানের হেফাযত'-এর দুটো অর্থ হতে পারে। এক. তারা যেনা-ব্যভিচার থেকে পবিত্র থাকে, দুই. তারা নগ্নতা ও উলংগতা পরিহার করে। এখানে উল্লেখ্য, কেবল বিবস্ত্র হওয়াকেই নগ্নতা বলা হয় না, বরং পাতলা কাপড় পরিধান ও আঁট-সাঁট পোশাক পরিধান করাও নগ্নতার মধ্যে গণ্য হবে।

আয়াতে বর্ণিত দশম ও সর্বশেষ গুণ-বৈশিষ্ট্য হলো, 'আল্লাহ তাআলাকে বেশী বেশী করে স্মরণ করা।' আল্লাহকে খুব বেশী বেশী করে স্মরণ করার অর্থ হলো মুখে সর্বাবস্থায় সর্বক্ষণে কোনো না কোনোভাবে আল্লাহর নাম উচ্চারিত হবে। কোনো লোকের মধ্যে এ গুণ-বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হবে তখন, যখন তার অন্তরে আল্লাহর চিন্তা-খেয়াল সম্পূর্ণরূপে বদ্ধমূল হয়ে যাবে। চেতনার স্তর থেকে অবচেতন ও অনবচেতন পর্যন্ত আল্লাহর চিন্তা গভীর হয়ে গেলেই একজন লোকের এ অবস্থা হতে পারে যে, সে যে কাজই করবে আর যে কথাই বলবে তাতেই আল্লাহর নামের স্মরণ ও উচ্চারণ থাকবে। খাওয়ার শুরুতে 'বিস্‌মিল্লাহ'। চর্বন করতে 'সুবহানাল্লাহ', গিলতে 'আলহামদুলিল্লাহ বলবে। সর্বোপরি এ খাদ্যদ্রব্য হালাল পথে এসেছে কিনা তৎপ্রতি অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। বস্তুত এ লক্ষ্য রাখাই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর স্মরণ বা ذكر الله সাধারণ কথাবার্তায় তার মুখে সর্বাবস্থায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থায় উচ্চারিত হবে—'বিসমিল্লাহ', 'আলহামদুলিল্লাহ', 'ইনশাআল্লাহ', 'মাশাআল্লাহ', 'সুবহানাল্লাহ' 'জাযাকাল্লাহ', ইত্যাদি আল্লাহর স্মরণমূলক বাক্যসমূহ। নিজের প্রতিটি বিষয়ে সাহায্য চাইবে আল্লাহর কাছে। যে কোনো নিয়ামত পেলে আল্লাহর শোকর আদায় করবে। বিপদ আসলে আল্লাহর রহমত চাইবে, প্রত্যেক সমস্যা ও জটিলতায় কেবল আল্লাহর দিকেই মুখ ফিরাবে। যে কোনো অন্যায় বা পাপ কাজের অসওয়াসা আসবে তখনই কেবল আল্লাহর ভয়েই তা থেকে বিরত থাকবে। কখনো কোনো অপরাধ হয়ে গেলে সে জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে। মোটকথা উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে, দুনিয়ার সকল কাজে আল্লাহর স্মরণ করাই হবে তার স্থায়ী নিয়ম। প্রকৃতপক্ষে এটাই হচ্ছে—ইসলামী জিন্দেগীর প্রাণশক্তি। এখানে লক্ষণীয় যে, ইসলাম নির্ধারিত সব

ধরনের আনুষ্ঠানিক ইবাদাতের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় ঠিক করা আছে, ঐ সময় তা আদায় করা হলে মানুষের জিম্মা খালাস হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহর স্মরণ বা 'যিক্‌রুল্লাহ' এমন এক ইবাদাত যা প্রতিটি মুহূর্তেই জারী থাকে। মানবজীবনের এ সম্পর্ক তাকে আল্লাহর বান্দা হওয়ার সাথে স্থায়ীভাবে যুক্ত করে রাখে। যাবতীয় ইবাদাত ও দীনি কাজ এরই সাহায্যে সঞ্জীবিত হয়ে উঠে। এরি ফলে বিশেষ বিশেষ আমল বা ইবাদাতের সময় আল্লাহর দিকে মন উন্মুখ হয়ে থাকে—মুখ সর্বদা আল্লাহর স্মরণে সিক্ত থাকে। কারো এরূপ অবস্থা হলেই বুঝা যাবে যে, তার জীবনের সকল ইবাদাত ও দীনি কাজ উৎকর্ষ লাভ করেছে। যেমন একটি চারাগাছ সঠিক প্রকৃতি এবং অনুকূল আবহাওয়া ও পরিবেশে বপন করলে তার উৎকর্ষ সাধিত হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে যে জীবন এরূপ আল্লাহর স্থায়ী ও সার্বক্ষণিক স্মরণশূন্য, তাতে নির্দিষ্ট সময়েও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আদায় করা ইবাদাত ও দীনি কাজ এমন একটি চারাগাছের মত, যা স্বীয় প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিপরীত আবহাওয়া ও পরিবেশে লাগানো হয়েছে এবং কেবলমাত্র মাটির বিশেষ পরিচর্চার কারণে লালিত হচ্ছে। এ বিষয়টিকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট করে দিয়েছেন। হাদীসটি এই ঃ

عَنْ مُعَاذِبْنِ اَنَسِ الْجُهَنِيِّ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ رَجُلاً سَائَلَهٗ اَىُّ الْمُجَاهِدِيْنَ اَعْظَمُ اَجْرًا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ اَكْثَرُهُمْ لِلّٰهِ تَعَالٰى ذِكْرًا ـ قَالَ اَىُّ الصَّائِمِيْنَ اَكْثَرُ اَجْرًا ؟ قَالَ اَكْثَرُهُمْ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ ذِكْرًا ـ ثُمَّ ذَكَرَ الصَّلٰوةَ وَالزَّكٰوةَ وَالْحَجَّ وَالصَّدَقَةَ كُلُّ ذٰلِكَ يَقُوْلُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَكْثَرُهُمْ لِلّٰهِ ذِكْرًا ـ مسند احمد

"মুআয ইবনে আনাস আল জুহানী বর্ণনা করেছেন ঃ এক ব্যক্তি রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মুজাহিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী পুণ্য ও পুরস্কার লাভ করবে কে ? তিনি বললেন, তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশী আল্লাহর যিকির করবে। সে জিজ্ঞেস করলো, রোযাদার লোকদের মধ্যে কে বেশী পুরস্কার পাবে। তিনি বললেন, তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশী আল্লাহর যিকির করবে। অতপর সে ব্যক্তি নামায, যাকাত, হজ্জ ও সদকা দানকারীদের সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করলো। আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেকটির জবাবে বললেন, যে সবচেয়ে বেশী আল্লাহর যিকির করবে।"–মুসনাদে আহমাদ

আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত দশটি গুণ-বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচনা করে বলা হয়েছে যে, এসব গুণাবলী যেসব নারী-পুরুষের মধ্যে পাওয়া যাবে, তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান। বস্তুত ইসলামের মৌলিক মূল্যমান (Basic Values) সমূহ এ একটি আয়াতেই বলে দেয়া হয়েছে। এ মূল্যমান সমূহের দৃষ্টিতে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। কার্যত উভয়ের কর্মক্ষেত্র অবশ্যই ভিন্ন ও স্বতন্ত্র। পুরুষদের কাজকর্ম করতে হয় জীবনের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ও বিভাগে আর স্ত্রীলোকদের করতে হয় অপর ক্ষেত্র ও বিভাগে। কিন্তু উল্লিখিত মূল্যমান উভয়ের মধ্যে সমানভাবে বর্তমান থাকলে আল্লাহর কাছে উভয়ের মর্যাদা ও পুরস্কার এক ও অভিন্ন, উভয়ের পুণ্য ও কর্মফল সম্পূর্ণ সমান মানের। এদের এক শ্রেণীর লোক মহিলা—যারা ঘরের দায়িত্ব পালন করেছে, সন্তান লালন-পালন করেছে ; অপর শ্রেণীর লোক—যাদের দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে খেলাফত ও রাষ্ট্র পরিকল্পনা করা। একজন সন্তান লালন-পালন করেছে অপরজন জিহাদের ময়দানে উপস্থিত হয়ে আল্লাহ ও তাঁর দীনের জন্য লড়াই করেছে। এ কারণে তাদের উভয়ের কর্মফল ও পুরস্কারে কোনো পার্থক্য নেই।–তাফহীমুল কুরআন

মাওলানা সালাহুদ্দীন ইউসুফ তার তাফসীরে 'আল কুরআনুল করীম'-এ বর্ণনা করেন যে, হযরত উম্মে সালমা রা. এবং অন্যান্য কজন মহিলা সাহাবী বললেন, এ কেমন কথা! আল্লাহ তাঁর কালামের সর্বত্র কেবল পুরুষদের সম্বোধন করেছেন—মহিলাদের নয় ? তাঁর এ কথার জবাবে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়েছে। মুসনাদে আহমদ ৩০১/২ পৃষ্ঠা তিরমিযী হাদীস নং ৩২১১। এ আয়াতে নারীদের শান্ত্বনা দেয়া হয়েছে মাত্র ; কেননা সমগ্র হুকুমেই নারীরা পুরুষদের সাথে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অবশ্য যেসব আয়াত শুধু মহিলাদের জন্য নাযিল হয়েছে সেকথা স্বতন্ত্র। এ আয়াত এবং এতদসংক্রান্ত অন্যান্য আয়াত থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইবাদাত ও আল্লাহর আনুগত্যে আখিরাতের মর্যাদা ও ফযিলত ইত্যাদিতে নারী-পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। উভয়ের জন্যই সমানভাবে এর দরজা খোলা আছে এবং উভয়ে অধিক থেকে অধিকতর পুণ্য ও সওয়াব হাসিল করতে সক্ষম। এতে তো লিংগের পার্থক্যের ভিত্তিতে কমবেশী করা হয় না।–আল কুরআনুল করীম

শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী রহ. আল কুরআনুল কারীম-এর হাসিয়ায় লেখেন, কোনো কোনো নবী পত্নী বলেছিলেন যে, কুরআনের অধিক সংখ্যক স্থানেই তো কেবল পুরুষদের সম্পর্কে বলা

হয়েছে—নারীদের সম্পর্কে নয়। তাছাড়া এ আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে শুধু নবী পত্নীদের কথা বলা হয়েছে, সাধারণ নারী সমাজের কথা কিছুই বলা হয়নি। মহিলাদের এসব কথার প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়েছে। এখানে নারীদের শান্ত্বনা দিয়ে বুঝানো হয়েছে যে, নারী হোক বা পুরুষ হোক—কারো পরিশ্রম ও উপার্জন আল্লাহর দরবারে বিনষ্ট হতে দেয়া হয় না। তাছাড়া যেভাবে পুরুষদের চারিত্রিক উন্নতি করার উপকরণ মওজুদ আছে, মহিলাদের জন্যও সেই ময়দান প্রশস্ত আছে। এখানে নারীগণের মনতুষ্টির জন্য এভাবে নারী ও পুরুষ পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তা নাহলে আল কুরআনের যে হুকুম পুরুষদের জন্য নাযিল হয়েছে সেই হুকুম সাধারণত মহিলাদের প্রতিও আরোপিত হয়ে থাকে। পৃথক পৃথক নাম নিয়ে বলার কোনো প্রয়োজন নেই। অবশ্য নারীদের জন্য নির্দিষ্ট হুকুম হলে তা পৃথকভাবেই বলে দেয়া হয়েছে।–আল কুরআনুল করীম, তাফসীরে উসমানী।

❐

তেত্রিশ

يَاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ط ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ط وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ○

"হে নবী! তোমার স্ত্রীগণ, মেয়েরা এবং মুমিন নারীদের বলে দাও, তারা যেন তাদের চাদরের কিছু অংশ নিজেদের মুখাবয়বের উপর টেনে দেয়, এতে করে তাদের চিনতে পারা অনেকটা আসান হবে ; ফলে তাদের উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও পরম দয়াবান।"

–সূরা আল আহযাব ঃ ৫৯

মুসলিম নারীগণ প্রয়োজনে বাড়ীর বাইরে যাবে কিভাবে ?

নারী-পুরুষের মাঝে, কর্মবন্টন অনুযায়ী নারীগণের প্রধান কর্মক্ষেত্র পরিবার। পারিবারিক কার্যাবলী সম্পাদন বাড়ীর অভ্যন্তরে হলেও কখনও প্রয়োজনে বাড়ীর বাইরেও তাদের যাতায়াত আবশ্যকীয় হয়ে পড়ে। মুসলিম নারীগণ বিভিন্ন পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় কার্যক্রমে বাড়ীর বাইরে যেতে কুরআন ও হাদীস নিষেধ করে দেয়নি। তবে তারা বের হবে পর্দা করে শালীনতা সহকারে। এ বিষয়ে সূরা আল আহযাবের ৩৩ আয়াতে এ বইয়ের বিষয় নং একত্রিশে আলোচনার সূচনা করা হয়েছে। যেখানে মহিলাদের জন্য সাধারণত ঘরে পারিবারিক বিষয়াদিকেই প্রধান গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সাথে সাথে ঘরের বাইরে তাদের বিচরণ কিরূপ হবে সে বিষয়েরও সীমারেখা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর রসূলকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন তাঁর স্ত্রী-কন্যা ও মুসলিম মহিলাদেরকে প্রয়োজনীয় কাজে বাইরে যাওয়ার সময় সমস্ত শরীর, মাথা ও বুকের খোলা অংশ আচ্ছাদিত করার আদেশ দেন। সর্বাংগ আচ্ছাদনকারী একটা জিল্‌বাব বা বড় চাদর দিয়ে শরীরটাকে ঢেকে নিতে হবে। এ পোশাক তাদেরকে অন্যান্য নারীদের মধ্য থেকে আলাদা বৈশিষ্ট্য এনে দিবে আর দুষ্কৃতকারী ও বখাটে লোকদের উত্যক্তি থেকে রক্ষা করবে। কেননা মহিলাদেরকে উত্যক্তকারী বখাটেরা আপাদমস্তক আবৃত মহিলাদেরকে দেখলে তাদেরকে দীনদার পরহেজগার নারী হিসেবে চিনতে পেরে লজ্জা ও সংকোচবোধ করে এবং সংযত আচরণ করে। সূরা আল

আহযাবের আলোচ্য ৫৯নং আয়াতটিতে 'জিলবাব' পরিধানের নির্দেশ লক্ষ্যণীয়।

এ আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে সুদ্দী বলেছেন, মদীনার কিছু পাপাচারী বখাটে লোক রাতের আঁধার নেমে এলেই মদীনার অলিগলিতে বেরিয়ে পড়তো এবং মেয়েদের খোঁজ করতো। মদীনা ছিল ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা। তাই রাত হলে মহিলারা প্রকৃতির ডাকে সারা দিতে বাইরে বেরিয়ে যেতো, আর পাপাচারী বখাটেরা এ সুযোগের অপেক্ষায় থাকতো। তবে কোনো মহিলাকে চাদর দিয়ে আপাদমস্তক আবৃত দেখলে তারা বলতো এতো 'সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলা'। কাজেই তার ব্যাপারে তারা সংযত থাকতো। আর যখন তারা দেখতো যে, কেউ বড় চাদর দিয়ে শরীর না ঢেকেই বেরিয়েছে, তখন তারা বলতো, এতো দাসী-বাঁদী বা নিম্নস্তরের মহিলা। এই বলেই তারা মহিলার উপর আক্রমণ চালাতো।

মুজাহিদ বলেছেন, 'জিলবাব' বা বড় চাদর পরিধানের আদেশ দেয়া হয়েছে এজন্যে, যেন বুঝা যায় তারা স্বাধীন ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে। ফলে কোনো অপরাধপ্রবণ লোক তাদের কোনোভাবে উত্যক্ত করতে চেষ্টা করবে না। আর 'আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু'—একথার অর্থ হলো অজ্ঞতাবশত জাহেলী যুগে যেসব অন্যায় হয়ে গেছে, তা আল্লাহ ক্ষমা করবেন।

এ আয়াত থেকে বুঝা যায়, আরবের সামাজিক পরিবেশকে পবিত্র করার জন্য যে অব্যাহত চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, ফেতনা-ফাসাদ ও নৈরাজ্য দূর করার জন্য যে ক্রমাগত বিধি-নিষেধ জারি করা হচ্ছিল এবং যাবতীয় বিশৃংখলা ও দুর্নীতিকে সংকীর্ণতম গণ্ডীতে সীমিত করার জন্য যে সর্বাত্মক চেষ্টা করা হচ্ছিল—এসব কিছুর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল গোটা মুসলিম সমাজের উপর ইসলামী নিয়ম-বিধি ও ঐতিহ্যের নিরংকুশ কর্তৃত্ব ও শাসন প্রতিষ্ঠা করা।–ফী যিলালিল কুরআন

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে মহিলাদের ঘরের বাইরে যাওয়ার সময় বড় চাদর বা বোরকা পরিধান করে শালীন পোশাকে পর্দা সহকারে বের হতে হবে। তাছাড়া রসূলুল্লাহ স. এক হাদীসে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন যে, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রসমূহে মহিলাদের ঘর থেকে বের হওয়ার জন্য কোনো বাধা-নিষেধ নেই। রসূলের পবিত্র সহধর্মীনীদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, তারা পর্দা সহ বাইরে যেতে পারবে। তদুপরি পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার পরেও রসূলুল্লাহ স.-এর আমল এ সাক্ষ প্রদান করে যে, প্রয়োজনে মেয়েদের ঘরের বাইরে যাওয়ার অনুমতি রয়েছে। যেমন হজ্জ

ও ওমরার সময় রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে তাঁর বিবিগণের গমনের কথা বহু বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তেমনিভাবে তাঁর স. সাথে তাঁদের বিভিন্ন যুদ্ধে যাওয়ারও প্রমাণ রয়েছে। আবার অনেক রেওয়ায়াতে এ প্রমাণও পাওয়া যায় যে, নবীজীর পুণ্যবতী স্ত্রীগণ পিতা-মাতা ও অন্যান্য মুহরিম আত্মীয়গণের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে নিজেদের বাড়ী থেকে বের হতেন এবং আত্মীয়স্বজনের রোগ-ব্যাধির খবর নিতে যেতেন ও শোকানুষ্ঠান প্রভৃতিতে অংশগ্রহণ করতেন। এছাড়া রসূলে করীম স.-এর জীবদ্দশায় তাঁর স্ত্রীগণের মসজিদে যাওয়ারও অনুমতি ছিল।

কেবল রসূলে করীম স.-এর সাথেও তাঁর সময়কালেই যে এমনটি ঘটেছিল তা নয় ; বরং তাঁর ইন্তেকালের পরও হযরত সাওদা রা. ও যয়নাব বিনতে জাহাশ রা. ছাড়া অন্যান্য পত্নীগণের হজ্জ ও ওমরার উদ্দেশ্যে বাইরে গমন করার প্রমাণ রয়েছে। আর এ সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামও কোনো আপত্তি উত্থাপন করেননি।

সারকথা এই যে, কুরআন পাকের ইংগিত, নবী করীম স.-এর আমল ও সাহাবায়ে কেরামের ইজমা অনুসারে প্রয়োজনের সময় মুসলিম নারীগণের ঘরের বাইরে যাওয়ার বিষয়টি আল্লাহর বাণী وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ "তোমরা তোমাদের ঘরে অবস্থান করো" এর হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন হজ্জ-ওমরা ইত্যাদি। আর স্বাভাবিক প্রয়োজনাদি, নিজের পিতা-মাতা ও মুহরিম আত্মীয়গণের সাথে সাক্ষাত, এদের অসুস্থতায় সেবা-শুশ্রূষা করা, অনুরূপভাবে যদি কারো জীবিকা নির্বাহের সামান বা বিকল্প কিছু না থাকে তবে চাকুরী করার জন্য বা কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে মহিলাদের বাহির হওয়াও এ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নয়। অর্থাৎ এসব উদ্দেশ্যে মহিলাদের বের হওয়ার পথে ইসলাম বাধা দেয় না। অবশ্য বের হওয়ার জন্য শর্ত হলো অংগ সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বের না হওয়া—বরং বোরকা বা বড় চাদর দিয়ে পর্দার সাথে বের হওয়া।–তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন

আলোচ্য আয়াতে কুরআনের ভাষা হলো, يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ- "তারা যেন তাদের উপর তাদের জিলবাব ঝুলিয়ে রাখে।" আরবী ভাষায় 'জিলবাব' বলা হয় বড় চাদরকে। এখানে مِنْ শব্দ দ্বারা বুঝায় বড় চাদরের অংশবিশেষ। এবং পুরো আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় এই যে, 'মহিলারা যেন নিজেদের গায়ে বড় চাদরটি ভালভাবে পরিধান করে সেটার একটা অংশ কিংবা তার গুণ্ঠন নিজের উপর হতে ঝুলিয়ে নেয়। আর আমাদের ভাষায় এটাই হচ্ছে 'ঘোমটা দেয়া'।

নবী করীম স.-এর নিকটবর্তী সময়ে বড় বড় মুফাস্‌সিরগণ এ আয়াতের এরূপ অর্থই করেছেন। ইবনে জারীর ও ইবনুল মুনযির বর্ণনা করেছেন, মুহাম্মদ ইবনে শিরীন র. হযরত উবাদাতুস সালমানীর কাছে এ আয়াতের অর্থ জিজ্ঞেস করেছিলেন। তিনি জবাবে মুখে কিছু বলার পরিবর্তে নিজের গায়ের চাদর উঠিয়ে তা এমনভাবে পরলেন যে সমস্ত মাথা, কপাল ও মুখাবয়ব ঢেকে গেল, আর কেবল একটি চোখ খোলা রাখা হলো। হযরত ইবনে আব্বাসও এ আয়াতের এরূপ তাফসীরই করেছেন। ইবনে জারীর, ইবনে আবু হাতেম ও ইবনে মারদুইয়া তাঁর যেসব কথা উদ্ধৃত করেছেন, তাতে তিনি বলেন, "আল্লাহ নারীদের হুকুম দিয়েছেন যে, তারা কোনো কাজে যখন ঘর থেকে বেরিয়ে যাবে তখন নিজেদের চাদরের আঁচল উপর থেকে ঝুলিয়ে দিয়ে নিজের মুখাবয়ব ঢেকে নিবে এবং কেবল চক্ষু খোলা রাখবে।" কাতাদাহ এবং সুদ্দীও আলোচ্য আয়াতের এ তাফসীরই করেছেন।

সাহাবা ও তাবেঈনের পর ইসলামের ইতিহাসে যে কজন বড় বড় মুফাস্‌সির হয়েছেন, তাঁরা সকলে একমত হয়ে আলোচ্য আয়াতের এ অর্থই করেছেন। ইমাম ইবনে জারীর তাবারী বলেন ঃ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ–অর্থাৎ ভদ্র স্ত্রীলোকেরা নিজেদের পোশাক-আশাক দাসীদের মত পরিধান করে যেন ঘর থেকে বের না হয়, আর তাদের চেহারা ও মাথার চুল যেন খোলা না থাকে। বরং তারা যেন তাদের গায়ের চাদরের এক অংশ ঝুলিয়ে রাখে, যাতে কোনো ফাসেক লোক তাদের মুখ ও চেহারা দেখার সাহস না পায়। (জামেউল বায়ান, খণ্ড ২৩ পৃষ্ঠা-৩৩ থেকে তাফহীমুল কুরআন।) আল্লামা আবু বকর জাস্‌সাস বলেন, "এ আয়াত প্রমাণ করে যে, যুবতী মহিলাদেরকে তাদের মুখাবয়ব ঢেকে রাখার হুকুম দেয়া হয়েছে এবং ঘর থেকে বের হওয়ার সময় পূর্ণ আবরণ ও পবিত্র চরিত্রবতী হওয়ার প্রমাণ প্রকাশমান থাকতে হবে, যেন সন্দেহপ্রবণ চরিত্রের লোকেরা তাদের দেখে কোনোরূপ লালসার বশবর্তী না হয়। (আহকামুল কুরআন, ৩য় খণ্ড, ৪৫৮ পৃষ্ঠা থেকে তাফহীমুল কুরআন।) আল্লামা জামাখশারী তাঁর তাফসীর আল কাশ্‌শাফ ২য় খণ্ড ২২১ পৃষ্ঠায় বলেন, يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ অর্থ তারা তাদের চাদরের একাংশ উপর থেকে ঝুলিয়ে নিবে এবং তা দিয়ে তাদের চেহারা ও চারিপাশকে ভালভাবে আবৃত করে রাখবে। আল্লামা নিজামুদ্দীন নিশাপুরী বলেন, يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ অর্থ নিজের উপর দিয়ে চাদরের একটা অংশ ঝুলিয়ে নিবে। এভাবে মেয়েদের চেহারা ও মাথা ঢেকে রাখার হুকুম দেয়া হয়েছে।–গারায়েবুল কুরআন খণ্ড ২২, পৃষ্ঠা-৩২ তাফহীমুল কুরআন।

ইমাম রাজী বলেন, এরূপ হুকুম দিয়ে লোকদের একথা জানিয়ে দিতে চাওয়া হয়েছে যে, এরা চরিত্রহীনা স্ত্রীলোক নয়। কেননা চেহারা বা মুখমণ্ডল 'সতর' এর মধ্যে শামিল না হলেও যে স্ত্রীলোক তার চেহারা ঢেকে রাখবে, সে অপর কোনো ব্যক্তির সামনে তার চেহারা খুলতে রাজী হওয়ার বিষয়ে কোনো ব্যক্তিই সাহস করতে পারে না। বরং সবাই বুঝতে পারবে যে, এ তো পর্দানশীন স্ত্রীলোক। এদের সাথে কোনোরূপ দুষ্কৃতির আশা করা যায় না।-তাফসীরে কবীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৯১ থেকে তাফহীমুল কুরআন।

একটি সন্দেহের অপনোদন

বিভিন্ন তাফসীর আলোচনা করলে দেখা যায় যে, আলোচ্য আয়াতে স্বাধীন নারীদেরকে এক বিশেষ ধরনের পর্দার আদেশ দেয়া হয়েছে। তা এই যে, তারা মাথার উপর দিক থেকে তাদের চাদর লটকিয়ে দিয়ে চেহারা ঢেকে ফেলবে, যাতে বাঁদীদের থেকে তাদের স্বাতন্ত্র ফুটে উঠে এবং তারা দুষ্টদের কবল থেকে নিরাপদ হয়ে যায়। কিন্তু এর মানে এ নয় যে, ইসলাম সতীত্ব সংরক্ষণে স্বাধীন নারী ও বাঁদীদের মধ্যে কোনোরূপ পার্থক্য করেছে এবং স্বাধীন নারীদের সতীত্ব সংরক্ষণ করে বাঁদীদের ছেড়ে দিয়েছে। বরং প্রকৃতপক্ষে এরূপ পার্থক্য লম্পটরা ও দুষ্ট লোকেরাই করে রেখেছিল। তারা স্বাধীন নারীদের প্রতি হস্তক্ষেপ করার দুঃসাহস করতো না। কিন্তু বাঁদীদেরকে উত্যক্ত করতে কসুর করতো না। শরীয়ত তাদের সৃষ্ট পার্থক্যকে এভাবে কাজে লাগিয়েছে যে, অধিকাংশ নারী তাদেরই স্বীকৃত নীতির মাধ্যমে আপনা আপনি নিরাপদ হয়ে গেছে। এখন বাঁদীদের সতীত্ব সংরক্ষণের ব্যাপারটিও ইসলামে স্বাধীন নারীদের অনুরূপ ফরয ও জরুরী। কিন্তু সে জন্যে আইনগত কঠোরতা অবলম্বন ছাড়া গত্যন্তর নেই। তাই পরবর্তী আয়াতে সেই আইনও ঘোষণা করা হয়েছে যে, যারা এ কুকর্ম থেকে বিরত হবে না তাদেরকে কিছুতেই ক্ষমা করা হবে না বরং যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানেই পাকড়াও করা হবে ও শাস্তি দেয়া হবে। এ আইন বাঁদীদের সতীত্ব ও স্বাধীন নারীদের অনুরূপ সংরক্ষিত করে দিয়েছে। আলোচ্য ৫৯ আয়াতের পরে ৬০ ও ৬১ আয়াতে বলা হয়েছে।

لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْمُرْجِفُوْنَ فِى الْمَدِيْنَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُوْنَكَ فِيْهَآ اِلَّا قَلِيْلًا ○ مَّلْعُوْنِيْنَ اَيْنَمَا ثُقِفُوْٓا اُخِذُوْا وَقُتِّلُوْا تَقْتِيْلًا ○

অর্থাৎ মুনাফিকরা এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে এবং মদীনায় গুযব রটনাকারীরা যদি এ থেকে বিরত না হয় তবে আমি অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে আপনাকে প্রবল করে দেব। তারপর এ শহরে আপনার প্রতিবেশী অল্পই থাকবে। তাদের উপর চারদিক থেকে লানত বর্ষিত হবে। অভিশপ্ত অবস্থায় তাদেরকে যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানে ধরা হবে এবং নির্দয়ভাবে হত্যা করা হবে।–মাআরেফুল কুরআন

আলোচনার শেষ পর্যায়ে সূরা আল আহযাবের ৬০ ও ৬১ আয়াতে মুনাফিক, মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত ও বিকৃত রুচীসম্পন্ন সেইসব লোকের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। যারা মুসলিম সমাজে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নানা ধরনের গুযব রটাতো। তাদের বিরুদ্ধে কঠোর হুমকি দিয়ে বলা হয়েছে যে, তারা যদি তাদের যাবতীয় অপতৎপরতা থেকে এবং মুসলিম নরনারী ও সমগ্র মুসলিম সমাজকে উৎপীড়ন ও উত্যক্ত করা থেকে বিরত না হয়, তাহলে ইহুদীদের মত তাদেরকেও মদীনা থেকে উচ্ছেদ করা হবে এবং তাদেরকে যেখানেই পাওয়া যাবে হত্যা করা হবে। কেননা ইতিপূর্বে রসূল স.-এর হাতে ইহুদী, সকল প্রকার অপরাধী ও দুষ্কৃতকারীদের সমাজ থেকে উৎখাত করা আল্লাহর স্থায়ী রীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে।–ফী যিলালিল কুরআন

❐

চৌত্রিশ

وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا○

"যারা বিনা অপরাধে মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীকে কষ্ট দেয়, তারা মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহন করে।"

–সূরা আল আহযাব ঃ ৫৮

মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীকে কষ্ট দেয়ার পরিণতি

আলোচ্য আয়াতে কোনো মুমিন পুরুষ অথবা মুমিন নারীকে শরীয়তসম্মত কারণ ছাড়া তোহমত বা মিথ্যা অপবাদ দেয়ার চরম পরিণতি সম্পর্কে সাবধান করা হয়েছে। মদীনায় এক শ্রেণীর লোকেরা মুসলিম নর-নারীর বিরুদ্ধে এ ধরনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকতো। মুসলিম নারী-পুরুষ সম্পর্কে তারা এমন মিথ্যা অপবাদ আরোপ করতো যা প্রকৃতপক্ষে মুসলিম নর-নারীগণ করতেন না। ওরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে নানা কুৎসা ও অপবাদ রটাতো এবং নানা রকম ফন্দি আঁটতো। এমনি ঘটনা আজকাল সর্বত্রই ঘটতে দেখা যায়। বিকৃত ও গর্হিত রুচীর মুনাফিক ও দুষ্কৃতকারীদের এমন ধরনের দুরভিসন্ধির কবলে পড়ে মুসলিম নারী-পুরুষ সর্বত্রই হেস্তনেস্ত হয়ে থাকে। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ওদের যাবতীয় ষড়যন্ত্র ও দুরভিসন্ধির জবাব দেন এবং ওদের অপবাদ খণ্ডন করেন।–ফী যিলালিল কুরআন

মুনাফিকদের ইসলাম বিরোধী ষড়যন্ত্রের এ হচ্ছে এক জঘন্যতম আচরণ। মদীনার ঐসব মুনাফিকদের অন্তরে সার্বক্ষণিক জ্বালা এই ছিল যে, মুসলিম নারী-পুরুষের নৈতিক মান অন্য সকল জাতির তুলনায় ছিল মহান ও সুউচ্চে। আর এতে করে ইসলামের দাওয়াতের প্রভাব ছিল প্রচুর এবং এর ফলাফল প্রমাণিত হচ্ছিলো ব্যাপকতরভাবে। ওরা হিংসার বশবর্তী হয়ে মুসলিম নারী-পুরুষের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটাতে আরম্ভ করলো। এভাবে মুসলিম জাহানের নৈতিক ও চারিত্রিক ভিত ভেংগে দিতে পারলেই ওদের কলিজা ঠাণ্ডা হতো। হযরত আয়েশা রা.-এর বিরুদ্ধে প্রচারিত ইফ্কের ঘটনাটিও এ উদ্দেশ্যেই সাজানো হয়েছিল। এখানে ওদের এহেন মিথ্যা

ষড়যন্ত্রকারীদের কঠোর শাস্তি ও করুণ পরিণতির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। ওদের সাবধান করে দেয়া হয়েছে যে, এখনো যদি ওরা এহেন অপকর্ম থেকে বিরত না হয়, তাহলে এর পরিণতি তারা স্বচক্ষে দেখতে পাবে।

–তাদাব্বুরে কুরআন

'বুহ্তান' (মিথ্যা অপবাদ) কাকে বলে তা এ আয়াত থেকে জানা যায়। কারো মধ্যে যে দোষ প্রকৃতই নেই বা যে লোক যে অপরাধ আদৌ করেনি, তা সেই ব্যক্তি করেছে বলে প্রচার করাই হলো 'বুহ্তান'। নবী করীম স.ও বুহ্তান (بهتان)-এর এ অর্থই বুঝিয়েছেন। আবু দাউদ ও তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম স.-এর নিকট জিজ্ঞেস করা হলো (غيبت) 'গীবত' কাকে বলে ? তিনি বললেন, ذِكْرُكَ اَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ - তোমার ভাইয়ের কথা এমনভাবে বলা, যা তার পক্ষে অসহ্য-অপসন্দনীয়। বলা হলো, "আমার ভাইয়ের মধ্যে যদি সে দোষত্রুটি বর্তমান থাকে তবুও ?" নবী করীম স. বললেন ঃ

اِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ وَاِنْ لَّمْ يَكُنْ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدْ بَهَتَّهُ -

"তার মধ্যে সে দোষ বর্তমান থাকলে তো তুমি তার গীবত করলে, আর যদি তার মধ্যে ঐ স্বভাব না থাকে তবে, তুমি বুহ্তান অর্থাৎ মিথ্যা দোষারোপ করলে।"

বস্তুত এটি একটি নৈতিক দোষই নয়—কেবল পরকালেই যে এর শাস্তি হবে, তাই নয়। এ আয়াতের আলোকে ইসলামী রাষ্ট্রের আইনে মিথ্যা দোষারোপ একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধরূপে অবশ্যই গণ্য হবে।

–তাফহীমুল কুরআন

আলোচ্য আয়াত দ্বারা কোনো মুসলমানকে শরীয়তসম্মত কারণ ছাড়া কষ্টদানের সম্পর্কে অবৈধতা প্রমাণিত হয়েছে। রসূলুল্লাহ স. বলেন, "সে লোকই প্রকৃত মুসলিম যার হাত ও যবান থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদে থাকে আর কেউ কষ্ট না পায়। আর মুমিন সে ব্যক্তি যার কাছ থেকে মানুষ জীবন ও ধন-সম্পদের ব্যাপারে নিরুদ্বেগ থাকে।"

–মাআরেফুল কুরআন, তাফসীরে মাযহারী থেকে।

মুনাফিকদের পক্ষ থেকে সকল মুসলমান ও রসূলুল্লাহ স. দুই প্রকারে কষ্ট পেতেন। তাদের দ্বিবিধ নির্যাতনের একটি ছিল এই যে, মুসলমানদের দাসীরা কাজকর্মের জন্য বাইরে গেলে দুষ্ট প্রকৃতির মুনাফিকরা তাদেরকে উত্যক্ত করতো এবং কখনো কখনো দাসী সন্দেহে স্বাধীন নারীদেরকেও উত্যক্ত করতো। ফলে সাধারণ মুসলমানগণ এবং রসূলুল্লাহ স. কষ্ট পেতেন।

তাদের দ্বিতীয় নির্যাতন ছিল, তারা সর্বদা মিথ্যা খবর রটনা করতো। যেমন তারা বলে বেড়াতো এক্ষণে অমুক শত্রুপক্ষ মদীনা আক্রমণ করবে এবং সকলকে নিশ্চিহ্ন করে ছাড়বে। প্রথম প্রকারের নির্যাতন থেকে স্বাধীন নারীদেরকে বাঁচানোর তাৎক্ষণিক ও সহজ ব্যবস্থা ছিল স্বাধীন নারীদের মধ্যে বিশেষ স্বাতন্ত্র ফুটিয়ে তোলা। কারণ মুনাফিকরা স্বাধীন নারীদের পারিবারিক প্রভাব প্রতিপত্তি ও শক্তি-সামর্থের কারণে তাদেরকে সচরাচর উত্যক্ত করার সাহস পেত না। পরিচয়ের অভাবেই এরূপ ঘটনা সংঘটিত হতো। তাই স্বাধীন নারীদের পরিচয় ফুটিয়ে তোলার প্রয়োজন ছিল, যাতে তারা অতি সহজে দুষ্টদের কবল থেকে নিরাপদ হয়ে যায়।

অপরদিকে শরীয়ত স্বাধীন নারী ও দাসীদের মধ্যে প্রয়োজন বশত একটি পার্থক্যও রেখেছে। স্বাধীন নারীরা তাদের মুহরিম ব্যক্তির সামনে যতটুকু পর্দা করে, দাসীদের জন্য ঘরের বাইরেও ততটুকু পর্দা রাখা হয়েছে। কারণ, প্রভুর কাজকর্ম করাই দাসীর কর্তব্য, এজন্যে তাকে প্রয়োজনে বার বার বাইরেও যেতে হয়। এমতাবস্থায় মুখাবয়ব ও হাত আবৃত রাখা কঠিন ব্যাপার। স্বাধীন নারীরা বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন হলেও তা বার বার হয় না। কাজেই পূর্ণ পর্দা পালন করা, তাদের জন্য কঠিন নয়। তাই স্বাধীন নারীদের জন্য নির্দেশ রয়েছে তারা যেন লম্বা চাদর মাথার উপর থেকে মুখাবয়বের সামনে ঝুলিয়ে নেয়। যাতে পর-পুরুষের দৃষ্টিতে মুখাবয়ব না পড়ে। বলা হয়েছে يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ-তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়।–মাআরেফুল কুরআন

মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীকে কষ্ট দেয়া ও নিপীড়ন করা সম্পর্কে সূরা বুরূজে নিপীড়নকারীদের জন্য অত্যন্ত মারাত্মক শাস্তির ঘোষণা দেয়া হয়েছে। আল কুরআনের সেই ঘোষণা হলো ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ ○

"যারা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীকে নিপীড়ন করেছে। অতপর তাওবা করেনি, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি, তাদের জন্য আরও রয়েছে ভস্মকারী শাস্তি।"–সূরা বুরূজ ঃ ১০

আয়াতটির তরজমা মাআরেফুল কুরআনে করা হয়েছে এভাবে—যারা মুমিন পুরুষ ও নারীকে নিপীড়ন করেছে। অতপর তাওবা করেনি, তাদের জন্য আছে জাহান্নামের শাস্তি, আর আছে দহন যন্ত্রণা।

পঁয়ত্রিশ

لِّيُعَذِّبَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكٰتِ وَيَتُوْبَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ط وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ○

"যাতে আল্লাহ শাস্তি দেন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীকে। আর আল্লাহ তাওবা কবুল করেন মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীগণের। আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।"–সূরা আল আহযাব ঃ ৭৩

আল্লাহর শাস্তি অথবা সন্তুষ্টি লাভ মানুষের পুরুষ বা নারী হওয়ার কারণে নয়

আলোচ্য আয়াতের পূর্বের আয়াতে 'আল্লাহর আমানত' মানবজাতি কিভাবে নিজের কাঁধে তুলে নিল, সে বিষয়ে বলা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "আমি এ আমানত আকাশজগত, যমীন ও পাহাড়ের সামনে পেশ করেছিলাম। তারা তা বহন করতে অস্বীকার করলো, তারা ভয় পেয়ে গেল ' কিন্তু মানুষ তা নিজের কাঁধে তুলে নিল। মানুষ যে বড় যালেম ও মূর্খ-জাহেল তাতে সন্দেহ নেই।"–সূরা আল আহযাব ঃ ৭২। অতপর আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন, "আমানতের এ বোঝা গ্রহণ করার অনিবার্য পরিণাম এই যে, আল্লাহ মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীদের শাস্তি দিবেন ; আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের (ক্ষমা) তাওবা কবুল করবেন। আল্লাহ তো বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

এখানে (امانت) 'আমানত' বলতে (خلافت) 'খিলাফত' বুঝানো হয়েছে। কুরআনের ঘোষণা মতে এই যমীনে মানুষকে এ খিলাফতের মর্যাদা দান করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা মানুষকে আল্লাহর আনুগত্য ও নাফরমানী করার যে আযাদী দান করেছেন এবং এ আযাদী ভোগ ও ব্যবহার করার জন্য আল্লাহর সৃষ্টির উপর হস্তক্ষেপ করার ও কর্তৃত্ব চালাবার যে এখতিয়ার দিয়েছেন, তার অনিবার্য ফল এই যে, মানুষ তার নিজের ইচ্ছাধীন কাজ কর্মের জন্য নিজেই দায়ী হবে। ভাল নীতি অনুসরণ করলে তার পুরস্কার লাভ করার এবং মন্দ নীতি অনুযায়ী কাজ করলে তার শাস্তি ভোগ করার

সে-ই হবে উপযুক্ত জিম্মাদার। এ এখতিয়ার যেহেতু মানুষ নিজে লাভ করেনি, বরং আল্লাহ তাআলাই তাকে এটা দান করেছেন এবং এগুলোর সঠিক ও ভুল ব্যবহারের জন্য মানুষ আল্লাহর কাছে দায়ী। এজন্য আল কুরআনের অন্যান্য স্থানে এ 'এখতিয়ার'কেই বলা হয়েছে 'খিলাফত'। আর এখানে একেই বলা হয়েছে 'আমানত'।

এ 'আমানত' কত বড় গুরুত্বপূর্ণ ও সাংঘাতিক, সে বিষয়ে ধারণা দেয়ার জন্য আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেছেন। আসমান ও যমীন বিপুল বিরাটত্ব সত্ত্বেও এবং পাহাড়-পর্বত আয়তনে বিরাট-বিশাল ও কঠিন হওয়া সত্ত্বেও এ 'আমানত' মাথায় তুলে নেয়ার সাহস ও শক্তি পায়নি। অথচ দুর্বল গঠন প্রকৃতির এ মানুষ নিজেদের সামান্য প্রাণের উপর সেই বোঝা নিজের কাঁধে তুলে নিলো।

যমীন ও আসমানের সামনে আমানতের এই বোঝা পেশ করা এবং ওদের তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করা ও সে জন্য ভয় পাওয়া বাস্তব আভিধানিক অর্থে যেমন হতে পারে, তেমনি হতে পারে ইংগিতের ভাষায় কথা বলা। আল্লাহ তাআলার সাথে তাঁর সৃষ্টিকুলের যে সম্পর্ক তা আমরা জানতে বুঝতে পারি না। যমীন, সূর্য, চন্দ্র ও পাহাড়-পর্বত আমাদের সামনে বোবা, বধির ও নিষ্প্রাণ। কিন্তু আল্লাহর কাছেও যে তারা এমন হবে, তা কোনো কথা নয়। আল্লাহ তাঁর সকল সৃষ্টির সাথে কথা বলতে পারেন এবং তারা তাঁর কথার জবাবও দিতে পারে। এর প্রকৃত অবস্থা ও তত্ত্ব যে কি, তা বুঝতে পারা আমাদের সাধ্যাতীত। কবির ভাষায় ঃ

خاك وباد واب اتش بنده اند ـ بامن وتو مرده باحق زنده اند

"মাটি-বাতাস, আগুন-পানি আল্লাহর বান্দা। তোমার আমার কাছে জড় হলেও স্রষ্টার কাছে জীব।"

কাজেই আল্লাহ তাদের সামনে এ কঠিন দায়িত্বের আমানত পেশ করছেন আর তারা তা দেখে ভয়ে কেঁপে উঠেছে এবং তাদের নিজেদের মালিক ও স্রষ্টার কাছে বলেছে ঃ আমরা তো মালিকের এখতিয়ারাধীন খাদেম হয়েই থাকতে চাই—এতেই আমাদের কল্যাণ নিহিত বলে মনে করি। নাফরমানী করার স্বাধীনতা ও এখতিয়ার লাভ করে তার হক আদায় করা এবং হক আদায় করতে না পারা অবস্থায় মালিকের শাস্তি ভোগ করা আমাদের সহ্যের অতীত ব্যাপার।—এমনটি বলা কিছুমাত্র অসম্ভব ব্যাপার নয়। ঠিক তেমনি এটাও সম্ভব যে, আমাদের বর্তমান অস্তিত্ব গড়ে উঠার পূর্বে আল্লাহ তাআলা সমগ্র মানবজাতিকে অন্য কোনো ধরনের অস্তিত্ব দান করে নিজের

সামনে হাজির করেছেন এবং সেখানে এ এখতিয়ার লাভ করার জন্য তিনি নিজেই হয়তো ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। এ ব্যাপারটিকে অসম্ভব মনে করার কোনো দলিল-প্রমাণ আমাদের কাছে নেই। এটাকে একটি অসম্ভব ব্যাপার মনে করা তো সেই ব্যক্তিরই কাজ হতে পারে, যে নিজের মন ও চিন্তাশক্তির যোগ্যতা সম্পর্কে ভুল অনুমান করে বসে আছে। [আরও বিস্তারিত বুঝার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন আলোচ্য আয়াতের ফুট নোট]

আলোচ্য আয়াতের শুরু করা হয়েছে এই বলে ঃ لِيُعَذِّبَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ এখানে ل অব্যয়টি বক্তব্যের কারণ ও উদ্দেশ্য বর্ণনা অর্থে ব্যবহৃত হয়নি ; বরং আরবী ব্যাকরণের পরিভাষায় এ ل কে لام عاقبة বলা হয়। আয়াতের অর্থ এই যে, পরিণামে আল্লাহ্ তাআলা মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীদেরকে এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীদেরকে শাস্তি দিবেন। আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে পুরস্কৃত করবেন। আরবী সাহিত্যেও এই لام عاقبة এর ব্যবহার আছে। যেমন, ولدوا للموت وبنوا للخراب –অর্থাৎ জন্মগ্রহণ করো পরিণামে মৃত্যুর জন্য এবং নির্মাণ করো পরিণামে বিধ্বস্ত হওয়ার জন্য। কথাটির ভাবার্থ হলো, প্রত্যেক জন্মগ্রহণ-কারীর পরিণাম মৃত্যু এবং প্রত্যেক নির্মাণের পরিণাম ধ্বংস।

–মাআরেফুল কুরআন

وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ-এর সাথে আলোচ্য বাক্যটি সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ মানুষ যে আমানতের বোঝা বহন করেছে, এর পরিণামে মানুষ দু দলে বিভক্ত হয়ে যাবে ঃ এক. কাফের ও মুনাফিক ইত্যাদি যারা অবাধ্য হয়ে আমানত নষ্ট করে দেবে তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে। দুই. মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী। যারা আনুগত্যের মাধ্যমে আমানতের হক আদায় করবে। তাদের সাথে অনুগ্রহ ও ক্ষমাসুন্দর ব্যবহার করা হবে।

পূর্বে ظلوم ও جهول শব্দদ্বয়ের এক তাফসীরে বলা হয়েছে যে, এটা সমস্ত মানবজাতির জন্য নয়, বরং বিশেষ ধরনের লোকদের জন্য বলা হয়েছে। যারা আল্লাহর আমানতকে নষ্ট করে দেবে। উপরোক্ত সর্বশেষ বাক্যেও এ তাফসীরের সমর্থন রয়েছে।"–মাআরেফুল কুরআন

এভাবে রাব্বুল আলামীনের দেয়া এখতিয়ার বা ইচ্ছাশক্তির ব্যবহার অনুযায়ী আদম সন্তান আল্লাহর সন্তুষ্টি অথবা বিরাগের ভাগী হবে। কে পুরুষ আর কে নারী, এখানে সে তারতম্য মোটেই বিবেচনাযোগ্য নয়। অনেক সময় পুরুষ নারীর তুলনায় অধিক পরিমাণ কাজ আনজামদানে সক্ষম হলেও আল্লাহর কাছে তো অবশ্যই Quantity-র চেয়ে Quality-র গুরুত্ব অধিক।

আর এখানে خلافت বা আল্লাহর প্রতিনিধিত্বই মানবজাতির পক্ষ থেকে কাম্য ও আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে অধিকতর বিবেচ্য। সুতরাং বাহ্যিকভাবে কাজের সংখ্যা বা পরিমাণই আল্লাহর উদ্দেশ্য বা বিবেচ্য নয় বরং কাজটির প্রতি গুরুত্ব প্রদান ও সহযোগিতার হাত বাড়ানো প্রত্যেক সচেতন ব্যক্তি মাত্রেরই অন্যতম উদ্দেশ্য হওয়া কর্তব্য। বস্তুত কারো আমল তাকে জান্নাতে নিতে পারবে না, পারবে শুধু তার কৃতকর্ম তাকে জান্নাত বা জাহান্নামের অধিকারী করতে। হোক সে পুরুষ অথবা হোক নারী। অবশ্য এ অধিকার কার্যকর করার বা না করার পূর্ণ এখতিয়ার আল্লাহ রাব্বুল আলামীনেরই রয়েছে। কারণ, সবকিছুর উপর নিরংকুশ আধিপত্য একমাত্র তারই।

আলোচ্য আয়াতের মূল ঘোষণা হলো শির্ক ও নিফাক মানুষকে আল্লাহর আযাবের যোগ্য করে, আর ঈমান যোগ্য করে আল্লাহর ক্ষমা ও রহমতের। মানুষটি নারী কি পুরুষ—তা মোটেই বিবেচ্য নয়।

❐

ছত্রিশ

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ط يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ ○ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّاِنَاثًا ج وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا ط اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ○

"আকাশজগত ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহরই। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন, যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন, অথবা তিনি তাদেরকে পুত্র-কন্যা উভয়ই দান করেন। আর যাকে তিনি চান বন্ধা করে রাখেন। তিনি সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান।"

—সূরা আশ শূরা ঃ ৪৯-৫০

আল্লাহ কাউকে দেন মেয়ে, কাউকে দেন ছেলে, আবার কাউকে দেন দুটোই, আর কাউকে রাখেন নিঃসন্তান

আলোচ্য আয়াত দুটোতে ঘোষণা করে দেয়া হয়েছে যে, আকাশসমূহ ও পৃথিবীর কর্তৃত্ব ও আধিপত্য একমাত্র আল্লাহর। সর্বময় ক্ষমতা ও প্রজ্ঞার মালিক আল্লাহ যা ইচ্ছা তা-ই সৃষ্টি করেন। কাজেই মানুষের কর্তব্য একমাত্র তারই আনুগত্য ও দাসত্ব কবুল করে নেয়া। এখানে يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ বলে আল্লাহর কুদরতের একটি বিধি বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ তিনিই প্রত্যেক ছোটবড় বস্তু সৃষ্টি করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন এবং যখন ইচ্ছা যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। সৃষ্টি প্রসংগ তুলে বলা হয়েছে মানব সৃষ্টিতে কারও ইচ্ছা, ক্ষমতা এমনকি জ্ঞানেরও কোনো দখল নেই। পিতা-মাতা মানব সৃষ্টির বাহ্যিক মাধ্যম হয়ে থাকে মাত্র। সন্তান প্রজননে তাদের ইচ্ছা ও ক্ষমতার কোনো দখল নেই। দখল থাকা তো দূরের কথা, সন্তান জন্মগ্রহণের পূর্বে মাতাও জানে না যে তার গর্ভে কি আছে এবং কিভাবে গঠিত হচ্ছে। আল্লাহ তাআলাই কাউকে কন্যা সন্তান, কাউকে পুত্র সন্তান, কাউকে পুত্র-কন্যা উভয়ই দান করেন, আর কাউকে রাখেন সম্পূর্ণ বন্ধা করে—তার কোনো সন্তানই হয় না।

এখানে সন্তানের প্রকার বর্ণনা প্রসংগে আল্লাহ তাআলা প্রথমে উল্লেখ করেছেন কন্যা সন্তানের কথা তারপর বলেছেন পুত্র সন্তানের কথা। এ

ইংগিত দৃষ্টে হযরত ওয়াছেলা ইবনে আসকা বলেন, যে নারীর গর্ভ থেকে প্রথমে কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে সে পুণ্যময়ী।-মাআরেফুল কুরআন

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ "আকাশজগত ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহরই।" কথাটা সম্পর্কে আল্লামা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী তাঁর তাফহীমুল কুরআনে লিখেন, অর্থাৎ যেসব লোক কুফর ও শিরকের নির্বুদ্ধিতায় পড়েছে, তাদেরকে বুঝালেও যদি তারা না শুনে ও না মানে তাহলে কিছুই করার নেই। সত্য তো সত্যই থেকে যাবে। যমীনের ও আসমানের বাদশাহী দুনিয়ার তথাকথিত ও নামকা ওয়াস্তে রাজা-বাদশাহ ও ডিকটেটরদের হাতে ছেড়ে দেয়া হয়নি। তেমনিভাবে কোনো নবী, ওলী বা দেব-দেবীরও তাতে কোনো অংশ নেই। বরং এসবের মালিক একমাত্র আল্লাহ—অন্য কেউ নয়। তার বিরুদ্ধে কেউ দাঁড়ালে সে না নিজ শক্তিতে জয়ী হতে পারে, না তারা যে সব সত্তাকে নিজেদের নিবুর্দ্ধিতার কারণে আল্লাহর ইখতিয়ারের অধিকারী বলে মনে করে নিয়েছে তাদের কেউ এসে তাকে বাঁচাতে পারে।

অতপর يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ 'তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন' থেকে এ আয়াতে যা বলা হয়েছে তা আল্লাহ তাআলার নিরংকুশ (Absolute) বাদশাহ হওয়ার অকাট্য প্রমাণ। মানুষ যত বড় বৈষয়িক শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে বলে মনে করুক না কেন, নিজের ঘরে নিজের ইচ্ছামত সন্তান জন্মবার ক্ষমতার অধিকারীও সে নয়—অন্য কাউকে ইচ্ছামত সন্তান দেয়া তো দূরের কথা। আল্লাহ যাকে বন্ধা বানিয়ে রেখেছেন, সে কোনো ঔষধ, কোনো চিকিৎসা, কোনো তাবীজ-তুমার দিয়ে নিজের ঔরসে সন্তান জন্মাতে পারে না। তেমন শক্তি তার কখনো হতে পারে না। যাকে আল্লাহ কেবল কন্যা সন্তানই দিয়েছেন সে কোনো তদবীরেই একটি পুত্র সন্তানও জন্মাতে পারে না। পক্ষান্তরে যাকে আল্লাহ কেবল পুত্র সন্তান দিয়েছেন, সে কোনো উপায়েই একটা কন্যা সন্তান লাভ করতে পারে না। এ ব্যাপারে প্রতিটি মানুষ চূড়ান্তভাবে অক্ষম। এমন অবস্থা দেখার পরও যদি কেউ আল্লাহর কর্তৃত্বে নিজেকে নিরংকুশ ক্ষমতার অধিকারী বলে মনে করে কিংবা অন্য কোনো সত্ত্বাকে এরূপ ক্ষমতার মালিক বলে বিশ্বাস করে ; তবে তা হবে তার নিজেরই দায়িত্বহীনতা বা অদূরদর্শিতার ফল। এর পরিণতিও সেই ভোগ করতে বাধ্য হবে। নিজেকে নিজে যত বড় কিছুই ভাবুক না কেন, প্রকৃত ব্যাপারে তার দরুন বিন্দুমাত্র পরিবর্তন সূচিত হবে না।-তাফহীমুল কুরআন

আকাশজগত ও পৃথিবীর বাদশাহী আল্লাহরই হাতে। কাজেই ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি তো আল্লাহ রাব্বুল আলামীনেরই দান। এসব আল্লাহ তাআলার মেহেরবানীর প্রতীক, যাকে ইচ্ছা তিনি দেন এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা তিনি তুলে নেন। সবই তাঁর মেহেরবানী। এসব মানুষের অন্তরের কাছাকাছি সত্তা, আর মানুষ বড়ই অনুভূতিশীল জীব। তাই ইতিপূর্বে রিয্ক বা আবশ্যকীয় জীবনোপকরণ সম্পর্কে অনেক কথা আল কুরআনে এসে গেছে। এখানে রিয্ক সম্পর্কিত কথা সন্তান-সন্ততির উল্লেখ দিয়ে পূর্ণতা বিধান করা হয়েছে। কারণ অন্যান্য ধন-দৌলতের মত সন্তান-সন্ততিও আল্লাহর কাছ থেকেই আসে। আসমান ও যমীনের বাদশাহী আল্লাহ তাআলার মালিকানাধীন এবং সবকিছুর উপর রয়েছে আল্লাহ তাআলার নিরংকুশ বাদশাহী ও কর্তৃত্ব। এমনিভাবে বলা হয়েছে তিনি যা চান তাই সৃষ্টি করেন। তিনি এমন জিনিস সৃষ্টি করেন যাতে মানুষ খুশী হয় আবার এমন জিনিসও পয়দা করেন যাতে মানুষ দুঃখিত হয়। তিনি মানুষকে কখনো তাঁর পসন্দনীয় জিনিস দান করেন আবার কখনো তার থেকে তার প্রিয় জিনিস বা প্রিয়জনকে কেড়ে নেন। যাকে ইচ্ছা তিনি কন্যা সন্তান দান করেন, আবার যাকে ইচ্ছা তিনি দান করেন পুত্র সন্তান। আবার কখনো পুত্র কন্যা দুটোই দেন ; আবার চাইলে কাউকে কিছুই দেন না—রাখেন তাকে বন্ধা বানিয়ে। এসব কিছুই আল্লাহ তাআলারই একচ্ছত্র আধিপত্যের অধীন। এসব বিষয়ে এখতিয়ার খাটানোর অধিকার তিনি ছাড়া আর কারো নেই। তিনি নিজের ইচ্ছা ও জ্ঞান মোতাবেক এসব কিছু সৃষ্টি ও পরিচালনা করেন। নিশ্চয়ই তিনি সবকিছু জানেন সবার উপর ক্ষমতা রাখেন।–ফী যিলালিল কুরআন

আয়াতে কারিমায় উপরোক্ত বিষয়ে আল্লাহর, একমাত্র আল্লাহরই কর্তৃত্ব ও আধিপত্য বর্ণনা করতে গিয়ে বাক্যটি শুরু করা হয়েছে لِلّٰهِ শব্দ দিয়ে। বুঝানো হয়েছে পৃথিবীতে মানুষ এসবের হাকীকত না বুঝে শুধু বাহ্যিক অবস্থার উপর ধারণা নিয়ে বসে আছে। তারা বাহ্যত দেখছে দুনিয়ার রাজা-বাদশাহ ও ক্ষমতাধর ব্যক্তি ও শক্তি কত কিছুই না করতে পারে—করে যাচ্ছে। অথচ তাদের এ ধারণাটা ভিত্তিহীন। কারণ নিরংকুশ ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিপতি তো একমাত্র আল্লাহই। কিন্তু মানুষ এতই অজ্ঞ যে তারা এসব সৃষ্টি ও ধ্বংস অন্য মানুষের ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস করে নিজেকে অপমানিত করে আর সর্বশক্তিমান আল্লাহর সাথে মানুষকে শরীক করে বসে। মানুষের এক গ্রুপের দাবী হলো তারা নিসন্তানকে সন্তান দিতে পারে, রুগীকে সুস্থ করতে পারে তারা আরও কত কি করতে পারে। কিন্তু

এসবই যে ভেলকীবাজী সে বিষয়টি তারা তলিয়ে দেখতে পারছে না। ফলে অপর শ্রেণীর মানুষ ওদের ভেলকীবাজীর খপ্পরে পা দিয়ে শিরকে নিমজ্জিত হয়ে দুনিয়া-আখিরাত বরবাদ করে ফেলে।

এহেন ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস যেমন বর্তমান মুসলিম উম্মাহ—উম্মাতে মুহাম্মাদিয়ার কোনো কোনো অংশে বিরাজ করছে, ঠিক এমনি আকীদা-বিশ্বাস পূর্ববর্তী জাতিসমূহেও বিরাজিত ছিল। আল কুরআন

আমাদের সে ইতিহাসও জানিয়ে দিয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَهُمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ـ

"অনেক আলিম-দরবেশ মানুষের সম্পদ ভক্ষণ করে অন্যায়ভাবে বাতিলপন্থায় আর তারা ওদের আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখছে।"

এটা সম্ভব হয়েছে এ কারণে যে, ইহুদী-খৃস্টান পণ্ডিত ও দরবেশগণ সাধারণ জনগণকে নিজেদের গোলামে পরিণত করে রেখেছে, অথচ এদের দায়িত্ব ছিল লোকদের আল্লাহর গোলাম বানিয়ে দেয়ার কাজ করা। অজ্ঞ-মূর্খ জনগণ এসব ধর্মীয় নেতাদের অন্ধ অনুকরণ করে নিজেদের মর্যাদা ধূলিস্যাৎ করে দিয়ে সেই নেতাদের পেছনে চলে আল্লাহর পরিবর্তে তাদেরকেই 'রব'-এর আসনে সমাসীন করেছে। আল কুরআন সে বিষয়েও সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছে।

اِتَّخَذُوْا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ـ

"ওরা ওদের পণ্ডিত-দরবেশদের 'রব' বানিয়ে নিয়েছে আল্লাহ তাআলার পরিবর্তে।"

আয়াত দুটো মিলিয়ে পড়লে দেখা যায়, ইহুদী-খৃস্টান আলিম ও দরবেশগণ আল্লাহর কিতাব ও ধর্মীয় বিষয়ে ব্যাখ্যা-প্রচার করতো নিজেদের স্বার্থ সামনে রেখে ; আল্লাহর গুণ-সিফাত তাদেরও কিছু আয়ত্বাধীন আছে। সন্তান দেয়া, পুত্র সন্তান হওয়া, দুনিয়াতে প্রভাব-প্রতিপত্তি, অর্থ-সম্পদ, স্বাস্থ্য-সুস্থতা ইত্যাদি বিষয়ে যেন তাদেরও কিছু এখতিয়ার রয়েছে। জনসাধারণ এমনি ভ্রান্ত বিশ্বাস পোষণ করতো আর তারাও জনসাধারণের এহেন আকীদা-বিশ্বাসের তালীম দিতো। পূর্ববর্তী নবীগণের অনুসারী বলে কথিত জাতিসমূহের মত আজকের মুসলিম সমাজেও অনুরূপ ভ্রান্ত

আকীদা-বিশ্বাস সমাজের অভ্যন্তরে জেঁকে বসেছে। ফলে মানুষ আল্লাহর যমীনে আল্লাহর খলীফা হয়ে বাঁচার পথ ধরছে না, তারা নানা শিরকে নিমজ্জিত হয়ে তাওহীদী ধ্যান-ধারণা থেকে বহু দূরে সরে পড়ছে। পরিণামে সিটকে পড়ছে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির আসন থেকে।

আলোচ্য আয়াত দুটোতে কোনো দম্পতিকে সন্তান দান করা ও না করার ভিত্তিতে মানুষকে চার শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন ঃ এক. যাদের কেবল ছেলে সন্তান দেন, দ্বিতীয়. যাদের কেবল কন্যা সন্তান দেন, তৃতীয় যাদের ছেলেমেয়ে উভয় প্রকার সন্তানই দান করেন এবং চতুর্থ যাদের ছেলেমেয়ের কোনেটিই দেন না—বন্ধ্যা রাখেন।

ইতিহাসে মানব সন্তান সৃষ্টির পদ্ধতির ব্যাপারেও মানুষ চার শ্রেণীতে বিভক্ত ঃ এক. আল্লাহর কুদরতে প্রত্যক্ষ সৃষ্টি। যেমন হযরত আদম আ.-কে মাতাপিতা ছাড়া অর্থাৎ মহিলা-পুরুষ ছাড়া সৃষ্টি করা হয়েছে। দ্বিতীয়, মা হাওয়া আ.-কে আদম থেকে তথা কেবল পুরুষ থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তৃতীয়, হযরত ঈসা আ.-কে শুধু তাঁর মা মারইয়াম থেকে (পিতা ছাড়া) সৃষ্টি করা হয়েছে। চতুর্থ, বাকী সকল মানুষকে মা-বাপ থেকে পুরুষ-মহিলার মাধ্যমে সৃষ্টি করা হয়ে থাকে। মানব সৃষ্টির এসব পার্থক্যের মাঝে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কুদরতের রহস্য নিহিত রয়েছে—আল্লাহর কুদরতের রহস্যে হাত দেয়ার মত অথবা তাঁর এ নিয়মের পরিবর্তন করার নিরংকুশ ক্ষমতা পৃথিবীর কোনো শক্তির নেই।

❐

সাইত্রিশ

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا ط اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ○

"হে মানুষেরা! আমিই তোমাদের সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও একজন নারী হতে, আর তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহর কাছে অধিক মর্যাদাবান, যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন।"

–সূরা আল হুজুরাত ঃ ১৩

মানব সৃষ্টি একজন পুরুষ একজন নারী থেকে। মানব মর্যাদার মূল ভিত্তি 'তাকওয়া'। জাতি ও গোত্র বিভক্তি পরিচিতি মাত্র।

আলোচ্য আয়াতে সমগ্র মানব জাতিকে সম্বোধন করে মহান আল্লাহ তাদের মূল যে এক ও অভিন্ন সে বিষয়ে এক বাস্তব ও ঐতিহাসিক সত্য ঘোষণা করেছেন। এর উদ্দেশ্য জাতি-ধর্ম-বর্ণ-বংশ নির্বিশেষে সকল মানুষের মূল যে এক ও অভিন্ন, তাদের মর্যাদা নিরূপণের মানদণ্ড যে এক ও অভিন্ন এবং সেটাই যে এ মহান ইসলামী সমাজের ভিত্তি সে কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া। বলা হয়েছে হে মানবজাতি! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রী থেকে সৃষ্টি করেছি ; অতপর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে করে তোমরা পৃথিবীতে পরস্পর পরিচিত হতে পার। জেনে রেখ, তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে তাকওয়াবান ব্যক্তিই সবচেয়ে মর্যাদার অধিকারী। নিসন্দেহে আল্লাহ তাআলা সর্বজ্ঞ ও মহাজ্ঞানী।

এর তাৎপর্য হলো, বহু বর্ণে ও জাতিতে বিভক্ত হে মানব সমাজ! তোমাদের মূল এক ও অভিন্ন। সুতরাং তোমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না, দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ো না এবং ধ্বংস হয়ে যেয়ো না। হে মানবজাতি আল্লাহ তাআলা তোমাদের সবাইকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছেন। অতপর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করার উদ্দেশ্য এ নয় যে, তোমরা পরস্পর দ্বন্দ্ব-কলহে লিপ্ত হবে আর মারামরি

কাটাকাটি করে মরে যাবে। বরং এটা ছিল পরস্পর পরিচিতির জন্য। বর্ণ, ভাষা, স্বভাব, চরিত্র, প্রতিভা ও যোগ্যতার বিভিন্নতা একটা সৃষ্টিগত বৈচিত্র মাত্র। এ বিভিন্নতা বিবাদ-বিসম্বাদ ও শত্রুতা দাবী করে না, বরং দাবী করে মানব জাতির সকল দায়িত্ব বহনে ও সকল চাহিদা পূরণে পারস্পরিক সহযোগিতা। বর্ণ, বংশ, ভাষা, ভূমি এবং এ ধরনের অন্য সকল উপকরণের কোনো মূল্য আল্লাহর দৃষ্টিতে নেই। আল্লাহর দৃষ্টিতে মানুষের মর্যাদা পরিমাপ করার ও শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয় করার একটি মাত্র মানদণ্ড আছে। আর সেই মানদণ্ড হচ্ছে 'তাকওয়া'—আল্লাহ সম্পর্কে মানুষের সাবধানতা ও সচেতনতা সে বিষয়টির প্রতি বিশ্ববাসীর দৃষ্টি নিবদ্ধ করছেন এই বলে যে, اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ –"নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে মর্যাদায় সেই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ যে তোমাদের সবাইর চেয়ে অধিকতর তাকওয়াবান।" এভাবে পৃথিবীতে দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও বিবাদ-বিসম্বাদের সকল কারণ তিরোহিত হয়ে যায় এবং মানুষের মধ্যে সংঘাত-সংঘর্ষের প্ররোচক সকল কারণ দূরীভূত হয়ে যায় আর মৈত্রী ও সহযোগিতার একটি মাত্র কারণ স্পষ্ট হয়ে উঠে। আর তা হচ্ছে আল্লাহ সকলের একমাত্র উপাস্য এবং মানুষ সৃষ্টির মূল উৎস এক ও অভিন্ন। নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের যোগ্য হওয়ার একমাত্র মাপকাঠি হলো তাকওয়া—আল্লাহর সম্পর্কে সাবধানতা। এ মাপকাঠিকেই ইসলাম যথার্থ মাপকাঠিরূপে ঘোষণা করেছে মানবজাতিকে সকল প্রকার বর্ণ, বংশ, ভাষা ও গোত্র-ভিত্তিক সংকীর্ণতার বেড়াজাল থেকে মুক্ত করার জন্য। কেননা এ সবই তো জাহেলিয়াত থেকে উদ্ভূত—তার নাম পরিচয় যা-ই থাক না কেন। এগুলোর সাথে ইসলামের কোনোই সম্পর্ক নেই।–ফী যিলালিল কুরআন

আলোচ্য আয়াতটিতে সমগ্র মানব জাতিকে সম্বোধন করে এমন এক চরম ভ্রান্তি ও গোমরাহীমূলক বিষয়ে সংশোধন করতে চাওয়া হয়েছে যা গোটা বিশ্বে এক সর্বাত্মক মারাত্মক বিপর্যয় ও চরম অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাহলো বংশ, বর্ণ, ভাষা, দেশ ও জাতীয়তার বিদ্বেষ। প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রতিটি যুগে মানুষ সাধারণত মনুষ্যত্বকে ভুলে গিয়ে নিজেদের চতুষ্পার্শে এমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবেষ্টনী রচনা করে নিয়েছে যার ভিতরে জন্মগ্রহণকারীকে সে আপন বলে গ্রহণ করেছে আর তার বাইরে জন্মগ্রহণকারীকে ভিন্ন, অপর বা শত্রুরূপে চিহ্নিত করেছে। অথচ এ পরিবেষ্টনী কোনো বিবেক-বুদ্ধি বা নীতি-আদর্শ কিংবা নৈতিকতার ভিত্তিতে গড়ে উঠেনি। গড়ে উঠেছে জন্মের অ-ইচ্ছামূলক ভিত্তির উপর। কোথাও তার ভিত্তি হচ্ছে বিশেষ কোনো বংশ, পরিবার বা গোত্রে জন্মগ্রহণ করা, কোথাও কোনো ভৌগলিক সীমারেখার মধ্যে জন্মগ্রহণ করা, আবার

কোথাও কোনো বিশেষ বর্ণধারী বা ভাষাভাষী জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করা। এসবগুলোই হলো মানুষে মানুষে পার্থক্য করার কথিত আধুনিক ভিত্তি।

ইহুদীরা এরই ভিত্তিতে বনী ইসরাঈলকে আল্লাহর পসন্দ করা বিশেষ জাতিরূপে গণ্য করে ও সেজন্যে গৌরব করে। তাদের ধর্মীয় হুকুম-আহকামে পর্যন্ত অ-ইসরাঈলীদের অধিকার ও মান-মর্যাদা ইসরাঈলীদের তুলনায় হীনতর বানিয়ে রেখেছে। হিন্দু সমাজের বর্ণ বিচার এ পার্থক্যবোধের কারণেই গড়ে উঠেছে। তাতে ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। উঁচু জাতের লোকদের তুলনায় সমস্ত মানুষকে নীচ ও অপবিত্র বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আর শুদ্রদের চরম লাঞ্ছনা ও অপমানের গভীরে নিক্ষেপ করা হয়েছে। শ্বেতাংগ ও কৃষ্ণাংগের পার্থক্য আফ্রিকায় ও আমেরিকায় কৃষ্ণাংগ লোকদের উপর যে অমানুষিক যুলুম ও নিপীড়ন চালিয়েছে তার মর্মান্তিক কাহিনী তো ইতিহাসের পাতায় খুঁজতে হবে না—বর্তমান শতাব্দীর প্রত্যেক ব্যক্তিই তা স্বচক্ষে দেখতে পারে। পাশ্চাত্যের জাতি-সমূহের হিংস্র জাতীয়তাবাদ এক একটি জাতিকে অন্যান্য জাতিগুলোর জন্য হিংস্র পশুতে পরিণত করেছে। নিকট অতীতে ও অতিসম্প্রতি সংঘটিত যুদ্ধসমূহেই তার নিকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া গেছে।–তাফহীমুল কুরআন

এ অত্যন্ত মারাত্মক ও সর্বধ্বংসী অন্ধ ও হিংস্র জাতীয়তাবাদের যথার্থ সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা আজকের বিশ্ববাসী এ আয়াত থেকে গ্রহণ করতে পারে। আয়াতটি যেন আজকের পৃথিবীর মানবজাতির নাজাতের দিকনির্দেশনা দানের উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছে। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

আয়াতে কারীমার মূলভাষ্য নিম্নরূপ

আল্লাহ তাআলা সমগ্র মানব জাতিকে সম্বোধন করে যে মূল নির্দেশনা দিয়েছেন তাহলো, হে পৃথিবীর মানব জাতি! তোমাদের সকলের—সমস্ত মানুষের মূল ও উৎস এক ও অভিন্ন। একজন পুরুষ ও একজন মহিলা হতেই গোটা মানবজাতি অস্তিত্ব লাভ করেছে। বর্তমানে দুনিয়াতে মানুষের যত বংশ বা গোত্র রয়েছে তা সবই মূলত একটি প্রাথমিক বংশেরই শাখা-প্রশাখা মাত্র। আর এর সূচনা হয়েছিল এক পিতা ও এক মাতা থেকে। তোমরা এ পর্যায়ে যে ভাব ও ধারণা পোষণ করছো, তা সম্পূর্ণ বাতিল ও ভিত্তিহীন। মানব সৃষ্টির ধারায় কোথাও কোনো পার্থক্য বা উঁচু-নিচুর তারতম্য নেই—তা করার কোনো ভিত্তিও নেই। এক ও অনন্য আল্লাহ তাআলাই তোমাদের সকলের সৃষ্টিকর্তা। বিভিন্ন মানুষ বা মানব বংশকে

বিভিন্ন সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি করেছেন, এমনও কিছুতেই নয়। একই প্রাণী জীবাণু হতে তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। কিছু সংখ্যক মানুষ বা মানব বংশকে কোনো পবিত্র বা উন্নতমানের জীবাণু থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং অন্য কিছু লোক বা বংশকে কোনো অপবিত্র ও নিম্নমানের সৃষ্টি বীজ থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে—এমন ধারণা করা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। মানব সৃষ্টির নিয়ম-পদ্ধতিও সম্পূর্ণ অভিন্ন। সে অভিন্ন ও একই নিয়মে সৃষ্টি হয়েছে দুনিয়ার সমস্ত মানুষ। মানব সৃষ্টির নিয়ম-পদ্ধতিতেও একবিন্দু পার্থক্য নেই। সে জন্যে ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম-পদ্ধতি অবলম্বিত হয়নি। তোমরা সকলে একই পিতা-মাতার সন্তান। সকলের দেহে একই পিতা-মাতার শোণিতধারা প্রবাহিত। মানুষের প্রাথমিক যুগল ভিন্ন ভিন্ন ছিল না এবং দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন জনতা ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম-পদ্ধতিতে জন্মগ্রহণ করেনি।–তাফহীমুল কুরআন

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রথম মানুষ হযরত আদম আ. থেকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর স্ত্রী হাওয়া আ.-কে, আর এ দুজন থেকে সকল বনী আদমকে। মানব জাতির অস্তিত্ব লাভে, তাদের স্থিতি, বৃদ্ধি ও সংরক্ষণে নারী-পুরুষের মাধ্যম আল্লাহর গৃহীত সাধারণ নীতি। অবশ্য এতে নারীর ত্যাগ ও ভূমিকা সর্বাধিক।

ইসলামী জীবন পদ্ধতির নির্দেশিকা আল কুরআন বিশ্ব স্রষ্টা আল্লাহ তাআলার একমাত্র নির্ভুল বাণী সম্ভার। আল্লাহর মহাসৃষ্টি মানুষের সার্বিক কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যেই তিনি শেষ নবী মুহাম্মদ স.-এর মাধ্যমে প্রেরণ করেছেন এই আল কুরআন। আলোচ্য আয়াতে বিশ্ব মানুষের কৃত্রিম সাম্প্রদায়িকতা ও জাতীয়তাসহ সকল প্রকারের সংকীর্ণতার জাল ছিন্ন করে পৃথিবীর সকল মানুষের প্রকৃত সম্পর্ক এবং তাদের শ্রেষ্ঠত্বের বৈশিষ্ট্য আলোচিত হয়েছে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে। আজকের পৃথিবীতে একটা সভ্য সমাজ গড়ার তথা বিশ্ব-পরিবার গঠন বা বিশ্বায়ণের প্রবক্তা ও অনুরূপ চিন্তা-গবেষণার ধারকদের জন্যে এর চেয়ে উদার ও সার্বজনীন অমোঘ বিধানের নযীর আর কোথায়ও কি আছে ?

❐

আটত্রিশ

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ يَسْعٰى نُوْرُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ
بُشْرٰىكُمُ الْيَوْمَ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط ذٰلِكَ هُوَ
الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○ يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا انْظُرُوْنَا
نَقْتَبِسْ مِنْ نُّوْرِكُمْ ج قِيْلَ ارْجِعُوْا وَرَآءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا ط فَضُرِبَ
بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍ لَّهٗ بَابٌ ط بَاطِنُهٗ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهٗ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ○

"সেদিন তুমি দেখবে মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের সম্মুখে ও ডানদিকে তাদের নূর দৌড়াতে থাকবে। তাদের উদ্দেশ্যে বলা হবে, আজ তোমাদের জন্য সুসংবাদ জান্নাতের, যার তলদেশে ঝর্ণাসমূহ প্রবাহমান থাকবে, সেখানে তোমরা স্থায়ী হবে, এটাই হবে মহাসাফল্য। সেদিন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীরা মুমিনদের বলবে, আমাদের জন্য একটু থাম, আমরা তোমাদের নূর থেকে যেন একটু গ্রহণ করতে পারি। ওদের বলা হবে, পেছনে ফিরে গিয়ে নূর খোজ। তারপর উভয়ের মধ্যখানে স্থাপিত হবে একটা প্রাচীর যার একটা দরজা থাকবে, এর ভিতরে থাকবে রহমত আর বাইরে থাকবে আযাব।"-সূরা আল হাদীদ ঃ ১২-১৩

কিয়ামতের দিন মুনাফিক নারী-পুরুষরা ঈমানদার নারী-পুরুষের কাছে নূর ভিক্ষা চাইবে

কিয়ামতের কঠিন দিনে কেবল মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীগণই এমন অবস্থায় থাকবে যে, তাদের সম্মুখে ও ডানদিকে নূর চমকিতে থাকবে। কাফির-মুনাফিক, ফাসেক-ফাজির প্রভৃতি অন্ধকারে হাতড়িয়ে মরবে। যেভাবে এরা দুনিয়ার জীবনে দীন ইসলামের আলোতে জীবনযাপন না করে যথেচ্ছভাবে জীবন কাটিয়েছে। এদের দুনিয়ার জীবনটা নিজেরাই ইসলাম থেকে দূরে থেকে বিভ্রান্তিতে শেষ করে দিয়েছে। ঐ দিনের মুমিনগণের সেই নূর তো হবে তাদের ইসলামের সঠিক আকীদা-বিশ্বাস ও যথার্থ নেক আমলসমূহের ফল স্বরূপ। ঈমানের সত্যতা-যথার্থতা ও চরিত্র-নৈতিকতার স্বচ্ছতাই সেদিন নূর-এ পরিবর্তিত হয়ে যাবে। তাতে নেক বান্দাদের ব্যক্তিত্ব

উজ্জ্বল-উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। যে ব্যক্তির আকীদা ও আমল যতটা আলোকময় ও স্বচ্ছ হবে, তার অস্তিত্বের নূর ততবেশী আলোময় ও তেজস্বীরূপ ধারণ করবে। সে যখন হাশরের ময়দান থেকে বের হয়ে জান্নাতের দিকে যেতে থাকবে তখন তার নূর তার সামনে ও ডানে দৌড়াতে থাকবে। হযরত কাতাদাহ বর্ণিত একটি মুরসাল হাদীস একথাটার সর্বোত্তম ব্যাখ্যা পেশ করে। তিনি বলেন, রসূলে করীম স. ইরশাদ করেছেন, কারো নূর এতটা তেজস্বী হবে যে, মদীনা হতে 'এডেন' পর্যন্তকার দূরত্ব সমান স্থানে পৌঁছে যাবে। আর কারো নূর 'মদীনা' হতে 'সানা' পর্যন্ত এবং কারো তার চেয়ে আরও কম। এমনকি এমন মুমিনও হবে যার নূর তার পায়ের বেশী দূরত্বে পৌঁছবে না। মোটকথা, যার দ্বারা সার্বিক কল্যাণ দুনিয়াতে যতটুকু বিস্তৃতি লাভ করে তার নূর ততটা তেজস্বী ও চমকানো হবে। আর দুনিয়ার যে যে স্থান পর্যন্ত তার কল্যাণ পৌঁছে থাকবে হাশরের মাঠে ততটা দূরত্ব পর্যন্ত তার নূরের আলোকচ্ছটা দৌড়াতে থাকবে।–তাফহীমুল কুরআন

আল কুরআন ঈমানদার নারী-পুরুষের সামনে ও ডানে তার নূর চমকাতে থাকবে বলে ঘোষণা দিয়েছে। তাহলে বামদিক কি অন্ধকারে থেকে যাবে ? ব্যাপারটি এমন না। বরং ডানদিক আলোকোদ্ভাসিত হয়ে উঠলে বামদিকও উজ্জ্বল হয়ে যাবে। অর্থাৎ আলো তার ডান হাতেই ঝুলতে থাকবে। আর এর উজ্জ্বলতা চতুর্দিক উদ্ভাসিত করবে। নবী করীম স.-এর এক হাদীস থেকে এর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। হযরত আবু যর ও হযরত আবু দারদা রা. বর্ণনা করেছেন রসূলে করীম স. বলেছেন ঃ

اَعْرِفُهُمْ بِنُوْرِهِمُ الَّذِىْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ

"আমি তাদের চিনতে পারবো তাদের সেই নূরের দ্বারা, যা তাদের সামনে ডানে ও বামে দৌড়াতে থাকবে।"–হাকেম, ইবনে আবু হাতিম, ইবনে মারদুইয়া থেকে তাফহীমুল কুরআন।

এ নূর দেয়ার ব্যাপারটি পুলসিরাত চলার কিছু পূর্বে সংঘটিত হবে। হযরত আবু উমামা বাহেলী রা. থেকে বর্ণিত এক হাদীসে এর বিবরণ রয়েছে। হাদীসটি কিছু দীর্ঘ। এতে আছে আবু উমামা রা. একদিন দামেশকে এক জানাযায় শরীক হন। জানাযা শেষে উপস্থিত লোকদেরকে মৃত্যু ও পরকাল স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য তিনি মৃত্যু কবর ও হাশরের কিছু অবস্থা বর্ণনা করেন। নিম্নে তার কয়েকটি বাক্যের অনুবাদ দেয়া হলো ঃ

"অতপর তোমরা কবর থেকে হাশরের মাঠে স্থানান্তরিত হবে। হাশরের বিভিন্ন মনযিল ও স্থান অতিক্রম করতে হবে। এক মনযিল আল্লাহ তাআলার

হুকুমে কিছু মুখাবয়বকে সাদা ও উজ্জ্বল করে দেয়া হবে। আর কিছু চেহারাকে করে দেয়া হবে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ। আরেক মনযিলে সমবেত সকল মুমিন ও কাফিরকে গভীর অন্ধকার আচ্ছন্ন করে ফেলবে। কিছু দৃষ্টিগোচর হবে না। এরপর নূর বণ্টন করা হবে। প্রত্যেক মুমিনকে নূর দেয়া হবে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত আছে, প্রত্যেক মুমিনকে তার আমল পরিমাণে নূর দেয়া হবে। ফলে কারো নূর পর্বত পরিমাণ, কারো খেজুর বৃক্ষ পরিমাণ, আর কারো হবে মানবদেহ পরিমাণ। সর্বাপেক্ষা কম নূর সেই ব্যক্তির হবে যার কেবল বৃদ্ধাঙ্গুলিতে নূর থাকবে। তাও আবার কখনও জ্বলে উঠবে এবং কখনও নিভে যাবে।–ইবনে কাসীর থেকে মাআরেফুল কুরআন।

পুলসিরাতের ঘটনাটি ঘটবে এভাবে যে, কাফিররা তো পুলসিরাতে যাবে না বরং প্রথমেই জাহান্নামের দরজা দিয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। হাঁ যারা কোনো নবীর উম্মতভুক্ত হবে তাদের পুলসিরাতের উপর দিয়ে পার হতে হবে। পুলসিরাতের উঠার আগে এক গাঢ় অন্ধকার লোকদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে। সেই সময় ঈমানদারদের সাথে উক্ত নূর থাকবে। মুনাফিকরাও সেই নূরের আলোতে ঈমানদারগণের পেছনে পেছনে চলতে চাইবে। কিন্তু মুমিনগণ দ্রুত সামনে এগিয়ে যাবে। ফলে তাদের আলো মুনাফিকদের থেকে দূরে সরে যাবে। তখন মুনাফিকরা চিৎকার দিয়ে বলবে, আরে একটু থাম না, আমাদেরকে পেছনে অন্ধকারে ফেলে চলে যেয়ো না। সামান্য অপেক্ষা কর যেন আমরাও তোমাদের আলোতে চলতে পারি। আর তোমাদের নূর থেকে উপকৃত হতে পারি। দুনিয়াতে তো আমরা তোমাদেরই সাথী ছিলাম, আর আমাদেরও প্রকাশ্যে মুসলিমদের মধ্যেই গণ্য করা হতো। আজ এ কঠিন মুসিবতের সময় আমাদের অন্ধকারে ফেলে কোথায় যাচ্ছ—এটাই কি বন্ধুত্বের হক ? উত্তর আসবে, পেছনে গিয়ে নূর অনুসন্ধান করো। নূর পেলে তো ওখান থেকেই পেতে পারবে। একথা শুনে তারা পেছনে হটবে। ইত্যবসরে উভয়ের মধ্যখানে দেওয়াল স্থাপিত হয়ে আড়াল হয়ে যাবে। "পেছনে গিয়ে নূর অনুসন্ধান কর"—ارْجِعُوْا وَرَائَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا বলার অর্থ এ নূর তো ঈমান ও নেক আমলের মাধ্যমে দুনিয়াতে অর্জন করা যায়। আখিরাত তো ঈমান-আমলের ফল ভোগ করার স্থান। সুতরাং নূর অর্জনের স্থানে তো পেছনে অর্থাৎ দুনিয়াতে চলে যাও আর ঈমান-আমলের পুঁজি নিয়ে আস। অথবা পেছনে যাওয়ার অর্থ পুলসিরাতে উঠার পূর্বে যেখানে নূর বণ্টন করা হয়েছে সেখানে চলে যাও। অথবা একথাটা ঈমানদারগণ ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে বলবে যে পেছন

থেকে নূর নিয়ে এসো।–আল কুরআনুল করীম–মাওলানা মাহমুদুল হাসান ও মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী।

হাশরের ময়দানে পুলসিরাত পার হওয়ার প্রাক্কালে অত্যন্ত অন্ধকার হবে। তখন প্রত্যেকের ঈমান ও আমালে সালেহ তার সাথে থাকবে এবং এর আলোকে তারা চলতে থাকবে। সম্ভবত ঈমানের নূরের স্থান তো হলো 'কল্‌ব'—যা হবে সম্মুখ ভাগে আর আমালে সালেহ-এর নূর থাকবে ডান দিকে। কারণ নেক আমলসমূহ ডান দিকেই জমা হয়ে থাকে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ ঈমান-আমলের মর্যাদা অনুযায়ী তার নূর কমবেশী হতে থাকবে। উম্মাতে মুহাম্মদী স.-এর নূর তাঁর খাতিরে অন্যান্য উম্মাতের তুলনায় খুব উজ্জ্বল ও তেজস্বী হয়ে থাকবে।

মুমিন ও মুনাফিকদের মধ্যখানে দেওয়াল দিয়ে আড়াল করে দেয়া হবে। সেই দেওয়ালের একটা দরজা হবে। সেই দরজা দিয়ে মুমিন জান্নাতে প্রবেশ করে মুনাফিক থেকে আড়ালে চলে যাবে। সেই দরজার ভেতরে গিয়ে মুমিনগণ জান্নাতের শান্তি পাবে আর তার বাইরের দিকে থাকে আল্লাহর আযাবের দৃশ্য।–আল কুরআনুল করীম-মাওলানা মাহমুদুল হাসান, মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী।

❐

উনচল্লিশ

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِىْ تُجَادِلُكَ فِىْ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِىْٓ اِلَى اللّٰهِ ق وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ط اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ○

"আল্লাহ অবশ্যই শুনতে পেয়েছেন সেই নারীর কথা, যে তার স্বামীর ব্যাপারে তোমার সাথে বাদানুবাদ করছে আর সে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করছে। আল্লাহ তোমাদের উভয়ের কথোপকথন শুনেন, আল্লাহ সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা।"–সূরা মুজাদালা ঃ ১

যে নারীর অভিযোগ সপ্ত আকাশ পর্যন্ত পৌঁছেছে ও গৃহীত হয়েছে

যে মহিলার ব্যাপার সম্পর্কে এ আয়াত ও তৎপরবর্তী কটি আয়াত নাযিল হয়েছিল তিনি ছিলেন খাজরাজ গোত্রের খাওলাহ বিনতে সা'লাবা। তাঁর স্বামীর নাম ছিল আওস ইবনে সামেত আনসারী। মহিলার স্বামী 'জিহার' করেছিলেন। 'জিহার' শব্দ 'জাহরুন' শব্দ থেকে নির্গত। অর্থ পিঠ। তৎকালীন আরব সমাজে প্রায় এমন ঘটতো যে স্বামী-স্ত্রী ঝগড়া-বিবাদ হলে স্বামী রাগান্বিত হয়ে স্ত্রীকে বলতো, اَنْتَ عَلَىَّ كَظَهْرِ اُمِّىْ-তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পিঠের তুল্য। একথার তাৎপর্য হলো, তোমার সাথে সহবাস করা আমার জন্য নিজের মায়ের সাথে সহবাস করার সমান। অর্থাৎ তুমি আমার জন্য হারাম।

জাহেলিয়াতের যুগে আরব দেশে এ ধরনের বাক্য তালাক—বরং তালাক থেকেও অধিক কঠিনভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা ঘোষণা করা হতো। কেননা তাদের কাছে এর অর্থ ছিল স্বামী নিজের স্ত্রীর সাথে শুধু বিবাহ সম্পর্কই ছিন্ন করছে না, বরং তাকে মায়ের মত নিজের জন্য হারামও বানিয়ে নিচ্ছে। এ কারণে আরব সমাজে তৎকালে তালাক দেয়ার পরেও স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করার একটা উপায় থাকতো। কিন্তু জিহার করার পর স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণের আর কোনো উপায়ই থাকতো না।–তাফহীমুল কুরআন

হযরত আওস ইবনে সামেত একবার তাঁর স্ত্রী খাওলাকে বলে দিলেন, اَنْت عَلَىَّ كَظَهْرِ اُمِّىْ -তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পিঠের মত, অর্থাৎ হারাম। এভাবে খাওলার স্বামী জিহার করার পর হযরত খাওলা রা. এর শরীয়ত সম্মত বিধান জানার জন্য রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে উপস্থিত হলেন।

তখন পর্যন্ত এ বিষয়ে রসূলুল্লাহ স.-এর প্রতি কোনো বিধান নাযিল হয়নি। তাই তিনি প্রচলিত রীতি অনুযায়ী খাওলাকে বলে দিলেন مَا اَرَاكِ لا قد حرمت عليه। "আমার মতে তুমি তোমার স্বামীর জন্য হারাম হয়ে গেছো।" একথা শুনামাত্র খাওলা রা. বিলাপ শুরু করে দিলেন এবং বললেন, আমি আমার যৌবন তার কাছে নিঃশেষ করেছি। এখন বার্ধক্যে সে আমার সাথে এ ব্যবহার করলো ! আমি কোথায় যাব। আমার ও আমার বাচ্চাদের ভরণ-পোষণ হবে কিভাবে ? এক রেওয়ায়াতে খাওলার এ উক্তিও বর্ণিত আছে, مَا ذَكَرَ طَلَاقًا-আমার স্বামী তো তালাক উচ্চারণ করেননি, এমতাবস্থায় তালাক হয়ে গেল কিভাবে ? অন্য এক বর্ণনায় আছে, খাওলা আল্লাহ তাআলার কাছে ফরিয়াদ করে বললেন, اللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَشْكُوا اِلَيْكَ আয় আল্লাহ! আমি তোমার কাছে ফরিয়াদ করছি। এক রেওয়ায়াতে আছে, রসূলুল্লাহ স. খাওলাকে বললেন, مَا اُمِرْتُ فِى شَانِكِ بِشَئٍ حَتّٰى الاٰن তোমার বিষয়ে আমার প্রতি এখনও কোনো বিধান অবতীর্ণ হয়নি। এসব রেওয়ায়াতে কোনো বৈপরিত্য নেই, সবকটিই সঠিক হতে পারে। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে।-দুররে মানছুর ও ইবনে কাসীর থেকে তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন।

আলোচ্য আয়াতে এ মহিলা সাহাবীর স্বামীর জিহার করার বিষয় নিয়ে রসূলে করীম স.-এর কাছে গিয়ে বারবার বাদানুবাদ করা এবং আল্লাহর কাছে তার ফরিয়াদ করার কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِىْ ..... আল্লাহ নিশ্চয়ই সে মহিলার অভিযোগ শুনেছেন— তার ফরিয়াদ গ্রহণ করেছেন। এ মহিলা সাহাবীর ফরিয়াদ আল্লাহর নিকট শ্রুত ও গৃহীত হওয়া এবং সাথে সাথে আল্লাহর নিকট থেকে অনুকূল ফরমান জারি হওয়া এমন একটি ব্যাপার যার দরুন সাহাবায়ে কিরামের সমাজে তাঁর এক বিশেষ মর্যাদা স্বীকৃত হয়েছিল। ইবনে আবু হাতিম ও বায়হাকী বর্ণিত এক হাদীসে বলা হয়েছে, হযরত ওমর রা. একবার কতিপয় সংগী-সাথীসহ কোথায়ও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে একজন বৃদ্ধা মহিলা এসে দাঁড়ালে হযরত ওমর রা. থেমে গেলেন এবং দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত তার বক্তব্য শুনতে থাকলেন। তার কথা শেষ করা পর্যন্ত তিনি দাঁড়িয়ে থাকলেন। সাথীদের মধ্য থেকে একজন বলে উঠলেন, আপনি এ বৃদ্ধার কারণে কুরাইশ বংশের নেতৃস্থানীয় লোকদেরকে এত সময় এখানে দাঁড় করিয়ে রাখলেন ? তখন হযরত ওমর রা. বললেন, তোমরা কি জানো, কে এই মহিলা ? ইনি খাওলা বিনতে সা'লাবা। ইনি এমন এক মহিলা যার অভিযোগ সপ্ত আকাশের উপর শোনা হয়েছে। আল্লাহর কসম, ইনি যদি আমাকে রাত পর্যন্তও দাঁড়

করিয়ে রাখতেন, তাহলেও আমি দাঁড়িয়ে থাকতাম। কেবল নামাযের সময় হলে তাঁর কাছে অবসর চেয়ে নিতাম।

ইবনে আবদুল বার কাদাতা থেকে একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। এ মহিলা পথিমধ্যে হযরত ওমর রা.-এর সম্মুখীন হলে তিনি তাঁকে সালাম করলেন। মহিলা সালামের জবাব দানের পর বলতে লাগলেন, হে ওমার এমন একটা সময় ছিল যখন আমি তোমাকে উকাজের বাজারে দেখতে পেয়েছিলাম। তখন সবাই তোমাকে উমাইর বলতো, হাতে লাঠি নিয়ে ছাগল চরাতে। অতপর কিছু দিন যেতে না যেতেই লোকেরা তোমাকে ওমার বলতে শুরু করে। আরও কিছুদিন পর তোমাকে 'আমীরুল মুমিনীন' বলা হতে থাকে। প্রজাসাধারণের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে চলবে। স্মরণ রেখ, যে লোক আল্লাহর অভিশাপকে ভয় করে, তার জন্য দূরের লোকও নিকটাত্মীয় স্বরূপ হয়ে যায়। আর যে মৃত্যুকে ভয় করে তার সম্পর্কে আশংকা সে যে জিনিসকে রক্ষা করতে চায়—তাই হয়ত সে হারিয়ে ফেলবে। একথা শুনে হযরত ওমর রা.-এর সাথী জারুদ আবদী বললেন, হে মহিলা! তুমি আমীরুল মুমিনীনের সাথে খুব বে-আদবী করছো ! হযরত ওমর রা. বললেন, উনাকে বলতে দাও। জান ইনি কে ? তাঁর কথা তো সপ্ত আকাশের উপরও শোনা হয়েছে, ওমরকে তো অবশ্যই শুনতে হবে। ইমাম বুখারী রহ.ও তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে সংক্ষেপে এরূপ কাহিনী বর্ণনা করেছেন।–তাফহীমুল কুরআন

❐

চল্লিশ

اَلَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِّنْ نِّسَآئِهِمْ مَّا هُنَّ اُمَّهٰتِهِمْ ط اِنْ اُمَّهٰتُهُمْ اِلَّا الّٰئِىْ وَلَدْنَهُمْ ط وَاِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا ط وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ

"তোমাদের মধ্যে যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে যিহার করে, তাদের স্ত্রীরা তাদের মা নয়। তাদের মা তো তারা যারা তাদের জন্ম দিয়েছে। এ লোকেরা তো একটা অসংগত ও অসত্য কথা বলে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পাপ মোচনকারী ও বড়ই ক্ষমাশীল।"–সূরা মুজাদালা ঃ ২

স্ত্রীকে 'মায়ের মত' বললে সে তার মা হয়ে যায় না

তৎকালীন জাহেলিয়াতের যুগে এ যিহার করলে যিহারকারীর স্ত্রী তার জন্য মায়ের মতই হারাম হয়ে গেছে বলে তাকে আর স্ত্রীরূপে গণ্য করা হতো না। এ যুগেও অনেক অজ্ঞ-মূর্খ লোক ঝগড়া-ঝাটি করে না বুঝেশুনে নিজের স্ত্রীকে নিজের মা, বোন ও মেয়ের সাথে তুলনা দেয়। বলে, তুই আমার জন্য আমার মায়ের মত, তুই আমার জন্য আমার বোনের মত, তুই আমার জন্য আমার মেয়ের মত। এমন কথার স্পষ্ট অর্থ দাঁড়ায়, সে নিজের স্ত্রীকে এখন আর স্ত্রী মনে করে না, বরং তাকে সেই নারীদের মধ্যে গণ্য করে, যারা তার জন্য মুহরিম। এ ধরনের কথা বলাকে ফিক্‌হের ভাষায় যিহার (ظهار) বলে। আরবী ভাষায় এ যিহার শব্দ যাহরুন থেকে নির্গত। এ র অর্থ সওয়ারী—যার ওপর সওয়ার হওয়া যায়। জন্তুযানকে আরবীতে যাহরুন (ظهر) বলা হয়। কেননা এর পিঠের উপর আরোহণ করা হয়। জাহেলিয়াতের সমাজে লোকেরা নিজের স্ত্রীকে নিজের জন্য হারাম করে দেয়ার উদ্দেশ্যে বলতো, তোমাকে 'যাহর'—সাওয়ারী বানানো আমার জন্য নিজের মাকে সাওয়ারী বানানোর মতই হারাম। এ কারণে এ ধরনের বাক্য বা উক্তি মুখে উচ্চারণ করাকে যিহার (ظهر) বলা হতো।

'যিহার' সম্পর্কে ইসলামের ফায়সালা হলো, কেউ যদি নির্লজ্জের মত নিজের স্ত্রীকে মা'র মত বলে, তবে তার একথায় সেই স্ত্রী তার মা হয়ে যেতে পারে না ; না মার মত মর্যাদা, সম্ভ্রম ও পবিত্রতা পেতে পারে। মায়ের মা হওয়া একটা প্রকৃত ও বাস্তব ব্যাপার। কেননা সেই তো তাকে গর্ভে ধারণ করেছে, প্রসব করেছে। এ কারণে পুত্রের জন্য সে চিরতরে হারাম, চির সম্মানার্হ। কিন্তু যে নারী তাকে গর্ভে ধারণ করেনি, তাকে কেবল মুখে মা

বললেই সে মা হয়ে যেতে পারে না। সাধারণ বিবেক-বুদ্ধি, নৈতিকতা; আইন কোনো একটি দিক দিয়ে কি তার জন্য সেই মর্যাদা-সম্ভ্রম ও পবিত্রতা হতে পারে যা বাস্তবতার কারণে প্রকৃত গর্ভধারিণী ও জন্মদায়িনী মা'র জন্য রয়েছে ? এ কারণে জাহেলিয়াতের যুগের নিয়মকে আল্লাহ্ তাআলা বাতিল ঘোষণা করেছেন। তখন যিহারকারী স্বামীর সাথে তার স্ত্রীর বিবাহ সম্পর্ক চিরতরে ছিন্ন হয়ে যেতো এবং সে তার জন্য তার মায়ের মতই চিরকালের জন্য হারাম হয়ে যেতো। আল্লাহর এই ঘোষণার ফলে এ বদ রসমের চির অবসান হয়ে গেল।

স্ত্রীকে মায়ের সাথে তুলনা করা—বলে দেয়া যে তুমি আমার মায়ের মত। এতো এক হাস্যকর, অর্থহীন ও অত্যন্ত লজ্জাকর ব্যাপার। কোনো সুস্থ মস্তিষ্কের লোক—কোনো ভদ্র ব্যক্তি এর কল্পনাও করতে পারে না, করা উচিত নয়। মুখে উচ্চারণ করা তো দূরের কথা। দ্বিতীয়ত, একথা আসলেও মিথ্যা। কেননা কেউ যদি বলে তার স্ত্রী এখন তার মা হয়ে গেছে, তাহলে সে তো সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা বলে ফেললো। আর যদি সে এরূপ কথা বলে বুঝাতে চায় যে, তার স্ত্রী এখন তার মায়ের মতই হারাম হয়ে গেছে, সে তাকে তার মায়ের মর্যাদা দিয়েছে, তবে তাও সম্পূর্ণ অসত্য কথা, পুরোপুরি মিথ্যাবাদী। কেননা কেউ যদি নিজ ইচ্ছা মত কোনো স্ত্রীলোককে কখনো নিজ স্ত্রী বানাবে, আবার কখনো মায়ের মর্যাদা দিবে—এরূপ অধিকার আল্লাহ্ তাআলা তাকে দেননি। আইন-বিধান রচয়িতা সে নিজে নয়—আল্লাহই শরীয়ত রচয়িতা বিধানদাতা।

আর আল্লাহ্ তাআলা তো প্রসবকারিণী মা'র সাথে দাদী, নানী ও শাশুড়ী, দুধ সেবন করিয়েছে যে নারী এবং নবীর স্ত্রীগণকে মায়ের মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। কেউ নিজের ইচ্ছামত অপর কোনো নারীকে এর মধ্যে শামিল করার অধিকার আল্লাহ্ কাউকে দান করেননি। যে মহিলা তার স্ত্রী হয়ে আছে তাকে এর মধ্যে গণ্য করার তো প্রশ্নই আসে না। আল্লাহ্ তাআলার উক্ত ঘোষণা থেকে আইনের এ ধারাটি জানা গেল যে, 'যিহার' করা অতি বড় গুনাহ ও হারাম কাজ। যে লোক এ কাজ করে, সে কঠিন শাস্তি পাওয়ার যোগ্য।

কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার অসীম অনুগ্রহ এই যে, তিনি প্রথমত 'যিহার' সংক্রান্ত জাহেলিয়াতের প্রথাকে বাতিল ঘোষণা করে মুমিনদের পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবনকে বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। আর দ্বিতীয়ত, এ কাজ যারা করে তাদের জন্য অত্যন্ত সহজ ও হালকা ধরনের শাস্তি নির্দিষ্ট করেছেন। এমন কাজের শাস্তি এর চেয়ে অধিক সহজ ও হালকা আর কি

হতে পারে? তাছাড়া আল্লাহর বড় অনুগ্রহ এই যে, এ শাস্তি কোনো বেত্রাঘাত কিংবা নির্যাতন রূপে নয় বরং কয়েকটি ইবাদাত ও নেক কাজ রূপেই ধার্য হয়েছে। এ কাজগুলো এমন যে এতে করে মুমিনদের নফসের পরিশুদ্ধি করণ এবং মুমিনদের সমাজে কল্যাণ প্রসারে বিশেষ কার্যকর।

প্রসংগত উল্লেখ্য, ইসলামে কোনো কোনো অপরাধের শাস্তি বিধানে কাফ্ফারা স্বরূপ কতিপয় ইবাদাত নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এ পর্যায়ের ইবাদাতগুলোতে ইবাদাতও শাস্তি—এ দুটো দিকই পুরো মাত্রায় বর্তমান। এসব পালন করতে যেমন শাস্তির কষ্ট ভোগ করতে হয় তেমনি সেই সাথে একটি নেকও ইবাদাতের কাজ করে নিজের গুনাহের প্রায়শ্চিত্তও করে নিতে পারে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর বর্ণনা অনুযায়ী ইসলামের যুগে যিহার সংক্রান্ত ব্যাপার সর্বপ্রথম হযরত আউস ইবনে সামেত দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল। তাঁর স্ত্রী হযরত খাওলার আকুল আর্তনাদের ফলেই যিহারের কারণে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান স্বরূপ এ আয়াতসমূহ নাযিল হয়।

সূরার ২য় ও ৩য় আয়াতে যিহারের সমাধান সম্পর্কে নির্দেশ নাযিল হয়। যার তরজমা হলো এই—"যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে 'যিহার' করে, পরে নিজের সেই কথা থেকে ফিরে যায়, যা তারা বলেছিল। পরস্পরকে স্পর্শ করার পূর্বেই তাদেরকে একটি দাস মুক্ত করতে হবে। একথা দিয়ে তোমাদের উপদেশ দেয়া হচ্ছে। তোমরা যাকিছু করো আল্লাহ সে বিষয়ে অবহিত আছেন। যে মুক্ত করার জন্য দাস পাবে না সে যেন একাধারে দু মাস রোযা রাখে পরস্পরকে স্পর্শ করার পূর্বে। আর যে লোক এটাও করতে সমর্থ নয় সে যেন ষাটজন মিসকীনকে খাবার খাওয়ায়। এ নির্দেশ এজন্যে যে তোমরা যেন আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আন। এটাই আল্লাহর দেয়া সীমারেখা। আর কাফিরদের জন্য রয়েছে মর্মান্তিক শাস্তি।

উপরোক্ত আয়াত দুটোতে কেউ যিহার করলে তার প্রতিবিধান স্বরূপ তিনটে বিকল্প ইবাদাতমূলক কাজ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ যিহারকারী তার স্ত্রীকে স্ত্রী হিসেবে রাখার জন্য তার যিহার করার অযৌক্তিক অন্যায় কথার কাফ্ফারা স্বরূপ তাকে একটি গোলাম আযাদ করতে হবে। তার যদি গোলাম আযাদ করার সামর্থ না থাকে তাহলে একাধারে ষাট দিন রোযা রাখতে হবে, আর যদি সে রোযা রাখার সমর্থও না রাখে তবে তার কাফ্ফারা হলো ষাটজন মিসকীনকে খাবার খাওয়াবে। ব্যাস, যিহারকারী উপরোক্ত তিনটি কাজের মধ্য থেকে সামর্থানুযায়ী যে কোনো একটি কাজ করলেই তার স্ত্রীকে পূর্বের ন্যায় স্ত্রী হিসেবে গণ্য করতে পারবে।

একচল্লিশ

يَآيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلٰى اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَّلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِيْنَ وَلَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَاْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَّفْتَرِيْنَهٗ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِيْ مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

"হে নবী! মুমিন নারীগণ যখন তোমার কাছে এসে একথার উপর বাইয়াত করে যে, তারা আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, যিনা করবে না, নিজেদের সন্তান হত্যা করবে না, তারা সজ্ঞানে কোনো অপবাদ রচনা করে রটাবে না, আর সৎকাজে তোমাকে অমান্য করবে না। তখন তুমি তাদের বাইয়াত গ্রহণ করবে এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। আল্লাহ তো ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।"–সূরা মুমতাহিনা ঃ ১২

রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে নারীদের আনুগত্যের শপথ

এ আয়াতে মুসলিম নারীদের থেকে একটি বিস্তারিত আনুগত্যের শপথ নেয়ার বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। এ শপথ ছিল ঈমান ও আকায়িদ সহ শরীয়তের বিধান পালনের ব্যাপারে সুস্পষ্ট অংগীকার। পূর্ববর্তী আয়াতে যদিও এ শপথ মুহাজির নারীদের ঈমান পরীক্ষার পরিশিষ্ট হিসেবে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু ভাষার ব্যাপকতার কারণে এটা শুধু তাদের বেলায়ই প্রযোজ্য নয়, বরং সকল মুসলিম নারীর জন্য ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য। বাস্তব ক্ষেত্রে তাই ঘটেছে। এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে শুধু মুহাজির নারীরাই নয়, অন্যান্য নারীরাও শপথ গ্রহণ করেছে। সহীহ বুখারীর রেওয়ায়াতে হযরত ওমায়মা বর্ণনা করেন, আমি এবং আরও কয়েকজন মহিলাসহ রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে শপথ করেছি। তিনি আমাদের কাছ থেকে শরীয়তের বিধি-বিধান পালনের অংগীকার নেন এবং সাথে সাথে এ বাক্যও উচ্চারণ করেন, فيما استطعن واطقن অর্থাৎ আমরা এসব বিষয়ে অংগীকার করি যে পর্যন্ত আমাদের সাধ্যে কুলায়। ওমায়মা এরপর বলেন ঃ এ থেকে জানা

গেল যে, আমাদের প্রতি রসূলুল্লাহ স.-এর স্নেহ-মমতা আমাদের নিজেদের চেয়েও বেশী ছিল। আমরা তো নিঃশর্ত অংগীকার করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তিনি আমাদেরকে শর্তযুক্ত অংগীকার শিক্ষা দিলেন। ফলে অপারগ অবস্থায় বিরুদ্ধাচারণ হয়ে গেলে তা অংগীকার ভংগের শামিল হবে না।–তাফসীরে মাযহারী

সহীহ বুখারীতে হযরত আয়েশা রা. এ শপথ সম্পর্কে বলেন, মহিলাদের এ শপথ কেবল কথাবার্তার মাধ্যমে হয়েছে—হাতের উপর হাত রেখে শপথ হয়নি, যা পুরুষদের ক্ষেত্রে হতো। বস্তুত রসূলুল্লাহ স.-এর হাত কখনো কোনো গায়রে মুহরিম নারীর হাতকে স্পর্শ করেনি।–তাফসীরে মাযহারী

হাদীস থেকে প্রমাণিত যে, এ শপথ কেবল হুদাইবিয়ার ঘটনার পরেই নয়, বরং বার বার হয়েছে। এমনকি মক্কা বিজয়ের দিনও রসূলুল্লাহ স. পুরুষদের কাছ থেকে শপথ গ্রহণ করে সাফা পর্বতের উপর নারীদের কাছ থেকে শপথ গ্রহণ করেন। পর্বতের পাদদেশে দাঁড়িয়ে হযরত ওমর রা. রসূলুল্লাহ স.-এর বাক্যাবলী নীচে সমবেত মহিলাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিতেন।–মাআরেফুল কুরআন

মক্কা বিজয়ের পর কুরাইশ বংশের লোকেরা দলে দলে নবী করীম স.-এর নিকট 'বাইয়াত' হওয়ার জন্য উপস্থিত হতে লাগলো। সাফা পর্বতের উপর তিনি নিজে পুরুষদের নিকট থেকে বাইয়াত গ্রহণ করলেন। আর হযরত ওমর রা.-কে স্ত্রীলোকদের নিকট থেকে বাইয়াত গ্রহণের জন্য নিজের তরফ থেকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তিনি যেন এ আয়াতের কথাগুলোর স্বীকৃতি তাদের নিকট থেকে আদায় করেন, সেই নির্দেশও তাঁকে দেয়া হয়েছিল। পরে তিনি মদীনায় প্রত্যাবর্তন করার পর একটি বাড়ীতে আনসারদের স্ত্রীলোকদের একত্রিত করার নির্দেশ দিলেন এবং হযরত ওমর রা.-কে তাদের নিকট থেকে বাইয়াত নেয়ার জন্য পাঠালেন। ঈদের দিনেও পুরুষদের সামনে ভাষণ দেয়ার পর নবী করীম স. স্ত্রীলোকদের সম্মেলন স্থানের দিকে চলে যান এবং ভাষণ দানকালে তিনি এ আয়াত পাঠ করে এ কথাগুলোর প্রতিশ্রুতি তাদের নিকট থেকে গ্রহণ করলেন। এসব ক্ষেত্র ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে স্ত্রীলোকেরা এককভাবে ও সামষ্টিকভাবে নবী করীম স.-এর খেদমতে হাজির হয়ে বাইয়াত করতে থাকেন। বহু কটি হাদীসে একথার উদ্ধৃতি রয়েছে।–তাফহীমুল কুরআন

মক্কা শরীফে স্ত্রীলোকদের নিকট থেকে যখন 'বাইয়াত' গ্রহণ করা হচ্ছিলো তখন হযরত আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা বিনতে উৎবা এ হুকুমের ব্যাখ্যা

চেয়ে নবী করীম স.-এর নিকট প্রশ্ন করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আবু সুফিয়ান একজন কৃপণ ব্যক্তি। আমি যদি তার কাছে না বলে তার মাল-সম্পদ থেকে আমার ও আমার সন্তানদের জন্য কিছু গ্রহণ করি, তবে তাতে কি আমার গুনাহ হবে ? নবী করীম স. জবাবে বললেন, না, তবে শুধু প্রচলিত পরিমাণ, তার বেশী নয়। অর্থাৎ যতটা ঠিক প্রয়োজন পূরণের জন্য দরকার ততটা গ্রহণ করলে তা চুরির পর্যায়ে পড়বে না এবং তাতে গুনাহও হবে না।-আহকামুল কুরআন, ইবনে আরাবী থেকে তাফহীমুল কুরআন।

রসূল স.-এর যুগের মুসলিম নারীগণ তাঁর কাছে যেসব বিষয়ে শপথ করেছিলেন, আয়াতে বর্ণিত সেসব বিষয়াবলী নিম্নরূপ ঃ

এক. আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করা, নির্ভেজাল তাওহীদী জিন্দেগী যাপন করা, দুই. চুরি না করা—হযরত আবু সুফিয়ানের স্ত্রী এ বিষয়েরই ব্যাখ্যা চেয়েছিলেন রসূলে করীম স.-এর কাছে। নারীদের অনেকেই স্বামীর অর্থ-সম্পদ চুরি করতে অভ্যস্থ ছিল বিধায় বিষয়টি উল্লেখযোগ্য ছিল। তিন. যিনা বা ব্যভিচার না করা—নারীরা এ ব্যাপারে কঠোর ভূমিকা রাখতে পারলে পুরুষদের জন্য আত্মরক্ষা করাও সহজতর হতে পারে। চার. নিজেদের সন্তানকে হত্যা না করা। জাহেলিয়াতের যুগে কন্যা সন্তানকে জীবন্ত প্রোথিত করার অমানবিক কাজের প্রচলন ছিল বিধায় মুসলিম নারীদের তা থেকে কঠোরভাবে বারণ করা হয়। পাঁচ. মিথ্যা অপবাদ ও কলংক আরোপ থেকে বিরত থাকা—এ বুহ্তান বা অপবাদ সম্বলিত আয়াতে দু ধরনের মিথ্যা দোষারোপ বুঝায়। কোনো স্ত্রীলোকের অপর নারীর প্রতি পর-পুরুষের সাথে গোপন প্রণয়ের দোষারোপ রচনা করা এবং এ ধরনের মিথ্যা গল্প সমাজে প্রচার করে বেড়ানো এক ধরনের মিথ্যা দোষারোপ—বুহ্তান। স্ত্রীলোকদের মধ্যে এ ধরনের কথা প্রচার করে বেড়ানোর একটা সাধারণ প্রবণতা লক্ষ করা যায়। আর কোনো স্ত্রীলোক যদি পর-পুরুষের নিকট থেকে গর্ভধারণ করে নিজের স্বামীকে বুঝায় যে, এটা তোমার সন্তান। তাহলে একাজটাও মিথ্যা অপবাদের মধ্যে শামিল। আবু দাউদ শরীফে হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি নবী করীম স.-কে বলতে শুনেছেন, যে স্ত্রীলোক কোনো বংশে এমন কোনো সন্তান নিয়ে আসে (প্রসব করে) যা সেই বংশের সন্তান নয়। আল্লাহর সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই আর আল্লাহ তাকে কখনো জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না।-তাফহীমুল কুরআন

ছয়. অত্র আয়াতের ষষ্ঠ বিষয় হচ্ছে, একটি সাধারণ বিধি। আর তা হচ্ছে وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِىْ مَعْرُوْفٍ –অর্থাৎ ভাল কাজে (হে রসূল) আপনার

আদেশ অমান্য করবে না। রসূলুল্লাহ স. যে কোনো কাজের আদেশ দিবেন তা কিছুতেই ভাল না হয়ে পারে না। এর ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই অসম্ভব। এমতাবস্থায় فِىْ مَعْرُوْفٍ বলে 'ভাল কাজে' কথাটি যুক্ত করার বিষয়টি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তা হচ্ছে মুসলমানরা যেন ভাল করেই বুঝে নিতে পারে যে, আল্লাহর আদেশের বিপরীতে কোনো মানুষের আনুগত্য করা জায়েয নয়। এমনকি তিনি যদি রসূলও হন। তাই রসূলের আনুগত্যের সাথে এ শর্তটি যুক্ত করে দিয়েছেন।–মাআরেফুল কুরআন

কিন্তু এখানে فِىْ مَعْرُوْفٍ কথাটি প্রকৃতপক্ষে শর্ত স্বরূপ সংযুক্ত করা হয়েছে বলে মনে হয় না, বরং এটা রসূলের আনুগত্যের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করার জন্যই যুক্ত করা হয়েছে বলে বুঝায়। এখানে মূল কথা وَلَا يَعْصِيْنَكَ অর্থাৎ মহিলারা আপনার হুকুম অমান্য করবে না বলাই উদ্দেশ্য। বাকী فِىْ مَعْرُوْفٍ কথাটা আগের বাক্যাংশকে জোর দেয়ার জন্য অলংকার স্বরূপ ব্যবহৃত হয়ে থাকবে। কারণ রসূল স. কখনো উম্মাতকে مَعْرُوْفٌ ছাড়া খারাপ কাজের হুকুম দেয়ার কল্পনা করাই অসম্ভব।

রসূল স.-এর কাছে কৃত নারী সমাজের শপথের বিষয়ের মধ্যে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদির উল্লেখ আলোচ্য আয়াতে নেই। কারণ এসব তো দীনের ভিত্তি বা ইসলামের বুনিয়াদ হওয়ার কারণে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। রসূলুল্লাহ স. আল্লাহর নির্দেশে কেবল সেসব বিষয়ের বাইয়াত (শপথ) নিয়েছেন, যেসব কাজ সাধারণত নারীদের থেকে প্রকাশ পেতো। যাতে করে নারীগণ দীনের স্তম্ভ বা ইসলামের বুনিয়াদী কাজ গুলোর প্রতি আমল করার সাথে সাথে এসব বিষয়গুলো থেকে বিরত থাকতে পারে। এ থেকে জানা যায় যে, আলিম সমাজ, দায়ীগণ এবং ওয়ায়েজগণ নিজেদের সমগ্র চেষ্টা-সাধনা যেন কেবল দীনের স্তম্ভগুলোর আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রাখে, বরং সমাজে যেসব বদ রসম, কুপ্রথা ও নৈতিকতা বিরোধী প্রথা-রসম চালু আছে সেগুলোর পরিপূর্ণ রহিতকরণ কাজে সমাজকে উদ্বুদ্ধ করবে। লক্ষ করা যায় যে, নামায-রোযার মত মৌলিক কাজে অভ্যস্থ লোকেরাও কুপ্রথা ও অনৈতিক কার্যক্রমে ডুবে থাকে।–আল কুরআনুল করীম, মাওলানা সালাহুদ্দীন ইউসুফ।

এখানে ভাল কাজে রসূলের যে আনুগত্যের কথা বলা হয়েছে তা মূলত রসূলুল্লাহ স. হিসেবে مَعْرُوْفٌ-এর শর্তারোপ করা হয়নি—হয়েছে ইসলামী সমাজের শাসক হিসেবে। কারণ রসূল হিসেবে غير معروف কাজের নির্দেশ দেয়া অসম্ভব। ইমাম আবু বকর জাস্‌সাস লিখেছেন, আল্লাহ জানতেন

তাঁর নবী মারূফ ছাড়া অন্য কোনো কাজের নির্দেশ কখনই দেন না। এতদসত্ত্বেও তিনি তাঁর নবীর নাফরমানী থেকে বিরত রাখার কথা বলতে গিয়ে 'মারূফ'—ন্যায়সংগত কাজে শর্তারোপ করেছেন (ন্যায়সংগত কাজে তাঁর নাফরমানী করা যাবে না বলেছেন)। একথা বলার উদ্দেশ্য আল্লাহর আনুগত্য বিরোধী কাজেও শাসকদের আনুগত্য করার জন্য দাবী করা বা নির্দেশ দেয়ার কোনো সুযোগই যাতে কেউ পেতে না পারে তার পথ চিরতরে বন্ধ করে দেয়া। নবী করীম স. স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন ঃ

لَاطَاعَةَ فِىْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ اِنَّمَا الطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوْفِ۔

"আল্লাহর নাফরমানী করে অন্য কারো আনুগত্য বা আইন নির্দেশ মেনে নেয়া যায় না। আনুগত্য করা যেতে পারে কেবলমাত্র مَعْرُوْفُ 'ভাল বলে পরিচিত' কাজে।"

তিনি আরও বলেছেন ঃ

مَنْ اَطَاعَ مَخْلُوْقًا فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ سَلَّطَ اللّٰهُ عَلَيْهِ ذٰلِكَ الْمَخْلُوْقَ۔

"যে ব্যক্তি আল্লাহর নাফরমানী করে ও কোনো লোকের আনুগত্য করবে, আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে তার উপর প্রতিষ্ঠিত করে দেবেন। (অতপর সেই ব্যক্তির গোলামী করা ছাড়া তার কোনো উপায় থাকবে না।)"–তাফহীমুল কুরআন

❐

বিয়াল্লিশ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ ج
وَاِنْ تَعْفُوْا وَتَصْفَحُوْا وَتَغْفِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○ اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ
وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ط وَاللّٰهُ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ○

"হে তোমরা যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের স্ত্রীগণ ও সন্তান-সন্ততিগণের কেউ কেউ তোমাদের শত্রু। সুতরাং তাদের সম্পর্কে তোমরা সতর্ক থাকবে। আর তোমরা যদি ওদের মার্জনা করো, ওদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করো এবং ওদের ক্ষমা দরে দাও ; তাহলে জেনে রেখ আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল অতিশয় দয়ালু। তোমাদের ধন-সম্পদ, তোমাদের সন্তান-সন্ততি তো একটা পরীক্ষা বিশেষ ; আর আল্লাহ, তাঁরই কাছে রয়েছে মহাপুরুস্কার।"–সূরা তাগাবুন ঃ ১৪-১৫

কোন কোন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের শত্রু

এ আয়াতগুলোর শানেনুযুল সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায়, হিজরতের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপের সময় মক্কা থেকে অনেক মুসলমান মদীনায় হিজরত করে চলে যান। কিন্তু কতেক মুসলমান হিজরতের ইচ্ছা করেও হিজরত করতে পারলেন না। কারণ, তাদের স্ত্রী ও সন্তানগণ এ পথে বাধার সৃষ্টি করে বসেছিল। অতপর যখন তারা রসূলে করীম স.-এর নিকট উপস্থিত হলো, তখন তারা দেখতে পেল যে, পূর্বে যারা হিজরত করে মদীনায় পৌঁছেছিল। তাঁরা দীন-শরীয়ত সম্পর্কে বেশ ইলম অর্জন করে নিয়েছে। এটা দেখে তাদের স্ত্রী ও সন্তানাদির প্রতি রাগান্বিত হয়ে সে বাধাদানকারী স্ত্রী ও সন্তানদের শাস্তি দিতে উদ্যত হলো। তখন আল কুরআনের এ আয়াতগুলো নাযিল হয়। এতে আল্লাহ তাআলা ওসব স্ত্রী ও সন্তানদের মার্জনা ও ক্ষমা করে দেয়ার শিক্ষা দিয়েছিলেন।–তিরমিযী

আয়াতে فَاحْذَرُوْهُمْ তাদের সম্পর্কে তোমরা সতর্ক থাকবে বলে বুঝানো হয়েছে যে, তোমরা ওদের পেছনে লাগা থেকে সাবধান থেকো। বরং তোমাদের উচিত ওরা যেন তোমাদের পেছনে চলে দীনের পথে অগ্রসর হয়—এমন ব্যবস্থা ও সুযোগ করে দেয়া। যাতে করে ওরাও তোমাদের

মত আল্লাহর আনুগত্যের দিকে ধাবিত হতে পারে। এমন যেন না হয় যে, তোমরা ওদের পেছনে লেগে পড় আর নিজেদের পরিণাম ধ্বংস করে দাও।–আল কুরআনুল করীম ঃ মাওলানা সালাহুদ্দীন ইউসুফ

তাদের সম্পর্কে সতর্ক থাকার আর এক অর্থ হতে পারে তাদের বৈষয়িক সুখ-সুবিধা বিধান করতে গিয়ে তোমরা স্বীয় পরিণতি-পরকাল বরবাদ করো না। তাদের প্রতি স্নেহ-ভালবাসা এতবেশী পোষণ করো না যাতে করে আল্লাহ ও রসূলের সাথে তোমাদের সম্পর্ক রক্ষা ও ইসলাম পালনের পথে তারা প্রতিবন্ধক হয়ে না দাঁড়াতে পারে। তাদের প্রতি এতটা নির্ভরতা রেখো না যাতে তোমার অসতর্কতার সুযোগে মুসলিম সমাজের গোপন তথ্য জেনে নিয়ে শত্রু পক্ষকে জানিয়ে দিতে পারে। রসূলে করীম স. তাঁর একটি কথায় মুসলমানদেরকে এ ব্যাপারে সাবধান করে দিয়েছিলেন। হাদীসটি এই ঃ

يُؤْتَى بِرَجُلٍ يَّوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ اَكَلَ عِيَالُهُ حَسَنَاتُهُ-

"কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে হাজির করা হবে, আর বলা হবে এর সন্তানরা এর সব নেক আমল খেয়ে ফেলেছে।"

'স্ত্রী ও সন্তানাদির কেউ কেউ ঈমানদারকে শত্রু'—একথা বলার পর আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ

وَاِنْ تَعْفُوْا وَتَصْفَحُوْا وَتَغْفِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ-

'আর তোমরা যদি ওদের মাফ করো, ওদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করো এবং ওদের ক্ষমা করে দাও, তাহলে আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল অতিশয় দয়ালু। এর অর্থ এই যে, তোমাদের স্ত্রী ও সন্তানাদি সম্পর্কে তোমাদের অবহিত করা হচ্ছে কেবল তোমাদের সাবধান করার উদ্দেশ্যে, যেন তোমরা সতর্ক থাক এবং দীন ইসলামকে তাদের ক্ষতি থেকে রক্ষা করার চিন্তা করো। এর মূলে অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই। তোমরা তোমাদের স্ত্রী-পুত্রকে মারপিট করবে, কিংবা তাদের থেকে রূঢ় আচরণ ও দুর্ব্যবহার করবে অথবা তাদের সম্পর্কে এতটা তিক্ততা সৃষ্টি করবে যার ফলে তোমাদের পারিবারিক জীবনটাই দুর্বিসহ হয়ে উঠে—এটা কখনও উদ্দেশ্য নয়। কেননা এমনটি হলে দুটো বিরাট ক্ষতি হওয়ার আশংকা রয়েছে। একটি হলো, এর ফলে স্ত্রী-পুত্রকে সংশোধন করার পথ চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে। দ্বিতীয়টি হলো এর ফলে সমাজে ইসলামের বিরুদ্ধে একটা সাধারণ বিরোধিতা সৃষ্টি হতে পারে। আশপাশের লোকেরা মুসলমানদের চরিত্র ও আচরণ সম্পর্কে এরূপ ধারণা করতে পারে

যে, ইসলাম গ্রহণ করলেই বুঝি নিজের ঘরেও স্ত্রী-পুত্র-পরিজনের প্রতি কঠোর ও রূঢ় আচরণকারী হয়ে যেতে হয়।–তাফহীমুল কুরআন

এ প্রসংগে মনে রাখা আবশ্যক যে, ইসলামের শুরুতে লোকেরা যখন প্রথম প্রথম ইসলাম গ্রহণ করছিলো, তখন তাদের একটি অসুবিধা দেখা দিতো যদি তাদের পিতা-মাতা কাফের থেকে যেতো। কেননা তারা এদের উপর ইসলাম ত্যাগ করার জন্য চাপ সৃষ্টি করতো এবং তাদের মতই কাফের হয়ে থাকার জন্য বাধ্য করতে চাইতো। আর একটি অসুবিধা হতো যদি তাদের সন্তান-সন্ততি (কিংবা স্ত্রী হলে তাদের স্বামী ও সন্তানরা) কুফরী অবস্থায় থাকতো এবং দীন ইসলাম থেকে তাদেরকে ফিরিয়ে আনার জন্য চেষ্টা চালাতো। প্রথমোক্ত অবস্থা সম্পর্কে সূরা আনকাবূতের ৮ম আয়াতে ও সূরা লুকমানের ১৪-১৫ আয়াতে বিধান দেয়া হয়েছে যে, দীনের ব্যাপারে পিতা-মাতার কথা (যদি দীনের বিপরীত হয়) তবে তা কখনই মেনে নেয়া যাবে না। অবশ্য সেই অবস্থায়ও দুনিয়ার ব্যাপারে তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করে যেতে হবে। আর শেষোক্ত অবস্থার বিধান এ আয়াতে দেয়া হয়েছে—বলা হয়েছে নিজেদের দীনকে নিজেদের সন্তানাদির ক্ষতি হতে রক্ষা করার চিন্তা অবশ্যই করতে হবে। কিন্তু তাই বলে তাদের সাথে কোনোরূপ কঠোরতা ও রূঢ় আচরণ করা যাবে না। বরং নম্রতা ও ক্ষমা সহিষ্ণুতাকে পুরোপুরি কাজে লাগাবে।–তাফহীমুল কুরআন

আলোচ্য আয়াতের আলোকে ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, পরিবার-পরিজনের কেউ কোনো শরীয়ত বিরোধী কাজ করে ফেললেও তার সাথে সম্পর্ক ছেদ করা, তার প্রতি বিদ্বেষ রাখা ও তার জন্য বদদোআ করা উচিত নয়।–রুহুল মাআনী-মাআরেফুল কুরআন

আয়াত ১৫ তে বলা হয়েছে ঃ اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ তোমাদের ধন-সম্পদ, তোমাদের সন্তান-সন্ততি তো পরীক্ষা বিশেষ। এখানে فِتْنَةٌ শব্দের অর্থ পরীক্ষা। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, ধন-সম্পদ ও সন্তানাদির মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মানুষের পরীক্ষা নেন যে, এসবের মুহব্বতে লিপ্ত হয়ে সে আল্লাহর বিধানাবলীকে উপেক্ষা করে, না মুহাব্বতকে যথাসীমায় রেখে স্বীয় কর্তব্য পালনে সচেষ্ট হয়।–মাআরেফুল কুরআন

এ ক্ষেত্রে রসূলে করীম স.-এর একটা বাণী স্মরণীয়। তাবারানী হযরত আবু মালেক আশআরী হতে বর্ণনা করেছেন, হযরত রসূল করীম স. ইরশাদ করেছেন, তোমার আসল শত্রু সে নয় যাকে হত্যা করলে তোমার সাফল্য হবে, আর সে তোমাকে হত্যা করলে তোমার জন্য জান্নাত নির্দিষ্ট

হবে। বরং হতে পারে তোমার আসল শত্রু তোমার সেই সন্তান, যে তোমার ঔরসে জন্মগ্রহণ করেছে। তারপর তোমার বড় শত্রু হচ্ছে তোমার সেই ধন-সম্পদ যেগুলোর তুমি মালিক হয়ে আছো। এ কারণে আল্লাহ্ তাআলা এখানেও সূরা আনফালে বলেছেন, যদি ধন-সম্পদ ও সন্তানের বিপদ হতে নিজেদের বাঁচিয়ে নিতে পার ও তাদের ভালবাসার উপর আল্লাহর ভালবাসাকে বিজয়ী রাখতে পারো ; তাহলে তোমাদের জন্য আল্লাহর কাছে অতিবড় মূল্য ও শুভফল হবে।–তাফহীমুল কুরআন

দুনিয়ার জীবনে আল্লাহর পথে চলার ব্যাপারে বহুসংখ্যক ঈমানদার পুরুষকে নিজের স্ত্রী হতে ও বহুসংখ্যক স্ত্রীলোককে নিজের স্বামী হতে এবং পিতা-মাতাকে তাদের সন্তানদের থেকে অসংখ্য প্রকারের দুঃখ-কষ্ট, বিপদ, অসুবিধা ও প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়। পুরুষের পক্ষে এমন স্ত্রী পাওয়া বা স্ত্রীর পক্ষে এমন স্বামী পাওয়া, যে ঈমান ও সততার জীবন যাপনে পরস্পরের পূর্ণ মাত্রায় সহযোগী ও সাহায্যকারী হবে। তারপর তাদের সন্তানদেরও আকীদা-বিশ্বাস, আমল ও স্বভাব-চরিত্রে তাদের মনমত ও চক্ষু শীতলকারী হবে—এমনটা খুব কমই ঘটে থাকে। সাধারণত দেখা যায় স্বামী ঈমানদার চরিত্রবান হলে স্ত্রী ও সন্তানাদি এমন হয় যারা তার ঈমানদারী, সততা ও বিশ্বস্ততাকে তাদের দুর্ভাগ্যের কারণ মনে করে। তারা চায় স্বামী বা পিতা তাদের জন্য এমন কাজ করুক, যাতে তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ বৃদ্ধি পায়—পরিণামে তাকে জাহান্নামে যেতে হলেও তাদের কোনো আপত্তি নেই। পক্ষান্তরে অনেক মুমিন স্ত্রীলোক এমন স্বামীর পাল্লায় পড়ে যে, তার শরীয়ত পালন করে চলাটা স্বামীর মোটেই সহ্য হয় না। সন্তানরা অসদাচারী পিতার পদাংক অনুসরণ করে ও অসৎকর্মে লিপ্ত হয়ে মায়ের জীবনকে দুঃসহ করে তোলে। বস্তুত কুফর ও ঈমানের দ্বন্দ্বে মুমিনের দায়িত্ব হলো আল্লাহ ও দীনের খাতিরে সর্বপ্রকার ক্ষতি ও দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে প্রস্তুত থাকা। কারাবরণ কিংবা দেশত্যাগ করে চলে যেতে হলেও অথবা জিহাদে শরীক হয়ে নিজের জীবন বিপদের মুখে ঠেলে দিতে হলেও কিছুমাত্র কুণ্ঠিত না হওয়া। প্রকৃত ঈমানের এটাই দাবী। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে একজন ঈমানদার স্বামীর পথে তার স্ত্রী ও সন্তানরাই বড় বাধা ও প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। মুসলিম সমাজেও ঈমানদার লোকদের জীবনে এরূপ অবস্থা সাধারণত লক্ষ্য করা যায়। আলোচ্য আয়াত ১৪ (প্রথমোক্ত) এর একটি প্রয়োগ সাধারণভাবে এ প্রেক্ষিতেই হতে পারে।

আয়াতটির আরেকটি প্রয়োগ সে সময়ের ঈমানদারদের বেলায় প্রযোজ্য যখন এটি নাযিল হওয়ার পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল তদানীন্তন মুমিনদের

বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে। তদানীন্তন মক্কা ও আরবের অন্যান্য অঞ্চলে সাধারণত এ পরিস্থিতি দেখা দিয়েছিল যে, একজন পুরুষ ঈমান আনলো, কিন্তু স্ত্রী-পুত্র পরিজন যে কেবল ঈমান আনতে প্রস্তুত ছিল না তাই নয়, বরং তাকেই ইসলাম থেকে বিরত রাখার বা ফিরিয়ে আনার জন্য দিনরাত চেষ্টা চালিয়ে যেতো। অনুরূপ অবস্থার সম্মুখীন হতো সেসব মহিলারাও যারা নিজেদের সমাজ পরিবেশে একাই ইসলাম গ্রহণ করতো ও ঈমানের পথে চলতো। অবশ্য বর্তমান সময়েও অমুসলিম সমাজে বা সেকুলার পরিবেশে ইসলামী অনুশাসন মান্যকারী বা ইসলামী আন্দোলনে অংশ গ্রহণকারী বহু লোকের জীবনে একই ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব হয়ে থাকে।–তাফহীমুল কুরআন

❐

তেতাল্লিশ

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا امْرَاتَ نُوْحٍ وَّامْرَاتَ لُوْطٍ ط كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتٰهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَّقِيْلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدّٰخِلِيْنَ ○

"আল্লাহ কাফিরদের জন্য নূহের স্ত্রী ও লূতের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন। এ দুজন ছিল আমার দুজন নেক বান্দার অধীন। কিন্তু তারা উভয়ই নিজ নিজ স্বামীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। ফলে নূহ ও লূত ওদেরকে 'আল্লাহর শাস্তি হতে রক্ষা করতে পারলো না। ওদের দুজনকেই বলা হলো, যাও আগুনে প্রবেশকারীদের সাথে তোমরাও প্রবেশ করো।"

–সূরা তাহরীম ঃ ১০

দুজন নেক বান্দার স্ত্রী ছিলেন দুজন বিশ্বাসঘাতক নারী

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা কাফিরদের ব্যাপারে দুজন নবীর স্ত্রীর দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। সেই দুই নারী হলো হযরত নূহ ও হযরত লূত আলাইহিস সালামের স্ত্রী। এরা দুজনই ছিল নিজ নিজ স্বামীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাকারিণী। হযরত নূহ আ.-এর স্ত্রী 'ওয়াগেলা' আর হযরত লূত আ.-এর স্ত্রীর নাম 'ওয়ালেহা'। এ দুজন মহিলা তাদের স্বামীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। কিন্তু তার মানে এ নয় যে, ওরা ব্যভিচারিণী ছিল। কারণ, কোনো নবীর স্ত্রীই ব্যভিচারিণী ছিল না। বরং এখানে বিশ্বাসঘাতক মানে ওরা ঈমানের দিক থেকে নিজ নিজ স্বামীর অনুসারী ছিল না। তারা উল্টো নবী স্বামীদের বিরুদ্ধে শত্রুদের সাহায্য ও সমর্থন করতো। হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, কোনো নবীর কোনো স্ত্রীই ব্যভিচারিণী হয়নি। এ.দুজনের বিশ্বাসঘাকতা (خيانت) ছিল দীনের ব্যাপারে। তারা নবী স্বামীর দীন গ্রহণ করেনি। হযরত নূহ আ.-এর স্ত্রী ঈমানদারগণের গোপন তথ্যাদি শত্রুদের পৌঁছে দিতো। আর হযরত লূত আ.-এর স্ত্রী তার ঘরে আসা নতুন নতুন লোকদের সম্পর্কে জাতির চরিত্রহীন লোকদেরকে খবর জানিয়ে দিতো। (ইবনে জারীর, তাফহীমুল কুরআন।) উদাহরণ হিসেবে উল্লিখিত এ দুজন নারী ধর্মের ব্যাপারে আপন আপন স্বামীর বিরুদ্ধাচারণ করেছিল এবং কাফির ও মুশরিকদের সাথে সম্পর্ক ও

যোগাযোগ রাখতো এবং ওদের কাছে মুসলমানদের গোপনীয় তথ্য ফাঁশ করে দিতো। পরিণামে তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হলো অন্যান্য জাহান্নামীদের সাথে। নবীর স্ত্রী হয়েও ঈমান-বিশ্বাসের তারতম্যের কারণে তথা দীন ইসলামের অনুসরণ না করার কারণে ওদের এ করুণ অবস্থা। আল্লাহ তাআলার প্রিয় বান্দা নবী-রসূলদের স্ত্রী হয়েও আদর্শিক পার্থক্যের কারণে ওদের পরিণাম ছিল ভয়াবহ। ওদের সেই ভয়াবহ পরিণতি থেকে ওদের স্বামীগণের নবী হওয়ার দোহাই পেড়ে নাজাত পায়নি তারা।

এসব দৃষ্টান্ত দিয়ে যে সত্যকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, তাহলো একজন মুমিনের ঈমান তার কোনো কাফির স্বজন ও আত্মীয়ের উপকারে আসতে পারে না। তাই নবী ও ওলীগণের পত্নীরা যেন নিশ্চিত না হয় যে, তারা তাদের স্বামীদের কারণে মুক্তি পেয়ে যাবে এবং কোনো কাফির পাপাচারীর স্ত্রী যেন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না হয় যে, স্বামীর কুফরী ও পাপাচার তার জন্য ক্ষতিকর হবে ; বরং প্রত্যেক পুরুষ ও নারীকে নিজেই নিজের ঈমান ও সৎকর্মের চিন্তা করা উচিত।

আয়াতে নবী পত্নীদের বিশ্বাসঘাতকতা বলে বুঝানো হয়েছে ওরা নিজ নিজ নবী (স্বামীর) উপর নবী হিসেবে ঈমান আনেনি, বিশ্বাসস্থাপন করেনি। বরং ওরা এ ব্যাপারে মুনাফিকীতে লিপ্ত ছিল। অধিকন্তু ওদের আন্তরিকতা ছিল স্বীয় কাফির লোকদের সাথে। যেমন নূহ আ.-এর স্ত্রী তাঁর সম্পর্কে এলাকার লোকদের বলতো, এতো মাজ্নুন—অস্বাভাবিক ব্যক্তি। হযরত লূত আ.-এর স্ত্রী নিজের বাড়ীতে আগত সুশ্রী লোকদের ব্যাপারে অসৎ লোকদের জানিয়ে দিতো। কেউ কেউ বলেছেন, এ দুই মহিলাই নিজেদের লোকদের মাঝে নিজেদের স্বামীর ব্যাপারে কুৎসা রচনা করতো। চোগলখুরী করে বেড়াতো। আয়াতে বলা হয়েছে, এ দুই মহিলার স্বামীগণ নবী হওয়া সত্ত্বেও ওরা নবী স্বামীর আনুগত্য ত্যাগ করেই ক্ষ্যান্ত হয়নি, অধিকন্তু ওরা নবীগণের শত্রুর সাথে সম্পর্ক ও যোগাযোগ রাখতো এবং নবীদের ও ঈমানদারগণের গোপনীয় তথ্যাদি দুশমনদের জানিয়ে দিতো। ওদের নিজেদের এ বদ-আমল ওদের জাহান্নামের দিকে ঠেলে দিলো। নবীর স্ত্রী হিসেবে কোনো নাজাত পায়নি ওরা।–মাওলানা সালাহুদ্দীন ইউসুফ, আল কুরআনুল করীম

আয়াতে বর্ণিত দৃষ্টান্ত থেকে জানা গেল যে, আল্লাহর কোনো কোনো অতি প্রিয় বান্দা নবী-রসূলগণের স্ত্রীও আদর্শগত সমস্যার সৃষ্টি করে নবী-রসূলদের বহু কষ্ট-যন্ত্রণা দিয়েছিল। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে

উঠলো যে, কারো নিজের ঈমান-আমল ঠিক না থাকলে আল্লাহর অতিপ্রিয় কোনো লোকের সাথে সম্পর্ক তাকে নাজাত দিতে পারে না।

সূরা তাহরীমের এ দশম আয়াত ও একাদশ আয়াতের মূল বক্তব্য হলো আল্লাহর দীন সম্পূর্ণ অকাট্য ও নিরপেক্ষ। প্রত্যেকে শুধু তাই পাবে, যা সে নিজের ঈমান আমলের ভিত্তিতে পাওয়ার যোগ্য ও অধিকারী। বড় কোনো ব্যক্তির সাথে বিশেষ কোনো সম্পর্ক কাউকেও বিশেষ ফায়দা দিতে পারে না ; পক্ষান্তরে কোনো নিকৃষ্টতম ব্যক্তির সম্পর্কও কারো জন্য কিছুমাত্র ক্ষতিকর নয়। এ পর্যায়ে নবী করীম স.-এর স্ত্রীগণের সামনে তিন ধরনের নারীর দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে। দশম আয়াতে হযরত নূহ ও লূত আ.-এর স্ত্রীদ্বয়ের দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে। তারা ঈমান আনলে এবং নিজেদের সম্মানিত স্বামীগণের সহযোগিতা করলে মুসলিম উম্মাহর কাছে তাদের মান-সম্মান হযরত মুহাম্মদ স.-এর স্ত্রীগণের মতই হতো। কিন্তু তারা এর সম্পূর্ণ বিপরীত নীতিতে চলায় নবীর স্ত্রী হওয়াটা তাদের কোনো কাজে আসল না। তারা জাহান্নামে যাওয়া থেকে নাজাত পাবে না। দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত পরবর্তী একাদশ আয়াতে (হযরত আসিয়ার) ফিরাউনের স্ত্রীর। তিনি ছিলেন আল্লাহর নিকৃষ্টতম শত্রুর স্ত্রী। কিন্তু তিনি যেহেতু ঈমান গ্রহণ করেছেন এবং ফিরাউনী কাজকর্ম ও নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত পথ ও নীতি গ্রহণ করেছেন। এজন্যে ফিরাউনের মত এতবড় এক কাফেরের স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর জন্য তা বিশেষ কোনো ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়নি। আল্লাহ তাআলা তাঁকে জান্নাতের অধিকারী করেছেন। তৃতীয় দৃষ্টান্ত হযরত মারইয়ামের। তাঁকে এতবড় মর্যাদা দেয়া হয়েছে শুধু এ কারণে যে, আল্লাহ তাআলা তাঁকে যে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করেছিলেন, তিনি সেজন্যে আনুগত্যের মস্তক অবনত করে দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন কুমারী। এ অবস্থায় তাঁর গর্ভে আল্লাহর হুকুমে সন্তানের সঞ্চার করে দেয়া হলো। হযরত মারইয়াম সেজন্যে কোনো কান্নাকাটি, চিৎকার, হাহাকার বা বিলাপ করলেন না। তিনি সবকিছু অকপটে সহ্য করে নিয়েছেন। কেননা আল্লাহর মর্জি রক্ষার জন্য তা সহ্য করা ছিল একান্তই অপরিহার্য। ঠিক তখনই আল্লাহ তাঁকে سيدة النساء فى الجنة 'জান্নাতীদের শ্রেষ্ঠ মহিলা' নামে অভিহিত করলেন।–মুসনাদে আহমদ থেকে তাফহীমুল কুরআন।

❑

ছয়াল্লিশ

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا امْرَاَتَ فِرْعَوْنَ م اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ وَنَجِّنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهٖ وَنَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ○ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرٰنَ الَّتِيْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهٖ وَكَانَتْ مِنَ الْقٰنِتِيْنَ ○ ع

"আল্লাহ মুমিনদের জন্য দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন ফিরাউনের স্ত্রীকে। যখন সে দোয়া করছিল, হে আমার রব! আমার জন্য জান্নাতে তোমার সান্নিধ্যে একখানা ঘর নির্মাণ করো আর আমাকে উদ্ধার করো ফিরাউন ও তার কার্যকলাপ হতে, আর আমাকে উদ্ধার করো যালিম সম্প্রদায় হতে। আরও দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন ইমরান কন্যা মারইয়ামের—যে তার সতীত্ব রক্ষা করেছিল। ফলে আমি তার মধ্যে রূহ্ ফুঁকে দিয়েছিলাম। সে তার রবের বাণী ও তার কিতাবসমূহ সত্য বলে গ্রহণ করেছিল। সে ছিল আমার একান্ত অনুগতদের অন্যতম।"–সূরা আত তাহরীম ঃ ১১-১২

আল্লাহদ্রোহী স্বামীর আল্লাহভক্ত স্ত্রী আর আল্লাহর অনুগত এক মহিয়ষী নারী

আলোচ্য আয়াতে ফিরাউন পত্নী হযরত আছিয়া বিনতে মুযাহিমের দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয়েছে। মূসা আ. যখন যাদুকরদের মুকাবিলায় সফল হন, ফলে যাদুকররা মুসলমান হয়ে যায়, তখন বিবি আছিয়া তাঁর ঈমান প্রকাশ করেন। এতে ফিরাউন ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে ভীষণ শাস্তি দিতে চাইলো। কতক রেওয়ায়াতে আছে ফিরাউন হযরত আছিয়ার দু হাত ও দু পায়ে পেরেক মেরে বুকের উপর ভারী পাথর রেখে দিল, যাতে তিনি নড়াচড়া পর্যন্ত করতে না পারেন। এমতাবস্থায় তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে এ আয়াতে বর্ণিত দোয়া করেন। কোনো কোনো রেওয়ায়াতে আছে, ফিরাউন উপর থেকে একটি ভারী পাথর তাঁর মাথার উপর ফেলে দিতে মনস্থ করলে তিনি এ দোয়া করেন। ফলে আল্লাহ তাআলা তাঁর রূহ কবজ করে নেন এবং পাথরটি নিষ্প্রাণ দেহের উপর পতিত হয়। তাঁর দোয়ার বাংলা অর্থ–"হে আমার পালনকর্তা! আপনি নিজের সান্নিধ্যে জান্নাতে আমার জন্যে একটি

গৃহ নির্মাণ করুন।" আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতেই তাঁকে জান্নাতের ঘর দেখিয়ে দেন।-তাফসীরে মাযহারী থেকে। আয়াতে বর্ণিত হযরত আছিয়ার দোয়ার মধ্যে ছিল وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ "আমাকে ফিরাউন ও তার কার্যকলাপ থেকে রক্ষা করো।" অর্থাৎ আমাকে তোমার শত্রু ও মুসলমানদের শত্রু ফিরাউন থেকে হিফাযত করো, আর তার আমল অর্থাৎ তার অন্যায়-অনাচার, যুল্ম ও স্বৈরাচারী কার্যকলাপ থেকেও আমাকে রক্ষা করো। তার এসব যুলমের অশুভ পরিণতিতে আমাকে শরীক করো না।"–তাফহীমুল কুরআন

আলোচ্য আয়াতে ফিরাউন পত্নী আছিয়ার এ দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে ঈমানদারদের জন্যে। অর্থাৎ তাদের জন্য এ দৃষ্টান্ত দেয়ার উদ্দেশ্য তাদের ঈমানের প্রতি উৎসাহিত করা, দীনের কাজে তাদের প্রেরণা দেয়া, ইসলামের পথে তাদের দৃঢ়পদ রাখা, দীনের ব্যাপারে কঠিন বিপদে সবর করার জন্যে। তাছাড়া এজন্যও যে, কুফরির প্রতিবন্ধকতা ও কঠোরতা ঈমানের এতটুকুনও ক্ষতি করতে পারে না, যেমন পারেনি ফিরাউন পত্নী আছিয়ার ব্যাপারে। যেই আছিয়া ছিল তৎকালীন সর্ববৃহৎ কাফিরের স্ত্রী। সেই কাফিরও তার স্ত্রীকে ঈমান থেকে ফিরাতে পারেনি। মূলত আল্লাহ তাআলা এখানে এ মযবুত ঈমানের অধিকারী নারী বিবি আছিয়ার ঈমানের দৃঢ়তার কথাটা তুলে ধরেছেন। এ থেকে বিশ্বের নিপীড়িত নির্যাতিত নারীর জন্য শিক্ষা গ্রহণের উদাহরণ-উপকরণ পাওয়া যায়, ঈমানের পথে দৃঢ় থাকার প্রেরণা মিলে।-আল কুরআনুল করীম ঃ মাওলানা সালাহুদ্দীন ইউসুফ।

হযরত আছিয়া যুগশ্রেষ্ঠ ইসলামের শত্রু ফিরাউনের স্ত্রী হয়েও হতে পেরেছেন একজন খাঁটি ঈমানদার, আল্লাহর ওলী। আলোচ্য আয়াতে তিনি আল্লাহর কাছে চারটি বিষয়ে দোয়া করেছেন বলে দেখা যায়। এক. আল্লাহর নৈকট্যলাভ এবং জান্নাতে তার জন্য স্থান নির্ধারণ, দুই. ফিরাউনের অধীনতা থেকে নাজাত দেয়া, তিন. ফিরাউনের বেঈমানী ও যুল্ম-অত্যাচার ইত্যাদির পরিণতি থেকে বিবি আছিয়াকে মুক্ত রাখা, চার. সকল বিধর্মী যালিম কওম থেকে তাকে নাজাত দেয়া। আয়াতের বাহ্যিক অর্থ থেকেই এটা বুঝা যায়।

হযরত থানভী রহ. বলেন, হযরত আছিয়ার এ দোয়া হয়তো স্বাভাবিক অবস্থায় করেছিলেন অথবা একটা বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে তিনি এ দোয়া করেছিলেন। সেই অবস্থাটা ছিল এই যে, যখন ফিরাউন বিবি আছিয়ার ঈমান আনার কথা জেনে গেল, তখন সে নির্দেশ দিল যে, আছিয়াকে বেঁধে যেন প্রখর রোদের মধ্যে শোয়ায়ে দেয়া হয় আর তাঁর বুকের উপর চাক্কির

পাথর চেপে দেয়া হয়। সেই বিশেষ অবস্থায় তিনি আল্লাহর দরবারে এ দোয়া করেছিলেন। দয়াময় আল্লাহ্ তাঁকে সেই সময় জান্নাতে তাঁর স্থান দেখিয়ে দিলেন। ফলে ফিরাউনের দেয়া শাস্তির তীব্রতা হ্রাস পেয়ে গেল। তাঁর মনে প্রশান্তি অনুভূত হলো।–আল কুরআনুল হাকীম ঃ মাওলানা আশরাফ আলী থানভী।

হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী রহ. আল কুরআনুল করীম এ উল্লেখ করেন, "ফিরাউন বিবি আছিয়ার ঈমান আনার খবর শুনলে তাঁর হাত-পা বেঁধে বহুবিধ শাস্তি দিতে থাকে। এমতাবস্থায় মেহেরবান আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁকে জান্নাতে তাঁর স্থান দেখানো হলো। ফলে সকল ধরনের শাস্তির যন্ত্রণা লাঘব হয়ে গেল। পরিশেষে ফিরাউন তাঁকে রাজনৈতিক কারণ দর্শিয়ে হত্যা করে ফেলে। এভাবে বিবি আছিয়া অত্যাচারী স্বামীর কবল থেকে নাজাত পান এবং শাহাদাতের পেয়ালা পান করে স্বীয় মালিকের দরবারে পৌঁছে যান। সহীহ হাদীস থেকে জানা যায়, নবী করীম স. তাঁর কামেল হওয়ার কথা ঘোষণা করেন এবং হযরত মারইয়ামের সাথে তাঁর আলোচনা করা হয়। তাঁর পবিত্র আত্মায় হাজার হাজার রহমত বর্ষিত হোক।"

অতপর মহিয়ষী নারী হযরত মারইয়াম-এর উল্লেখ করার উদ্দেশ্য এই যে, একটি বেঁকে বসা কওমের লোক তাদের মধ্যেই ছিল তার বসবাস। কিন্তু আল্লাহ তাকে দুনিয়া ও আখিরাতের মর্তবা-মর্যাদায় ধন্য করেছেন এবং সমস্ত পৃথিবীর নারী সমাজের উপর তাঁকে মর্যাদা দিয়েছেন। আয়াতের শেষাংশে হযরত মারইয়ামের প্রশংসা প্রকাশ পেয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَكَانَتْ مِنَ الْقٰنِتِيْنَ-

"সে ছিল অনুগতদের অন্যতম।"

এখানে قٰنِتِيْنَ শব্দটি قَانِتٌ শব্দের বহুবচন। এর অর্থ নিয়মিত ইবাদাতকারী। এ হচ্ছে হযরত মারইয়ামের পরিচিতি। হযরত আবু মূসা রা. বর্ণিত একটি হাদীসে রসূলুল্লাহ স. বলেন, পুরুষদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন কামেল ও সিদ্ধপুরুষ। কিন্তু নারীদের মধ্যে কেবল ফিরাউন পত্নী আছিয়া, ইমরান তনয়া মারইয়াম পুর্ণ্যতা লাভ করেছেন। বাহ্যত এখানে নবুওয়াতের গুণাবলী বুঝানো হয়েছে—যা নারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি অর্জন করেছেন।–তাফসীরে মাযহারী, তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন।

এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় মাওলানা সালাহুদ্দীন ইউসুফ তাঁর তাফসীর আল কুরআনুল করীমে বলেন, অর্থাৎ তিনি (মারইয়াম) এমন লোকদের

মধ্যে অথবা এমন বংশের মধ্যে ছিলেন, যারা ছিল খুব ইবাদাতকারী, অনুগত, সৎ ও যোগ্যতায় এবং আনুগত্যে অদ্বিতীয়। হাদীস শরীফে এসেছে, জান্নাতী নারীদের মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদাবান নারী হযরত খাদীজা রা., হযরত ফাতেমা রা., হযরত মারইয়াম এবং ফিরাউন পত্নী হযরত আছিয়া রা.-মুসনাদে আহমদ ১/২৯৩, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৯/২২৩।

অন্য এক হাদীসে আছে, পুরুষদের মধ্যে তো বহু লোক কামেল হয়েছে। কিন্তু নারীদের মধ্যে কামেল কেবল ফিরাউন পত্নী বিবি আছিয়া, মারইয়াম বিনতে ইমরান এবং খাদীজা বিনতে খোয়াইলিদ রা.। তাছাড়া হযরত আয়েশা রা.-এর মর্যাদা অন্যান্য নারীর উপরে এরূপ যেমন 'ছারীদ' সমস্ত খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।-সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম

এখানে ফিরাউনের স্ত্রী বিবি আছিয়াকে ইমরানের কন্যা মারইয়ামের সাথে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, ফিরাউনের স্ত্রী আল্লাহর কাছে কত উচ্চমর্যাদার অধিকারী ছিলেন, যার বদৌলতে তিনি মারইয়ামের সাথে উল্লেখ্যের যোগ্য হয়েছিলেন। তাঁর এ মহত্ব ও উচ্চমর্যাদার একমাত্র কারণ তাঁর জীবনের স্বতন্ত্র ঈমানী বৈশিষ্ট্য। এরা দুজন সতী, ঈমানদার, চরিত্রবান ও অনুগত মহিলার দৃষ্টান্ত স্বরূপ কুরআনে উল্লিখিত হয়েছে। এ দুজন নারীর দৃষ্টান্তকে আল্লাহ আল কুরআনে রসূলুল্লাহ স.-এর স্ত্রীগণের সামনে এবং পরবর্তী সকল প্রজন্মের মুমিন নারীদের সামনে তুলে ধরেছেন।-ফী যিলালিল কুরআন

❑

পঁয়তাল্লিশ

فَاِذَا جَآءَتِ الصَّآخَّةُ ۝ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ ۝ وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ ۝ وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ ۝ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَاْنٌ يُّغْنِيْهِ ۝

"যখন কিয়ামত উপস্থিত হবে, সেদিন মানুষ পলায়ন করবে তাঁর ভাই থেকে, তার মাতা আর তার পিতা থেকে এবং তার স্ত্রী ও সন্তানাদি থেকে। সেদিন প্রত্যেকেরই নিজের এক চিন্তা থাকবে, যা তাকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে।"–সূরা আবাসা ঃ ৩৩-৩৭

যেদিন মানুষ তার একান্ত আপনজন এমনকি স্ত্রী থেকেও পলায়ন করবে

আলোচ্য আয়াতসমূহে হাশরের ময়দানের ভয়াবহতার তীব্রতা সম্পর্কে বলা হয়েছে। এখানে প্রথম আয়াতে (৩৩নং) হযরত ইসরাফিলের শিংগা ফুঁকের ফলে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার কথাটা তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে فَاِذَا جَآءَتِ الصَّآخَّةُ "যখন আসবে মহানাদ।" এখানে الصَّآخَّةُ মানে 'কান বধিরকারী আওয়ায' অর্থাৎ ইসরাফিলের শিংগার এমন কঠোর আওয়ায যাতে মানুষের কান বধির হয়ে যাবে। তরজমায় শব্দটির অর্থ করা হয়েছে 'কিয়ামত' শব্দ দিয়ে। দ্বিতীয় আয়াত (৩৪নং) থেকে হাশরের দিন সকল মানুষের মহাসমাবেশের দিন মানুষের ব্যস্ততা, অস্থিরতা ও প্রত্যেকের নিজ নিজ মুক্তির অস্থিরতা সম্পর্কে বলা হয়েছে।

সেদিন প্রত্যেক মানুষ আপন চিন্তায় বিভোর হবে। দুনিয়ার জীবনে যেসব আত্মীয়তা ও সম্পর্কের কারণে মানুষ একে অপরের জন্য জীবন পর্যন্ত দিতে কুণ্ঠিত হয় না, হাশরের ময়দানে তারাই নিজ নিজ চিন্তায় এমন নিমগ্ন হবে যে, কেউ কারো খবরই নিতে পারবে না ; বরং সামনে দেখলেও মুখ লুকাবে। প্রত্যেকেই তার ভাই থেকে পালাবে, আপন মা-বাপ থেকে পালাবে, এমনকি নিজের অর্ধাংগিনী স্ত্রী ও প্রাণপ্রিয় সন্তানাদি থেকেও লুকাবে। এক কথায়, প্রত্যেক মানুষ নিজের নিস্তার ও নিষ্কৃতির চিন্তায় এমন অস্থির ও হয়রান থাকবে যে, নিজের প্রাণপ্রিয় সকল প্রকার আত্মীয়দের থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখবে।

দুনিয়ার জীবনে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা ভাইদের মধ্যে হয়ে থাকে। এর চেয়ে বেশী পিতা-মাতাকে সাহায্য করার চিন্তা হয় এবং স্বভাবগত কারণে এর চেয়েও বেশী স্ত্রী ও সন্তানদের সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। আয়াতগুলোতে নীচ থেকে উপরের সম্পর্ক যথাক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে।-তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন

لِكُلِّ امْرِءٍ شَأْنٌ يُّغْنِيْهِ 'প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ চিন্তায় থাকবে অস্থির হয়ে।' অথবা এর অর্থ নিজের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব থেকে সবাই থাকবে নিরপেক্ষ ও বেপরওয়া হয়ে। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, প্রত্যেক মানুষ হাশরের ময়দানে নগ্নদেহ, খালী পা ও খাতনাবিহীন হয়ে উঠবে। হযরত আয়েশা রা. জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে অন্যের লজ্জাস্থানের প্রতি দৃষ্টি পড়বে না ? রসূলুল্লাহ স. জবাবে এ আয়াতটি তিলাওয়াত করে শুনালেন।-তিরযিমী

মানুষের পরস্পর থেকে লুকানোর কারণ সম্পর্কে কেউ কেউ বলেছেন, মানুষ নিজ নিজ লোকদের থেকে পলায়ন করবে এজন্যে যেন সে ওদের কষ্ট-মুসিবত দেখতে না পায় যে কষ্ট-মুসিবতে তারা গ্রেফতার হয়ে পড়বে। কারো কারো মতে এজন্যে পলায়ন করবে, যেহেতু তারা জানবে যে, ওরা কারো কাজে আসবে না, কোনো উপকার করতে পারবে না।-ফতহুল কাদীর থেকে মাওলানা সালাহুদ্দীন ইউসুফ।-আল কুরআনুল করীম, উর্দু

সূরা মাআরিজ এর এক থেকে চৌদ্দ পর্যন্ত আয়াতসমূহেও প্রায় এ ধরনের কথাই বলা হয়েছে। 'পালাবে' বলে যে কথাটি বুঝানো হয়েছে, তার একটি অর্থ এরূপও হতে পারে যে, মানুষ সেদিন তার নিকটতম আত্মীয়-স্বজনকে সেই কঠিন বিপদের সম্মুখীন দেখতে পেয়ে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসবে না ; বরং সে দূরে সরে যাবে। তখন তার ভয় হবে এরা তাকে সাহায্যের জন্য ডাকলে সে তো কিছুই করতে পারবে না। একথাটির আরও একটি অর্থ হতে পারে। তাহলো, দুনিয়ার জীবনে মানুষ আল্লাহর ভয় ভুলে গিয়ে পরকালকে উপেক্ষা করে পরস্পরের জন্য যে গুনাহ করেছে এবং একে অপরকে গোমরাহ করেছে, তার খারাপ পরিণতি সম্মুখে আসতে দেখে তাদের প্রত্যেকে অপরের নিকট থেকে দূরে পালাবে ; যেন সে নিজের গোমরাহী ও গুনাহর জন্য তাকে দায়ী করে বসতে না পারে। ভাই ভাইকে, সন্তান পিতা-মাতাকে, স্বামী স্ত্রীকে এবং পিতা-মাতা সন্তানকে ভয় করবে যে সে হয়ত তার বিরুদ্ধে আল্লাহর দরবারে সাক্ষ্য দিয়ে বসবে। এ ভয়ে সেসব আপনজন থেকে দূরে পালাবে।-তাফহীমুল কুরআন

হাশরের মাঠে সকল মানুষের উলংগ হয়ে উঠার হাদীসটি বিভিন্ন সূত্র এ সনদে কিছু পার্থক্যসহ নিম্নরূপে বর্ণিত হয়েছে ঃ নবী করীম স. বলেছেন, কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে সকল মানুষ সম্পূর্ণ নগ্ন ও উলংগ অবস্থায় উত্থিত হবে। রসূলুল্লাহ স.-এর বেগমদের একজন, কোনো কোনো বর্ণনা মতে হযরত আয়েশা রা. অপর এক বর্ণনা মতে হযরত সওদা রা. আবার অন্য একটি বর্ণনা মতে কোনো একজন মহিলা ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের গোপন অংগসমূহ সেদিন সকলের সম্মুখে অনাবৃত ও উন্মুক্ত হবে ? জবাবে নবী করীম স. আয়াতগুলো তিলাওয়াত করে বলে দিলেন, "সেদিন কারো প্রতি তাকাবার মত হুশজ্ঞান কারো থাকবে না।"–নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনে আবু হাতীম, ইবনে জারীর, তাবারানী, ইবনে মারদুইয়া, বায়হাকী, হাকেম ইত্যাদির বরাতে তাফসীরে তাফহীমুল কুরআন।

❑

ছেচল্লিশ

تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ۝ مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ۝ سَيَصْلٰى نَارًا
ذَاتَ لَهَبٍ ۝ وَّامْرَاَتُهٗ ط حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۝ فِىْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ۝

"ধ্বংস হোক আবু লাহাবের হস্তদ্বয় এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও। তার কোনো কাজে আসেনি তার ধন-সম্পদ আর যা সে উপার্জন করেছে। অচিরেই সে প্রবেশ করবে লেলিহান অগ্নিতে। তার স্ত্রী—যে ইন্ধন বহন করে, তার গলায় পাকানো রজ্জু নিয়ে।"–সূরা লাহাব

খড়ী বাহক যে নারী গলায় লোহার শিকল নিয়ে প্রবেশ করবে লেলিহান অগ্নিতে

'সূরা লাহাব' রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আপন চাচা আবু লাহাবের নাম ধরে নাযিল হয়েছে। এতে আবু লাহাবের দোষ প্রচার করা হয়েছে। যদিও মক্কা ও মদীনায় আবু লাহাবের চেয়ে ইসলাম ও রসূলের অধিক শত্রুতাকারী অনেক লোক বর্তমান ছিল, কিন্তু তাদের কারো নাম ধরে কুরআনে তার দোষ বলা হয়নি। তাই প্রশ্ন জাগে কোন্ বিশেষ কারণে কুরআনে এ লোকটির নাম দিয়ে তার দোষ প্রচার করা হলো ? প্রশ্নটির জবাব পেতে হলে তদানিন্তন আরব সমাজ ও রসূলের ব্যাপারে আবু লাহাবের ভূমিকার কথা সুস্পষ্টভাবে জানতে হবে।

আবু লাহাবের স্ত্রীর অযথা নবী স.-এর প্রচণ্ড বিরোধিতা ও ভয়ানক শত্রুতার পরিণতি সম্পর্কেও বলা হয়েছে এ সূরার শেষাংশে। উভয়ের পরিণতি হলো লেলিহান অগ্নি শিখাপূর্ণ জাহান্নামের শাস্তি। কারণ, তারা উভয়ই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অমানবিক যন্ত্রণাদানে এবং ইসলামের বিরোধিতায় ছিল অগ্রগামী ও কঠোর।

প্রাচীনকালে সমগ্র আরব ভূমিতে সর্বত্র ব্যাপক অশান্তি, উচ্ছৃংখলতা, লুটতরাজ ও চরম অরাজকতা বিরাজিত ছিল। নিজের বংশ-পরিবার ও রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়-স্বজনের প্রত্যক্ষ সাহায্য ও সহযোগিতা ছাড়া সেই সমাজে নিজের জান-মাল ও মান-সম্মান রক্ষা করা কোনো ব্যক্তির পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। শত শত বছর ধরে এমনি অবস্থা বিরাজিত ছিল। তাই

আরব সমাজের নৈতিক মূল্যমানে 'সেলায়ে রেহ্মী'—নিকটাত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহারের সম্পর্ক অত্যন্ত বেশী গুরুত্ব লাভ করেছিল। এ সম্পর্ক ছিন্ন করা, কিংবা তার যথাযথ মর্যাদা রক্ষা না করা এবং এর হক আদায় না করা সে সমাজে বড় পাপ বলে মনে করা হতো। এ নৈতিক আদর্শকে জাহেলিয়াতের যামানায় আরবের লোকেরাও খুবই সম্মানার্হ ও অবশ্য পালনীয় মনে করতো। কিন্তু সেই সমাজের একটি মাত্র লোক ইসলামের শত্রুতা করতে গিয়ে এ আদর্শ লংঘন করে বসলো। এ লোকটি ছিল আবদুল মুত্তালিবের পুত্র আবু লাহাব। সে ছিল নবী করীম স.-এর আপন চাচা ! আরবে তখন চাচাকে পিতার সমান শ্রদ্ধেয় ও সম্মানার্হ মনে করা হতো। বিশেষত ভ্রাতুষ্পুত্র পিতৃহীন হলে চাচাই তাকে নিজের সন্তানের মত ভালবাসবে, তদানীন্তন আরব সমাজে চাচার প্রতিই এমন আশা-ভরসা ছিল। কিন্তু এ ব্যক্তি ইসলামের সাথে চরম শত্রুতা ও কুফর প্রীতির কারণে আরব সমাজের এ চিরন্তন রীতি লংঘন করতেও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হলো না।

কুরআনের আয়াত وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ—"তোমার নিকটাত্মীয়দের ভয় দেখাও—সাবধান করে দাও" আয়াতটি যখন নাযিল হয়, তখন একদা ভোরবেলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'সাফা' পর্বতের চূড়ায় উঠে উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করে বললেন, 'يَا صَبَاحَاهُ'—হায় ভোরবেলার বিপদ।' তৎকালীন আরবে কেউ যদি নিজের কবিলার উপর শত্রুকে আক্রমণ চালাতে আসতে দেখতো। তাহলে সেই ব্যক্তি পাহাড়ে উঠে এরূপ চিৎকার দিতে থাকতো। এ ছিল তৎকালীন আরবের সাধারণ নিয়ম। নবী করীম স.-এর এ চিৎকার শুনে কুরাইশ বংশের সকল গোত্রের লোক অথবা তার প্রতিনিধি সেখানে এসে উপস্থিত হলো। এ সময় তিনি তাদের প্রত্যেক গোত্রের নাম নিয়ে নিয়ে সাবধান বাণী শুনালেন—দীনের দাওয়াত দিলেন। তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই এবং অন্য কেউ কিছু বলার আগেই নবী করীম স.-এর চাচা আবু লাহাব বলে উঠলো ঃ تَبًّا لَكَ اَلِهٰذَا جَمَعْتَنَا ؟ তোর সর্বনাশ হোক, একথা বলার জন্যই কি তুই আমাদের একত্রিত করেছিস ? এক বর্ণনা মতে, একথা বলতে বলতে আবু লাহাব নবী করীম স.-এর প্রতি নিক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে একটি পাথরও হাতে তুলে নিয়েছিল।-বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, ইবনে জরীর প্রভৃতি থেকে তাফহীমুল কুরআন।

ইবনে যায়েদ-এর বর্ণনা অনুযায়ী একদিন আবু লাহাব নবী করীম স.-কে জিজ্ঞেস করলো, "আমি যদি তোমার প্রচারিত দীন কবুল করি,

তাহলে আমি কি পাব ?" উত্তরে নবী করীম স. বললেন, "সব ঈমানদার যা পাবে আপনিও তা পাবেন।" সে বললো, "আমার জন্য বাড়তি মর্যাদা কিছু হবে না ?" নবী করীম স. বললেন, "আপনি আর কি চান ?" তখন সে বললো ঃ

تَبًّا لِّهٰذَا الدِّيْنَ تَبًّا اَنْ اَكُوْنَ وَهٰؤُلَاءِ سَوَاءً-

"ধ্বংস হোক এ দীন যাতে আমি ও অন্যান্য লোক সমান হয়ে যাব।"

এ লোকটি (আবু লাহাব) মন-মানসিকতার দিক থেকে কি এক ভয়ানক খবীস লোক ছিল, তা একটি ঘটনা হতেই প্রকট হয়ে উঠে। নবী করীম স.-এর পুত্র কাশেমের পর তাঁর দ্বিতীয় পুত্র আবদুল্লাহরও ইন্তেকাল হয়ে গেল। তখন এ লোকটি ভাইপোর জন্য শোক প্রকাশ করার পরিবর্তে বিশেষ আনন্দে ও অত্যন্ত খুশীতে উৎফুল্ল হয়ে উঠে এবং কুরাইশ সরদারদের কাছে গিয়ে গিয়ে যেন একটা অতি বড় সুসংবাদ দিতে লাগলো এই বলে যে, শুনলে ? আজ তো মুহাম্মাদের নাম-নিশানাও মুছে গেল। তার এ অমানবিক মনোভাব প্রকাশের প্রেক্ষিতে সূরা কাউসার নাযিল হয়।

নবী করীম স. দীনের দাওয়াত দেয়ার জন্য যেখানে যেখানে যেতেন এ লোকটি তাঁর পেছনে পেছনে গিয়ে লোকদেরকে তাঁর বক্তব্য শুনা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করতো। হযরত রবীয়া ইবনে আব্বাদ দেয়ালী বলেন, "আমি অল্পবয়স্ক ছিলাম। একদিন আমি পিতার সাথে যুলমাযায এর বাজারে গেলাম। দেখলাম নবী করীম স. বলছেন, يَاَيُّهَا النَّاسُ قُوْلُوْا لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ تُفْلِحُوْنَ। "হে লোকেরা! বলো, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তবেই তোমরা কামিয়াব হবে, কল্যাণ পাবে।" দেখলাম তাঁর পেছনে পেছনে আর একটি লোক বলছে, এ লোকটি মিথ্যাবাদী। এ লোক পৈতৃক ধর্ম ত্যাগ করেছে।" আমি জিজ্ঞেস করলাম, "এ লোকটি কে ?" লোকেরা বললো, "এতো তাঁর চাচা, আবু লাহাব।"-মুসনাদে আহমদ, বায়হাকী থেকে তাফহীমুল কুরআন।

মোটকথা, আবু লাহাব নবী করীম স.-এর বিরোধিতায় এ ধরনের অত্যন্ত নীচ ও হীন কাজে সদাসর্বদা লিপ্ত থাকতো। ঠিক এ কারণেই এ সূরায় আবু লাহাবের নাম ধরে তার হীন কার্যকলাপের সমালোচনা করা হয়েছে।

আবু লাহাবের স্ত্রীও নবী করীম স.-এর প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণের ক্ষেত্রে তার চেয়ে কম ছিল না। সে রাতের অন্ধকারে নবী করীম স.-এর দরজার সামনে কাঁটাযুক্ত আগাছা-পরগাছা এনে ফেলে রাখতো। এ ছিল

তার নিত্যকার অভ্যাস। এ মহিলাটির নাম ছিল 'আরওয়া'। উম্মে জামিল ছিল তার উপনাম। সে ছিল আবু সুফিয়ানের ভগ্নি। এ মহিলা নবী করীম স.-এর সাথে শত্রুতার ব্যাপারে তার স্বামী আবু লাহাবের চেয়ে কিছুমাত্র পেছনে ছিল না। হযরত আবু বকর রা.-এর কন্যা হযরত আসমা রা. বলেন, এ সূরাটি যখন নাযিল হয় ও উম্মে জামিল তা শুনতে পায়, তখন সে ক্রোধে আগুনের মত জ্বলে উঠে এবং রাসূলুল্লাহ স.-এর খোঁজে বের হয়ে পড়ে। তার হাতে ছিল একমুষ্টি পাথর। নবী করীম স.-এর কুৎসা রটনা প্রসংগে নিজেই কবিতা রচনা করে তা আবৃত্তি করতে করতে সে অগ্রসর হচ্ছিল। যখন সে হেরেম শরীফে উপস্থিত হলো, তখন সেখানে নবী করীম স.-এর সাথে হযরত আবু বকর রা.-ও বসেছিলেন। হযরত আবু বকর রা. বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেই মহিলাটি আসছে। আপনার সাথে সে কোনোরূপ অন্যায় আচরণ করে ফেলতে পারে বলে আমার আশংকা হচ্ছে।" তখন নবী করীম স. বললেন, "সে আমাকে দেখতেই পাবে না।" বাস্তবে তা-ই হলো। নবী করীম স. সেখানে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও সে তাঁকে দেখতে পেল না। তাই সে হযরত আবু বকর রা.-কে বললো, "শুনলাম তোমাদের সংগী (নবী) নাকি আমার কুৎসা রটনা করছে ?" হযরত আবু বকর রা. বললেন, "এ ঘরের রব-এর নামে শপথ করে বলছি, তিনি তো তোমার কোনো কুৎসা করেননি।" একথা শুনে সে ফিরে গেল।-সীরাতে ইবনে হিশাম এর বরাতে তাফহীমুল কুরআন।

হযরত আবু বকর রা.-এর এরূপ উত্তরদানের তাৎপর্য হলো প্রকৃতপক্ষে আবু লাহাবের স্ত্রীর কুৎসা করেছে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা ; রসূলুল্লাহ স. নিজে তো কিছুই করেননি, কিছুই বলেননি। কারণ সূরা লাহাব তো আল্লাহই নাযিল করেছেন।

এ সূরায় এ মহিলাকে حَمَّالَةَ الْحَطَبِ অর্থ কাষ্ঠবহনকারীণী বলা হয়েছে। মুফাস্‌সিরীনে কিরাম এ কথার কয়েকটি তাৎপর্যের উল্লেখ করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা, ইবনে যায়েদ রা. দাহ্‌হাক ও রুবাই ইবনে আনাস বলেন, আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামিল রাতের অন্ধকারে কাঁটাযুক্ত গাছের ঢাল কুড়িয়ে এনে রসূলে করীম স.-এর ঘরের দরজায় ফেলে রাখতো। এ কারণে তাকে এ সূরায় কাষ্ঠবহনকারীণী বলা হয়েছে। কাতাদাহ, ইকারামা, হাসান বসরী, মুজাহিদ ও সুফিয়ান সওরী বলেন, এ মহিলা লোকদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কুটনাগিরি করে বেড়াতো। একজনের বিরুদ্ধে অন্যজনকে ক্ষেপিয়ে তুলতে চেষ্টা করতো। এ কারণে আরবী প্রচলন অনুযায়ী তাকে কাষ্ঠবহনকারীণী বলা হয়েছে। কেননা যে ব্যক্তি

একদিকের কথা অন্যদিকে বলে পরস্পরের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদের আগুন ধরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে বেড়ায় তাকে আরবরা حَمَّالَةَ الْحَطَبِ - ('কাষ্ঠবহনকারীণী') বলে। সাইদ ইবনে যুবায়ের বলেন, যে লোক গুনাহের বোঝা নিজের মাথায় তুলে নেয় তার সম্পর্কে আরবী প্রচলন অনুযায়ী বলা হয় فُلَانٌ يَحْطِبُ عَلَى ظَهْرِهِ 'অমুক ব্যক্তি নিজের পিঠে কাষ্ঠ বোঝাই করে।' অতএব حَمَّالَةَ الْحَطَبِ মানে গুনাহের বোঝা বহনকারীণী। মুফাস্‌সিরীনে কিরাম এর আরও একটি অর্থ বলেছেন, তাহলো আবু লাহাবের স্ত্রী সম্পর্কে ঘোষিত একথাটি এ দুনিয়ার জীবন সম্পর্কে নয়। এটা বরং পরকালীন জীবন সম্পর্কিত কথা। অর্থাৎ আখিরাতের জীবনে সে মহিলা কাষ্ঠ এনে এনে সেই আগুনে নিক্ষেপ করবে যাতে তার স্বামী আবু লাহাব জ্বলতে থাকবে।

—তাফহীমুল কুরআন

খড়িবাহক বা কাষ্ঠবহনকারীণী এ মহিলাটি লেলিহান শিখাপূর্ণ আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার সময় তার গলায় পেঁচানো থাকবে শক্ত শিকল। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব, হাসান বসরী ও কাতাদাহ বলেন, আবু লাহাবের স্ত্রী সবসময় একটি মূল্যবান হার গলায় পরিধান করে থাকতো। সে বলতো লাত উজ্জার শপথ, আমি আমার এ হার বিক্রি করে এর মূল্য স্বরূপ প্রাপ্ত অর্থ মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে ব্যয় করবো। এ কারণে এখানে বলা হয়েছে فِي جِيدِهَا মানে তার অলংকার পরিহিত গলা আসলে বিদ্রূপ স্বরূপ বলা হয়েছে। অর্থাৎ জাহান্নামে তার অলংকার শোভামণ্ডিত গলায়—যার হার নিয়ে সে গৌরব করে—শক্ত রশি দিয়ে বাঁধা থাকবে। এটা মূলত কুরআনের এক বিশেষ ধরনের বিদ্রূপ ভংগি। কুরআনের বেশ কটি আয়াতে এরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যেমন একটি আয়াত فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ তাদেরকে কঠোর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও। এ দুটো কথা একই ধরনের বিদ্রূপাত্মক কথা।

আল্লাহর হাবীব মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে শত্রুতাকারী এ বিষাক্ত মনের অধিকারী মহিলার গলায় জড়ানো রশি সম্পর্কে এ সূরায় বলা হয়েছে, তাহলো حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ অর্থাৎ সেই রশি হবে 'মাসাদ' টাইপের। আভিধানিক ও তাফসীরবিদগণ এ مَسَدٌ শব্দের কয়েক অর্থ বলেছেন। এক অর্থ 'মাসাদ' হলো 'খুব বেশী পাকানো শক্ত রশি।' দ্বিতীয় অর্থ 'মাসাদ' মানে 'খেজুরের ছাল দিয়ে তৈরি রশি।' তৃতীয় কথা হলো উটের চামড়া কিংবা পশমের তৈরি রশিই হলো 'মাসাদ'। শব্দটির আরেক অর্থ হলো লোহার তার জড়ানো মযবুত রশি।' মোটকথা দুনিয়ার জীবনে আল্লাহর রসূলের সাথে শত্রুতায় স্বামীর সাথে পাল্লা দিয়ে এ মহিলাটি যেমন বিভিন্ন ষড়যন্ত্র করেছিল, তাদের উভয়কে এর পরিণামও ভোগ করতে হবে তেমনি কঠোরভাবে।

সাতচল্লিশ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۝ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ۝ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۝

"বলো, আমি আশ্রয় চাই প্রভাতের স্রষ্টার কাছে, সেসবের অনিষ্ট হতে যা তিনি সৃষ্টি করেছেন, রাতের অনিষ্ট হতে যখন তা গভীর হয় এবং অনিষ্ট হতে সেসব নারীর যারা গিরায় ফুঁক দিয়ে যাদু করে, আর হিংসুকের অনিষ্ট হতে যখন সে হিংসা করে।"–সূরা ফালাক

সাধারণত নারীরা যাদুটোনা করে থাকে বা তাদের মাধ্যমে যাদু করা হয়

আল কুরআনের সর্বশেষ দুটো সূরা 'সূরা ফালাক ও 'সূরা নাস।' দুটো সূরা একই বিষয়ে ও একই ঘটনা উপলক্ষে নাযিল হয়েছে। এজন্যে কোনো কোনো মুফাস্সির উভয় সূরার তাফসীর একত্রে লিখেছেন। তাছাড়া সূরা দুটোর একটা নামকরণ করা হয়েছে, আর তাহলো المعوذتين। 'আল মুআওয়াযাতাইন'। বস্তুত বনী আদম আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হলেও তাদের অমিষ্টকারীর সংখ্যাও কম নয়। আর সকল অনিষ্টকারী বা সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে মানবজাতিকে রক্ষা করতে পারে একমাত্র রাব্বুল আলামীন। তাই মেহেরবান আল্লাহ তাআলা আল কুরআনে মানবজাতির প্রকৃত সফলতা লাভের জন্য 'সিরাতুল মুস্তাকীম' বা সরল পথের নির্দেশনা দান শেষে তাদের সম্ভাব্য সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণেরও শিক্ষা দিয়েছেন এ দুটো সূরার মাধ্যমে।

ইহুদীদের মিত্র মুনাফিক লবীদ ইবনে আ'সাম আল্লাহর নবী মুহাম্মাদ স.-কে যাদু করেছিল। তিনি এতে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। মুসনাদে আহমদের রেওয়ায়াত অনুযায়ী রসূলুল্লাহ স.-এর এ অসুখ ছয় মাস স্থায়ী ছিল। আল্লাহ তাআলা এ দুটো সূরা নাযিল করলে আল্লাহর নবী তা পড়ে যাদু থেকে আরোগ্য লাভ করেন। পাপীষ্ঠ লবীদ তার কন্যাদের মাধ্যমে রসূলুল্লাহ স.-কে যাদু করে। সে একটি সূতোয় এগারটি গিরা দিয়ে যাদু করিয়েছিল। আর এ দুটো সূরায়ও ঠিক এগারটি আয়াত রয়েছে। আল্লাহর নবী এক একটি আয়াত পড়ে এক একটি গিরা খুলতে থাকেন। এগারতম

গিরা খোলা শেষ হওয়ার সাথে সাথে তাঁর অনুভব হলো যেন এক বিরাট ভারী বোঝা তাঁর মাথা থেকে সরে গেছে।

যারা যাদুর স্বরূপ সম্পর্কে অবগত নয় তাদের মনে প্রশ্ন জাগে আল্লাহর রসূলের উপর যাদুর ক্রিয়া হলো কিভাবে ? যাদুর স্বরূপ ও এর ক্রিয়া সম্পর্কে সূরা বাকারায় বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। আসলে যাদুর ক্রিয়াও আগুন-পানির ক্রিয়ার মত। আগুন গরম করে বা পুড়িয়ে দেয়, পানি শীতল করে বা ভিজিয়ে দেয়—এ হলো আগুন ও পানির স্বাভাবিক ক্রিয়া। নবী-রসূলগণও এসবের ক্রিয়ার বাইরে নয়। যাদুর ক্রিয়াও ঠিক আগুন-পানির ক্রিয়ারই ন্যায়। কাজেই নবী-রসূলগণের যাদুগ্রস্ত হওয়া অসম্ভব বা অবাস্তব কিছু নয়।-তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন

পাঁচ আয়াত বিশিষ্ট সূরা ফালাক। প্রথম দু আয়াতে আল্লাহর আশ্রয় চাওয়ার শিক্ষা দেয়া হয়েছে সকল সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে। তৃতীয় আয়াতে আশ্রয় চাওয়ার শিক্ষা রয়েছে রাতের অন্ধকারে জিন ও মানুষের দুষ্ট শ্রেণীর যাবতীয় অনিষ্ট থেকে। বিশেষত রাত যখন অতি গভীর ও ঘনীভূত হয়ে আসে তখনই মানুষের চিরশত্রু শয়তান—জিন শয়তান ও মানুষ শয়তান মানব সাধারণের জান-মাল ও অর্থ-সম্পদের ক্ষতি করে, রোগ-শোক, চুরি-ডাকাতি, প্রতারণা প্রবঞ্চনা ও সন্ত্রাসী কার্যক্রমের মাধ্যমে তাদের উপর চড়াও হয়। চতুর্থ আয়াতে আশ্রয় প্রার্থনার শিক্ষা রয়েছে গিরায় ফুঁক দিয়ে অন্য মানুষকে ক্ষতিকারী বা ক্ষতিকারিণীর অনিষ্ট থেকে। এখানে বলা হয়েছে وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ অর্থ আর আশ্রয় চাই গিরায় ফুঁকদানকারিণীর অনিষ্ট থেকে। যারা যাদু করে তারা ডোর ইত্যাদিতে যাদুর মন্ত্র পড়ে ফুঁক দিয়ে গিরা দেয়। আয়াতে نفث মানে ফুঁক আর عقد মানে গিরা। نفّٰثٰت শব্দ যদি نفوث এর বিশেষণ হয় তাহলে এর অর্থ ফুঁকদানকারী পুরুষ ও নারী উভয় হতে পারে। এখানে نفّٰثٰت স্ত্রীলিংগের শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যাদুর কাজ সাধারণত নারীরাই করে এবং জন্মগতভাবে এর সাথে তাদের সম্পর্কই বেশী। সর্বোপরি যে বিশেষ ঘটনায় এ সূরাটি নাযিল হয় তাহলো রসূলুল্লাহ স.-কে যাদু করার ঘটনা। আর সেই ঘটনার মূল নায়ক পুরুষ হলেও মূলত যাদুকরের সেই পাপিষ্ঠের কন্যারাই পিতার আদেশে রসূলুল্লাহ স.-এর উপর যাদু করেছিল।-মাআরেফুল কুরআন

যাদু সম্পর্কে একটা কথা মনে রাখা আবশ্যক। এতে করে অন্য লোকের উপর খারাপ ক্রিয়া সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে শয়তান বা খবীস রূহ কিংবা

তারকার সাহায্য চাওয়া হয়। এ কারণে কুরআন শরীফে যাদুকে কুফরী বলা হয়েছে। সূরা আল বাকারার ১০২ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ -

"সুলায়মান কুফরী করেনি—শয়তানরাই কুফরী করেছিল। ওরা লোকদেরকে যাদু শিক্ষা দিচ্ছিলো।"

এমনকি যাদুতে যদি কোনো কুফরী কথা বা শেরকী কাজ নাও থাকে তবুও তা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। নবী করীম স. যাদুকে পরকাল বিনষ্টকারী সাতটি কবীরা গুনাহর মধ্যে গণ্য করেছেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে যে, নবী করীম স. বলেছেন, তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে দূরে থাক। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেই সাতটি কাজ কি কি ? তিনি বললেন, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, যাদু করা, আল্লাহর হারাম করা প্রাণ হত্যা করা, সুদ খাওয়া, ইয়াতীমের সম্পদ খাওয়া, জিহাদের ময়দানে শত্রুর মুকাবিলা না করে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করা ও পালিয়ে যাওয়া, আর নির্দোষ সতী-সাধ্বী ঈমানদার নারীর উপর যিনার—ব্যভিচারের মিথ্যা অভিযোগ তোলা।–তাফহীমুল কুরআন

সমাপ্ত

আমাদের প্রকাশিত কিছু বই

- পর্দা ও ইসলাম
  - সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.
- স্বামী স্ত্রীর অধিকার
  - সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.
- মুসলিম নারীর নিকট ইসলামের দাবী
  - সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.
- মুসলিম মা বোনদের ভাবনার বিষয়
  - অধ্যাপক গোলাম আযম
- মহিলা সাহাবী
  - তালিবুল হাশেমী
- সংগ্রামী নারী
  - মুহাম্মদ নূরুযযামান
- মহিলা ফিকহ(১-২ খণ্ড)
  - আল্লামা আতাইয়া খামীস
- ইসলাম ও নারী
  - মুহাম্মদ কুতুব
- ইসলামী সমাজে নারী
  - সাইয়েদ জালালুদ্দিন আনসার উমরী
- আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা
  - আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাদ
- পর্দা প্রগতির সোপান
  - অধ্যাপক মাজহারুল ইসলাম
- একাধিক বিবাহ
  - সাইয়েদ হামেদ আলী
- নারী নির্যাতনের কারণ ও প্রতিকার
  - শামসুন্নাহার নিজামী
- নারী মুক্তি আন্দোলন
  - শামসুন্নাহার নিজামী
- পর্দা একটি বাস্তব প্রয়োজন
  - শামসুন্নাহার নিজামী
- আদর্শ সমাজ গঠনে নারী
  - শামসুন্নাহার নিজামী
- পর্দা কি প্রগতির অন্তরায়?
  - সাইয়েদা পারভীন রেজভী